সাঁওতাল পরগণার সাঁওতাল জনজাতির সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিবর্তন ও পরিবেশভাবনা (১৮৫৫-১৯৬৪)

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা শাখার ইতিহাস বিভাগের অধীনে পিএইচ.ডি উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা সন্দর্ভ

গবেষক

পার্থ মন্ডল

নিবন্ধনসংখ্যা- A00HI1501319

ইতিহাস বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক মহুয়া সরকার

ইতিহাস বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা- ৭০০০৩২

২০২৩

Certified that the Thesis entitled

সাঁওতাল পরগণার সাঁওতাল জনজাতির সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিবর্তন ও পরিবেশভাবনা (১৮৫৫-১৯৬৪) submitted by me for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the Supervision of Prof.Mahua Sarkar, Department of History, Jadavpur University, and that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere/elsewhere.

Countersigned by the Supervisor   Signature of the Candidate

Dated: Dated :

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	i-iii
সারণি সূচি	iv
মানচিত্র সূচি	v
চিত্র সূচি	vi
ভূমিকা	১-৩৩
প্রথম অধ্যায়	৩৪-৯৩
সাঁওতাল পরগণার গঠন, ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য এবং ঐতিহ্যশালী সাঁওতাল সমাজ ও সংস্কৃতি	
দ্বিতীয় অধ্যায়	৯৪-১৬১
প্রশাসনিক ব্যবস্থা, মিশনারি ও হিন্দু সংস্কৃতির প্রভাব	
তৃতীয় অধ্যায়	১৬২-২১১
সাঁওতাল পরগণার সাঁওতালদের অর্থনৈতিক অবস্থা ও অভিপ্রয়াণ	
চতুর্থ অধ্যায়	২১২-২৫৪
স্বাধীনতা পরবর্তী উন্নয়ন ও সাংবিধানিক রীতিনীতি : ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের প্রেক্ষাপট	
পঞ্চম অধ্যায়	২৫৫-২৮৯
সাঁওতাল পরগণার সাঁওতাল সমাজ-সংস্কৃতিতে পরিবেশের প্রভাব	
উপসংহার	২৯০-২৯৯
পরিশিষ্ট ১ : সাক্ষাৎকার	৩০১-৩১৩
পরিশিষ্ট ২ : সারণি	৩১৪-৩১৫
পরিশিষ্ট ৩ : মানচিত্র	৩১৬- ৩১৮
পরিশিষ্ট ৪ : চিত্রাবলী	৩১৯- ৩২৮
পরিশিষ্ট ৫ : নির্বাচিত প্রাথমিক সূত্রের অনুলিপি	৩২৯-৩৩৬
গ্রন্থপঞ্জি	৩৩৭-৩৫৯

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমার পিতা বাল্য বয়সে পিতৃ-মাতৃহীন অবস্থায় এক সাঁওতাল পরিবারে বেড়ে ওঠে, আর সেই সূত্রেই সাঁওতালদের জীবন ও সংস্কৃতির সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে এবং বাবার কাছ থেকেই সাঁওতালি ভাষা-সংস্কৃতি এবং অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে অবগত হই। তখন থেকেই মনে হতে থাকে এই মানুষগুলোর স্বতন্ত্র জীবনশৈলীকে যদি বৃহত্তর পরিসরে তুলে ধরতে পারি, আর সেই সুপ্ত ভাবনাকে প্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ আসে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণায় সুযোগ পাওয়ায়। তবে আমার সেই ভাবনার বিষয়কে গবেষণার বিষয় হিসাবে নির্বাচিত করে তোলার জন্য প্রথমেই আমি আমার তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক মহুয়া সরকার ম্যামের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই। তিনি ইতিহাস বিভাগের বহু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব বহন করেও এবং নানান প্রতিকূলতার মধ্যেও আমার এই গবেষণার জন্য যথেষ্ট সময় ও পরামর্শ দিয়েছেন। গবেষণার বিষয়টি যেহেতু স্বতন্ত্র সেহেতু তাঁর বৌদ্ধিক সুচিন্তিত পরামর্শ এবং পথনির্দেশ ব্যতীত গবেষণা সম্পূর্ণ করা সম্ভব ছিল না। তিনি বার বার মনে করিয়ে দিয়েছেন বিদ্যায়তনিক চর্চার থেকে আদিবাসীদের নিজস্ব ভাষ্যকে অনুধাবন করার এবং তাঁর পরামর্শেই দু-বছর যাবৎ অলচিকি লিপি শিক্ষায় সার্টিফিকেট কোর্সে ভর্তি হয় ও তা সম্পূর্ণ করি। এর পরে প্রথমেই কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করি প্রয়াত অধ্যাপক শুভাশিস বিশ্বাস স্যারকে, যিনি গবেষণার সূচনা পর্বে নানান ভাবে সহযোগিতা করেছেন। সেই সঙ্গে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই আমার রিসার্চ অ্যাডভাইসারি কমিটির অন্যতম সদস্য অধ্যাপক রূপকুমার বর্মন ও দেবজিৎ দত্ত স্যারকে, যারা নানা সময়ে বিভিন্ন পরামর্শ দিয়ে গবেষণাকে সমৃদ্ধ করতে সহযোগিতা করেছেন।

বর্তমান গবেষণার উপাদান সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লেখ্যাগার, ওয়েস্ট বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট লাইব্রেরী, ঝাড়খণ্ড রাজ্য লেখ্যাগার, বিহার রাজ্য লেখ্যাগার, দুমকা রেকর্ড অফিস, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাঁওতালি বিভাগীয় গ্রন্থাগার, কলকাতা জাতীয় গ্রন্থাগার, রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার, রাম দয়াল মুন্ডা

ট্রাইবাল ওয়েল ফেয়ার রিসার্চ ইন্সটিটিউট প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মীদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা পেয়েছি। তাদের সকলের প্রতি আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই।

এই গবেষণার কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে যাদের বৌদ্ধিক ও মানসিক সহযোগিতা পেয়েছি তাদের মধ্যে অন্যতম বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাঁওতালি বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ধনেশ্বর মাঝি, গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার সহকারি অধ্যাপক ড. মুন্সী মহম্মদ সাইফুল আহমেদ, আজিম প্রেমজি ফাউন্ডেশনে আদিবাসী শিক্ষা বিষয়ে কর্মরত নুরুল হাসান, বীরভূম মহাবিদ্যালয়ের ইতিহাসের সহকারি অধ্যাপক প্রসেনজিৎ মণ্ডল, কবি জয়দেব মহাবিদ্যালয়ের বাংলার সহকারি অধ্যাপক ড. ভরত দাস, বোলপুর মহাবিদ্যালয়ের বাংলার সহকারি অধ্যাপক ড. মিঠুন কুমার দে। এছাড়াও ক্ষেত্রসমীক্ষা এবং বিভিন্ন বিষয়ে সহযোগি হিসাবে সব সময় আমার পাশে থেকে সহযোগিতা করেছে ভাই পিন্টু মণ্ডল ও শ্রীরাম কাপর। তাদের সকলের কাছে আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

এর পরে যাদের কথা না বললেই নয়, তারা হল দিদি অনিতা রায়, দাদা নিত্যরঞ্জন রায় ও বন্ধু অভিজিৎ সেন। যারা আর্থিক ও মানসিক ভাবে পাশে থেকে গবেষণার কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সহযোগিতা করেছে। সেই সঙ্গে আমার পরিবারের বাবা, মা, ভাই, বোন, মাসি সব সময় শারীরিক ও মানসিক ভাবে সহযোগিতা করে গেছে। বিশেষ করে আমার মাসি সমস্ত প্রতিকূলতায় মানসিক ভাবে পাশে থেকে গবেষণাকে সচল রাখতে অভয় দিয়ে গেছে। যাদের প্রতি আমার ঋণ স্বীকার বা কৃতজ্ঞতাও যথেষ্ট নয়।

গবেষণার কাজে বিভিন্নভাবে যারা সহযোগিতা করেছে তারা হল- অলোক দা, শুভদীপ দা, শুভঙ্কর দা, দেবলীনা দি, অমিয় দা, অভিমন্যু দা। যাদের প্রত্যেকের কাছে আমি ঋণী। এছাড়াও প্রসেনজিৎ, রেজ্জাক, আমিরুল, অনির্বাণ, অনন্ত, সাগেন, সঞ্জিব, সৌরভ, সুকৃতি। এদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞ সর্বদা পাশে থেকে নানা বিষয়ে সাহায্য করার জন্য।

সর্বোপরি সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর কাছে আমি চিরঋণী রইলাম, যাদের জন্যই আমার এই গবেষণার ফসল। এছাড়া ক্ষেত্রসমীক্ষায় বহু সাঁওতাল পরিবার যথেষ্ট সময় দিয়ে গবেষণাকে সমৃদ্ধ করতে সহযোগিতা করেছে, তাই তাদের প্রতিও আমি কৃতজ্ঞ। পরিশেষে পুনরায় কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি সেই সকল মানুষের যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে আমার এই প্রয়াসকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে।

সেপ্টেম্বর, ২০২৩

পার্থ মন্ডল

গবেষক

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা- ৭০০০৩২

সারণি সূচি

পৃষ্ঠা

১. অস্ট্রো-এশিয়াটিক মুন্ডারী শাখার বিভিন্ন গোষ্ঠীর ভাষার উৎপত্তি ৩১৪

২. সাঁওতালদের নৃতাত্ত্বিক পরিচয় ৩১৫

মানচিত্র সূচি

পৃষ্ঠা

১. জঙ্গলতরাই জেলার মানচিত্র ৩১৬

২. যুগ্ম অবস্থানে দামিন-ই-কোহ ও সাঁওতাল পরগণার মানচিত্র ৩১৭

৩. সাঁওতাল পরগণার মানচিত্র ৩১৮

চিত্র সূচি

পৃষ্ঠা

১. সাঁওতালদের ঐতিহ্যমন্ডিত জাহের থান, সিমলাডাঙ্গাল, ফতেহপুর, জামতাড়া, ঝাড়খণ্ড। ৩১৯

২. সাঁওতালদের পরিবর্তিত জাহের থান, সিমলাডাঙ্গাল, ফতেহপুর, জামতাড়া, ঝাড়খণ্ড। ৩১৯

৩. সাঁওতালি বিয়ের অতীত, যেখানে আগুনের ব্যবহার নেই, চাঁদডিহ, দুমকা, ঝাড়খণ্ড। ৩২০

৪. সাঁওতালি বিয়ের বর্তমান, যেখানে আগুনের ব্যবহার করা হচ্ছে, সোনাডাঙ্গাল, দুমকা, ঝাড়খণ্ড। ৩২০

৫. খ্রিষ্টান সাঁওতাল কবিরাজের চিত্র ও তাঁর প্রদত্ত প্রেসক্রিপশন অনুলিপি। ৩২১

৬. ঐতিহাসিক বট বৃক্ষ - যেখানে প্রকাশ্যে কানহুকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল। ৩২২

৭. ভগনাডিহি গ্রামের সিধু-কানহু মুর্মু স্মৃতি স্থল। ৩২২

৮. বেনাগড়িয়া মিশন, গবেষকের নিজস্ব সংগৃহিত। ৩২৩

৯. কয়রাবনি মিশন, ফতেহপুর, ঝাড়খণ্ড। ৩২৩

১০. সাঁওতাল বাড়ির দেওয়ালে সাঁওতালি গ্রাম্য হাটের ভাস্কর্য, মিরগাপাহাড়ি, জামতাড়া, ঝাড়খণ্ড। ৩২৪

১১. সাঁওতাল বাড়ির দেওয়ালে শিকার দৃশ্যের ভাস্কর্য, দুমা, জামতাড়া, ঝাড়খণ্ড। ৩২৪

১২. সাঁওতাল বাড়ির দেওয়ালে মারাং বুরুর উপাসনার দৃশ্যের ভাস্কর্য, বেদিয়া, দেওঘর, ঝাড়খণ্ড। ৩২৫

১৩. সাঁওতাল বাড়ির দেওয়ালে সাঁওতাল কৃষি জীবনের একটি ভাস্কর্য শৈলী, সিমরা, দেওঘর, ঝাড়খণ্ড। ৩২৫

১৪. সাঁওতাল বাড়ির দেওয়ালে বাহা পরবের ভাস্কর্য, লহরজুড়ি, দেওঘর, ঝাড়খণ্ড।৩২৬

১৫. সাঁওতাল বাড়ির দেওয়ালের অঙ্কন শৈলী, তেলিয়াবাঁধি, জামতাড়া, ঝাড়খণ্ড। ৩২৬

১৬. সাঁওতাল পরগণার সিমলাডাঙ্গাল গ্রামের নিরজ মুর্মুর গৃহে রাত্রি যাপন ও নৈশাহারে গবেষকের উপস্থিতি। ৩২৭

১৭. সাঁওতাল ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে গবেষক, তেলিয়াবাঁধি, জামতাড়া, ঝাড়খণ্ড। ৩২৭

১৮. সাঁওতাল বাদ্যকার,দুমা,জামতাড়া, ঝাড়খণ্ড। ৩২৮

১৯. হুল দিবসে গবেষকের অংশগ্রহণ। ৩২৮

ভূমিকা

ভূমিকা

দেশ, কাল, পাত্রকে কেন্দ্র করেই রচিত হয় ইতিহাস। কাল বা সময়ের বিবর্তনে সামাজিক চলমানতাই ইতিহাস রচনার উপজীব্য, সে কারণেই পরিবর্তন এক অনিবার্য পরিণতি। ভারতবর্ষে ইতিহাস রচনায় প্রাথমিক প্রাধান্য ছিল সামগ্রিকতায়। এই দেশ যেহেতু বিভিন্ন ধর্ম, জাতি ও গোষ্ঠী নিয়ে গঠিত, তাই এই সামগ্রিকতার মধ্যে তাদের সঠিক মূল্যায়ন সম্ভব নয়। রাজনৈতিক ইতিহাস থেকে ভারতের ইতিহাস রচনা ক্রমশ অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক দিকে পরিচালিত হয়। আর এরই সঙ্গে এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে উঠে আসে আদিবাসী ইতিহাস রচনার এক নব্যধারা। এই আদিবাসীরা প্রাচীন ও মধ্যযুগে কিরাত, ব্যাধ, নিষাদ, বনবাসী প্রভৃতি নামে পরিচিত থাকলেও ঔপনিবেশিক সময়ে সমস্ত আদিবাসীদের 'ট্রাইব' নামে নির্মাণ করা হয়। আর এই 'ট্রাইব' শব্দটি ল্যাটিন শব্দ 'ট্রাইবাস' থেকে এসেছে, যার অর্থ জাতি। 'ট্রাইবাস' দ্বারা প্রাচীন রোমের 'ট্রাই' অর্থাৎ তিনটি প্রাচীন জাতিকে বোঝাত—টাইটেস, র‍্যামনেস এবং লুসেরস। ভারতে এই 'ট্রাইব' শব্দটির প্রচলন ঘটে ঔপনিবেশিক নির্মাণ হিসাবে ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে ব্রেইন হাউটন হডসন্ এর লেখা 'Journal of The Asiatic Society'-র একটি প্রতিবেদন থেকে। সুষান দেভলের মতে 'Tribe is a Colonial Construct'.[১] তবে এই নিয়ে কিছু বিতর্কের অবকাশও রয়েছে। অবশ্য পরবর্তীতে ইনডিজেনাস বা আদিবাসী শব্দটি 'ট্রাইব' শব্দটির সমার্থক শব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। ব্যুৎপত্তিগতভাবে ইনডিজেনাসের অর্থ হল 'নেটিভ' বা 'Born Within'. বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে 'ইনডিজেনাস পিপল' জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে আইনগত স্বীকৃতি পায়, ঔপনিবেশিক শোষণের ফলে যে স্বতন্ত্র সংস্কৃতি সম্পূর্ণ জনজাতিগুলির অস্তিত্ব বিপন্ন হয়েছিল তারাই এই অভিধার অন্তর্ভুক্ত। অন্যদিকে ১৯৩৮ সালে 'আদিবাসী মহাসভা' গঠনের পর 'আদিবাসী' শব্দটি বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে। তবে স্বাধীনতার পর ভারতীয় সংবিধানের ৩৪২নং ধারায় আদিবাসীদের সংজ্ঞায়িত করে 'সিউডল ট্রাইবস' নামে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অন্যদিকে আদিবাসী গোষ্ঠীগুলি কোনো একমাত্রিক সত্তা নয় (Homogenous Category), সভ্যতার বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন আদিবাসীদের অবস্থান। এই দিক দিয়ে সাঁওতালরা ছিল ভারতবর্ষের বৃহত্তম জনজাতি এবং তাদের

নিজস্ব সামাজিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নিয়ে এক অগ্রবর্তী ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত। পূর্বভারতের আদিবাসীদের মধ্যে সাঁওতাল পরগণার সাঁওতালরা নিজেদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের দৃঢ়তায় অনন্য নজির সৃষ্টি করে। ঔপনিবেশিকতার বন্ধনে ভারতবর্ষের অন্যান্য জনজাতি যখন দিশা হারিয়ে ফেলে তখন এই এলাকার সাঁওতালরা নিজেদের সমাজ-সংস্কৃতিকে রক্ষার তাগিদে বিদ্রোহের পথকে বেছে নিতে পিছপা হয়নি, আর এই মানসিক দৃঢ়তার বলেই নিজস্ব ভূখণ্ড লাভ করে বিশেষ পরিচিতি পায়। তবে মার্ক ব্লখকে মনে রেখে বলা যায়, 'Historian never escapes from time'.[২] আর এই সময়কেন্দ্রিক ইতিহাস বর্তমান গবেষণার মূল লক্ষ্য। সাঁওতাল বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে যে ইতিহাসের সূচনা, সেটি বিভিন্ন উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে ঔপনিবেশিক ও উত্তর-ঔপনিবেশিক সময়ের নেহেরু যুগ পর্যন্ত বিস্তৃত। আর এই সময় পর্বে বিভিন্ন প্রতিকূলতা যেমন—ঔপনিবেশিক সরকারের নানান আইন-কানুন, মিশনারি ও হিন্দু সংস্কৃতির প্রভাব এবং স্বাধীনতা পরবর্তী নেহেরুর নেওয়া উন্নয়নমূলক কর্মসূচি সাঁওতাল পরগণার সাঁওতালদের রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, সেগুলি তথ্যনিষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত করাই এই গবেষণার উদ্দেশ্য। সেই সঙ্গে এই সময়কালে বিভিন্ন পরিবর্তনের ফলশ্রুতি হিসাবে সাঁওতাল জনজীবনে কী ধরনের ভাঙনের সৃষ্টি করেছিল, সেটিকে বুঝতে এই গবেষণা যথেষ্ট সাহায্য করবে।

বর্তমান গবেষণার শিরোনাম থেকে স্পষ্ট যে স্থান বা ভৌগোলিক ভূখণ্ড হিসাবে বেছে নেওয়া হয়েছে সাঁওতাল পরগণাকে, কারণ এর পরিবেশগত দিকটি এই গোষ্ঠীর কাছে ছিল এক আদর্শগত স্থান। উপরন্তু অন্যান্য স্থানে যেমন, পূর্বতন জঙ্গলমহলে তারা পরিবেষ্টিত ছিল মাহাতো বা অন্যান্য হিন্দু সংখ্যা গরিষ্ঠের দ্বারা। অন্যদিকে আদিবাসী অধ্যুষিত ছোটনাগপুর অঞ্চলে ছিল মুণ্ডা, হো, ওঁরাও গোষ্ঠীর আদি বাসভূমি। সাঁওতাল পরগণায় পাহাড়িয়া ব্যতীত অন্য কোনো জনজাতির বসবাস ছিল না। পাহাড় ও জঙ্গলময় এই এলাকাটির আদি বাসিন্দা ছিল পাহাড়িয়া জনজাতি। সাঁওতালরা এখানকার আদি বাসিন্দা ছিল না, বহিরাগত হিসাবে উনিশ শতকের প্রথম ভাগে এই অঞ্চলে তাদের প্রবেশ ঘটে। অন্যদিকে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সঙ্গে এই এলাকার নাম ও সীমানা বারবার বদলাতে থাকে। প্রাচীন ও মধ্যযুগে রাজমহল পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত এই এলাকাটির নাম ছিল 'জঙ্গলতরাই'। প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ

হওয়ায় ঔপনিবেশিক শাসনপর্বে এলাকাটি ব্রিটিশ শাসকদের কাছে বাণিজ্যিক কারণে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে দস্যুপ্রবণ পাহাড়িয়াদের দমন করতে তৎকালীন বড়লাট ওয়ারেন হেস্টিংস ৮০০ সৈন্যের দল পাঠান, আর তখন থেকেই এই এলাকায় ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৮৩৭ সালে ব্রিটিশ প্রশাসকরা এই এলাকাটির নামকরণ করে 'দামিন-ই-কোহ' (পাহাড়ের প্রান্তদেশ)। তবে এর দু-দশক পরে অর্থাৎ ১৮৫৫ সালে এই এলাকাটি 'সাঁওতাল পরগণা' নামে পরিচিত হয়। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে এই এলাকাটি বিহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকলেও, ২০০০ সালে বিহার থেকে আলাদা হয়ে 'ঝাড়খণ্ড' রাজ্যের অংশ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। তবে ১৭৯০-১৮২০ সালের মধ্যে সাঁওতালরা এখানে বহিরাগত হিসাবে বসতি স্থাপন শুরু করলেও ব্রিটিশ শাসকেরা তখন পর্যন্ত এই এলাকাটিকে পুরোপুরিভাবে সাঁওতালদের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়নি। পাহাড়িয়ারা চাষবাসের প্রতি অনীহা দেখালে ১৮৩৭ সালে জেমস পনন্টেট 'দামিন-ই-কোহ'-কে সাঁওতালদের জন্য সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত করে দেন। সাঁওতালরা সাঁওতাল পরগণায় প্রথম গ্রামটি প্রতিষ্ঠা করে সগাড় ডাঙ্গায় তারপর পিপড়া এবং আমগাছিয়াতে। সাঁওতালরা ছিল সহজ, সরল ও পরিশ্রমী মানুষ। তারা হাড়ভাঙ্গা খাটুনির দ্বারা পার্বত্য ও জঙ্গলাকীর্ণ এই এলাকাকে শস্য ও শ্যামলাময় করে তোলে। জল, জঙ্গল, জমি নির্ভর (Subsistence Economy) অর্থনীতির ওপর ভিত্তি করে স্বতন্ত্র এক গ্রামীণ সমাজ কাঠামো গড়ে তুলেছিল। যেখানে ছিল মাঝি নির্ভর গোষ্ঠীবদ্ধ সমতাবাদী জীবন-যাপন প্রণালী, নিজস্ব লোকাচার-বিশ্বাস, উৎসব-অনুষ্ঠান, চিকিৎসা পদ্ধতি এবং নিজস্ব পরিবেশভিত্তিক মূল্যবোধ। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ হলেও সেখানে নারীদের যথেষ্ট সম্মান দেওয়া হত। তবে গোষ্ঠীগত দিক থেকে এই সমতাবাদী সমাজ পরবর্তীকালে ইতিহাসের বহু ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। যার দরুন সাঁওতালদের আত্মপরিচিতি সঙ্কটের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে।

আদিবাসী ইতিহাস রচনার প্রচেষ্টার সূচনা ঔপনিবেশিক সময়কালে হলেও ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনায় People বা জনতা, অথবা প্রান্তিক অধিবাসী বা আদিবাসীদের দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয়েছিল ইতিহাসের মূল ধারায় প্রবেশের জন্য। অন্যদিকে পশ্চিম বা মূলত ইউরোপের ইতিহাসে আদিবাসী ইতিহাসের কোনো ধারণা না থাকায় বিংশ শতকের তিরিশের দশক থেকেই রচিত হয়েছিল People

History বা জনতার ইতিহাস। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, স্বাধীন ইউরোপেই যেখানে বিংশ শতকের তিরিশের দশকের আগে People History বা জনতার ইতিহাস নিয়ে কোনো কাজ হয়নি, সেখানে ঔপনিবেশিক দেশ ভারতে সেটি আশা করা সংগত ছিল কি? একদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষিত উচ্চবর্গীয় ঐতিহাসিক সম্প্রদায়, অন্যদিকে ব্রাহ্মণ্যকূল উভয়েরই কাছেই দলিত বা আদিবাসীরা ছিল ব্রাত্য। পাশ্চাত্যের সেখানো Barbarian বা বর্বর বা অসভ্য অভিধা আদিবাসীদের ভদ্রলোক ঐতিহাসিকদের কাছ থেকে বহন করতে হয়েছিল দীর্ঘকাল। জনজাতি বা নিম্নবর্গীয়দের নিয়ে প্রথম যে বিবরণ তাও ঔপনিবেশিক সরকারি কর্মচারিদের অবদান। অন্যদিকে যে বিষয়টি অনিবার্যভাবে উঠে আসে তা হল আদিবাসী ইতিহাস রচনার পদ্ধতিগত দিকটি। সাধারণ ইতিহাস রচনায় লেখ্যাগারের উপাদানকে প্রাধান্য দেওয়া হলেও আদিবাসী ইতিহাস রচনায় তার সীমাবদ্ধতা স্পষ্ট। লেখ্যাগারের উপাদানে এই সমস্ত জনজাতিকে ‘বর্বর’, ‘দস্যু’, বা ‘অপরাধপ্রবণ’ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে, কিন্তু এর গ্রহণযোগ্যতা ক্রমশই অযৌক্তিক প্রতিপন্ন হয়েছে। দ্বিতীয়ত, দীর্ঘদিন তাদের কোনো লিপি না থাকায় তাদের কোনো লিখিত উপাদান আমাদের কাছে পৌঁছায়নি। মৌখিক যে ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়েছে তার প্রায় সবটাই মিশনারি বা সরকারি আধিকারিকদের বিবরণ এবং অধিকাংশই পক্ষপাত দোষে দুষ্ট। E.H. Carr ইতিহাস লিখনে ঐতিহাসিক তথ্য ও ইতিহাস রচয়িতাদের মধ্যে যে সম্পর্ক নির্ণয় করেছেন যেখানে ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিভঙ্গি এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেয়েছে, তাই আদিবাসী ইতিহাস রচনাতেও প্রতিফলিত হয়েছে বিভিন্ন মতাদর্শ। কারো কাছে এরা এক বিশেষ সময়ের পর অগ্রসর হতে পারেনি (Lost or frozen in Time), কারো কাছে এদের ঐতিহ্যগত অতীত (Traditional Past) ও ইতিহাসের অতীত (Historic Past) দুই-ই সমুজ্জ্বল। আবার E.H. Carr ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিকদের কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দিয়ে লিখেছেন, ‘History can not be written unless the historian can achieve some kind of contact with the mind of those about whom he is writing’.[৩] সোভিয়েত রাশিয়ার বিপ্লবের মহাভাষ্য রচনার ক্ষেত্রে এ যেমন সত্য, তেমনি সত্য আদিবাসী ইতিহাস রচনায়। কিন্তু এই মানসিক সংযোগ ঘটবে কীভাবে? এখানেই আসছে নৃতত্ত্বের এক বৃহৎ ভূমিকা। আদিবাসী মানুষকে জানার জন্য দরকার তাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ, নৃতত্ত্বের ভাষায় যাকে

বলা হয় “participant observation”, …“it is best to observe them by interacting with them intimately and over an extended period”.[৪] এই কাজটি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে করেছিলেন ভেরিয়ার এলুইন। কিন্তু এখানেও একটা সমস্যার কথা উল্লেখ করা যায়, যিনি এই অংশগ্রহণকারী পর্যবেক্ষণ করছেন তিনি কতটা নিরপেক্ষ। অর্থাৎ Observer bias-এর ক্ষেত্রে কি করা যায়? অনেকটা E.H. Carr-এর ইতিহাসকারের বর্তমান অবস্থানের সঙ্গে অতীতের তথ্য সংগ্রহের দ্বন্দ্ব। এর সমাধানে আধুনিক নৃতত্ত্ববিদরা যৌথ পর্যবেক্ষণ বা পুনরায় পর্যবেক্ষণের কথা বললেও তা যে সর্বাংশে সুরক্ষিত তা বলা যায় না। এই সমাধানটি এই কারণে, অনেকাংশে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে ইতিহাসবিদ ও গবেষকদের সততা এবং তাদের পেশার প্রতি সহজ বিশ্বাসের উপর। এই সমস্ত প্রক্রিয়াটিকে অন্য অর্থে ক্ষেত্রসমীক্ষা বলা যেতে পারে। কিন্তু শতবর্ষ প্রাচীন ইতিহাসের ক্ষেত্রসমীক্ষা কীভাবে হবে? এক্ষেত্রে নির্ভর করতে হয় বংশপরম্পরায় স্মৃতির উপর। এটি অনেকসময় হয় যৌথ স্মৃতি বা Collective Memory. আবার এগুলির সবকটি ইতিহাসের সংজ্ঞা মেনে না চললেও উপাদান হিসাবে তার তাৎপর্য অস্বীকার করা যায় না। একটি দেশকে শাসন করতে গেলে তার বিভিন্ন আদিবাসীদের সম্পর্কে জ্ঞানার্জন এক আবশ্যিক শর্ত, বিশেষত ইংরেজ শাসনের সূচনা থেকেই যেখানে বিভিন্ন কৃষক ও আদিবাসী বিদ্রোহ তাদের যথেষ্ট বিড়ম্বিত করেছিল। ভারতব্যাপী যে অজস্র আদিবাসী বসবাস করে তাদের মধ্যে পূর্বভারতের সাঁওতাল জনজাতির চরিত্র এক বিশেষ স্বাতন্ত্র্যে দীপ্যমান। আর এই স্বাতন্ত্র্যের চরিত্র নিয়ে আদিবাসী ইতিহাস লিখনে মতান্তরের আধিক্য। কারও কাছে এই স্বাতন্ত্র্য ‘অসভ্যতা’ বা ‘বর্বরতার’ নামান্তর, আবার কারো কাছে এক ‘বুনো’ জাতির রোমান্টিকতার প্রতিফলন। কেউ এদের মধ্যে খুঁজে পান নিম্নবর্গীয় উপাদানের বৈশিষ্ট্য। আর যারা এর উদ্দেশ্য, সেই সাঁওতালরা নিজেরা মনে করে তারা এক মহান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী এক সুসভ্য জাতি। কিন্তু কেন এই বৈপরীত্যের তীব্রতা? সাঁওতাল ইতিহাস রচনার যেহেতু কোনো লিখিত উপাদান নেই তাই একে নিজের পছন্দ অনুযায়ী ব্যাখ্যা করার একটা সুযোগ থেকেই যায়। এসব ক্ষেত্রে প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটনে অনেক বেশি সাহায্যকারী ভূমিকা নিতে পারে গ্রন্থাগারে বিদেশি নথি নয়, তাদের নিজস্ব বিশ্ববীক্ষা। এই বিশ্ববীক্ষা ছড়িয়ে আছে সাঁওতালদের নিজস্ব লোকগাথা,

সংগীত, প্রথা, ধর্ম বিশ্বাস এমনকি ধাঁধার মধ্যেও। উপাদান সংক্রান্ত এই গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশটি আমরা পেয়ে যাই, মার্ক ব্লখের *The Historian Craft* গ্রন্থটি থেকে, আর একে সংহত করতে যা প্রয়োজন তা হল ঐতিহাসিক E.H.Carr কথিত Historical Imagination বা ঐতিহাসিক কল্পনা। তবে এই সব উপাদানের মর্মস্থলে পৌঁছাতে গেলে একান্তই আবশ্যিক যে জনজাতি গোষ্ঠীর উপর গবেষণা তাদের নিজস্ব ভাষার উপর মোটামুটি একটা দখল। বর্তমান গবেষকের সাঁওতালি ভাষা ও লিপি শিক্ষা এই বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করেছে।

বিষয় সম্পর্কিত সাহিত্য পুনঃসমীক্ষা

যেকোনো গবেষণার ক্ষেত্রে তথ্যসম্পর্কিত পূর্ববর্তী পাঠগুলির বিশ্লেষণ ব্যতীত বর্তমান গবেষণার আবশ্যিকতা নির্ধারণ সম্ভব নয়। বিস্ময়ের বিষয় এইটি যে, সাঁওতালদেরকে কেন্দ্র করে যে বহুমাত্রিক ও বহু সংখ্যক ইতিহাস প্রবন্ধ, উপন্যাস ও ছোটোগল্প রচিত হয়েছে, তা ভারতের অন্য কোনো জনজাতি সম্পর্কে যথার্থই বিরল। আবার এই কথাও সত্য যে সাঁওতাল পরগণা সংক্রান্ত রচনা খুব বেশি উল্লেখের দাবি রাখে না। সম্ভবত বিহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এবং এই অঞ্চল ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের তুঙ্গ অবস্থায় পৌঁছানোয় তেমন গুরুত্ব পায়নি। বস্তুতপক্ষে ঔপনিবেশিক সময়কালে আদিবাসী বা সাঁওতাল জনজাতি সম্পর্কিত অধিকাংশ বিষদ আলোচনা (Discourse) সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় প্রশাসনিক আধিকারিক এবং খ্রিষ্টান মিশনারিরা সম্পূর্ণ করেছিলেন। অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতীয় আদিবাসী সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ শুরু করে, উদ্দেশ্য ছিল স্থানীয় আদিবাসীদের ধর্ম, প্রথা ও সমাজ সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ। আর এক্ষেত্রে সাঁওতালদের সম্পর্কে প্রথম লিখিত রচনাটি প্রকাশিত হয় ১৭৯৫ সালে 'এশিয়াটিক রিসার্চেজ' পত্রিকায়, লেখক স্যার জন শোর। যার শিরোনাম ছিল 'On Some Extraordinary Facts, Customs, and Practices of the Hindus'. এই প্রবন্ধে সাঁওতালদের 'সুন্তার' (Soonters) হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অধুনা সাঁওতাল পরগণার আদি বিবরণ পাওয়া যায় ফ্রান্সিস বুকাননের ১৮১০-১১ সালের ভাগলপুর জেলার পর্যালোচনা থেকে। এখান থেকে তথ্য আহরণ করে মন্টগোমারি মার্টিন রচনা করেন *Eastern India* (১৮৩৮) গ্রন্থটি, যা দামিন-ই-কোহ অঞ্চলে

সাঁওতালদের আগমনের একটি বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ। ক্যাপ্টেন ওয়াল্টার শেরউইলের রাজমহল অঞ্চলে পরিভ্রমণের বিবরণ বা Notes টি প্রকাশিত হয় বাংলার ‘এশিয়াটিক সোসাইটি’ থেকে, যেখানে শেরউইল তার ভ্রমণবৃত্তান্তের কিছু ছবিও এঁকেছিলেন। পরবর্তীকালে ড্যানিয়েল রাইক্রফট তাঁর *Representing Rebellion : Visual Aspects of Counter-Insurgency in Colonial India* (২০০৬) গ্রন্থে এই ছবিগুলির ব্যাপক ব্যবহার করেছিলেন। ই. জি. ম্যান সদ্যগঠিত সাঁওতাল পরগণার অ্যাসিট্যান্ট কমিশনার ছিলেন এবং তাঁর রচিত *Sonthalia And The Sonthals* (১৮৬৭) গ্রন্থটির মধ্যে এই জনজাতির উৎপত্তি, তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস, বিভিন্ন উৎসব ইত্যাদি বিষয়ে বিবরণ যেমন আছে, তেমনি আছে সাঁওতালদের নিজস্ব ভাষ্য এবং সাঁওতাল বিদ্রোহ ও তৎপরবর্তী কালের কিছু ঘটনা। এই বইয়ের পরিশিষ্টে সংযোজিত হয়েছে ১৮৫৮ সালের সাঁওতাল পরগণার স্যার জর্জ উল (George Yule) এর রিপোর্টটি। এই রিপোর্টটির নাম ‘Report on the Santal Pergunahs for 1858’, এই রিপোর্টে উল্লিখিত আছে এই অঞ্চলের পুলিশি তদারকি সম্পর্কিত বিষয়। উপরন্তু কামিয়তি ব্যবস্থার বিবরণ, যা মূলত মহাজনের কাছে ঋণশোধ অক্ষমতার জন্য শ্রমদাস হিসাবে জীবন কাটানো সাঁওতালদের দুরবস্থার কথা।

জাত ও আদিবাসী সংক্রান্ত যুগান্তকারী দুটি গ্রন্থ হল হাবার্ট রিসলের দু খণ্ডের *The Tribes and Castes of Bengal* (১৮৯২) এবং *The People of India* (১৯১৫). প্রথম গ্রন্থের দুটি খণ্ডে আছে বাংলার সমস্ত জাতি ও আদিবাসীদের পরিচয় লিপি। আর দ্বিতীয় গ্রন্থটি ১৯০১ সালের জনগণনা ভিত্তিক ভারতের সমস্ত জাতি ও গোষ্ঠীর শ্রেণিবদ্ধকরণ। ভারতীয় ও বাংলার জনসমাজকে স্বতন্ত্ররূপে চিহ্নিত করার এটি প্রথম প্রয়াস। এর জন্য বলা হয় ‘The term tribe in Indian anthropology and sociology seams to carry this background music’.[৫] আবার ই.টি. ডালটন ১৮৭২ সালে সরকারি প্রচেষ্টায় লিখলেন Descriptive Ethnology of Bengal. ১৯৭৩ সালে এই বইটি দিল্লির কসমো প্রকাশক Tribal History of Eastern India নামে প্রকাশ করে। বিভিন্ন জনজাতিদের মধ্যে সাংস্কৃতিক মাত্রার পরিচয় এই গ্রন্থের বিশেষ আকর্ষণ। আসাম ও ছোটনাগপুর অঞ্চলে দীর্ঘদিন কর্মরত থাকায় তিনি বহু আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ব্যক্তিগত সংস্পর্শে এসে ছিলেন, এক কথায় ‘Participant Observation’-

এর এটি একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। এরপর ১৮৬৮ সালে প্রকাশিত হয় ডবলু. ডবলু. হান্টার রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ Annals of Rural Bengal. এই গ্রন্থে সাঁওতাল সমাজ, সংস্কৃতি, ভাষা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের উপর যেমন আলোকপাত করা হয়েছে, তেমনি সাঁওতাল বিদ্রোহের বিস্তৃত বিবরণ রয়েছে। এছাড়াও হান্টারের লেখা *A Brief History of The Indian Peoples* (১৮৯৫) ও *A Statistical Account of Bengal* (১৮৭৭)-গ্রন্থের বিভিন্ন খণ্ডে সাঁওতালদের সম্পর্কে বহু তথ্য পাওয়া যায়। আর একজন বিখ্যাত সাঁওতাল বিশেষজ্ঞ হলেন আর. কার্সটেয়ার্স (R. Carstaris), তিনি দীর্ঘদিন (১৮৮৫-৯৮) সাঁওতাল পরগণায় ডেপুটি কমিশনার পদে নিযুক্ত ছিলেন এবং তাঁর একটি বিখ্যাত বই হল *The Little World of An Indian District Officer* (১৯১২)। এই গ্রন্থে তিনি সাঁওতালদের কৃষি ও জমি সংক্রান্ত নানান বিষয়ের উপর আলোকপাত করেছেন এবং খেরওয়াড় আন্দোলনের কথাও তিনি বলেছেন। তাঁর আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা হল *Harma's Village : A Novel of Santal Life* (১৯৩৫) নামে সাঁওতাল বিদ্রোহের পটভূমিকায় লিখিত একটি উপন্যাস। এফ. বি. ব্রাডলে বার্ট নামে আর একজন সরকারি কর্মচারী লেখেন *The Story of An Indian Upland* (১৯০৫) এবং *ChotaNagpore : A Little-Known Province of The Empire* (১৯১০)। এই দুটি গ্রন্থে সাঁওতাল জীবনের নানা দিক উন্মোচিত হয়েছে। ডবলু. জি. আর্চার সাঁওতাল পরগণার ডেপুটি কমিশনার পদে নিযুক্ত ছিলেন এবং সাঁওতালদের বিষয়ে তাঁর অসংখ্য লেখা আছে। সাঁওতাল পরগণায় থাকাকালীন আর্চার সাহেব সাঁওতালদের প্রচলিত গান সংগ্রহ করে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। ১৯4৫ সালে প্রকাশিত এই গ্রন্থের নাম হড় সেরেঞ (সাঁওতালদের গান)। তবে তাঁর সবচেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল *The Hill of Flutes : Life, Love and Poetry in Tribal India : A Portrait of The Santals* (১৯৭৪)। সাঁওতালি ভাষায় তাঁর যথেষ্ট দখল ছিল এবং সাঁওতালদের বিভিন্ন উৎসবে তিনি নিয়মিত যোগদান করতেন, কিছুটা তাঁর পূর্বসূরিদের লেখার উপর ভিত্তি করে আর কিছু তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি এই গ্রন্থ রচনা করেন। সাঁওতাল জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে তিনি 'ম্যান ইন ইন্ডিয়া' পত্রিকায় বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন। তাঁর মোট প্রবন্ধের সংখ্যা ১৮ এবং *The Hill of Flutes* ছাড়াও তাঁর আর একটি বিখ্যাত গ্রন্থ হল *Tribal Law and Justice : A*

Report On The Santal (1984), এই গ্রন্থে তিনি সাঁওতালদের নিজস্ব আইন-কানুনকে লিপিবদ্ধ করে রাখেন।

সাঁওতালদের সম্পর্কে আমাদের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল বিভিন্ন সরকারি নথিপত্র। ইংরেজরা অত্যন্ত ইতিহাস সচেতন জাতি এবং সাঁওতাল সম্পর্কিত বিভিন্ন চিঠিপত্র ও তথ্য তারা সযত্নে গুছিয়ে সরকারি লেখ্যাগারে সঞ্চয় করে রেখেছেন। এগুলি কিছু হাতে নকল করে বাঁধিয়ে রাখা হয়েছে এবং পরের দিকে নথিপত্রগুলি ছাপার আকারে পাওয়া যায়। বিভিন্ন বিভাগভিত্তিক রক্ষিত এই সব নথি থেকে পর্যাপ্ত তথ্য পাওয়া যায়। সাঁওতালদের সম্পর্কে এই সব নথিপত্র আমাদের খুবই কাজে লাগে। আরেক ধরনের সরকারি উপাদান হল 'Settlement Report'। এইসব বিবরণ থেকে সাঁওতালদের কৃষি ও ভূমি ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রচুর তথ্য পাওয়া যায়। গুরুত্বপূর্ণ এই ধরনের কাজে যেসব কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন, তাঁদের মধ্যে এইচ. ম্যাক্‌ফারসন, ব্রাউন উড, জে. এ ক্র্যাভেন, এইচ. এল. এল. অ্যালানসন, জে. এফ. গ্যাৎজার প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। সাঁওতাল পরগণার Settlement Report গুলির মধ্যে এইচ. ম্যাক্‌ফারসনের 'Final Report on the survey and settlement operations in the District of Sonthal Parganas 1858-1907', ব্রাউন উডের 'Final Report on the survey and settlement of the Damin-i-koh 1878-79', জে. এ ক্র্যাভেনের 'Final Report on the survey and settlement of certain Estates in Santal Parganas 1888-92', এইচ. এল. এল. অ্যালানসনের 'Final Report on the survey and settlement operations in the District of Sonthal Parganas 1898-1910', জে. এফ. গ্যাৎজারের 'Final Report on the revision survey and settlement operations in the District of Santal Parganas 1922-35' গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। আবার এইচ. সি. সাদারল্যান্ড-এর 'Report on the management of the Rajmahal Hills' (Dt. 8 June, 1819, Dumka, Deputy Commissioner's record room), এটি পাহাড়িয়া ও রাজমহল অঞ্চলের ভূমি বন্দোবস্তের উল্লেখযোগ্য এক প্রাথমিক উপাদান। জেলা গেজেটিয়ারগুলি থেকে সাঁওতাল পরগণা ও অন্যান্য সাঁওতাল অধ্যুষিত জেলা সম্পর্কে প্রচুর তথ্য পাওয়া যায়। ও'ম্যালের জেলা গেজেটিয়ারগুলির (Bengal District Gazetteers : Santal Parganas, 1910) কথা এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এক্ষেত্রে আবার পি.সি. রায়চৌধুরির বিহার

ডিসট্রিক্ট গেজেটিয়ার্স (Bihar District Gazetteers : Santal Parganas, 1965) সাঁওতাল পরগণা সম্পর্কে তথ্য প্রদান করে। পরিশেষে আদমশুমারির কথা বলা যেতে পারে। ১৮৭২ সালে প্রথম আদমশুমারির কাজ শুরু হয় এবং তার পর থেকে দশ বছর অন্তর এই কাজ হাতে নেওয়া হয়। আদমশুমারির বিবরণ আমাদের খুব কাজে লাগে। আদমশুমারির কাজে নিযুক্ত যেসব কর্মচারী সাঁওতালদের উপর গুরুত্বপূর্ণ তথ্য অনুসন্ধান করেছেন, তাঁদের মধ্যে এইচ. বেভারলি, বিসলে, আর. এম. ম্যাকফেল, অশোক মিত্র প্রমুখের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বিদেশিরা সাঁওতালদের সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান সমৃদ্ধিশালী করলেও অন্তত স্বাধীনতার আগে পর্যন্ত ভারতীয়রা বিশেষভাবে বাঙালিরা, আদিবাসীদের সম্পর্কে খুব একটা আগ্রহী ছিল না। সাঁওতাল বিদ্রোহ অবশ্য তাদের গভীরভাবে উদ্বিগ্ন করেছিল এবং তা নিয়ে স্বল্প পরিসরে হলেও বিভিন্ন সাময়িকপত্রে লেখালেখিও হয়েছিল। সাঁওতাল বিদ্রোহের উপর একটি গুরুত্বপূর্ণ রচনা হল বাবু দিগম্বর চক্রবর্তী প্রণীত History of The Santal Hool of 1855 (১৯৮৯). দিগম্বর চক্রবর্তীর জন্ম হয়েছিল পাকুড়ে এবং পেশায় তিনি ছিলেন একজন আইন বিশেষজ্ঞ। বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেছিল, এমন সাঁওতালদের কাছে নিজের কানে শুনে তিনি তাঁর গ্রন্থের তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। তাছাড়া তিনি পাকুড় রাজের কুখ্যাত দেওয়ান দীনদয়াল রায়ের বোন বিমলা দেবীর কাছ থেকেও শুনেছিলেন সাঁওতাল বিদ্রোহের রোমহর্ষক নিষ্ঠুর ঘটনা। যাই হোক, সাঁওতাল বিদ্রোহ বাঙালিদের মনে দাগ কাটলেও তারা কখনওই সাঁওতালদের ঘনিষ্ঠ হয়নি। তবে সাধারণভাবে বাঙালিরা সাঁওতালদের সম্পর্কে উদাসীন হলেও ১৮৮২ সালে রমেশচন্দ্র দত্ত 'Aboriginal Elements in The Population of Bengal' শীর্ষক এক প্রবন্ধে সাঁওতালদের কথা বলেন, যা প্রকাশিত হয় 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রিকায়। শরৎচন্দ্র মিত্র সাঁওতালদের নিয়ে বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ রচনা করেন। তাদের মধ্যে নরবলি প্রথা নিয়ে তিনি দুটি প্রবন্ধ লেখেন। প্রথম প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় 'জার্নাল অফ বিহার অ্যান্ড ওড়িশা রিসার্চ সোসাইটি'-তে। প্রবন্ধটির নাম ছিল 'A Note on The Human Sacrifices Among The Santal'. পরের বছর 'ম্যান ইন ইন্ডিয়া' পত্রিকায় জানুয়ারি-মার্চ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় 'Further Note On The Human Sacrifices Among The Santal'. এছাড়াও সাঁওতাল ধর্ম, সমাজ ও সংগীত নিয়ে

তিনি বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ রচনা করেন। সাঁওতালদের নিয়ে যেসব নৃতত্ত্ববিদগণ আগ্রহী হন, তাদের মধ্যে শরৎচন্দ্র রায়ের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। সাঁওতালসহ ছোটনাগপুরের বিভিন্ন জনগোষ্ঠী নিয়ে তাঁর বহু মৌলিক গবেষণা আছে এবং তাঁরই 'ম্যান ইন ইন্ডিয়া' পত্রিকাটি, যা প্রকাশিত হত রাঁচি থেকে। এই পত্রিকা ছাড়া তিনি 'জার্নাল অফ বিহার অ্যান্ড ওড়িশা রিসার্চ সোসাইটি'-পত্রিকাতেও সাঁওতালদের নিয়ে বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ রচনা করেন। আর একজন প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ হলেন কৃষ্ণপদ চট্টোপাধ্যায়। ইনিও সাঁওতালদের নিয়ে বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধের বিষয় হল সাঁওতালি ধাঁধা। 'Santal Riddles' নামে এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় 'জার্নাল অফ দ্য এশিয়াটিক সোসাইটি'-তে ১৯৫৫ সালে। তাঁর আর একটি বিখ্যাত প্রবন্ধ হল 'A Santal-Trap', এটি ১৯৫৫ সালে প্রকাশিত হয়। নৃতত্ত্ববিদগণ মূলত সাঁওতাল সমাজ, ধর্ম, সংস্কৃতি ইত্যাদির উপর আলোকপাত করেছেন। ওড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ এলাকার সাঁওতালদের নিয়ে মিশনারি, প্রশাসক, নৃতত্ত্ববিদগণ গবেষণা ও লেখালেখি করলেও ঐতিহাসিকরা আশ্চর্যজনকভাবে তাদের নিয়ে মাথা ঘামাননি, এমনকী সাঁওতাল বিদ্রোহের মতো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সম্পর্কেও তাঁরা নিস্পৃহ ছিলেন। অবশ্য সাঁওতাল বিদ্রোহের কথা আমরা নানা সূত্রে জানতে পারি। সাঁওতাল বিদ্রোহ নিয়ে প্রথম পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করেন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক কালীকিঙ্কর দত্ত। ১৯৪০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয় তাঁর *The Santal Insurrection of 1855-57* গ্রন্থটি। লেখ্যাগারের (Archives) তথ্য থেকে সংগৃহীত উপাদান থেকে তিনি বিদ্রোহের একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করেন। বিদ্রোহের বিস্তৃত বিবরণ উল্লেখ করে, এই বিদ্রোহ যে আইন-শৃঙ্খলার দিক থেকে ব্রিটিশ রাজত্বকে বিঘ্নিত করেছিল তা উল্লেখ করেছেন তিনি। আবার ১৯৫৫ সালে ন্যাশনাল বুক এজেন্সি থেকে প্রকাশিত হয় পাঁচু গোপাল ভাদুড়ির *ভগনাদিহির মাঠে।* সিধু, কানহু, পন্টেট সাহেবের চরিত্র নিয়েই এই উপন্যাস। তবে উপন্যাসের আকারে হলেও এটি ইতিহাসই।

যেসব মিশনারি সাঁওতালদের উপর মৌলিক গবেষণা করেছেন, তাঁদের মধ্যে প্রথমেই স্ক্রেফস্রুডের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৮৮৭ সালে তিনি 'হড়কোরেন মারে হাপ্‌রাম কো রেয়াঃক কাথা' নামে রোমান হরফে সাঁওতালি ভাষায় একটি আকরগ্রন্থ

রচনা করেন। তিনি কোলিয়ান নামে একজন সাঁওতাল গুরুর কাছ থেকে সাঁওতালদের সম্পর্কে মৌখিক তথ্য সংগ্রহ ও সংকলন করে এই গ্রন্থে তা লিপিবদ্ধ করেন। অনেক কষ্টে তিনি এই সাঁওতাল গুরুর সন্ধান পান এবং স্ক্রেফস্রুড বলেছেন যে, গুরু যা বলেছেন তা তিনি অক্ষরে অক্ষরে অনুসরণ করেছেন এবং এখানে তাঁর নিজস্ব কোনও বক্তব্য নেই, গুরুর সঙ্গে কথোপকথন শেষ হয় ১৮৭১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। এই গুরু ছিলেন মানভূম জেলার পাণ্ডুয়া গ্রামের বাসিন্দা এবং তাঁর গুরুর নাম ছিল বুকু। এই বইটি সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর একটি অত্যন্ত মূল্যবান দলিল বলে মনে করা হয়। পরে এই গ্রন্থটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন পি. ও. বোডিং। অনূদিত গ্রন্থটির নাম *Tradition and Institution of The Santals* (১৯৪২)। এই মূল্যবান গ্রন্থ ছাড়াও স্ক্রেফস্রুড ১৮৭৩ সালে *A Grammar of The Santali Language* নামে একটি গ্রন্থ লেখেন। আবার ১৯০৩ সালে 'জার্নাল অফ এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল' পত্রিকায় 'Traces of Fraternal Polyandy Among The Santal' নামে একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। সাঁওতালদের সম্পর্কে আমরা সবচেয়ে বেশি ঋণী পি. ও. বোডিং-এর কাছে, এই বিষয়ে তিনি ছিলেন বিদগ্ধ পণ্ডিত। তিনি দীর্ঘদিন সাঁওতালদের সঙ্গে বসবাস করেন এবং খুব কাছ থেকে তাদের দেখেন, তাঁর অসংখ্য গ্রন্থ ও প্রবন্ধের মধ্যে ধরা পড়েছে সাঁওতাল জনজীবনের নানা দিক। তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কীর্তি হল পাঁচ খণ্ডে রচিত সাঁওতালি ভাষার অভিধান, ১৯৩২ থেকে ১৯৩৬ সালের মধ্যে এই খণ্ডগুলি অসলো (নরওয়ে) থেকে প্রকাশিত হয়। এই অমূল্য গ্রন্থে বোডিং দেখিয়েছেন যে, যেহেতু সাঁওতালরা সব সময় এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ঘুরে বেড়াত, সেহেতু তাদের ভাষায় বিভিন্ন অঞ্চলের প্রভাব পড়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা নিজেদের ভাষা ও ব্যাকরণকে আশ্চর্যজনকভাবে এই সব প্রভাব থেকে অনেকাংশে মুক্ত রাখতে পেরেছিল। তবে তাদের কথ্য ভাষায় বহু বিদেশি শব্দের অনুপ্রবেশ হয়েছিল। বাংলা, বিহারি, হিন্দি, খারওয়ারি, মুণ্ডারী, এমনকী সংস্কৃত ও ফার্সি শব্দ তারা গ্রহণ করেছিল। এছাড়া তিনি *Materials for A Santali Grammar* (১৯২২) এবং *A Santali Grammar for Beginners* (১৯২২) নামেও দুটি বই লেখেন। তাঁর আর একটি উল্লেখযোগ্য অবদান হল তিন খণ্ডে রচিত *Santal Folk Tale*। ১৯২৫ থেকে ১৯২৯ সালের মধ্যে এই তিনটি খণ্ড অসলো থেকে প্রকাশিত হয়। মোহুলপাহাড়ি ও

বেনাগড়িয়া থেকে তিনি ৯৩টি গল্প সংগ্রহ করে এই অসাধারণ কাজটি করেন। এছাড়া ১৯৪০ সালে তিনি সাঁওতালি ভাষায় তাদের ধাঁধা নিয়েও একটি বই লেখেন, যাতে ২৪২টি ধাঁধা পাওয়া যায়। পরে *Santali Riddles* নামে এর একটি ইংরেজি অনুবাদও প্রকাশিত হয়। যেমনটি তিনি বিভিন্ন সাঁওতালের কাছে এই ধাঁধাগুলি শুনেছেন, ঠিক তেমনভাবেই তিনি তা পরিবেশন করেছেন। তাঁর আর একটি উল্লেখযোগ্য কাজ হল সাঁওতালি ঔষধ ও লোককথা সম্পর্কিত সুবিশাল তিন খণ্ডের গ্রন্থ যা 'মেময়ার্স অফ দ্য এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল' থেকে প্রকাশিত হয়। প্রথম খণ্ডের নাম *The Santals and Disease* (১৯২৫), দ্বিতীয় খণ্ডের নাম *Santal Medicine* (১৯২৭) এবং তৃতীয় খণ্ডের নাম *How The Santals Live* (১৯৪০)। সাঁওতালরা বিশ্বাস করত রোগের কারণ অশুভ শক্তি; যাদের সন্তুষ্ট ও খুশি করতে না পারলে রোগের উপশম দূর হবে না। কুসংস্কারের পাশাপাশি তারা কিন্তু চিকিৎসার জন্যও উপযুক্ত ব্যবস্থাও গ্রহণ করত। তাদের ওঝা একদিকে যেমন অশুভ আত্মাকে সন্তুষ্ট করার জন্য মন্ত্র আওড়াত, অন্যদিকে তেমনই রোগের লক্ষণ বিচার করে ওষুধেরও নিদান দিত। বোডিং এই রকম ৩০৫টি প্রেসক্রিপশন-এর উল্লেখ করেছেন। তৃতীয় খণ্ডে লেখক সাঁওতাল গ্রাম, কৃষিব্যবস্থা, মাছ ধরা, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্য, ধূমপান, হাঁড়িয়া ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। এইসব গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ ছাড়া বোডিং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় সাঁওতালদের নিয়ে অসংখ্য প্রবন্ধ লেখেন। এগুলির মধ্যে 'জার্নাল অফ দ্য বিহার অ্যান্ড ওড়িশা রিসার্চ সোসাইটি'-র ১৯১৬ সালের ২ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত 'Some Remarks on The Position of Women Among The Santals' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯২১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রাঁচি থেকে প্রকাশিত 'ম্যান ইন ইন্ডিয়া' পত্রিকায় 'The Kherwar Movement Among The Santal' নামক প্রবন্ধে তিনি এই আন্দোলনের বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। খেড়ওয়াড়দের নিয়ে তাঁর আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ 'A Santal-Sect' প্রকাশিত হয় ১৯২২ সালের মার্চ সংখ্যার 'দ্য মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায়। সাঁওতাল ধর্ম, ডাইনি প্রথা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় নিয়েও তিনি প্রবন্ধ রচনা করেছেন। অন্যান্য যেসব মিশনারি সাঁওতালদের নিয়ে লেখালেখি করেছেন তাঁদের মধ্যে রেভারেন্ড. জে. ফিলিপস, ই. এল. পুক্সলি, ডক্টর. সি. আর লেপসাস, এ. ক্যাম্পবেল, ডাবলু. জে. কালসো, জে. গসডাল প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অ্যান্ড্রু ক্যাম্পবেলের

একটি অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা তিন খণ্ডে প্রকাশিত *A Santali-English Dictionary* (১৮৯৯) এবং ১৮৯১ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর সাঁওতালি লোককথা সংকলন। এই গল্পগুলি (২৩টি) তিনি মানভূম জেলা থেকে সংগ্রহ করেন। এই দুটি মৌলিক গ্রন্থ ছাড়া তিনি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় সাঁওতালদের জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ রচনা করেন। এই সব প্রবন্ধের মধ্যে আছে : 'Superstition of The Santals', 'Death and Cremation Ceremony Among The Santals', 'Santal Legends', 'The Traditional Migration of The Santal Tribes', 'The Traditions of The Santals', 'Santal Marriage Customs' এবং 'Rules of Succession and Partition of Property as Observed by The Santals', যা আমাদের জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করেছে। সাঁওতাল জীবনের অনেক তথ্য নিহিত আছে মিশনারিদের কার্যবিবরণীতে। এই সব বিবরণ সংকলনের গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করেছেন কালসো 'ম্যান ইন ইন্ডিয়া' পত্রিকার ১৯৪৫ সালের সেপ্টেম্বর সংখ্যায়। এই সংকলনে ১৮২৮ থেকে ১৮৪৭ সালের মধ্যবর্তী সময়ের বিবরণ পাওয়া যায়। কালসোর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল *Tribal Heritage : A Study of The Santals* (১৯৪৯)। এই গ্রন্থে তিনি বাঁকুড়া জেলার সারেঙ্গা গ্রামের সাঁওতালদের কথা বলেছেন। এই বইটি থেকে সাঁওতালদের সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে আমরা সাঁওতালদের মধ্যে মিশনারিদের কার্যকলাপের বিবরণ পাই। এছাড়া বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তিনি সাঁওতালদের সম্পর্কে বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছেন। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'ম্যান ইন ইন্ডিয়া' পত্রিকায় ১৯৪৬ সালের মার্চ সংখ্যায় প্রকাশিত 'Notes and Queries : Santal Songs'. এই প্রবন্ধে তিনি দেখিয়েছেন সাঁওতালরা তাদের গানের মধ্যে শুধু তাদের অতীতকেই ধরে রাখেনি; এর মধ্যে উন্মোচিত হয়েছে তাদের জীবনদর্শন। আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ হল 'Some Beliefs and Customs Related to Birth Among The Santals', এটি ১৯৪১ সালে প্রকাশিত হয় 'জার্নাল অফ দ্য রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল' পত্রিকায়। মিশনারিদের কার্যকলাপের বিবরণ পাওয়া যায় গসডালের বর্ণনায়; সাঁওতালদের নিয়ে তিনিও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখেছেন। ১৮৫২ সালে রেভারেন্ড. জে. ফিলিপস্ নামে একজন মিশনারি *An Introduction to The Santali Language* নামে একটি গ্রন্থ লেখেন। গ্রন্থটি ইংরেজিতে লেখা হলেও এতে প্রায়

৫০০০ হাজার সাঁওতালি শব্দ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। সাঁওতালি লিখিত সাহিত্যের পথ প্রদর্শক হিসাবে সাঁওতাল সাহিত্যের ইতিহাসে রেভারেন্ড. জে. ফিলিপস্ এর নাম স্মরণীয় থাকবে, কারণ তার হাত ধরেই সাঁওতালি লিখিত সাহিত্যের যাত্রা পথ শুরু হয়। ই. এল. পুক্সলি নামে আর একজন মিশনারি ১৮৬৮ সালে *A Vocabulary of The Santali Language* নামে গ্রন্থ লেখেন, এতে ৫,৬০০টি সাঁওতালি শব্দ সংকলিত হয়েছে। ১৯৩৮ সালে বেনাগড়িয়া মিশন প্রেস থেকে প্রকাশিত হয় *হুটেরায় দেশমাঝি রেয়াঃক কাথা* গ্রন্থটি। এটি বিদ্রোহে অংশগ্রহণকারী পনের বছর বয়সী বালকের প্রতক্ষ্যদর্শী বিবরণ। সাঁওতালি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এটি প্রথম তাদের বিদ্রোহ সংক্রান্ত বিবরণ। এর বঙ্গানুবাদ প্রথমে মহাশ্বেতা দেবীর বর্তিকা পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং পরে এটি ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কের *সাঁওতাল গণসংগ্রামের ইতিহাস* গ্রন্থের পরিশিষ্টে সংযোজিত হয়। ব্যাপটিস্ট মিশনের জনসন সাহেব খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত ছোটে রায়ের কাছ থেকে এই বিবরণ সংগ্রহ করেন। ছোটে রায় বিদ্রোহের পর সাঁওতালদের দুর্দশার জন্য সিধু-কানুকে দায়ী করেছেন, তবে এই বক্তব্যে কিছু বিতর্ক আছে। প্রথমত, ছোটে রায় খ্রিষ্টান ছিলেন এবং বিদ্রোহের পর তাঁর অবস্থা খুব অসহায় ছিল। প্রথমা ব্যানার্জী তাঁর *Politics of Time, Primitives and Historical Writings in a Colonial Society* (২০০৬) গ্রন্থে বলেছেন যে, এই বিবরণ মুষ্টিমেয় কিছু ধর্মান্তরিত সাঁওতালদের দৃষ্টিভঙ্গি। 'However, if read against the grain, even this text seems to display narrative fractures'[৬]–কিন্তু স্থানান্তরিত সাঁওতালদের আসামের চা-কুলি হিসাবে অভিবাসনের যে করুণ বিবরণ ছোটে রায় দিয়েছেন, তাতে কোনো খাদ নেই।

স্বাধীনতা উত্তরকালে আদিবাসী বা সাঁওতাল জনজাতি বিষয়ক বেশ কিছু গ্রন্থ কয়েকটি বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। ১৯৯২ সালে *Sage*, New Delhi থেকে প্রকাশিত হয় সুষান দেভলের *Discourses of Ethnicity : Cultures and Protest in Jharkhand*. এই লেখিকাই বলেন ঔপনিবেশিকরাই 'ট্রাইব' শব্দটির নির্মাণ করেন। বস্তুতপক্ষে ভারতের জনজাতিদের বিভিন্ন বৈচিত্র বহু পূর্ব থেকে বিদ্যমান ছিল। 'ট্রাইব' নামাঙ্কিত না হলেও এর বৈশিষ্ট্যগুলি এদের মধ্যে পুরো মাত্রায় উপস্থিত ছিল, কাজেই 'ট্রাইব' অভিধা পশ্চিমের সৃষ্টি একথা মানা যায় না। অবশ্য বিনয়ভূষণ চৌধুরী ও অজয় সাকারিয়া এই তত্ত্বের সমালোচনা করেন। মিনা রাধাকৃষ্ণান তাঁর *First Citizens :*

Studies on Adibasis, Tribals and Indigenous Peoples in India (২০১৬) গ্রন্থে আদিবাসী নামকরণ নিয়ে এক বিতর্কের বিষয় সম্পর্কে অবগত করেছেন। জনজাতিদের কোন নামে চিহ্নিত করা হবে, ট্রাইব, আদিবাসী না ইনডিজেনাস। তবে ইনডিজেনাস শব্দটির আন্তর্জাতিক দ্যেতনা অনেক বেশি আর 'ট্রাইব' শব্দটি বহু পুরোনো। গ্রিক ভাষায় এর উল্লেখ হল 'ট্রাইবাস' নামে, বহু পরিবর্তনে এটি পৃথিবীর জনজাতিতে এসে সীমাবদ্ধ হয়েছে। আবার আদিবাসী মহাসভা গঠনের পর 'আদিবাসী' শব্দটি বিশেষ স্বীকৃতি পায় এবং পরবর্তী সময়ে জয়পাল সিং মুণ্ডা 'আদিবাসী' শব্দটিকে অধিকতর পরিচিতি দান করে। অন্যদিকে ইনডিজেনাস এর অর্থ হল 'নেটিভ' বা 'Born Within'. বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে 'ইনডিজেনাস পিপল' জাতীয় আন্তর্জাতিক স্তরে আইনগত স্বীকৃতি পায়। ঔপনিবেশিক শোষণের ফলে যে স্বতন্ত্র সংস্কৃতি সম্পন্ন জনজাতিগুলির অস্তিত্ব বিপন্ন হয়েছিল তারাই এই অভিধার অন্তর্ভুক্ত।

১৯৬০ এর দশকে F.G. Bailey এবং সুরজিৎ সিনহা 'Tribe-Caste Continum' তত্ত্বের কথা তুলে ধরেন। F.G. Bailey তাঁর *Tribe, Caste and Nation* গ্রন্থে (১৯৬০) উল্লেখ করেন যে, প্রতিটি জাতিই এক সময় ট্রাইব বা আদিবাসী ছিল, অর্থনৈতিক ক্রমবিকাশের ধারায় আদিবাসীরা কৃষক হয়েছে। এরই নাম দেওয়া হল Tribe-Caste Continum। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে বিদেশি পণ্ডিতরা ভারতের পরিপ্রেক্ষিত না জেনেই মন্তব্য করেন। প্রথমত আদিবাসীরা কোনোদিনই হিন্দু চতুর্বর্ণ প্রথার অন্তর্ভুক্ত ছিল না, যা কি না হিন্দু কৃষকরা ছিল। দ্বিতীয়ত, সামাজিক গঠন ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য সাধারণ চোখে ধরা পড়ে। অবশ্য অন্যদিকে সুরজিৎ সিনহা তাঁর *Tribe-Caste and Tribe-Peasant Continua* (১৯৬৫) গ্রন্থে বলেন ভারতীয় জনজাতিরা জাতি, কৃষক এবং ট্রাইব হিসাবে একসাথে অবিরাম চলমান ছিল। তারা হিন্দু প্রভাবিত হওয়ায় এটি সংঘটিত হয়। তবে স্থায়ী কৃষক হওয়ার পরেও আদিবাসী সাঁওতালরা স্ব-ঐতিহ্য হারায়নি। কখনই কোনো আদিবাসী পূজা বা উৎসবে ব্রাহ্মণের উপস্থিতি থাকে না। অন্যদিকে হিন্দু ধর্মে ব্রাহ্মণত্ব এক অনিবার্য শর্ত। অর্থাৎ তিনি জনজাতিদের কৃষক এবং আদিবাসী এই দুই সত্তার সম্মিলিত রূপকে তুলে ধরেন। বস্তুতপক্ষে আদিবাসীরা খাদ্য সংগ্রাহক, শিকার এবং ঝুমচাষ থেকে এক ক্রমবিকাশের পথে স্থায়ী কৃষকে পরিণত হয়।

আদিবাসীরা কৃষক হলেও হিন্দু চতুর্বর্ণাশ্রমের অন্তর্ভুক্ত হয়নি। সেক্ষেত্রে তার আদিবাসী সত্তা ছিল কৃষক সত্তা থেকেও অধিকতর শক্তিশালী। কিন্তু একথাও স্বীকার্য যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সাঁওতালরা হিন্দু কৃষকদের কৃষিভিত্তিক প্রথা ও উৎসবকে গ্রহণ করে নিয়েছে।

আদিবাসী জনজাতির উপর হিন্দু ধর্মের প্রভাব এবং তৎপরবর্তীকালে এদের মধ্যে ধর্মীয় পরিবর্তন এই গবেষণার অন্যতম আলোচ্য বিষয়। ডি.এন. মজুমদার তাঁর *A Tribe in Transition* (১৯৩৭) গ্রন্থে এই সম্পর্কিত আলোচনাটি তুলে ধরেছেন। বিখ্যাত নৃতাত্ত্বিক Mallinowski’s দ্বারা ডি.এন. মজুমদার অনেকটাই প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাঁর মতে সামাজিক সংগঠনগুলি নির্দিষ্ট পরিবেশ এবং আদি সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলির পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করা উচিত। হিন্দু সভ্যতার দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার বিষয়টি অর্থাৎ Accuturation এর ফলে আদিবাসী জনজাতির মধ্যে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতির বিচ্ছিন্নতা অনেকটাই দায়ী। এই প্রভাব যে সব আদিবাসী গোষ্ঠী অর্থাৎ সাঁওতাল, মুণ্ডা, কোল, ভিল প্রভৃতির উপর সমভাবে পড়েছিল তা নয়। পরবর্তীকালে বিনয়ভূষণ চৌধুরী তাঁর ‘Society and Culture of The Tribal World in The Colonial Eastern India : Reconsidering The Notion of “Hinduzation” of Tribes’, in Hetukar Jha, *Perspective on Indian Society and History : A critique*, (২০০২) প্রবন্ধে আদিবাসীদের উপর হিন্দু প্রভাবকে অস্বীকার না করেও আদিবাসীদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যকে স্বীকার করেছেন। কিন্তু সংগ্রামের হাতিয়ার হিসাবে আদিবাসীরা একদিকে শুদ্ধিকরণ এবং কৌশলগত দিক থেকে হিন্দু সমাজের কাছে ঋণী ছিল। এছাড়াও ২০০৫ সালে তাঁর পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ থেকে প্রকাশিত ‘ধর্ম ও পূর্বভারতের কৃষক আন্দোলন : (১৮২৫-১৯০০)’, এবং ‘Adivasi Quest for A New Culture In Colonial Bengal : Context, Ideology and Organization 1855-1932’ in Sabyasachi Bhattacharya (ed.) A Comprehensive History of Modern Bengal, Vol-3, 1700-1950 (২০২০) প্রবন্ধের মাধ্যমে পূর্ব ভারতের খেরওয়াড় ও সাপাহড় আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে সাঁওতালরা সামাজিক উত্তরণের তাগিদে বা রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার আশায় হিন্দু ধর্মের প্রতি আসক্ত হয়েছিল তার বিস্তৃত বিবরণ তুলে ধরেন। অন্যদিকে এম.এন. শ্রীনিবাস তাঁর *Social Changes In Modern India* (১৯৬৩) গ্রন্থে Sanskritisation

বা সংস্কৃতায়ন তত্ত্বের কথা বলেন। তিনি বলেন যে জনজাতিদের মধ্যে সব সময় উচ্চবর্গে উত্তরণের একটা প্রবণতা থাকে। Sanskritisation বা সংস্কৃতায়ন শব্দটি অবশ্য প্রথম ব্যবহার করেছেন ভাষাবিদ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। এখানে তিনি আদিবাসীদের এক সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিবর্তন লক্ষ্য করেছেন। এই মন্তব্য অবশ্য কিছু কিছু জনজাতিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও সব জনজাতিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। অন্যদিকে মার্টিন ওঁরাও তাঁর *The Santal : A Tribe In Search of a Great Tradition* (১৯৬৫) গ্রন্থে সাঁওতালদের সামাজিক চলমানতার উপরে ওঠার আকাঙ্ক্ষার বিষয়টি তুলে ধরেন, যাকে তিনি 'Rank Concession Syndrome'[৭] বলে উল্লেখ করেছেন। আবার পশুপতি প্রসাদ মাহাতো তাঁর *Sanskritization vs Nirbakanization* (২০০০) গ্রন্থে বলেন, হিন্দু ধর্মের সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের প্রতিক্রিয়া হিসাবে আদিবাসীদের মধ্যে এক নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের জন্ম দেয়, যাকে তিনি 'Nirbakization' বা 'Culture of Silence'[৮] বলে উল্লেখ করেছেন। তবে সবক্ষেত্রেই যে সামাজিক উত্তরণের তাগিদে সাঁওতালরা হিন্দু ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল তা বলা যায় না। দীর্ঘদিন হিন্দু ও আদিবাসীরা পাশাপাশি বসবাসের ফলে বিভিন্ন কাজের সুবাদে তাদের উভয়ের মধ্যে একটি সাংস্কৃতিক আদান প্রদান ঘটে। কারণ হিন্দুরাও অনেক ক্ষেত্রেই আদিবাসীদের অনেক বিষয়কে গ্রহণ করে। আর এক্ষেত্রে ট্রাইবালাইজেশনের তত্ত্বও উঠে আসে। বস্তুতপক্ষে আদিবাসী চিন্তাধারায় যে 'Inner domain' ছিল সেটি পরিণত হয় 'Autonomous domain'-এ যার ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা অদ্যপি বর্তমান।

আদিবাসী বিদ্রোহ সম্পর্কে কুমার সুরেশ সিং তাঁর দুখণ্ডে সম্পাদিত *Tribal Movement in India* (১৯৮৩) গ্রন্থে সর্বভারতীয় আদিবাসী ইতিহাসের কথা আলোচনা করেছেন। তিনি এই আন্দোলনগুলিকে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করে বর্ণনা দেন। প্রথম পর্যায় অর্থাৎ ১৭৯৫-১৮৬০ পর্যন্ত বিদ্রোহগুলিকে তিনি বলেছেন প্রাথমিক প্রতিরোধের আন্দোলন বা Primary Reistence Movement এবং এগুলির নেতৃত্বে ছিলেন আদিবাসী নেতারাই। যদিও প্রাথমিক প্রতিরোধ বলতে কী বোঝায় তা তিনি পরিষ্কার করেননি। দ্বিতীয় পর্যায় অর্থাৎ ১৮৬০-১৯২০ পর্যন্ত যে আন্দোলন সেখানে লক্ষ্য করা যায় কৃষিগত, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিষয়গুলি এবং এই নেতৃত্ব ছিল হয় কৃষক বা নয়

শিক্ষিত আদিবাসীদের হাতে। ১৯২০-৪৭ পর্যায়ে আদিবাসী আন্দোলন অনেকটাই ধর্ম নিরপেক্ষ রাজনৈতিক রূপ পায়। সাঁওতাল বিদ্রোহ প্রসঙ্গে সর্বপেক্ষা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কের লিখিত *সাঁওতাল গণ-সংগ্রামের ইতিহাস* (১৯৭৬) । লেখক নিজে সাঁওতাল হওয়ায় বিদ্রোহ সংক্রান্ত আলোচনায় এই জনজাতির বিশ্ববীক্ষা প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর মতে এই বিদ্রোহ এক স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং তার পরম্পরাও নির্দেশ করেছেন। কিন্তু তিলকা মাঝি সংক্রান্ত তার বিবরণ বিতর্কিত। ক্লিভল্যান্ড তিলকার হাতে নিহত হয়েছিলেন কি না সে সম্পর্কে কোনো প্রাথমিক উপাদান নেই, উপরন্তু ওই সময়কালে অর্থাৎ ১৭৫০-১৭৮৫ পর্বে জঙ্গলতরাই অঞ্চলে সাঁওতালদের অনুপ্রবেশ ঘটেনি। তিলকা মাঝি কোনো পাহাড়িয়া সর্দার হতে পারেন এবং এই বিষয়টি আরো গবেষণার অপেক্ষা রাখে। আবার ২০১৫ সালে সুরেন্দ্র ঝা এবং শিবশঙ্কর রাউতের যুগ্মভাবে লিখিত *History of The Santals of Jungle Terai* (১৮০০-১৮৫৫) গ্রন্থে জঙ্গলতরাই-এর ভৌগোলিক অবস্থানের গুরুত্বের পরিপ্রেক্ষিতে লেখকদ্বয় সেখানে পাহাড়িয়া জনজাতি ও সাঁওতালদের সঙ্গে সংঘর্ষের বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। সেই সঙ্গে সাঁওতাল বিদ্রোহের মূল্যায়নে অর্থনৈতিক কারণের সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্বকেও চিহ্নিত করেছেন। সাধারণ কৃষক বিদ্রোহ ও আদিবাসী বিদ্রোহ সম্পর্কে ১৯৮০-র দশকে যে বইটি সব চেয়ে বেশি আলোড়ন ও তাত্ত্বিক বিতর্কের জন্ম দিয়েছিল, সেটি হল রণজিৎ গুহর *Elementary Aspect of Peasant Insurgency in Colonial India* (১৯৮৩)। গ্রামশির তত্ত্ব অনুসরণ করে রণজিৎ গুহ বলেন যে, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মূল স্রোতের বিপরীতে আরো একটি আন্দোলন স্বকীয় রাজনৈতিক চেতনায় প্রতিভাত হয়েছিল। এর মধ্যে নীল বিদ্রোহ, তিতুমীরের বিদ্রোহের পাশাপাশি সাঁওতাল ও মুণ্ডা বিদ্রোহ বিদ্যমান ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর সাঁওতাল বিদ্রোহের পূর্বতন মূল্যায়নের সঙ্গে এর পার্থক্য এখানেই যে শ্রীগুহ এই বিদ্রোহে সাঁওতালদের এক স্বকীয় রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্যের সন্ধান করেছেন, যেখানে সেটি মূল জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত বা অনুসারী নয়। উপরন্তু তিনি এও দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে সাঁওতালরা উল্টোভাবে উচ্চবর্গের কিছু কৌশল ও প্রথাকে এবং কর্তৃত্বের চিহ্নগুলিকে আত্মসাৎ করেছিল। আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে ছিল এই বিদ্রোহ। উচ্চবর্গীয় ইতিহাসের বাইরে শ্রীগুহ নীচের তলা থেকে ইতিহাসকে দেখার চেষ্টা

করেছেন যাকে বলা যায় 'History From Below'. যদিও সাঁওতাল বিদ্রোহ সম্পর্কে শ্রীগুহের এই মূল্যায়নে কয়েকটি সীমাবদ্ধতা আছে। প্রথমত, হিন্দু বা মুসলমান সমাজের অন্তর্ভুক্ত কৃষক আর সমশ্রেণিভুক্ত সাঁওতাল আদিবাসীরা এক গোত্রীয় নয়। এরা ছিল হিন্দু চতুর্বর্ণাশ্রমের বাইরে, উপরন্তু তাদের নিজস্ব আত্ম-পরিচয়ের গৌরবজনক সংস্কৃতি কোনো উচ্চবর্গীয় সাংস্কৃতিক আধিপত্য স্বীকার করেনি। যেখানে তারা নিজেদের ট্রাইব বলে স্বীকার করে না, সেখানে তারা নিম্নবর্গের অভিধা মেনে নেবে তা সংগত নয়। বস্তুত, তারা মানেও না। গায়েত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক প্রশ্ন তুলে ছিলেন, 'Can the Suboltern speak'?[৯] তাদের হয়ে অন্যদের কথা বলাটাই দস্তুর। কিন্তু সাঁওতালরা নিজেদের কথা নিজেরায় বলতে পারে তাদের হুলসেরঙ্গ-এর মাধ্যমে। এ বিষয়ে সুহৃদকুমার ভৌমিক 'সাঁওতাল বিদ্রোহের গান ও কবিতা' নামক প্রবন্ধে এক উল্লেখযোগ্য বিবরণ তুলে ধরেন। আবার ড্যানিয়েল রাইক্রফট তাঁর *Representing Rebellion : Visual Aspects of Counter Insurgency in Colonial India* (২০০৬) গ্রন্থে বিদ্রোহ সম্পর্কিত এক ভিন্ন মাত্রিক আলোচনা করেছেন। সাঁওতাল বিদ্রোহের রাজনৈতিক, শৈল্পিক ও সাংবাদিকতার প্রতিনিধিত্ব কীভাবে লক্ষ করা যায় সেটাই তার মূল প্রতিপাদ্য। শেরউইলের অঙ্কিত বিভিন্ন চিত্রের বর্ণনায় লেখক খুঁজে পেয়েছেন দামিনের উন্নয়নশীল অর্থনীতির মধ্যেও সাঁওতালদের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক অস্তিত্ব, যদিও তাকে রণজিৎ গুহ বর্ণিত নিম্নবর্গীয় রাজনীতির সঙ্গে এক করে দেখতে রাজি নন তিনি।

আদিবাসী ইতিহাস চর্চার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থটি হল Abhay Flavian Xaxa ও G.N. Devy যুগ্মভাবে সম্পাদিত *Being Adivasi : Existence, Entitlements, Exclusion* (২০২১)। বিভিন্ন প্রবন্ধাবলির মধ্যে এই গ্রন্থে একদিকে উত্তর ঔপনিবেশিক সময়ের সংবিধানের পঞ্চম তপশিলের (5^{th} Schedule)-এর প্রভাব আলোচিত হয়েছে, অন্যদিকে বৃহত্তর ভারতের সঙ্গে আদিবাসীদের সংহতির নানা জটিল সমস্যাগুলি বিশ্লেষিত হয়েছে। এরই মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধটি হচ্ছে অর্চনা প্রসাদের 'Class Struggle and The Future of Adivasi Politics'. যেখানে তিনি শ্রেণিসংগ্রামের সঙ্গে ভবিষ্যৎ আদিবাসী রাজনীতির সম্পর্কটিকে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে আলোকপাত করেছেন। স্বাধীনতা উত্তর আদিবাসী প্রশ্নে তার বক্তব্য হল যে, পঞ্চশীল

নীতি অনুযায়ী আদিবাসী সংস্কৃতির সুরক্ষার কথা বলা হলেও মূল দ্বন্দ্বের বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। তাঁর ভাষায়, ‘Culture and Economy were seen as two unrelated spheres of Change’।[১০] অর্থাৎ অর্থনীতির পরিবর্তন যে সংস্কৃতিকেও প্রবাহিত করে এই বিষয়টি বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ রাখে। উদাহরণ হিসাবে তিনি আদিবাসী প্রতিরোধের বিষয়টিও উল্লেখ করেছেন এবং সেই সূত্রেই আদিবাসীদের মধ্যে শ্রেণি সংগঠনের দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ্য করা যায়। আবার ভারতের বর্তমান রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় আদিবাসী স্বশাসন কতটা গ্রহণীয় সে সম্পর্কে এই গ্রন্থেই Vincent Ekka-র ‘Lessons from the Institution of Indigenous Self-Governance’ এই প্রবন্ধটি এক দিকদিশারি। যেখানে এক বিতর্কিত আলোচনার বিষয় হিসাবে উঠে এসেছে ‘Adibasi Self Government’ বা ‘Indigenous Self Government’-এর কথা। বস্তুতপক্ষে ভারতীয় রাজনীতির প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র এবং আদিবাসী ধারণায় স্ব-শাসনিক গণতন্ত্র দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। উদাহরণস্বরূপ বিভিন্ন আদিবাসী আন্দোলন যেমন ঝাড়খণ্ড, ভূমিসেনা, কাষ্ঠকোরি সংগঠন এবং সর্বপরি নকশাল আন্দোলনের মূল দাবি ছিল ‘Adibasi Self Government’ বা ‘Indigenous Self Government’। আবার বর্তমান গবেষণার সঙ্গে সাযুজ্যের দিকটি অর্থাৎ সাঁওতাল পরগণার সাঁওতালদের ক্রম পরিবর্তনের ইতিহাস আলোচিত হয়েছে Surendra Prasad Sinha -র *Conflict and Tension In Tribal Society* (১৯৯৩) গ্রন্থে। প্রথমেই লেখক এই গ্রন্থে সাঁওতাল পরগণার সাঁওতালদের সঙ্গে কয়েকটি দ্বন্দ্বের উল্লেখ করেছেন। যেমন প্রশাসনিক ব্যবস্থার সঙ্গে সাঁওতালদের দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ, খ্রিষ্টান মিশনারি ও হিন্দুদের সঙ্গে এই জনগোষ্ঠীর সম্পর্কের জটিলতা ও তার প্রভাব, পাশ্চাত্য শিক্ষাকেন্দ্রিক আদি সমাজের চাপা উত্তেজনা এবং এই অঞ্চলের ইউরোপীয় জমিদারদের সঙ্গে সাঁওতালদের দ্বন্দ্ব। এই সবেরই সামগ্রিক পরিণতিতে সাঁওতাল সমাজ, ধর্ম ও রাজনীতির পরিবর্তনকে চিহ্নিত করা হয়েছে। সাঁওতাল বা আদি সমাজের সমতাভিত্তিক (Egalitarion) দিকটি আধুনিক গবেষণায় প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন। প্রথমা ব্যানার্জী তাঁর এক দীর্ঘ প্রবন্ধ Writing The Adibasi : Some Histrographical notes (The indian Economic and Social History Review, 53, 2016)-এ আদিবাসী সমতাবাদী সমাজকে এক ‘Myth’ বা ‘অতিকথা’ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন, অথচ এর পূর্বে সাঁওতাল

মণ্ডলীপ্রথাকে ব্যাখ্যা করে George E, Somers তাঁর *The Dynamics of Santal Traditions in a Peasant Society* (১৯৭৭) গ্রন্থে সাঁওতাল সমাজের সমতাবাদীর কথা উল্লেখ করেছেন। 'The Oral traditions and Observed Practices in the Village today repeatedly emphasize an egalitarian Ideology'।[১১] আদিবাসী পরিবর্তন বাহিকা সম্পর্কিত একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল ভার্জিনিয়াস জাক্সার (Virginius Xaxa) *State, Society and Tribes : Issues In Post Colonial India* (২০০৮)। আদিবাসী সমাজের অবস্থানকে অস্বীকার করে উত্তর-ঔপনিবেশিক সময়ে সমাজ, রাষ্ট্র ও জনজাতির পারস্পারিক সম্পর্কের টানা পোড়নকে কেন্দ্র করে আদিবাসী জীবনের যে বিভিন্ন মাত্রার পরিবর্তন তারই বিশ্লেষণাত্মক ব্যাখ্যায় সমৃদ্ধ এই বই। এই পরিবর্তনের একটা বড় দিক হল, '... A shift from communal and collective onwership of land and use of Labour to private ownership of land and labour'.[১২] Somers-এর তত্ত্ব উত্তর-ঔপনিবেশিককালে ইতিহাসের অনিবার্যতাতেই ব্যর্থ প্রমাণিত হয়।

পরিবেশ ইতিহাসের চর্চা ব্যতীত আদিবাসী জীবন বোধের অনুসন্ধান অসম্ভব। বর্তমানে পরিবেশ চর্চা ইতিহাসের এক নব দিগন্তকে উন্মোচিত করেছে। এই বিষয়ে সর্বপ্রথম যাদের নাম উঠে আসে তাঁরা হলেন রিচার্ড গ্রোভ, রামচন্দ্র গুহ, মাধব গ্যাডগিল, মহেশ রঙ্গরাজন, সুমিত গুহ প্রভৃতি দিকপাল পরিবেশ ঐতিহাসিকদের কথা। মূলত জঙ্গল, যা কি না আদিবাসী জীবনের মর্মকথা তারই উপাখ্যান, সৃষ্টি ও বিনষ্টি এই ইতিহাসের উপজীব্য। আবার এই প্রসঙ্গেই এসে পড়ে উন্নয়ন ও পরিবেশের বিতর্ক। এক্ষেত্রে সুমিত গুহ তাঁর *Environment and Ethnicity In India 1200-1991* (১৯৯৯) গ্রন্থে ভারতের মধ্যযুগের কৃষি সভ্যতার ভিত্তিতে বনবাসী জনজাতিদের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে ঊনবিংশ শতাব্দীর জাতিগত নৃতত্ত্বের মধ্যে নিহিত আছে ইনডিজেনাস সংস্কৃতি। অন্যদিকে K.Sivaramakrishnan পূর্ব ভারতের পরিবেশ, বিশেষত অরণ্য সংরক্ষণ ও আদিবাসী প্রতিক্রিয়ার চমৎকার বিবরণ দিয়েছেন তাঁর *Modern Forest, State Making and Environmental Change in Colonial Eastern India* (১৯৯৯) গ্রন্থে। আবার রামচন্দ্র গুহ ও মহেশ রঙ্গরাজন সম্পাদিত *The Fissured Land : An Ecological History* (১৯৯২) নামে তিন খণ্ডের এই বইতে পরিবেশ ইতিহাসের তত্ত্বগত দিক ও পূর্ব আধুনিক এবং আধুনিক কালের অরণ্য

সম্পদের বিস্তৃত বিবরণ রয়েছে। এছাড়াও রামচন্দ্র গুহ তাঁর একাধিক প্রবন্ধের মাধ্যমে পরিবেশের নানান বিষয়কে উপস্থাপিত করেছেন। যার মধ্যে তাঁর অন্যতম প্রবন্ধ হল 'Forestry in British and Post-British India : A Historical Analysis' (EPW, ১৯৮৩)। এই প্রবন্ধে তিনি ঔপনিবেশিক সরকারের জঙ্গল সংরক্ষণ ও নিধনে বাণিজ্যিক এবং রাজস্ব লাভের স্বার্থকে চিহ্নিত করেছেন। ঝাড়খণ্ড অঞ্চলে বাণিজ্যিক গাছের উৎপাদন আদিবাসীদের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যে প্রভাব ফেলে তার বিস্তৃত্ব বিবরণ দিয়েছেন। আবার মাধব গ্যাডগিল তাঁর 'Sacred Groves : An Ancient Tradition of Nature Conservation' (Scientific American, ২০১৮) প্রবন্ধে জঙ্গল বা প্রকৃতি সংরক্ষণে আদিবাসীদের 'জাহের থান'-এর প্রাসঙ্গিকতার কথা তুলে ধরেন। আবার অন্যদিকে তিনি তাঁর 'Grassroot Conservation Practices : Revitalizing the Tradition' in Ashish Kothari, Neema Pathak, R.V.Anuradha, Bansuri Taneja (Eds.) Communities and Conservarion : Natural Management in South and Central Asia (Sage, ১৯৯৮) প্রবন্ধে উল্লেখ করেন পণ্য সংস্কৃতির ধারায় আদিবাসীদের কেউ কেউ তাৎক্ষণিক লাভের আশায় জঙ্গল ধ্বংস করতে দ্বিধা করছে না। তাছাড়া জঙ্গলের উপর থেকে নিজেদের অধিকার চলে যাওয়ার ফলে জঙ্গল ধ্বংসের ব্যাপারে তারা নির্বিকার হয়ে পড়েছে। ফলত জঙ্গল সংরক্ষণের রীতিনীতিগুলোকেও আদিবাসীরা অস্বীকার করছে। পবিত্র থান বলে বিবেচিত হয় এমন জায়গার গাছও কাটতে ভয় পায় না। আদিবাসীদের পুরোনো সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলো দুর্বল হয়ে পড়ায় এই বিচ্যুতি আরও সহজ হয়েছে। আর এই বিচ্যুতির পিছনে তিনি খ্রিষ্টান ও হিন্দু ধর্মের প্রভাবের কথা বলেন। তাঁর মতে, এই ধর্মগুলি প্রকৃতি পূজা থেকে ঈশ্বরকে বিচ্ছিন্ন করে দেখে বলে এই ধর্মগুলির প্রভাবে আদিবাসীদের কাছে প্রকৃতিকে রক্ষার করার গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছে। আবার Valayutham Sarvanam তাঁর *Environmental History and Tribals in Modern India* (২০১৮) গ্রন্থে দেখান যে অরণ্যনীতি সমগ্র আদিবাসীদের জীবনে কী দুর্বিষহ প্রভাব বহন করে এনেছিল এবং এর সঙ্গে যুক্ত ছিল আদিবাসীদের উন্নয়নে অনীহা। আঞ্চলিক পরিবেশ চর্চার ক্ষেত্রে নির্মলকুমার মাহাতোর *Sorrow Songs of Woods : Adibasi Nature Relationship in The Anthropocence in Manbhum* (২০২০) একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। স্থানীয় সূত্র, লোকগান প্রভৃতির সঙ্গে অন্যান্য

উল্লেখযোগ্য সূত্র মিলিয়ে তিনি একটি জেলার আদিবাসীদের নিজস্ব জ্ঞান ও ভূ-চিত্রের ধারণার বিস্তৃতি ঘটিয়েছেন। এক্ষেত্রে আবার নিতা মাথুর সম্পাদিত *Santhal World View* (২০০১) গ্রন্থটিও বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এই গ্রন্থে মোট ১৬টি প্রবন্ধ রয়েছে। আর এই প্রবন্ধগুলির মাধ্যমে সাঁওতালদের শরীর সম্পর্কিত ধারণা, লিপির গঠন, খাদ্যাভাস, ধর্মীয় বিশ্বাস, রোগ নিরাময় পদ্ধতি এবং বিভিন্ন উৎসব ও অনুষ্ঠানের যেমন বর্ণনা রয়েছে, তেমনি সাঁওতালদের পরিবেশ ভাবনার বিষয়গুলিও আলোচিত হয়েছে। এরই মধ্যে বৈদ্যনাথ সরস্বতী তাঁর 'Nature As Culture : The Vision of a Tradition' প্রবন্ধে সাঁওতালদের বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের শব্দের তাল এবং উৎসবের মধ্যে তাদের পরিবেশ চেতনার সম্পর্কের বর্ণনা দেন। আবার ওঙ্কার প্রসাদ তাঁর 'Sound From a Santhali Village' প্রবন্ধে বিভিন্ন সাঁওতালি গান ও সুরের উৎসের মধ্যে প্রকৃতির সম্পর্কের দিকটি তুলে ধরেন। অন্যদিকে শ্যামসুন্দর মহাপাত্র তাঁর 'Formation of Ol Chiki Script and Process of Its Transmission' প্রবন্ধে সাঁওতালদের লিপির গঠনের ক্ষেত্রে পরিবেশের পাঁচটি উপাদান যেমন—জল, আগুন, বাতাস, আকাশ, ভূমির সম্পর্কের বর্ণনা দেন। ইরফান হাবিব তাঁর *Man and Environment : The Ecolocical History of India* (২০১৫) গ্রন্থে পরিবেশের বিবর্তনের সঙ্গে মানুষের অবস্থানের বিষয়টির ঔপনিবেশিক সময় পর্যন্ত বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। অন্যদিকে সংক্ষিপ্ত পরিসরে হলেও ঝাড়খণ্ডের কয়লা খনির দূষণ সাঁওতালদের শারীরিক গঠন ও স্বাস্থ্য এবং তাদের সমাজ সংস্কৃতির অবক্ষয় ডেকে আনে তা ১৯২০ সালের একটি রিপোর্টের ভিত্তিতে তার আলোচনা করেন।

শুচিব্রত সেনের *The Santal of Jungle Mahals : An Agrarian History, 1793-1881* প্রকাশিত হয় কলকাতা রত্না প্রকাশন থেকে ১৯৮৪ সালে। আবার বাংলায় পূর্বভারতের আদিবাসী অস্তিত্বের সংকট প্রকাশিত হয় কলকাতা দে'জ পাবলিশিং থেকে ২০০৩ সালে। অন্য আর একটি গ্রন্থ *The Santal of Jungle-Mahals : Through The Ages* প্রকাশ করে আশাদীপ পাবলিকেশন ২০১৩ সালে। এই তিনটি গ্রন্থে লেখক বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সাঁওতাল জনজাতির ইতিহাস আলোচনা করেছেন। কৃষি ইতিহাস, আত্ম পরিচয়ের ইতিহাস ও উত্তর-ঔপনিবেশিক সাঁওতাদের সংগ্রাম এই তিনটি গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়। লেখক বিদ্রোহকে দেখেছেন

যেখানে এক আত্মপরিচয়ের সংগ্রাম হিসাবে এবং অস্বীকৃত হয়েছে নিম্নবর্গীয় অভিধা। ২০১৪ সালে Primus থেকে প্রকাশিত হয় প্রদীপ চট্টোপাধ্যায়ের *Redifining Tribal Identity : The Changing Identity of The Santhals in South West Bengal* গ্রন্থটি। জনজাতির আত্মপরিচয় বিষয়টি এখন বিশ্বব্যাপী আলোচিত বিষয়, সেই দিক থেকে এই বইটি অত্যন্ত এক গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। ঔপনিবেশিক গোষ্ঠী বিভাজনের সূচনা কাল থেকে জনজাতিদের আত্মপরিচয়ের রাজনীতি ব্যাপক রূপ নেয়নি তার প্রধান কারণ জাতীয়তাবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের মূল দ্বন্দ্ব। তবে উত্তর-ঔপনিবেশিক সময়ে এই বিষয়টি তীব্রতা পায়। কিছু ক্ষেত্রে সমীক্ষার ভিত্তিতে লেখক এই আত্মপরিচয়ের সংকটকে বিশ্লেষণ করেছে। সেক্ষেত্রে প্রশাসনিক ব্যবস্থা, হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতি এবং মিশনারিদের প্রভাবকে বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। আবার সমগ্র ভারতীয় আদিবাসী পরিপ্রেক্ষিতে নন্দিনী সুন্দরের সম্পাদিত *The Scheduled and Their India : Politics, Identities, Policies and Work* (২০১৬) এই গ্রন্থের লেখাগুলি ভারতবর্ষের উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে আদিবাসী জীবন সম্পর্কে তত্ত্বগত ও তথ্যপূর্ণভাবে রচিত। এই উন্নয়নে আদিবাসীরা যে শুধুমাত্র স্বভূমি চ্যুত হয়েছে তাই নয়, হারিয়েছে তাদের অরণ্যের অধিকার। লেখিকা এরই পরিপ্রেক্ষিতে আদিবাসী বিদ্রোহগুলি পর্যালোচনা করেছেন। অন্যদিকে নির্মল সেনগুপ্ত সম্পাদিত *Fourth World Dynamics : Jharkhand* (১৯৮২) গ্রন্থে বিভিন্ন প্রবন্ধাবলির মাধ্যমে ঝাড়খণ্ড অঞ্চলের স্বাধীনতা পরবর্তী উন্নয়ন ও তার প্রভাব সম্পর্কে যেমন বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন, তেমনি ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের কারণ এবং আদিবাসী জনজীবনে তার প্রভাব সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে। আর এইসব আলোচনার মাধ্যমেই পূর্বতন সাঁওতাল পরগণার সাঁওতালদের অবস্থান বিষয়ক একটা সম্মুখ ধারণা পাওয়া যায়। আদিবাসীদের দ্বারা অধুনা তাদের নিজের দৃষ্টিভঙ্গিতে বেশ কিছু গল্প-উপন্যাস রচিত হয়েছে। সাহিত্যিক উপাদান হিসাবে এদের মূল্য কোনো অংশেই কম নয়। সৌভেন্দ্র শেখর হাঁসদা লিখিত *Adibasi Will Not Dance* (২০১৫) এ রকমই একটি গ্রন্থ। এই গ্রন্থে মোট দশটি গল্প রয়েছে। আর এই গল্পগুলির মাধ্যমে লেখক আদিবাসী জনজীবনের বাস্তব প্রেক্ষাপটকে উপস্থাপিত করেছেন। ঝাড়খণ্ডের আদিবাসী পরিবারগুলির মধ্যে আত্মমর্যাদা বিকাশের চূড়ান্ত রূপ দেখা যায় যখন মঙ্গল মুর্মু ও তাঁর নাচের দল ভারতের রাষ্ট্রপতির

সামনে নাচ দেখাতে অস্বীকার করে। স্বাধীনতা পরবর্তী উন্নয়নে আদিবাসীদের যে কোনো লাভ হয়নি এবং আদিবাসীরা যে নির্বাচনী রাজনীতির একটি সংখ্যা মাত্র থেকে গেছে, তা লেখক গল্পের ছত্রে ছত্রে তার বাস্তবতাকে তুলে ধরেছেন।

গবেষণার বিষয় সম্পর্কিত উপরিক্ত আলোচনায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সাঁওতাল জনজাতিকে সর্বভারতীয় বৃহৎ প্রেক্ষাপটে বা বিহার ও ঝাড়খণ্ড রাজ্যের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করা হয়েছে। অন্যদিকে সাঁওতালদের আলোচনায় বেশিরভাগ বিষয় মূলত সাঁওতাল বিদ্রোহ কেন্দ্রিক। তাই একদিকে সাঁওতাল পরগণার (যা মূলত দুমকা, গোড্ডা, দেওঘর ও রাজমহল এই চারটি অঞ্চলকে নিয়ে গঠিত) সাঁওতাল জনজাতি বিষয়ক আলোচনা বিশেষ গুরুত্ব পায়নি, তেমনি সাঁওতাল বিদ্রোহের পরবর্তী সাঁওতাল পরগণার সাঁওতালদের সমাজ-সংস্কৃতির ধারাবাহিক আলোচনার অপ্রতুলতা রয়েছে। তাই বর্তমান গবেষণায় এই বিষয়গুলিকে অনুধাবন করে তার ইতিহাসগত আলোচনাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আবার সাঁওতাল সমাজ সংস্কৃতির সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় সম্পৃক্ত থাকায় বা সেই বিষয়গুলির আলোচনা ব্যতীত সমাজ সংস্কৃতিকে বোঝা সম্ভব নয়, সেগুলিকেও বিশ্লেষণ ও আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও এই গবেষণায় সাঁওতাল জনজাতির নিজস্ব ভাষ্যকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, যা এতদিন পর্যন্ত উপেক্ষিত থাকায় বা বোধগম্য না হওয়ায় সাঁওতাল বিষয়ক বহু ধারণার অস্বচ্ছতা ছিল।

গবেষণায় উত্থাপিত প্রশ্ন

১) সাঁওতাল পরগণা নামে নিজস্ব ভূখণ্ড লাভের পরেও কীভাবে সাঁওতাল সমাজ-সংস্কৃতি উপনিবেশ ও উপনিবেশ পরবর্তী কাঠামোয় আবদ্ধ হয়ে পড়ে?

২) ১৮৫৫ পরবর্তী পরিস্থিতি সাঁওতাল সমাজ-সংস্কৃতির কোন কোন ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করে?

৩) হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির এবং খ্রিস্টান মিশনারিদের ভাবধারা কীভাবে সাঁওতাল পরগণার সাঁওতাল জনজাতির গোষ্ঠীগত জাতি চেতনাকে প্রভাবিত করেছিল?

৪) সাঁওতাল পরগণার সাঁওতালদের অর্থনৈতিক সংকট এবং অভিপ্রয়াণ সাঁওতাল পরগণার জনসংখ্যার বিন্যাসকে কী প্রভাবিত করেছিল?

৫) স্বাধীন ভারতের নেহরুর আদিবাসী ভাবনা, উন্নয়নের প্রচেষ্টা ও সাংবিধানিক অধিকার কীভাবে সাঁওতালদের পরিচিতি সংকটকে ত্বরান্বিত করেছিল?

৬) সাঁওতালদের আত্মপরিচয়কে জাগ্রত করতে অলচিকি লিপির উদ্ভব কী ধরনের সহায়ক ভূমিকা গ্রহণ করেছিল?

৭) পরিবেশের সঙ্গে সাঁওতাল সমাজ-সংস্কৃতি কতটা সম্পৃক্ত ছিল এবং তার অবনমনেই বা কী প্রভাব পড়েছিল?

গবেষণা পদ্ধতি

আদিবাসী বা সাঁওতাল ইতিহাস রচনার পদ্ধতিগত দিকটি অন্যান্য ইতিহাস রচনার দিক থেকে অনেকটাই স্বতন্ত্র। অন্যান্য ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে লেখ্যাগারের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেও সাঁওতাল ইতিহাস চর্চায় লেখ্যাগারের বাইরে বা Beyond Archive কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। কারণ আদিবাসীদের নিজস্ব কোনো লিখিত উপাদান না থাকায় লেখ্যাগার ভিত্তিক তথ্য বিশেষভাবে ফলপ্রসূ হয়ে ওঠে না। সরকারি আমলা ও মিশনারিদের দ্বারা সাঁওতাল মৌখিক ভাষ্যের লিখিত তথ্য থাকলেও তা অধিকাংশই পক্ষপাতদোষে দুষ্ট এবং প্রক্ষিপ্ত। তাই সাঁওতাল ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে তাদের বিভিন্ন বিন্তি বা পুরাণ, লোকসংগীত, ধাঁধা, হেয়ালি, রূপকথা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এরই সঙ্গে আদিবাসী বা সাঁওতালদের মধ্যে আলাপচারিতা বা দলগত কথোপকথন (যা সাক্ষাৎকার নয়, কারণ সাক্ষাৎকারে একটি বিশেষ উদ্দেশ্য পূরণের জন্য কয়েকটি প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে যেতে হয়। যা অনেক ক্ষেত্রেই নিরক্ষর গ্রাম্য আদিবাসীদের কাছে বোধগম্য হয়ে ওঠে না বা হলেও সঠিক তথ্য উঠে আসে না।) এবং Participant Observation বা প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ আদিবাসী বা সাঁওতালদের বিশ্ববীক্ষা ও মানসিকতার উপলব্ধিতে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। মূলত আদিবাসী বিদ্রোহগুলিকে সামনে রেখেই ঔপনিবেশিক সরকার বিভিন্ন রিপোর্ট বা প্রতিবেদন রচনা করে। সেক্ষেত্রে দেখা যায় বিদ্রোহগুলির পটভূমির বর্ণনায় বিশেষত ১৮৫৫ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহের পরিপ্রেক্ষিতে সাঁওতাল সমাজ, ধর্ম, অর্থনীতি, অভিপ্রয়াণ ইত্যাদি বিষয়গুলি অঙ্গাঙ্গীভাবে উঠে এসেছে। গবেষণার কাজের তথ্য হিসাবে এগুলির মূল্যায়নও সাঁওতাল ইতিহাস চর্চাকে সমৃদ্ধ করেছে। অন্যান্য নথি হিসাবে বিভিন্ন গেজেটিয়ার্স,

সেনসাস্ রিপোর্ট ও মিশনারিদেরর বার্ষিক রিপোর্ট বিশেষভাবে উল্লেখ্য। তাই পদ্ধতিগত দিক থেকে একদিকে বিভিন্ন সরকারি প্রতিবেদনের মূল্যায়ন এবং অন্যদিকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাভিত্তিক তাদের জীবনচর্চা, এই দ্বিবিধ উপায়ই সাঁওতাল ইতিহাস রচনায় প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে, আর সহায়ক উপাদান হিসাবে রয়েছে সাঁওতাল জাতি বিষয়ক বিভিন্ন গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা। ইংরেজি, বাংলা, হিন্দি ভাষায় লিখিত গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকার পাশাপাশি সাঁওতালদের ইদানিং নিজস্ব লিপিতে (অলচিকি) রচিত নানান লেখাপত্রে তাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও অনালোচিত সাঁওতাল ইতিহাসের বহু তথ্য গবেষণার কাজকে সমৃদ্ধ করেছে। সেই সঙ্গে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ ও পরিসংখ্যানগত বিষয়গুলির উপরও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই গবেষণাটিকে বিভিন্ন অধ্যায়ে বিন্যস্ত করে তুলনামূলক, ঐতিহাসিক এবং বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতির প্রয়োগ করা হয়েছে। তাছাড়া বর্তমান গবেষকের সাঁওতালি ভাষা ও লিপি জ্ঞাত থাকায় সাঁওতালদের নিজস্ব ভাষ্যের উপযুক্ত পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে, যা গবেষণার কাজকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছে।

গবেষণায় নির্ধারিত অধ্যায়ের রূপরেখা

গবেষণার বিষয়টিকে পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করে ভূমিকা ও উপসংহারের মাধ্যমে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো গেছে। সেক্ষেত্রে প্রথম অধ্যায়ে, সাঁওতাল পরগণার গঠন ও ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থানের পাশাপাশি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট আলোচিত হয়েছে। সেই সঙ্গে সাঁওতাল জনজাতির উৎপত্তি, নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, সাঁওতাল পরগণায় সাঁওতালদের বহিরাগত হিসাবে আগমনের ইতিহাস যেমন আলোচিত হয়েছে, তেমনি অন্যদিকে সাঁওতালদের স্বতন্ত্র সমাজ-সংস্কৃতির নানা বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে। তুলনামূলকভাবে এটাও আলোচিত হয়েছে যে সাঁওতাল পরগণার গঠনগত ও ভূপ্রাকৃতিক অবস্থান সেখানকার সাঁওতাল জনজাতিকে অন্যান্য অঞ্চলের সাঁওতালদের তুলনায় অনেক ক্ষেত্রেই স্বতন্ত্র করে তোলে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে, প্রশাসনিক, মিশনারি ও হিন্দু সংস্কৃতির প্রভাব আলোচিত হয়েছে। মূলত এই তিনটি বিষয়ই সাঁওতাল পরগণার সাঁওতাল জনজাতির কাঠামোগত পরিবর্তনে মূখ্য ভূমিকা পালন করে। ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দ্বারা সমগ্র পূর্বভারতের অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট পরিবর্তিত হতে থাকে। কিন্তু তখনও সাঁওতাল পরগণা বা তৎকালীন দামিন-ই-কোহ উক্ত ব্যবস্থার বাইরে ছিল।

পাহাড়িয়াদের (সাঁওতাল পরগণার আদি বাসিন্দা) দমনের উদ্দেশ্যে তৎকালীন দামিন-ই-কোহতে সাঁওতালদের প্রবেশ ঘটে এবং ঔপনিবেশিক সরকারিই এক প্রকার সাঁওতালদের এই এলাকায় স্থায়ী বসবাস স্থাপন ও চাষের কাজে উৎসাহ দেয়। কিন্তু ধীরে ধীরে এই অঞ্চলটিও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আওতায় এসে পড়ে। একদিকে অর্থনৈতিক শোষণ এবং অন্যদিকে সামাজিক-সাংস্কৃতিক নির্যাতন, এই দুই এর সম্মিলিত ফলে সংগঠিত হয় ১৮৫৫ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহ। শেষ পর্যন্ত সাঁওতাল বিদ্রোহ ব্যর্থ হলেও 'সাঁওতাল পরগণা' নামে ভূখণ্ড প্রাপ্তি সাঁওতালদের জাতিগত পরিচিতিকে বিশেষ মর্যাদায় পৌঁছে দেয়। কিন্তু পরবর্তীতে ঔপনিবেশিক সরকার প্রশাসনিক ক্ষেত্রে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করে সাঁওতালদের সমাজ-সংস্কৃতির বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে প্রভাবিত করতে থাকে, যা স্বাধীনতা পরবর্তী সময়েও বজায় থাকে। আর এখান থেকে পরিত্রাণের উপায় হিসাবে মিশনারি ও হিন্দু সংস্কৃতির ভাবধারা গ্রহণ করায় সাঁওতালদের গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজ কাঠামো বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং নতুন আঙ্গিকে পরিচালিত হতে থাকে, যা তাদের স্বতন্ত্র সমাজ-সংস্কৃতিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। তৃতীয় অধ্যায়ে, সাঁওতাল পরগণার সাঁওতালদের অর্থনৈতিক অবস্থান এবং অভিপ্রয়াণের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজ-সংস্কৃতির প্রেক্ষাপট আলোচিত হয়েছে। সাঁওতালদের অর্থনীতি ছিল মূলত জল-জঙ্গল-জমি কেন্দ্রিক। ঔপনিবেশিক সরকারের বিভিন্ন ভূমি বন্দোবস্তের মাধ্যমে এবং জঙ্গল আইনের দ্বারা সাঁওতালদের অর্থনৈতিক কাঠামোকে বিধ্বস্ত করার পাশাপাশি অর্থনীতির সঙ্গে জড়িত সাঁওতাল সমাজ-সংস্কৃতির নানান ক্ষেত্রকে ভাঙ্গনের মুখে ঠেলে দেয়। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়েও উন্নয়নের ধারায় বৃহৎ কলকারখানা, বাঁধ নির্মাণ এবং বাণিজ্যিক জঙ্গল আইন সাঁওতাল পরগণার সাঁওতালদের জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে। আর যার ফলে এখানকার সাঁওতালরা বিভিন্ন অঞ্চলে পরিযায়ী বা স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে অন্যত্র গমন করতে থাকে। অন্যদিকে উন্নয়নের সঙ্গী হিসাবে সাঁওতাল পরগণায় দিকুদের অনুপ্রবেশ ঘটে। যার সামগ্রিক ফলাফল হিসাবে সাঁওতাল সমাজ-সংস্কৃতির পরিবর্তনের সঙ্গে জনবিন্যাসের পরিবর্তন ঘটতে থাকে। চতুর্থ অধ্যায়ে, স্বাধীনতা পরবর্তী উন্নয়ন ও সাংবিধানিক অধিকারের সঙ্গে ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের প্রেক্ষাপট আলোচিত হয়েছে। স্বাধীন ভারতে আদিবাসীদের স্থান কোথায়, তা নির্ণয়ে তৎকালীন বিতর্কগুলির আলোচনার পাশাপাশি নেহরুর পঞ্চশীল নীতির ব্যর্থতার

বিষয়টিও তুলে ধরা হয়েছে। সাঁওতাল পরগণায় বৃহৎ কলকারখানা, বাঁধ নির্মাণ করা হলেও সাঁওতাল পরগণার সাঁওতালরা তার সুফল পায়নি বরং তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থাকে দুর্বিষহ করে তোলে। অন্যদিকে রক্ষাকবচ হিসাবে সাংবিধানিক নানান ব্যবস্থা থাকলেও তা সাধারণ আদিবাসী বা সাঁওতালদের অধিকারকে রক্ষা করতে পারেনি। আবার নির্বাচনী রাজনীতির দরুন সাঁওতাল সমাজ কাঠামোয় 'এলিট' শ্রেণির উদ্ভব তাদের গোষ্ঠী চেতনায় বিভাজন তৈরি করে। বিভিন্ন সর্বভারতীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থার দ্বারা সাঁওতালদের 'Traibal Self Government'-এর স্বতন্ত্র ভাবনা চিরতরে বিলীন হয়ে যায়। যার সামগ্রিক ফলাফল হিসাবে সাঁওতালরা স্বতন্ত্র রাজ্য হিসাবে ঝাড়খণ্ডের দাবি করলেও তা শেষ পর্যন্ত আঞ্চলিক ভাবধারায় পরিচালিত হতে থাকে। যেখানে সাঁওতালদের অধিকারের থেকে দিকুদের অধিকার রক্ষার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। যার ফলস্বরূপ সাঁওতাল পরগণা কেন্দ্রিক সাঁওতাল জনজাতি তার স্বতন্ত্র সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। পঞ্চম অধ্যায়ে, সাঁওতাল পরগণার সাঁওতাল জনজাতির সমাজ সংস্কৃতিতে পরিবেশের প্রভাব আলোচিত হয়েছে। আদিবাসী বা সাঁওতালদের বিশ্ববীক্ষা মূলত প্রকৃতি তথা পরিবেশ-কেন্দ্রিক। তাদের সমাজ-সংস্কৃতির প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই রয়েছে পরিবেশকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি। সাঁওতাল পরগণার পরিবেশ সেখানকার সাঁওতালদের বিশেষ স্বাতন্ত্র্যতা প্রদান করে। সাঁওতাল পরগণা অঞ্চলটি ছিল মূলত জঙ্গল, পাহাড় ও খনিজ সম্পদে পরিপূর্ণ। সাঁওতালদের বিভিন্ন উৎসব, গোষ্ঠী কাঠামো, ঔষধি ব্যবস্থা, গান-নাচ, সুর প্রভৃতির প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে পরিবেশ তথা প্রকৃতি ছিল গভীরভাবে সম্পৃক্ত এবং একে অপরের পরিপূরক। এমনকি পরবর্তীতে সাঁওতালদের অলচিকি লিপির উৎসও ছিল প্রকৃতি। প্রকৃতিকেন্দ্রিক জীবনবোধের পাশাপাশি প্রকৃতির সঙ্গে তাদের একটি সাংকেতিক সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। দেওয়াল চিত্রের বিভিন্ন বিষয় এবং গাছের ডাল ও গাছের পাতার মাধ্যমে বার্তার অভিপ্রায়ের নির্দেশ মূলত প্রকৃতিকেন্দ্রিক জীবনবোধের অন্যতম দৃষ্টান্ত। কিন্তু উপনিবেশ ও উপনিবেশ পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন জঙ্গল আইন, বাঁধ ও কলকারখানা নির্মাণের দ্বারা সাঁওতালদের প্রকৃতি চেতনায় আঘাত নেমে আসে এবং শেষপর্যন্ত প্রকৃতি কেন্দ্রিক সমাজ ও সংস্কৃতি তার স্বতন্ত্র কাঠামো থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

তথ্যসূত্র :

১. Susna B.C. Devalle, *Discourses of Ethnicity and Protest and Jharkhand*, Sage Publication, New Delhi, 1992, p.50.

২. March Bloch, *The Historian's Craft*, Manchester University Press, New York, 1954, Reprint 1979, p.194.

৩. E.H. Carr, *What is History*, Penguin Books, London, 2nd Edition, 1984, p.29.

৪. John Monaghan and Peter Just, *Social and Cultural Anthropology*, Oxford University Press, New York, 2000, p.13.

৫. Jha, Surendra, *Historiography of Tribal Movements in Colonial India 1770-1947*, Indian Histriography : An Analysis Eds. By Dilip Kumar Ghosh and Ranjit Sen, Institute of Historical Studies, Kolkata, 2013, p.146.

৬. Banerjee, Prathama, *Politics of time : "Primitives" and History Writing in a Colonial Society*, Oxford University Press, 2006, p.104.

৭. Martin Orans, *The Santal : A Tribe in Search of a Great Tradition*, Detroit: Wayne State University, 1965, p.108.

৮. Mahato, Pashupati Prasad, *Sanskritization Vs Nirbakization : A Study of Cultural resistance of the people of Junglemahal*, Purbalok Publication, Kolkata, First Published 2000, Second Edition 2012, p.18.

৯. Gayetri Chakravorty Spivak, 'Can the Subaltern Speak', in Patrick Williams and Laura Chrisman (eds.), *Colonial Discourse and post-colonial Theory*, Columbia University Press, New York, 1994, p.80.

১০. Prasad, Archana, 'Class Struggle and Future of Adivasi Politices', in Abhay Flavian Xaxa and G.N.Devy (eds.), *Being Adivasi : Existence, Entitlements, Exclusion*, Penguin Random House, India, Haryana, 2021, p.68.

১১. George E.Somers, *The Dynamics of Santal Traditions in a Peasant Society*, Abhinav Publications, New Delhi, 1977, p.58.

১২. Xaxa, Virginius, *State, Society and Tribes : Issues In Post Colonial India*, Pearson Longman, New Delhi, 2008, p.117.

প্রথম অধ্যায়

সাঁওতাল পরগণার গঠন, ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য এবং ঐতিহ্যশালী সাঁওতাল সমাজ ও সংস্কৃতি

প্রথম অধ্যায়

সাঁওতাল পরগণার গঠন, ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য এবং ঐতিহ্যশালী সাঁওতাল সমাজ ও সংস্কৃতি

আদিবাসী ইতিহাস চর্চা তার বিভিন্ন মাত্রার সংযোজনে আজ অনেকটাই সমৃদ্ধ। বর্তমান গবেষণা অর্থাৎ সাঁওতাল পরগণা কেন্দ্রিক সাঁওতাল জনজাতির সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও পরিবেশের ক্রমপরিবর্তনের এক বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা। সাঁওতাল পরগণার সাঁওতাল জনজাতির পর্যালোচনায় তাদের স্বতন্ত্র ও এক দৃঢ় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে প্রাথমিকভাবে তুলে ধরা প্রয়োজন। সেই সঙ্গে সাঁওতাল পরগণার ভূ-প্রকৃতি বা Landscape-এর মধ্যেই নিহিত ছিল সাঁওতাল জনজাতির ঐতিহ্যময় এক সংস্করণ। অভিবাসনের বিভিন্ন পর্যায় শেষে তারা খুঁজে পায় এই ভূখণ্ড, তখন তাদের মনে হয়েছিল তারা ফিরে পেয়েছে আদিকল্পের এক নিজস্ব দেশ এবং এখানেই তারা গড়ে তোলে তাদের এক স্বতন্ত্র সমাজ ও সংস্কৃতি। সমগ্র ভারতবর্ষে সাঁওতালদের সমাজ-সংস্কৃতির কাঠামো মোটামোটি ভাবে এক হলেও সাঁওতাল পরগণার অবস্থান ও ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য এখানকার সাঁওতালদের সমাজ- সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিশেষ স্বাতন্ত্র্যতা প্রদান করে। আবার সময়ের সঙ্গে এই অঞ্চলের পরিবর্তনশীল পরিস্থিতি সাঁওতাল সমাজ সংস্কৃতিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। তাই সাঁওতাল জনজাতির বিবর্তনের পর্যালোচনায় সাঁওতাল পরগণার ভূ-প্রাকৃতিক ও অবস্থানগত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সাঁওতালদের ঐতিহ্যশালী সমাজ সংস্কৃতির আলোচনা বিশেষ গুরুত্ব রাখে।

সাঁওতাল জনজাতির পরিচয়

সাঁওতাল জনজাতির বিষয়ে গবেষণার সূচনায় আমাদের প্রথমে সাঁওতাল শব্দটির উৎপত্তি সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। সাঁওতাল নামটির উৎস সম্পর্কে বিভিন্ন পণ্ডিত ভিন্ন ভিন্ন মতামত দিয়েছেন। ১৭৯৫ সালে এশিয়াটিক রিসার্চ থেকে প্রকাশিত জন শোরের ‘On Some Extraordinary Facts, Customs and Practices of the Hindus’ নামক প্রবন্ধে প্রথম সাঁওতালদের ‘সুন্তার’(soon tars) নামে উল্লেখ করা হয়।[১] আবার ফ্রান্সিস বুকাননের জার্নাল থেকে সংগ্রহ করে লেখা মন্টগোমারি মার্টিন *Eastern India*

গ্রন্থে প্রথম রাজমহল পাহাড়ের অধিবাসীরূপে সাঁওতালদের বর্ণনা প্রসঙ্গে 'সাঙ্গতার' (saungtar) কথাটি ব্যবহার করেন।[২] ডবলু.বি.ওল্ডহ্যামের বক্তব্য অনুসারে, সাঁওতাল কথাটি 'সামন্তওয়াল' শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ। অন্যদিকে সাঁওতাল পুরাণ মতে, বর্তমান মেদিনীপুর জেলার শিলদা পরগণা সাঁওতালদের কাছে 'সাঁতদিশম' নামে উল্লিখিত, 'সাঁতদিশম' অর্থাৎ সাত অঞ্চলে বসবাসকারী জনজাতি সাঁওতাল নামে পরিচিত। রেভারেন্ড স্ক্রেফসরুডের মতে, মেদিনীপুর জেলার একাংশ 'সাওন্ত' বা 'সামন্তভূমি' নামে পরিচিত ছিল এবং সাঁওতাল কথাটি এসেছে 'সাঁওণতর' কথার অপভ্রংশ হতে।[৩] তবেএ বিষয়ে বড়কা কিস্কু তাঁর *The Santals and their Ancestors* গ্রন্থে উল্লেখ করেন, অষ্টাদশ শতকের শেষ এবং ঊনবিংশ শতকের শুরুতে যখন আদিবাসীরা সাওন্ত থেকে দামিন-ই-কোহ তে বসবাসের জন্য চলে আসে তখন সাঁওতাল অভিধাটি ইংরেজ কর্তৃক নির্ধারিত হয়।[৪] আবার শ্রী বায়ার বাস্কের মতে, অষ্ট্রিক ভাষা-ভাষী জনগোষ্ঠী চীন থেকে এসে ছোটনাগপুর অঞ্চলে বসবাস শুরু করলে তারা 'চাওথিচ' নামে পরিচিত হয়। কারণ তারা চীনের 'খিউচথিচ' এলাকা থেকে ভারতবর্ষে অভিপ্রয়াণ করে। এই চাওথিচ থেকে হয় চাওথিচিয়াস। এ থেকে হয় চাওথিরাল। আবার এই থেকে হয় চাওথাল, চাওথাল থেকে আসে সাঁওতাল। অর্থাৎ খিউচথিচ – চাওথিচ – চাওথিচিয়াল – চাওথিয়াল – চাওথাল – সাঁওতাল ; এরূপ ভাবে সাঁওতাল নামের উদ্ভব হয়েছে। তবে এ মতের বিশেষ কোনো যুক্তি বা তথ্য পাওয়া যায় না। আবার ভাষাতত্ত্ববিদ আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে 'সাঁওতাল' কথাটির উদ্ভব ঘটেছে 'সমান্তপাল' থেকে, যার অর্থ সীমান্তরক্ষক। তিনি আরও বলেন—মধ্যযুগে সামন্তপাল কথাটি সামন্তয়াল এবং পরে 'সাঁওতাল' এ পরিণত হয়েছে।[৫] তবে সাঁওতালি কিংবদন্তী, গাঁথা, গানে এবং পুরাণে সাঁওতালদের সীমান্তরক্ষকের পরিচয়ের কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় না। এইরূপ একই প্রসঙ্গ পাওয়া যায় অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাসের মধ্যযুগীয় মঙ্গলকাব্য বা মোঘল বিবরণে; যেখানে নিষাদদের দ্বারা সামন্ত রাজাদের রক্ষার বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে তিনি বলেন—'সামন্তপাল' সংস্কৃত কথাটি প্রাকৃতের মধ্য দিয়ে সাঁওতালে পরিণত হয়েছে। অন্যদিকে সাঁওতাল সমাজের আনন্দ-বিনোদনের প্রকৃতি বিশ্লেষণে আরেকদল পণ্ডিতবর্গের অভিমত অনুযায়ী, সাঁওতাল কথাটির উদ্ভবের পশ্চাতে রয়েছে 'শ্যামের তাল' শব্দবন্ধটি। শ্যাম অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেমন বাঁশির সুরের তালে গোপিনীদের

সাথে নৃত্যগীত করেন, তেমনি আদিবাসী জীবন-সংস্কৃতির অন্যতম অঙ্গ হল বাঁশির সুরে ধামসা মাদলের তালে নৃত্যগীত করা, তাই তাদের নাম সাঁওতাল।[৬] তবে এটি সম্পূর্ণরূপে ধর্মীয় ভাবাবেগ প্রসূত মতবাদ। এ প্রসঙ্গে ভিন্ন পণ্ডিতবর্গের সকল মতের পাশাপাশি সাঁওতালি ঐতিহ্যবাহী আদি সাহিত্যে তাদের উৎস সম্পর্কে কোনো মতামত না থাকায় পন্ডিতদের চর্চায় মূলত মুখ্য হয়ে উঠেছে। তবে প্রাগৈতিহাসিক কাল হতে ভারত ভূখন্ডে বসবাসকারী কোল, মুন্ডা বা নিষাদের শাখা গোষ্ঠী যারা উত্তর পূর্ব ভারতে প্রবলভাবে বিদ্যমান ছিল তারা সকলেই খেরওয়াল পরিচয় বহন করলেও এই ব্যাপক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত সাঁওতালরা স্বাতন্ত্র্যতা বজায় রেখে প্রবল স্বাভিমানে স্বতন্ত্র জনজাতি হিসেবে বিশেষ পরিচিতি অর্জন করে। ঔপনিবেশিক সময়ে বিশেষ করে সাঁওতাল নামক পৃথক জাতিসত্তায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কাজটি দৃঢ়ভাবে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। সাঁওতাল নামের অর্বাচীন পরিচয়ে ভারতের প্রাচীনতম এক জনগোষ্ঠীর অন্যতম এবং শ্রেষ্ঠতম প্রতিনিধিদের এই জনজাতি পরিচিতির ব্যাপারটি কতদুর সত্য তা ব্যাপক অনুসন্ধানী বিষয় হলেও তেমন কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি, কারণ এই জনজাতির কোনো লিখিত বিবরণ নেই।

সৃষ্টিতত্ত্বের উত্তর খুঁজতে গিয়ে পৃথিবীর সকল জাতি নিজেদের নিজস্ব সৃষ্টিকাহিনী রচনা করেছে। সৃষ্টির কৌতূহল নিরসনের জন্য পৃথিবীর প্রতিটি প্রাচীন জাতি তৈরি করেছে নিজস্ব সৃষ্টিতত্ত্ব, যাতে বলা হয়েছে পৃথিবীতে প্রথমে শুধু জল ছিল, তারপর এল জলচর প্রাণী, তারপর গাছপালা এবং শেষে মানুষের সৃষ্টি হয়েছে। সাঁওতাল জনজাতির সৃষ্টিতত্ত্বের উৎস হল—পুরাণ বা বিন্তি। উক্ত বিন্তিগুলি বিভিন্ন সাঁওতালি অনুষ্ঠানের সময় বিন্তি গুরুরা গীতবাদ্য সহকারে পরিবেশন করে থাকেন। সাঁওতালি সৃষ্টিতত্ত্বে সাঁওতাল জনজাতির ধর্মীয় বিধি, লোকাচার ও সংস্কৃতির বিভিন্ন ধারা বিধিবদ্ধ প্রথাগত রূপে লৌকিকতার সাথে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। সাঁওতাল সমাজে বিন্তির কয়েকটি প্রবণতা লক্ষ্যণীয়, যেমন—জমসিম বিন্তি (জমসিম বোঙ্গার পূজার সময় পরিবেশিত হয়), ভাঁড়ান বিন্তি (শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে পরিবেশিত হয়), কারাম বিন্তি (কারাম পূজার উপলক্ষ্যে পরিবেশিত হয়), বাপলা বিন্তি (বিবাহ অনুষ্ঠানে পরিবেশিত হয়)। এই সকল প্রকার বিন্তিগুলি প্রথম দিকে প্রায় একই রকম হলেও বিষয়ভেদে নবতর বিষয় যুক্ত হয়ে ভিন্ন অনুষ্ঠানে ভিন্নভাবে পরিবেশিত হয়। ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে রেভারেন্ড লারস

ওলসেন স্ক্রেফসরুড সাঁওতাল জনজাতির পূর্বপুরুষদের কথা সম্বলিত সাঁওতালি ভাষায় *হড়কোরেন মারে হাপড়ামকো রেয়াংক কাথা* নামে এক মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশ করেন, সাঁওতাল গুরু কোলিয়ান হাড়ামের কাছ থেকে তথ্য সংগহ করে তিনি তা প্রকাশ করেন। স্ক্রেফসরুড তাঁর গ্রন্থে যে সৃষ্টিতত্ত্বের কথা বলেছেন তা হল—কারাম বিন্তির শুরুতে বলা হয়েছে আমরা সেই দিকে জন্মেছি, যে দিকে সূর্য ওঠে, আর চারিদিকে শুধু জল আর জল, আর জলের নীচে মাটি। সেখানে আরও বলা হয়েছে—

"আবদো হোড়, আবোনা,
সাওতা হেনা আ রোড় হেনা আ,
ওল হেনা আ, ধরম হেনতাবোনা,
ওনা খাতির
আবোবনা বোঙ্গা বুরু আ"।[৭]

(যার অর্থ, আমরা মানবজাতি, আমাদের সমাজ আছে, আমাদের ভাষা আছে এবং লেখার উপায় আছে, আমাদের ধর্ম আছে আমরা যার জন্য পূজা বা আরাধনা করি।)

জীবনের প্রথম পর্বে পৃথিবীতে ছিল জল আর জল, আর তলায় ছিল মাটি, সেই জলে স্নান করতে আসতেন ঠাকুরজীউ এবং তাঁর পত্নী ঠাকরাণ। তাঁরা 'তোড়ে সুতৌম' এ করে পৃথিবীতে আসতেন।[৮] এই কাল্পনিক সুতোর সাহায্যে ঠাকুরজীউ স্বর্গে ও মর্তে আসা যাওয়া করতেন এবং ঠাকুর প্রত্যেকবার পৃথিবীতে এসে কাঁকড়া, কুমীর, চিংড়ি, কচ্ছপ ও কেঁচো জাতীয় জলচর প্রাণীর সৃষ্টি করতেন। এরূপভাবেই ঠাকুর একদিন আপন খেয়ালে মাটি দিয়ে দুটি মানবমূর্তি গড়লেন। যখন তিনি উক্ত মূর্তি দুটিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করবেন তখনই সূর্যের ঘোড়া দুটি জলপান করতে এসে মূর্তি দুটি ভেঙ্গে দেয়।[৯] ঠাকুর দুঃখ পেয়ে স্থির করলেন আর মানুষ গড়বেন না। তবে একদিন ঠাকুরজীউ স্নানের সময় নিজের বুকের ময়লা ঘষে 'হাঁস' ও 'হাঁসিল' নামে দুটি পাখি তৈরি করেন। সাঁওতাল জনজাতিদের কোনো কোনো পুরাণে বলা হয়েছে—ঠাকুরজীউ সিরম নামক গুল্মের মুকুল থেকে তাদের তৈরি করেন।[১০] এরপর হাঁস-হাঁসিল উড়ে চলে যায়, কিন্তু কোথাও বসার স্থান না পেয়ে পরবর্তীতে তারা বসার স্থান হিসেবে ঠাকুরের হাতে এসে বসে। সেই সময় স্বর্গ থেকে সূর্যের ঘোড়া জল পানের জন্য এলে ঠাকুর তার মুখের

ফেনাতে হাঁস আর হাঁসিল কে বসিয়ে দেন। আশ্রয় তো হল কিন্তু তারা খাবে কী? তখন ঠাকুর স্থলভাগ সৃষ্টির প্রয়োজন অনুভব করলেন এবং ঠাকুর তার সৃষ্ট জীবগুলোকে মহাসমুদ্রের তলদেশ থেকে মাটি খুঁড়ে আনার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু তাতে কাজের কাজ কিছু হল না, কারণ মুখে করে তা আনতে আনতেই গলে যায়। শেষে ঠাকুরজীউ কেঁচোকে আদেশ দিলে কেঁচো কচ্ছবের পিঠে লেজ দিয়ে, সমুদ্রের তলদেশের মাটি খেয়ে মল আকারে কচ্ছবের পিঠে সঞ্চয় করতে থাকে এবং এই ভাবে পৃথিবী মাটিতে ভরে গেলে ঠাকুরজীউ মইদিয়ে তা সমান করে দেন। এর পর উঁচু অংশে পাহাড়-পর্বত এবং বাকি অংশে সমভূমি সৃষ্টি হল। এই সমভূমিতে ঠাকুর সর্বপ্রথম সিরম গাছ সৃষ্টি করলেন।[১১] পরবর্তীকালে দূর্বা ঘাস, করম গাছ,শাল, মহুয়া, কেঁদে গাছ প্রভৃতি সৃষ্টি করলেন। এরপর হাঁস ও হাঁসিল সিরম গাছের জঙ্গলে বাসা বেঁধে দুটি ডিম পাড়ে, যা থেকে জন্ম হয় দুই মানব শিশু যথা—পিলচু হাড়াম আর পিলচুবুড়ি। উক্ত মানব শিশু দুটিকে নিরাপদ স্থানে রাখার জন্য হাঁস ও হাঁসিল ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করলে ঠাকুর বলেন তিনি সর্বত্র, সর্বরূপে বিরাজিত।[১২] তাই ঠাকুর তাদের নিজেদের স্থান নির্বাচনের আদেশ দিলে তারা পশ্চিম দিকে যে স্থান নির্বাচন করেন তার নাম 'হিহিড়ি পিপিড়ি'। শিশু দুটি সেখানে সুমতুবুক ঘাসের দানা ও সাম ঘাসের শিষ খেয়ে বাড়তে লাগল। আর তাদের দেখাশোনার সমস্ত দায়িত্ব ছিল ঠাকুরের বার্তা বাহক লিটার উপর। এই লিটা প্রসঙ্গে এল. এস. এস. ও'ম্যালে তাঁর ডিস্ট্রিক্ট গ্যাজেটিয়ারে উল্লেখ করেন—'Lita is, according to the traditions, the real name of Marang Buru, and is preserved in the word Lita-ak, meaning the rainbow.'[১৩] এই লিটা একদিন তাদের হাঁড়িয়া প্রস্তুত করার কৌশল শেখালেন এবং পরবর্তীতে পিলচু হাড়াম ও পিলচু বুড়ি নিজেরা হাঁড়িয়া তৈরি করে লিটার নামে উৎসর্গ করে নিজেরা পান করে। বলা বাহুল্য, এর পর তারা নেশাগ্রস্থ হয়ে দৈহিক মিলনে লিপ্ত হয় এবং তাদের অনেক ছেলে মেয়ে জন্মায়। এই সংখ্যা নিয়েও নানা মতভেদ রয়েছে, তবে সাধারণত সাতটি ছেলে ও সাতটি মেয়ের কথা জানা যায়। বড় ছেলের নাম 'সান্দ্রা', তারপর 'সান্ধম', এরপর 'চারে', তারপর 'মানে' আর সকলের ছোট ছেলেটির নাম 'আচারে ডেলহু' বড় মেয়ের নাম 'ছিতা' তারপর 'কাপু', তারপর 'হিসি', আর একজনের নাম 'ডিমনি'। বাকিদের নাম বিশেষ ভাবে জানা নেই।[১৪] এরপর উক্ত সাত ছেলে-মেয়ের বিবাহ হলে আবার

তাদের সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে বিবাহ সম্পন্ন হয়। এরপর পিলচু হাড়াম ও পিলচু বুড়ি ভাই-বোনের বিবাহ বন্ধনের জন্য সাতটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত করে দেয়। যথা—বড় ছেলের বংশ 'হাঁসদা', তারপরটির বংশ 'মুর্মু', তারপর 'কিস্কু', তারপর 'হেমব্রম', তারপর 'মারান্ডি', তারপর 'সরেন', তারপর 'টুডু'।[১৫] পরবর্তীকালে তারা খোজকামানে চলে গেলে অত্যন্ত বদবুদ্ধি সম্পন্ন হয়ে পড়ে। এই সময় তারা ঠাকুর-কে অমান্য করলে ঠাকুর রেগে গিয়ে একজোড়া পুণ্যাত্মা বুড়ো, বুড়িকে 'হারাতা' নামক পর্বতের গুহায় পাঠিয়ে টানা সাতদিন ধরে অগ্নিবৃষ্টি সম্পন্ন করেন। ফলে সমগ্র সৃষ্টি বিনষ্ট হয়, শুধুমাত্র পুণ্যাত্মা জোড়া বেঁচে থাকে ও তাদের বংশবিস্তার ঘটতে থাকে। এরপর সেখান থেকে সাসাংবেদ নামক স্থানে গিয়ে তাদের সাতটি সম্প্রদায়ের মধ্যে আরও পাঁচটি সম্প্রদায় যুক্ত হয়। সেখান থেকে ধীরে ধীরে তারা 'জারপি দেশে', 'আয়রে দেশে', 'কায়েন্দে দেশে', 'চায় দেশে', 'চম্পা দেশে' গমন করে, এরপর শেষে তারা রাজমহল পাহাড়ের পাদদেশে জঙ্গলাকীর্ণ এলাকায় স্থায়ী বসতি গড়ে তোলে। সাঁওতালদের বিভিন্ন পুরাণে সৃষ্টিতত্ত্বের এই কাঠামোকেই মানা হয়েছে। পৃথিবীর সমস্ত প্রাচীন জাতির মধ্যে নিজেদের সৃষ্টি সম্বন্ধে উপকথার প্রচলন রয়েছে, কারণ মানুষ কোথা থেকে এল এই রহস্য যুক্তিবাদী মানুষকে সব সময় ভাবিয়েছে। নিজেদের সৃষ্টির রহস্য জানার ব্যাপারে অতি মাত্রায় আগ্রহী মানুষ কল্পনার জাল বুনে সে রহস্যের সমাধান খুঁজতে চেয়েছে, আর তাতেই পৃথিবীর সমস্ত প্রাচীন জাতির মধ্যে রচিত হয়েছে নিজস্ব সৃষ্টি তত্ত্বের, সাঁওতালদের ক্ষেত্রেও যার অন্যথা হয়নি।

নৃতাত্ত্বিক দিক থেকে সাঁওতালদের পরিচিতি নিয়ে নানা মতপার্থক্য থাকলেও পণ্ডিতমহল স্পষ্ট যে, সাঁওতালরা মুন্ডা নৃতাত্ত্বিক পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। সাঁওতালদের পূর্বপুরুষ সম্পর্কিত বিভিন্ন তত্ত্বগুলি হল—প্রথমত, তারা 'লেমুরিয়া' থেকে এসেছে, যা আফ্রিকা এবং মাদাগাস্কারের সঙ্গে ভারতবর্ষকে যুক্ত করেছিল। ইউরোপীয় ভাষাতত্ত্ববিদরা দেখিয়েছেন—মুন্ডারী, সাঁওতাল ও ভূমিজ ভাষার সঙ্গে ঐ অঞ্চলের ভাষা সমূহের মিল রয়েছে।[১৬] দ্বিতীয়ত, উইলিয়াম হান্টার ও মি.এ.কে.কিন এর মতে, মুন্ডা পরিবার ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছে উত্তর-পূর্বের গিরিপথ দিয়ে, আর দ্রাবিড়ীয়রা উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেও পরবর্তী সময়ে উভয়ের মধ্যে মিশ্রণ সম্পন্ন হয়। যদিও এই তত্ত্বটি সম্পূর্ণরূপে কর্নেল ডালটনের তত্ত্বের উপর নির্ভরশীল। তাঁর

মতে, সাঁওতালদের পূর্বপুরুষ উত্তর-পূর্ব ভারত থেকে এসেছে।[১৭] তৃতীয়ত, এস.ই.পিয়েল তাঁর 'On some traces of Kol – Mon – Anam : The Eastern Naga Hill' প্রবন্ধে উল্লেখ করেন, দক্ষিণ হিমালয় অঞ্চলের অস্ট্রোলয়েডদের সঙ্গে পূর্ব তিব্বত বা পশ্চিম চীনের উপনিবেশবাসীর মিশ্রণের ফলে মুন্ডা জনজাতির উৎপত্তি হয়েছে।[১৮] চতুর্থত, স্যার হাবার্ট রিজলে তাঁর *People of India* গ্রন্থে দেখিয়েছেন মুন্ডা এবং তার সমগোত্রীয় জনজাতিগুলি ভারতবর্ষের একান্তই আদিম অধিবাসী। পঞ্চমত, ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের গুয়াহাটি অধিবেশনের সভাপতি হিসেবে রায়বাহাদুর এস.সি.রায় বলেন, হিমালয়ের দক্ষিণ-পশ্চিম পাদদেশীয় অঞ্চলে বসবাসকারী ককেসীয় জাতির নিম্ন শাখা হল প্রি-দ্রাবিড়ীয় বা প্রোটো-অস্ট্রোলয়েড; যদিও এটি তাদের জন্মস্থান নয়। হাবার্ট রিজলের মতে, স্বল্প উচ্চতা বিশিষ্ট, কালো চামড়া, লম্বা মাথা, বড় নাক ও লম্বা বাহু প্রমাণ করে যে, তারা অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসী।[১৯] আবার ডালটনের মতে, রাজমহল পাহাড়ের আদিম অধিবাসীদের মত সাঁওতালরাও দ্রাবিড়ীয় গোষ্ঠীর জনজাতি।[২০] অন্যদিকে নৃতত্ত্ববিদ বিরাজা শঙ্কর গুহ বলেন, সাঁওতালদের দৈহিক বৈশিষ্ট্য ও অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের দৈহিক বৈশিষ্ট্যগত সাযুজ্য প্রমাণ করে সাঁওতালরা প্রোটো অষ্ট্রালয়েড শ্রেণীভুক্ত।[২১] সাঁওতালদের দৈহিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে এরা অষ্ট্রালয়েড গোষ্ঠীর হলেও এদের ভাষা মুন্ডা ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত। এক্ষেত্রে পি.ও.বোডিং মনে করেন, মঙ্গোলয়েড গোষ্ঠীর সাঁওতাল শিশুদের চামড়ার রঞ্জকের মধ্যে এক ধরনের দাগ লক্ষ করা যায়, যা সাধারণত নীল রঙের আর তা সকলের মধ্যে থাকে না।[২২] সাঁওতালি পুরাণ অনুযায়ী মুন্ডা, হো, ভূমিজ, বিরহড় ও সাঁওতাল প্রভৃতি জনজাতি একসঙ্গে খেরওয়াড় নামে পরিচিত। সুতরাং সাঁওতালি পুরাণ অনুযায়ী সাঁওতাল জনগোষ্ঠী খেরওয়াড় জনজাতির অন্যতম প্রধান শাখা।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে সাঁওতাল পরগণা

সাঁওতাল পরগণায় সাঁওতালদের অবস্থান নির্ণয়ে বা তাদের সমাজ-সংস্কৃতির প্রেক্ষাপট নির্ধারণে সাঁওতাল পরগণার গঠন ও যুগ বিন্যাসের পর্যালোচনা বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। কেননা যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সাঁওতাল পরগণার সীমানা ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বার বার পরিবর্তিত হয়েছে, যা সাঁওতাল সমাজ-সংস্কৃতিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে।

মূলত প্রাচীন প্রস্তর যুগ থেকেই এই এলাকার পরিচয়ে নানান তথ্য পাওয়া গেলেও ঔপনিবেশিক সময়পর্বেই এই এলাকা বহু পরিবর্তনে সাঁওতাল পরগণা নামে বিশেষ পরিচিতি লাভ করে। সাঁওতাল পরগণা ও তার নিকটবর্তী অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত প্রাচীন মানব জাতির ব্যাবহার্য বিভিন্ন প্রস্তর নির্মিত অস্ত্র-শস্ত্র ও যন্ত্রপাতির মাধ্যমে ঐতিহাসিকরা এই এলাকার যুগ বিন্যাসের একটি রূপ রেখা তুলে ধরতে পেরেছেন। বিশেষ করে পাথর নির্মিত হাতুড়ি, কুঠার, ছোট স্লেট, ছেনি প্রভৃতি অস্ত্র-শস্ত্র ও যন্ত্রপাতির নির্মাণের ব্যবহার্য উপাদান ও কৌশল সহায়ক ভূমিকা নিয়ে থাকে।[২৩] এ বিষয়ে পি.ও.বোডিং তাঁর ‘Shoulder Headed Celts’ নামক প্রবন্ধে এখানকার অধিবাসীদের দ্বারা ব্যবহৃত নানা গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্রশস্ত্রের উল্লেখে বলেন—‘Such celt have only been found in the countries mentioned as proof that the races now settled there viz, the Mons and Mundas belong to the same stock, thereby implying that the shoulder headed celts were originally manufactured and used by them.’[২৪] উক্ত অঞ্চলে ৭২০টি ত্রিভূজাকৃতি হাতলওয়ালা কুঠার পাওয়া গেছে, যেগুলি ৪.৫ সেমি থেকে ২৩ সেমি পর্যন্ত লম্বা। এছাড়াও ২৩৩টি হাত কুঠার (Axe Hammer) ও ৯০০টি ছোট সেল্ট পাওয়া গিয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য অধ্যাপক অলচিন মনে করেন, পোশাক তৈরির জন্য গাছের ছাল চাঁছার কাজে হাতকুঠারগুলি ব্যবহার করা হত।[২৫] ওসলোর University Ethnographic Museum-এ সংরক্ষিত ২৬২০টি নব্যপ্রস্তর যুগের অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করেছিলেন বোডিং সাহেব, যিনি ১৯০১-১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মহুলপাহাড়ির নরওয়েজিয়ান সাঁওতাল মিশনে (Norwegian Santal Mission) কর্মরত ছিলেন।[২৬] তিনি এগুলি সংগ্রহ করেছিলেন মহানতাড়া (Mahantara) অঞ্চল থেকে। তাঁর সংগ্রহের বাঁকানো ব্লেড ও তামার তৈরি কুঠার থেকে প্রস্তর যুগে এখানকার অধিবাসীরা যে লোহা ও তামার ব্যবহার জানত তা জানা যায়।[২৭] এছাড়া দুমকার ছোটি সুরজবেড়া পাহাড়ের ঢালে সানখোগরা (Sankhogra), ছোটোনাগপুর, পাহাড়পুর, গোয়ামী নদীর উপকূল, দেওঘর, চাকিয়া, ফুলবাড়ি পাহাড় প্রভৃতি অঞ্চলে পরবর্তীকালে আরও নানান প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে এ অঞ্চলে এখানকার অধিবাসীদের অবস্থান বোঝা যায়। আবার মেগাস্থিনিসের বিবরণী থেকে আমরা তৎকালীন সময়ে রাজমহল পাহাড়ের উত্তর প্রান্তে বসবাসকারী বর্তমান সাঁওতাল পরগণার আদিম অধিবাসীদের সম্পর্কে জানতে পারি। ৩০২ খ্রিঃপূঃ চন্দ্রগুপ্ত

মৌর্যের শাসনকালে ভারতে আগত এই বিদেশী গ্রীক পর্যটকের ভ্রমণবৃত্তান্ত অনুসারে প্রাচী ও গঙ্গাঁরিডি এর মাঝে মালি নামক জনজাতি বাস করত।[২৮] ধরা হয়, মালু পাহাড়টি হল বর্তমান ভাগলপুর জেলার পবিত্র মান্দার পাহাড়। ৬৪৫ খ্রিস্টাব্দে ভারতে আগত হিউ-এন-সাং-এর বিবরণীতে সাঁওতাল পরগণার উল্লেখ পাওয়া যায়, তিনি চম্পা থেকে লক্ষীসরাই হয়ে ক-চু-ওয়েন-কি-লো বা কজঙ্গল অঞ্চলে গিয়েছিলেন। এখানকার ভূ-প্রকৃতি ও জলবায়ু সম্পর্কে তিনি যে বিবরণ দিয়েছেন তা হল, এই স্থানের উত্তর সীমা গঙ্গার প্রায় নিকটবর্তী এবং দক্ষিণ দিকের বনে প্রচুর বন্য হস্তি লক্ষ্য করা যায়।[২৯] কজঙ্গল অঞ্চলটি বর্তমানের দক্ষিণ বিহার থেকে সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত। এ বিষয়ে জেনারেল কানিংহাম বলেন—'The distance and bearing bring us to the district of Rajmahal, which was Originally called Kajangol after town of that name, which still exists 18 miles to the south of Rajmahal… kajangol most probably comprised the whole of the hill country to the south and the west of Rajmahal'.[৩০] একাদশ শতকে রাজা হরিবর্মণ দেবের মন্ত্রী ভট্ট ভবদেবের ভুবনেশ্বর শিলালিপিতে রাঢ়দেশে এক জঙ্গলময় প্রদেশের বর্ণনা পাওয়া যায়, যাকে বর্তমানে সাঁওতাল পরগণারূপে নির্বাচন করা হয়েছে।[৩১] ঐতিহাসিক দীনেশচন্দ্র সরকার ন্যায়পালের সময়কালের সিস্তান লিপিতে 'সুমহা দেশ' নামে এক অঞ্চলের উল্লেখ পেয়েছেন, যাকে তিনি সাঁওতাল পরগনার অন্তর্ভুক্ত বলে নির্বাচন করেছেন এবং এই সুমহা অঞ্চল তখন পাল সামন্ত রাজ্য ছিল।[৩২] চোল রাজা রাজেন্দ্র চোলের তুরিমালাই লিপিতে চারটি রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক একক নির্ধারিত ছিল—তান্তাবুতি(দণ্ডভুক্তি), তাক্কানালডম (রাঢ়ের দক্ষিণ অংশ), উত্তরালাডাম (উত্তর রাঢ়), এছাড়া পালরাজা মহীপালের রাজ্যের কিছু অংশ সাঁওতাল পরগণার অংশবিশেষ ছিল। এই বিবরণীর প্রমাণ হিসাবে সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' গ্রন্থে উল্লিখিত—কুঞ্জাভাতি, তৈলাকাম্পা ও কজঙ্গল অঞ্চলে আদিম অধিবাসীদের বাসস্থান ছিল। সি.পি.এন.সিনহার বিবরণে—কুঞ্জাভাতি দুমকার নিকটবর্তী অঞ্চল, তৈলাকাম্পা ধানবাদ জেলার তেলকাপি আর কজঙ্গল রাজমহল পাহাড়ের দক্ষিণে অবস্থিত।[৩৩] ভাগীরথীর পশ্চিমে ও দ্বারকেশ্বরের উত্তরে অবস্থিত নারিখণ্ড জেলার কথা পুরাণের ব্রহ্মাণ্ড অংশে উদ্ধৃত রয়েছে, যেখানে শাল, অর্জুন ও শাঁখোতা গাছের জঙ্গলের উল্লেখ রয়েছে।

মধ্যযুগে বাংলার 'Key of Bengal' নামে পরিচিত তলিয়াগড়হি গিরিপথ যেটি রাজমহল পাহাড়ের নিকটে অবস্থিত এবং এখান দিয়েই উত্তর ভারত ও বাংলার মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হত।[৩৪] এই গিরিপথ দিয়ে বাংলায় মুঘল সেনাবাহিনীর প্রবেশের সময় থেকেই এই অঞ্চল সম্পর্কে ইতিহাসচর্চার সূচনা হয়েছে। ১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দে শূরবংশীয় আফগান শাসক শেরশাহ মুঘল সম্রাট হুয়ায়ুনের সঙ্গে যুদ্ধকালে এখানে প্রাকার ও দূর্গ নির্মাণকরেন।[৩৫] ১৫৭৩ খ্রীঃ দাউদ খাঁকে পরাস্ত করতে আকবরের সেনাপতি মুনিম খাঁ তেলাইয়াগড়হি দখল করেন। আবার ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দে দাউদ খাঁ শক্তিশালী হয়ে উঠলে মুঘল সম্রাট আকবর হুসেন কুলি খানকে দাউদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পাঠান এবং সঙ্গে আসেন টোডরমল। এই সময় দাউদ খাঁ হুসেন কুলি খানের কাছে পরাজিত হলে বাংলা মুঘল প্রদেশে পরিণত হয় এবং ১২০২-১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত গৌড় ছিল বাংলার রাজধানী। তবে ১৫৯২ খ্রীঃ রাজমহল বাংলার রাজধানী হয়ে ওঠে, কারণ গঙ্গা নদীর গতিপথ পরিবর্তনের ফলে গৌড়ের পরিবেশ অস্বাস্থ্যকর হয়ে পরে এবং ১৫৭৫ সালের মহামারিতে প্রচুর জনসংখ্যা হ্রাস পায়। পূর্বনাম 'আগমহল' পরিবর্তন করে বাংলার মুঘল দায়িত্বপ্রাপ্ত শাসক মান সিং-এর নাম রাখেন রাজমহল এবং এখানে তিনি দুর্ভেদ্য দুর্গ প্রাসাদ তৈরি করেন। সম্রাট আকবরের নামানুসারে এর পরবর্তী নাম হয় আকবরনগর। পরবর্তীতে ১৬০৮ সালে আরাকান থেকে পোর্তুগীজ জলদস্যুদের অত্যাচারে নবাব ইসলাম খান বাংলার রাজধানী ঢাকায় স্থানান্তরিত করেন।[৩৬] এই সময় রাজমহলকে কেন্দ্র করে নানাভাবে বাংলা থেকে উত্তর ভারত ও সমগ্র দেশের রাজনীতি এক জটিল ঘূর্ণাবর্তে জড়িয়ে পড়ে। রাজমহল অঞ্চলে শাহজাহান ও নুরজাহানের ভাই ইব্রাহিম খাঁর যুদ্ধ শুরু হয়, জাহাঙ্গীর বিরোধী শাহজাহান রাজমহল দখল করেন এবং ১৬৩৯ খ্রিঃ শাহজাহান পুত্র শাহসুজা বাংলার শাসক হিসেবে রাজমহলকে এক অপূর্ব নগরীতে পরিণত করেন। যদিও ১৬৪০ খ্রিঃ রাজহমল অগ্নিকান্ডে কিছুটা ভস্মীভূত হয়।[৩৭] ১৬৫৯ খ্রিস্টাব্দে শাহজাহানের মৃত্যু হলে শাহসুজার দিল্লী অধিকারের স্বপ্নভঙ্গ হয় এবং কারবা-এর যুদ্ধে তিনি পরাজিত হয়ে মুঙ্গেরে প্রত্যাবর্তন করেন। ঔরঙ্গজেব-এর পুত্র মীরজুমলা সুজার পশ্চাদধাবন করে খড়্গপুরের রাজা বাহরোজের সাহায্যে ৯ ই মার্চ মুঙ্গের দখল করেন। আবার, ২৪ শে মার্চ সিউড়ি দিয়ে যাবার পথে বীরভূমের জমিদার খাজা কমল আফগানের সাহায্যে

সুজাকে দ্বিতীয়বার আক্রমণ করেন ও গঙ্গার তীরে বেলেঘাটায় শিবির তৈরি করেন।[৩৮] অবশেষে সুজা রাজমহল ত্যাগ করে তানডাতে রাজধানী স্থাপন করেন। ইতিমধ্যে সুজার মেয়ের প্রেমে পাগল ঔরঙ্গজেবের পুত্র মহম্মদ সুজার পক্ষে যোগ দেয়। শেষ পর্যন্ত মীরজুমলা বিহারের গভর্নর দাউদ খাঁ এর সাহায্যে ১৬৬০ সালের ১১ই জানুয়ারি রাজমহল দখল করেন ও শাহসুজা সুতি হয়ে আরাকান রাজের সাহায্যের প্রত্যাশী হন এবং আরাকান পাড়ি দেন। ফলে বাংলার রাজধানী পুনরায় ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়। তবুও রাজমহলে একটি টাঁকশাল ও আকবর নগরে প্রধান ফৌজদার অফিস অবস্থিত ছিল। 'রিয়াজ-উস-সালাতিন' থেকে জানা যায় মুর্শিদকুলি খাঁ-কে এক পদস্থ অফিসার রাজমহল থেকে শীতকালে বরফ ও গ্রীষ্মকালে আমের জোগান দিতেন।

ঔপনিবেশিক সময়ে শাহসুজা কর্তৃক রাজমহলের উন্নীত গৌরবে এই অঞ্চল ইংরেজদের কাছে এক গুরুত্বপূর্ণ বানিজ্য কেন্দ্রে পরিণত হয়। ডঃ গ্যাব্রিয়েল বাউটন (Gabriel Bouchton) নামে এক ইংরেজ ডাক্তার শাহসুজার মেয়েকে এক দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে মুক্ত করলে তিনি শাহসুজার নিকট থেকে বাংলায় বাণিজ্য স্থাপনের ফরমান পাইয়ে দেবার কথা দেন ক্যাপ্টেন লিওনেসকে ১৬৫০ খ্রিস্টাব্দে এবং তিনি উক্ত ফরমান লাভ করেন ১৬৭৪ খ্রিস্টাব্দে।[৩৯] মীরজুমলা বাংলার দায়িত্বভার গ্রহণ করলে বাংলায় ইংরেজরা ব্যবসার ক্ষেত্রে নানা সমস্যার সম্মুখীন হন। পরস্পর পরস্পরের একটি করে জাহাজ আটক করলে মীরজুমলা ক্ষুব্ধ হয়ে ইংরেজদের বাংলা থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেন এবং শেষপর্যন্ত ইংরেজরা মীরজুমলার জাহাজ ফিরিয়ে দিয়ে তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং ১৬৭৬ খ্রিঃ ইংরেজরা রাজমহলে একটি এজেন্সির সূচনা করেন। ১৬৮১ খ্রিস্টাব্দে রবার্ট হেজেস এই এজেন্সির পরিচালক নিয়োজিত হন।[৪০] ১৬৯৬ খ্রিঃ জমিদার সুভা সিং ও উড়িষ্যার রহিম খাঁন বিদ্রোহ শুরু করেন এবং রাজমহল দখল করে ইংরেজদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করলে ইংরেজ বাণিজ্যস্থিতি প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। ১৭০২ খ্রিঃ ঔরঙ্গজেবের ঘোষণা বলে রাজমহলে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যায়। তাছাড়া ১৭০২ খ্রিঃ বাংলার দায়িত্বে থাকা আজিম-উস-শানের কাছ থেকে এবং পরবর্তীকালে ফারুকশিয়ারের কাছ থেকেও কিছু বাণিজ্যিক সুবিধা পেলেও কোম্পানির বাণিজ্যে রাজমহলের গুরুত্ব হ্রাস পেতে থাকে। যদিও ১৭২৮ খ্রীঃ আলিবর্দী খাঁ এখানকার ফৌজাদার নিযুক্ত হলে এখানে প্রশাসনিক স্বাচ্ছন্দ্য আসে।[৪১]

১৭৪২ সালে সিরাজের পতনের পর থেকে বাংলার ভাগ্যলক্ষ্মী ইংরেজদের দ্বারা পরিচালিত হতে থাকে।[৪২]

জঙ্গলাকীর্ণ ও পাহাড়ের পাদদেশীয় ভূমি হওয়ার কারণে বর্তমানের সাঁওতাল পরগণা জেলাটি পূর্বে জঙ্গলতরাই অঞ্চল নামে পরিচিত ছিল। এখানকার আদিম পাহাড়ি জনজাতিরা জঙ্গলতরাই এর উত্তরভাগে মালে ও দক্ষিণে মালপাহাড়ি হিসেবে বসবাস করত। মোঘল শাসক এদের প্রতি উদাসীন হলেও ১৭৬৫ খ্রিঃ থেকে এর বিস্তৃত জঙ্গলে আধিপত্য লাভ ও জঙ্গলের সম্পদের ব্যবহারের জন্য ব্রিটিশরা নানা শাসনতান্ত্রিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে, যদিও প্রাথমিকভাবে তা ছিল খুব সমস্যাজনক। মূলত 'জঙ্গলতরাই' অঞ্চল হিসেবে পরিচিত ছিল ভাগলপুর ও খড়গপুরের পাহাড়ি অঞ্চল।[৪৩] ক্যাপ্টেন ব্রাউন এই অঞ্চলে যে সীমানা নির্ধারণ করেন তা হল—ভাগলপুর ও কোলগাঁও এর সমভূমি অঞ্চল, উত্তরে গঙ্গা সমভূমি, উত্তর পশ্চিমে খড়গপুর পাহাড়, পশ্চিমে সিধুর ও বিহারের সমভূমি, দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিমের রামগড় ও পাণ্ডেত অঞ্চল, দক্ষিণ-পূর্বে বীরভূম, পূর্বে রাজমহল পাহাড় এবং উত্তর-পূর্বে গঙ্গা ও রাজমহল পাহাড়ের অংশবিশেষ।[৪৪] জঙ্গলতরাই এর প্রতি মোঘল সম্রাট ও তার প্রশাসকদের উন্নাসিকতা বিষয়ে ম্যাকফারসন্ তাঁর রিপোর্টে উল্লেখ করেন—'The country was not suited operation of the cavalry and the reduction of the hill and forest fortresses demanded a from of Military skill art and discipline which the Mughals had never possessed.'[৪৫] এখানের বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি সম্পর্কে বেনারস বিভাগের জর্জ জেমস স্টুয়ার্ট ১৮০৮ সালে লিখেছিলেন, ব্রিটিশ শাসনের প্রথম দিকে বীরভূম ও ভাগলপুরের মধ্যবর্তী অঞ্চলের চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলার পরিস্থিতির বর্ণনা। এখানকার ঘাটোয়াল প্রধানরাও প্রথম পর্বে ব্রিটিশ শাসকের পরিপন্থী ছিলেন, এমন একজন হলেন লছিমপুরের জমিদার জগন্নাথ দেও। ব্রিটিশের পক্ষ থেকে ওয়ারেন হেস্টিংস প্রথম এই জঙ্গলতরাই অঞ্চলে প্রশাসনিক সুব্যবস্থা স্থাপনে ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে মিলিটারি কমান্ডার জেনারেল বার্কারের পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং সেই পরামর্শ অনুযায়ী ক্যাপ্টেন ব্রুকের নেতৃত্বে ৮০০ সৈন্য দ্বারা সমতল ভূমির অধিবাসীদের পাহাড়িয়া জনজাতিদের লুণ্ঠন থেকে রক্ষা ও জঙ্গলতরাই অঞ্চলে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া সূচনা হয়। ওয়ারেন হেস্টিংসের নির্দেশ মতো ক্যাপ্টেন ব্রুক পাহাড়িয়া ডাকাত

ও জমিদারদের দমন করেন। এমনকি ১৭৭৩ খ্রিঃ জমিদার জগন্নাথ দেও এর তিউর দুর্গ ধূলিসাৎ করেন।[৪৬] কিন্তু, ক্যাপ্টেন ব্রুক বন্দীদের সাথে সহযোগিতার আবহাওয়া তৈরি করে তাদের সমতল ভূমিতে বসবাসের জন্য উৎসাহিত করেন। ক্যাপ্টেন ব্রুক এর রচনা থেকে ১৭৭৪ সালে উদয়নালা থেকে বারকপ পর্যন্ত মোট ১২০ ক্রোশ এলাকায় ২৩৩টি গ্রামের কথা জানতে পারা যায়। এ প্রসঙ্গে কালীকিঙ্কর দত্ত তাঁর *The Comprehensive History of Bihar* গ্রন্থে উল্লেখ করেন—'He made the Jungle Tarai a khas Settlement'[৪৭]

১৭৭৪ সালের জুলাই মাসে মেজর জেমস ব্রাউন বীরভূম ও গিধর-এর জঙ্গলতরাই এর কালেক্টর নিযুক্ত হন। এরপর ১৭৭৫ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে খড়কডিহা তার কালেক্টরির অন্তর্গত হয়।[৪৮] ঘাটওয়াল জমিদার জগন্নাথ দেও ও পাহাড়িয়ারা ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে ব্রাউন তা শক্ত হাতে দমন করেন। এরপর জগন্নাথ দেও এর পুত্র রূপনারায়ণ দেওকে পিতার জমিদারি মকারারী লিজ দেওয়া হয়।[৪৯] ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে জেমস ব্রাউন জঙ্গলতরাই শাসনের জন্য একটি পরিকল্পনা করেন, এই পরিকল্পনার পেছনে তার যে যুক্তি তা হল–'The Rajas of the Mountains and Jungles extending from the Maharttah boundary south, to the plain countries of Midnapoor, Burdwan, Birbhum, Bauglepoor, Monghir and Bihar north the natural and proper defenders of the honorable company's provinces against the Maharattahas on the side'[৫০] এই অঞ্চলের প্রশাসনকে ঢেলে সাজানোর জন্য তিনি পাহাড়ের বিভিন্ন ভাগকে একজন সর্দারের অধীনে পরগণায় বিভক্ত করেন। তিনি এই অঞ্চলে রাজস্বের হার কম রাখতে সেবার বিনিময়ে জায়গির ও নিষ্কর জমির ব্যবস্থার কথা বলেন। ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে উক্ত প্রস্তাব পাশ হয় এবং ব্রাউনের স্থলাভিষিক্ত হন অগাস্টাস ক্লিভল্যাণ্ড| তিনি ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এখানে দায়িত্বে থাকেন এবং প্রশাসনিক বেতনক্রম নির্ধারণ করে সর্দার-কে ১০ টাকা মাসে, নায়েব মাসে ৩ টাকা ও মাঝিদের মাসে ২ টাকা করে ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করেন। তিনি ভাগলপুর হিল রেঞ্জারের অধীনে পাহাড়িয়াদের নিয়ে ১৭৮২ খ্রিস্টাব্দে তিরন্দাজ বাহিনী গড়ে তোলেন। এ সম্পর্কে শেরউইল বলেন—'A fine body of soldiers as in the regular army'.[৫১] এইভাবে এই অঞ্চলে সর্দার পরিষদের দ্বারা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা গড়ে ওঠে, যদিও ১৮২৭ সালে এই ব্যবস্থা

তুলে দেওয়া হয়।[৫২] ১৮১৮-১৯ সালের রিপোর্টে ক্লিভল্যান্ডের প্রশাসন নিয়ে সাদারল্যাণ্ড একটি রিপোর্টে উল্লেখ করেন—'That the general measures introduced by Cleveland have operated towards conciliating the hill people and improvement of their condition is obviously'.[৫৩] ক্লিভল্যাণ্ড পাহাড়িয়াদের জন্য বার্ষিক ২৯৪৪০ টাকার এক পুনর্বাসন প্রকল্প চালু করেন, যার পরিকল্পনায় বলা হয়—

১. প্রতিটি মাঝি বা প্রধান নিজস্ব প্রয়োজন অনুযায়ী ৪০০ লোকের একটি তিরন্দাজ বাহিনী গঠন করার, এমনকি মাঝি একাধিক লোক নিযুক্ত করতে পারেন।

২. প্রতি ৫০ জনে একজন করে দায়িত্বপূর্ণ পদ থাকবে, যিনি সমগ্র বাহিনীর দায়িত্ব পালন করবেন।

৩. তিরন্দাজরা ভাগলপুর জেলাতেই কালেক্টরের অধীনে কর্মরত থাকবে।

৪. সরকারের শত্রু হিসেবে অবাধ্য পাহাড়ি গ্রামপ্রধান ও ঘাটওয়ালদের তাড়িয়ে দেবে এবং তাদের শত্রু হিসেবে গণ্য করবে।

৫. প্রত্যেক পাহাড়িয়া প্রধান নিজের বাহিনীর জন্য ৫ টাকা মাসে, সাধারণ বাহিনী ৩ টাকা মাসে, আর যারা বাহিনীর জন্য লোক সরবরাহ করবে তারা পাবে মাসে ২ টাকা এবং সকলেই সরকারের প্রতি অনুগত থাকবে।

৬. বাহিনীর প্রত্যেকে বছরে দুটি পাগড়ি, দুটি কোমরবন্ধ, দুটি জামা, দু-জোড়া জাঙ্গিয়া এবং বেগুনি রঙের একটি জ্যাকেট দেওয়া হবে।

ক্লিভল্যান্ডের এই পরিকল্পনা উত্তরের পাহাড়িয়ারা গ্রহণ করলেও দক্ষিণের অধিবাসীরা অস্বীকার করে। ক্লিভল্যাণ্ড পাহাড়ের নীচে গ্রামে বনজ, পশুজ দ্রব্যের বাজার তৈরি করেন ও কৃষিকাজ-কে উৎসাহ দিতে থাকেন। ইতিপূর্বে ওয়ারেন হেস্টিংস-এর তিরন্দাজ বাহিনী গড়ার প্রস্তাব স্যার আয়ারকূটর সময় পাশ হয় এবং জৌরাহা এই তিরন্দাজ বাহিনীর প্রধান নিযুক্ত হন।[৫৪] এইসব কাজের জন্য তিনি সাঁওতালদের কাছে পরিচিত ছিলেন 'Chilimili Saheb' নামে।

১৮০৩ খ্রিঃ রূপনারায়ণ দেও, ধরম দেও সিং, রঞ্জিত সিং ভাগলপুরের কালেক্টরের ডিক্রির বিরুদ্ধে জঙ্গলতরাই এ বিশৃঙ্খলা শুরু করেন। যদিও উইন্টেল সাহেব কর্তৃপক্ষের নির্দেশে তাদের দমন করেন, তবে ধরম দেও কে ধরা না গেলেও পরবর্তীকালে তাঁর ৪০০ টাকা জরিমানা ধার্য হয়। এরপর ফম্বেল ভাগলপুর শাসনের দায়িত্ব পান এবং তিনি শক্ত হাতে তা বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। ক্লিভল্যাণ্ডের আমলের 'Sazawal' আব্দুল রসুল খান এরপর এখানকার দায়িত্ব লাভ করেন ও সাঁওতালদের কাছে তিনি 'Con Saheb'নামে পরিচিতি পান।[৫৫] ১৮১৪-২৩ খ্রিঃ পর্যন্ত গভর্নর জেনারেল মার্কুইস হেস্টিংস এখানকার উন্নতির প্রভূত চেষ্টা করেন। তার স্ত্রী রাজমহল পরিভ্রমণ করে সেখানে আলুর বীজ ও কৃষি সরঞ্জাম দেবার প্রতিশ্রুতি দেন এবং ক্লিভল্যাণ্ড প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টি পুনরায় চালু করেন। ১৮১৮ খ্রিঃ সাদারল্যাণ্ডকে ভাগলপুর পাঠানো হলে তিনি ১৮১৯ সালে কিছু প্রস্তাব পেশ করেন—

১. পাহাড়ের বসবাসকারী অঞ্চলগুলি সরকারের সম্পত্তি হিসাবে ঘোষিত হোক।

২. পাহাড়ি অঞ্চলের বাইরে কিনারার অঞ্চলগুলিও সরকারের, যা জমিদারি অঞ্চল থেকে স্বতন্ত্র থাকবে।

৩. সমগ্র অঞ্চল পরিমাপের ব্যবস্থা করা।

৪. ১৭৯৬ সালের ১নং আইনের ত্রুটি থাকায় তা বাতিল করে ভাগলপুর অঞ্চল বিচার ও পুলিশি ব্যবস্থার আওতায় নিয়ে আসা হবে।

৫. ১৮০৭ সালে নির্ধারিত মিস্টার টার্নারের নিয়ম অনুযায়ী ১৩০১ টাকা মোট মাসিক ভাতা হারে সর্দার, নায়েব ও মাঝির মধ্যে ১০, ৩ ও ২ টাকা হারে প্রদত্ত হবে।

১৮২৩ খ্রিস্টাব্দের ১৭ই জুলাই ইংরেজ সরকার সাদারল্যাণ্ডের প্রস্তাব গ্রহণ করে দামিন-ই-কোহ বা পাহাড়ের প্রান্তদেশ গড়ে তোলেন। ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দে জন পেটি ওয়ার্ড এবং তার সহযোগী ক্যাপ্টেন ট্যানারের সাহায্যে দামিন-ই-কোহ-র সীমা নির্ধারণের দায়িত্ব পান। ১৮৩৩ খ্রিঃ সীমা নির্ধারণের কাজ সম্পন্ন হলে ১৮৩৭ সালে জেমস পন্টেট দামিন-ই-কোহ প্রশাসনের দায়িত্ব লাভ করেন। তবে পাহাড়িয়ারা এখানে আসতে অস্বীকার করায় উক্ত অঞ্চল সাঁওতালদের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। যদিও

১৭৯০ থেকে ১৮১০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে প্রথম এখানে সাঁওতালরা বসতি স্থাপন করতে শুরু করে।[৫৬] দামিন-ই-কোহ-এর আয়তন ছিল মোট ১৩৬৬.০১ বর্গমাইল, যার মধ্যে ৫০০ বর্গমাইল ছিল পাহাড়ের কিনারা অঞ্চল।[৫৭] সহজ, সরল ও পরিশ্রমী হিসেবে সাঁওতালরা রুক্ষ, পার্বত্য ও জঙ্গলাকীর্ণ ভূমিকে শস্য শ্যামলাময় করে 'আতু' বা সাঁওতালি গ্রামে পরিণত করে।[৫৮] ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে যেখানে গ্রামের সংখ্যা ছিল ৪২৭ টি, সেখানে ১৮৫১ সালে বেড়ে হয় ১৪৭৩ টি। উইলিয়াম হান্টারের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী ১৮৩১ সালে দামিন-ই-কোহ তে জনসংখ্যা ছিল ৩০০০ জন, সেখানে ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে সেই সংখ্যা দাঁড়ায় ৮২,৭৯৫ জনে।[৫৯] সাঁওতালদের পরিশ্রমের কথা তাদের গানেও প্রতিফলিত হয়। এরকমই একটি গান হল—

"সুর লাঁগড়ে
হানা ঘুতু পোর কুটাম
নওয়া ঘটু সিষোরক
লিতাই লিতাই হার তুতি গেল।" [৬০]

অর্থাৎ - (ঐ মাঠে ঝোপ জঙ্গল কাটতে হচ্ছে/ঐ মাঠে লাঙ্গল করতে হচ্ছে/নিতে নিতে হাল ভেঙ্গে গেল)।

অন্যদিকে, দামিন-ই-কোহ তে কিছু বহিরাগতদের আগমন ঘটে যারা সাঁওতালদের পক্ষে বিষময় হয়ে উঠেছিল। আবার, ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তাদের শোষণ যন্ত্রে নিক্ষেপ করে। এল.এস.এস. ও'ম্যালের বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার অফ সাঁওতাল পরগণায় উদ্ধৃত রয়েছে—ব্রিটিশ সরকার যাতে সহজেই জঙ্গলতরাই আবার হাসিল করতে পারে তাই জমিদারদের সহজ শর্তে দীর্ঘমেয়াদি জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছিল। কৃষিকার্যের পরিধি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাঙালি বহিরাগত ও ইংরেজরা সহজ সরল সাঁওতালদের ঋণের দায়ে আবদ্ধ করে তাদের ভালো জমিগুলি ছিনিয়ে নিতে থাকে।[৬১] এ সম্পর্কে উইলিয়াম হান্টার বলেন, সাঁওতালদের তিন বছর বিনা খাজনায় জমি ভোগ করার অধিকার দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তার পর খাজনার পরিমান হু হু করে বাড়তে থাকে। প্রথম তিন বছর খাজনা ছিল ৩ টাকা থেকে ১০ টাকা প্রতি গ্রামের উপর, কিন্তু এরপর থেকে ১৮৩৭ সালে ৬,৬৮২ টাকা, যা ১৮৫১ সালে বেড়ে দাঁড়ায় ৫৮,০৩৩

টাকাতে।[৬২] বহিরাগত কর্তৃক সাঁওতালদের জমি কেড়ে নেওয়ার পাশাপাশি তাদের গরু, মোষ, টাট্টু ঘোড়া কেড়ে নেওয়া হয়, এমনকি তাদের ফসল নষ্ট করে দেওয়া হয়।[৬৩] বারহেট নামে সাঁওতালি গ্রামের হাটে সাঁওতালদের পণ্য নিয়ে ঠকানো হতো, এমন কি কেনার সময় মহাজন বা ব্যবসায়ীরা 'বিশ' শব্দ উচারণ না করে কম বুঝিয়ে বেশি ফসল নিয়ে নিত, তাই সাঁওতালদের কাতরোক্তি ভেসে ওঠে 'বিশ বল বাবু বিশ বোল' শব্দ বন্ধনীতে। মহাজনদের কাছ থেকে সাঁওতাল কর্তৃক গৃহীত ফসল কোনো দিন শোধ করা সম্ভব হত না ফলে তারা সারাজীবন মহাজনদের ক্রীতদাস হয়ে যেত, যা কামিয়া বা কামিয়তি প্রথা নামে পরিচিত ছিল।[৬৪] এছাড়া খ্রিস্টান মিশনারি কর্তৃক ধর্মান্তকরণের অনাচার, রেলপথ স্থাপনের জন্য অত্যাচার শেষ পর্যন্ত ১৮৫৫ সালে সাঁওতাল বিদ্রোহের সূচনা করে। ফলত বিদ্রোহের ব্যাপকতা ও প্রকৃতি ব্রিটিশদের ভাবতে বাধ্য করে যে সমগ্র ভারতে প্রবর্তিত একই শাসনব্যবস্থা এ অঞ্চলে সম্ভব নয়। এর ফলস্বরূপ ব্রিটিশ সরকার ১৮৫৫ সালে ৩৭নং আইন পাশ করে এবং সাঁওতাল অধ্যুষিত এই অঞ্চলকে সাঁওতাল পরগণা নামে নতুন ভৌগোলিক সীমানা গঠন করা হয়। এই জেলাকে বীরভূম ও ভাগলপুর থেকে আলাদা করে চারটি মহকুমায় বিভক্ত করে প্রত্যেক বিভাগে একজন করে অ্যাসিসন্যান্ট কমিশনারের নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়।[৬৫] স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে সাঁওতাল পরগণা বিহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকলেও ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের মধ্যদিয়ে ২০০০ সালে বিহারের ১৮টি জেলা নিয়ে ঝাড়খণ্ড রাজ্য গড়ে ওঠে, যার মধ্যে সাঁওতাল পরগণাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

সাঁওতাল পরগণার অবস্থান ও ভূ-প্রাকৃতিক পরিচয়

বর্তমান বিহারের ভাগলপুর বিভাগের দক্ষিণ-পূর্ব অংশ নিয়ে গঠিত হয় সাঁওতাল পরগণা। ভৌগোলিক দিক থেকে এই অঞ্চলটি ২৩°১৮´ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৬°২৮´ থেকে ৮৭°৫৭´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত। ১৩৬৬.০১ বর্গমাইল অঞ্চল বিশিষ্ট এই ভৌগোলিক ক্ষেত্র, যার মধ্যে ৫০০ বর্গকিমি জায়গা হল পাহাড়হীন। ১৮৫০ সালের জরীপ অনুসারে ৫০০ বর্গকিমির মধ্যে জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চল ২৪৬ বর্গকিমি এবং ২৫৪ বর্গকিমি অঞ্চল চাষাবাদে ব্যবহার করার উপযুক্ত করা হয়েছিল।[৬৬] এই জেলার সামগ্রিক আয়তন ছিল ব্রিটিশ কাউন্টি-কর্ণোয়াল, ভেবন এবং সমারসেট-এর সমান।

এই ভৌগোলিক ক্ষেত্রের সর্ববৃহৎ দৈর্ঘ্য হল উত্তর-পূর্বের গঙ্গা থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে বরাকর নদী পর্যন্ত ১২০ মাইল, যদিও দক্ষিণেও উত্তরে দৈর্ঘ্য ১০০ মাইল এবং পূর্ব-পশ্চিমে প্রস্থ প্রায় সমান।[৬৭] সাঁওতাল পরগণার প্রধান প্রশাসনিক কার্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় দুমকাতে। ১৯০১ সালের আদমশুমারী অনুসারে এখানকার জনসংখ্যা হল ১,৮০৯,৭৩৭ জন। সাঁওতাল পরগণার উত্তরে ভাগলপুর ও পূর্ণিয়া জেলা এবং পশ্চিমে হাজারিবাগ ও মুঙ্গের জেলা। জেলার উত্তর-পূর্বে গঙ্গা নদী মালদা ও পূর্ণিয়া জেলাকে যেমন আলাদা করেছে তেমনি দক্ষিণে বরাকর ও অজয় নদী এই জেলাকে বর্ধমান ও মানভূম থেকে পৃথক করেছে। গঙ্গা নদী ও রাজমহল পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত হওয়ায় সাঁওতাল পরগণার উত্তর-পূর্বের অংশ পলিমাটি গঠিত অঞ্চল এবং দক্ষিণাংশ ক্রমশ ঢালু ও কিছু অংশ উচ্চ পাহাড়ী অঞ্চল, যার উচ্চতা ১০০০-২০০০ ফুট। এখানকার ভূমিকে তিনভাগে ভাগ করা যায়, যথা—মোট আয়তনের ৩/৮ অংশ পাহাড়ি অঞ্চল, ১/২ অংশ তরঙ্গায়িত ভূমি এবং বাকি অংশ সমতলভূমি। সাহেবগঞ্জ থেকে সিউড়ির উত্তর পর্যন্ত ১০০ মাইল অঞ্চল পার্বত্য ভূমি, যার মধ্যে দুমকার দক্ষিণ পূর্বাংশে সমগ্র অঞ্চলটির অবস্থান। সাঁওতাল পরগণার পশ্চিম ও দক্ষিণ অংশ তরঙ্গায়িত ভূমি এবং রাজমহল ও গঙ্গা নদীর মাঝে সংকীর্ণ ও দীর্ঘ সমতল ভূমির (প্রায় ১২০ মাইল) উপর দিয়ে চলে গেছে দীর্ঘ রেললাইন।

কথাসাহিত্যিক মহাশ্বেতা দেবী তাঁর ‘অরণ্যের অধিকার’ উপন্যাসে একদিকে যেমন রমণীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা দিয়েছেন ও সেরূপভাবে জনজাতিদের জীবনযাত্রার নানা বর্ণনা দিয়েছেন। সতীনাথ ভাদুড়ির ‘ঢোঁড়াই চরিত মানস’ উপন্যাসেও এই জেলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও জনজাতিদের জীবনযাত্রা আলোচিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে ম্যাকফারসন্ বলেন—‘The upland country, which is now a land smiling cultivation, is not devoid of hills, but these are either isolated peaks like phuljori or small range like Teor, their isolation makes them prominent and stand up boldy breaking the monotony of the landscape and making a striking addition to the prospect’[৬৮] সাহেবগঞ্জ থেক নাঙ্গলভাঙ্গা প্রসারিত রাজমহল হল এই অঞ্চলের মূল পাহাড় এবং এই পাহাড়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ হল মরী, যার উচ্চতা হল ২০০০ ফুট। এই অঞ্চলের অন্যান্য পাহাড়ি কেন্দ্রগুলি হল মহুয়া গড়হী (১৬৫৫ ফুট), সেন্দগর্স (২০০০ ফুট)। এই সব পাহাড়ি অঞ্চলের মধ্যদিয়ে সমভূমিতে

যাবার পাঁচটি গিরিপথ রয়েছে সেগুলি হল— দক্ষিণ পশ্চিমে চাপারভিটা, উত্তর পশ্চিমে মানঝাওয়া, পূর্বে ঘটিয়ারি, দক্ষিণপূর্বে মার্গে এবং রাজমহলের উত্তর পূর্বাঞ্চল। দুমকা মহকুমার দক্ষিণ-পূর্বে রামগড় পাহাড়, যার সর্বোচ্চ শৃঙ্গগুলি হল—সাপলা , লালওয়া পাহাড়, নুনিহাট পাহাড় এবং মিকরা পাহাড়। তাই ভি.বল রাজমহল পাহাড়কে 'Classic ground for the study of Indian Geology' বলে আখ্যা দিয়েছেন।[৬৯] আবার এগুলির সঙ্গে রয়েছে দেওঘর মহকুমার ফুলঝুড়ি দেগাড়িয়া, পাথারডা, ত্রিকুট পর্বত।

সাঁওতাল পরগণার উপর দিয়ে বেশ কয়েকটি নদী প্রভাবিত হয়েছে গঙ্গা, গুমানি, বাঁশলই, ব্রাহ্মণী, মোর, অজয় ও বরাকর। তেলিয়াগড়হির কিছু দূরে পশ্চিম দিকে সাঁওতাল পরগণাকে স্পর্শ করে গঙ্গানদী পূর্ব দিকে শাকরি গলি হয়ে দক্ষিণ পূর্বে প্রবাহিত হয়েছে। সময়ের ব্যবধানে গঙ্গানদীর গতিপথ বারংবার পরিবর্তিত হয়েছে। সাঁওতাল পরগণার উত্তরের গুরুত্বপূর্ণ নদী হিসেবে গোড্ডা মহকুমার রাজমহল পাহাড় থেকে উৎপত্তি লাভ করে উত্তর পূর্ব দিকে বারহেটের কাছে মোরেল নদীতে মিলিত হয়েছে এবং শেষে গঙ্গা নদীতে পতিত হয়েছে। বানস পাহাড় থেকে উৎপত্তি লাভ করে বাঁশলই নদী পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়েছে। আবার দুমকা মহকুমার উত্তরে দুধুয়া পাহাড় থেকে উৎপত্তি লাভ করে ব্রাহ্মণী নদী দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বীরভূম জেলায় প্রবেশ করে ভাগীরথীতে গিয়ে পতিত হয়েছে। সাঁওতাল পরগণার মধ্যেভাগ দিয়ে প্রবাহিত মোর নদী তিউর পাহাড় থেকে উৎপত্তি লাভ করে দক্ষিণ-পূর্বে ভাগীরথী নদীতে মিলিত হয়েছে। বিভিন্ন গতিতে এই নদীর ভিন্ন ভিন্ন নাম যেমন, উচ্চগতিতে মোতিহারি, মধ্যগতিতে মোর ও নিম্নগতিতে ময়ূরাক্ষী নামে পরিচিত। এর কতকগুলি উপনদী হল যথাক্রমে—ভুড়ভুড়ি, বোধাই, তিপ্রা, পুসারো, ভামড়ি, নানবিল, সিধ ও দৌনা প্রভৃতি। অজয় নদ মুঙ্গের জেলা থেকে উৎপত্তি লাভ করে ভাগীরথীতে গিয়ে মিলিত হয়েছে। এই জেলায় কিছু উষ্ণপ্রস্রবণ ও জলপ্রপাতও লক্ষ করা যায়, যার মধ্যে মতি ঝর্ণা অন্যতম, এটি মহারাজপুর রেলস্টেশনের দুই-মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত। সিংপুরে ১০ ফুট উঁচু ব্রাহ্মণী নদীর ঝর্ণা ও ১২ ফুট উঁচু কুমকিরা গ্রামের কাছে বাশটল নদীর ঝর্ণা অন্যতম। এখানকার অন্যতম উষ্ণ প্রস্রবন হল শিপুর গ্রামের উত্তর-পশ্চিমে বোরু নদীর তীরে লাউলাউডা, বরাকর নদীর কাছে বারামাসিয়া উষ্ণপ্রসবণ। ঝাড়িয়া পানি,

তাতলোই, হানাবিল, আপাতপানি, সুসুমপানি ও ভুমকা এই ছয়টি উষ্ণপ্রস্রবণ দুমকা মহকুমায় অবস্থিত।[৭০] কর্ণেল ওয়াডেন এর মন্তব্যে জানা যায় উষ্ণ প্রসবনের জল চুলকানি, ক্ষত ও চামড়ার রোগ সারাতে ব্যবহৃত হত।[৭১]

দামিন-ই-কোহ অঞ্চলে ৪০ ফুট দীর্ঘ ও ২০ ফুট গভীর শিরগাড়ি নামে এক গুহা আছে।[৭২] সাঁওতাল পরগণার বেশীরভাগ অঞ্চল নিস ও গাণ্ডোয়ানা শিলায় গঠিত। খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ এই অঞ্চলে কয়লা, বাড়ি তৈরির পাথর, চুন, লোহা, তামা ও সীসা পাওয়া যায়। ছোট ও ডেলাকৃতি ধাঁচের চুনাপাথর এখানে সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায়, যা এই অঞ্চলে 'ঘুটিং' নামে পরিচিত। রাজমহল পাহাড়ের লোহান্ডিহা অঞ্চলে চুনাপাথর ও চিনামাটি পাওয়া যায়। দেওঘরের বেহেরাকিতে পাওয়া যায় তামা এবং বরাকর নদী উপত্যকায় কয়লা পাওয়া যায়। ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে শেরউইল নামে একজন ইউরোপীয় দেওঘরের তামা ও রূপার খনি থেকে একপ্রকার মিশ্র ধাতু বের করে পরীক্ষা করে বুঝতে পেরেছিলেন সেখানে সাত শের ওজনের খনিজে ১৫৪ গ্রেন বিশুদ্ধ রূপা পাওয়া যায়।[৭৩] সাঁওতাল পরগণায় যেখানে সরকারি বন আছে সেখানে ঝুম চাষ পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। এছাড়া এসব অঞ্চলে প্রাপ্ত অন্যান্য বনজ সম্পদ হল শাল, নিম, বাঁশ, বট, শিমুল, পলাশ, সাবাই ঘাস, বাদাম গাছ, কাজু বাদাম গাছ, ওসর (তুঁত গাছ) ইত্যাদি। এখানে প্রাপ্ত জীবজন্তুদের মধ্যে অন্যতম হল— বাঘ, হরিণ, হায়না, ভাল্লুক, বন্য শূকর, চিতাবাঘ, গণ্ডার ও হাতি। এই সব অঞ্চলে বিচরণশীল অন্যতম প্রধান উল্লেখযোগ্য পাখিগুলি হল— জঙ্গলি মোরগ, তিতির পাখি, কাদাখোঁচা, ধূসর রঙের ছোট পাখি, সবুজ পায়রা ও কালো সারস প্রভৃতি। ইলিশ, রুই, কাতলা, বোয়াল, বোল ও কালবাউস প্রভৃতি এখানকার পরিচিত মাছ। এ বিষয়ে পি.সি. রায়চৌধুরী লিখেছেন—'Santal Pargana is a very good source for collection of spawn'.[৭৪] কুমির, বিভিন্ন প্রজাতির সাপ যেমন—কোবরা, চিতি এখানকার উল্লেখযোগ্য সরীসৃপ। গোড্ডা অঞ্চলের এক বাংলোয় এত বিশাল পরিমাণে সাপ নজরে এসেছিল যে, বাংলোটি 'Snakes Castle' নামে পরিচিত লাভ করে।[৭৫] অবস্থানগত কারণে বাংলা-বিহার সীমান্তে ও ছোটনাগপুরের মালভূমির অংশবিশেষ এই সাঁওতাল পরগণায় তিন ধরনের ভিন্ন জলবায়ু পরিলক্ষিত হয়। এই অঞ্চলের পূর্বদিকে পলিমাটি গঠিত অঞ্চলে স্যাঁতস্যাতে মাটি ও ভ্যাপসা প্রচণ্ড গরম লক্ষ্যণীয়, দেওঘর থেকে রাজমহল পর্যন্ত তরঙ্গায়িত ভূমি ও

জলবায়ু বিহার জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য। এই অঞ্চলে শীতকালে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা ও গ্রীষ্মকালে গরম অনুভূত হয়। গ্রীষ্মকালে এই অঞ্চলের বাতাসে লু (স্থানীয় গরম বাতাস) প্রবাহিত হয় এবং এখানে শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা এই তিন ঋতুর সক্রিয় প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারী শীতকাল, মার্চ থেকে মে পর্যন্ত গ্রীষ্মকাল, জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বর্ষাকাল, অক্টোবর মাস হল বর্ষাকাল থেকে শীতকালে প্রবেশের সময়।[৭৬] নভেম্বর মাসে শীতকালের সূচনা ও উষ্ণতার পতন ঘটতে থাকে ও ডিসেম্বর জানুয়ারি মাসে তাপমাত্রা সবচেয়ে কম ও ফেব্রুয়ারি মাসে উষ্ণতা বাড়তে শুরু করে মে-জুন মাসে তাপমাত্রা সবচেয়ে ৪৬.৭° (সেন্টিগ্রেড) বা (116°F) হয় এবং বায়ুর আর্দ্রতা ৪৯ থেকে ৫২ শতাংশ থাকে। মে মাস থেকে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বাড়তে থাকে জুলাই মাস পর্যন্ত। অক্টোবর মাসে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে ও অল্প বৃষ্টিপাত হয়। বর্ষাকাল ছাড়া বছরের বেশীরভাগ সময় আকাশ মেঘমুক্ত থাকে। শীত ও গ্রীষ্মকালে হাল্কা উত্তর-পশ্চিম পশ্চিমাবায়ু প্রবাহিত হয়। গ্রীষ্মকালে উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে বাতাস বইতে দেখা যায়। বর্ষাকালে বঙ্গোপসাগরের সৃষ্ট নিম্নচাপের জন্য এখানে ঝড় লক্ষ করা যায়।[৭৭] গবেষণার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এই আলোচনা তথা ভূ-প্রকৃতির প্রভাব মানব জীবনে এমনকি প্রকৃত রূপে প্রকৃতির সন্তান এই সাঁওতাল জনজাতির জীবনে প্রকৃতির প্রভাব অনস্বীকার্য, আর তা এখানে সম্পন্ন করা হল।

সাঁওতাল পরগণায় সাঁওতালদের আগমনের পরিপ্রেক্ষিত

সাঁওতাল পরগণায় সাঁওতালদের আগমনের সময় নিয়ে বিভিন্ন পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ লক্ষ করা যায়। তবে অধিকাংশ পণ্ডিত মনে করেন, তাদের আগমন এই অঞ্চলে অষ্টাদশ শতকের শেষ এবং ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে শুরু হয়েছিল। তাদের আদি বাসভূমি সম্পর্কে কিছু তথ্য না থাকায় মোটামুটিভাবে বলা সম্ভব হয়েছে যে তারা ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চল, তৎসংলগ্ন মেদিনীপুর এবং সিংভূম জেলাতে বসবাস শুরু করেছিল এবং অষ্টাদশ শতকের শেষে তারা পশ্চিমমুখী অভিগমন শুরু করেছিল।[৭৮] ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের মধ্যেই লাকের দেওয়ানি অর্থাৎ হান্ডুই ও বেল পাত্তা এই দুই পার্বত্য পাদদেশীয় অঞ্চলে সাঁওতালরা বসবাস করতে শুরু করে এবং এখান থেকেই বীরভূম অভিমুখে তার যাত্রাশুরু করেছিল।[৭৯] এটি যেহেতু কোনো

পরিকল্পিত ও সচেতন অভিযাত্রা ছিল না, সেহেতু সাঁওতালরা একসাথে জঙ্গলমহল থেকে দামিন-ই-কো তে চলে আসেনি এবং ঠিক কোন সময়ে তারা জঙ্গলমহল পরিত্যাগ করে দামিন-ই-কো তে এসে প্রথম বসতি স্থাপন করল তার নির্দিষ্ঠ কোন পরিসংখ্যান নেই। তবে বার্ডলে বার্ড তাঁর কাব্যিক বর্ণনায় সাঁওতালদের এই অঞ্চলে বসতি স্থাপনের এক সুন্দর বিবরণে বলেন, এটা মনে করা যেতে পারে যে প্রকৃতি যেন চিরকালের জন্য সাঁওতালদের জন্য তাদের প্রয়োজনীয় সময়ে এই জায়গা সংরক্ষিত রেখেছিল এবং একমাত্র সাঁওতালরা ছাড়া অন্য কোনো জনজাতি এই অঞ্চলে বসবাসের জন্য অধিকতর যোগ্য ছিল না। হিন্দু, মুসলমান জমিদার এবং মহাজনদের হাতে বার বার তাদের কষ্টার্জিত নিজস্ব জমি হারিয়ে এত দিনে তারা খুঁজে পেল তাদের আরাধ্য জমি, যেখানে অত্যাচারীর আসার সম্ভাবনা নেই। জঙ্গল কেটে কুমারী মাটিকে চাষযোগ্য করে ফসল ফলাবার আনন্দ তাদের মজ্জাগত। কৃতজ্ঞ মাটি অবশেষে সেই হাতের স্পর্শ পেল যার জন্য দীর্ঘকাল ছিল সে প্রতীক্ষারত এবং দীর্ঘ পদযাত্রা ও অসংখ্য প্রতিকূলতার শেষে সাঁওতালরা খুঁজে পেল সেই আপন ভূমি।[৮০]

দামিন-ই-কোহ তখন ছিল জঙ্গলতরাই নামে সম্পূর্ণভাবে পাহাড়িয়া অধ্যুষিত এক অঞ্চল। এর ভৌগোলিক অবস্থানের বর্ণনায় বোঝা যাবে এই অঞ্চলের প্রতি সাঁওতালদের আকর্ষণের কারণ। এর দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত রামগড় ও পাচেৎ, দক্ষিণ-পূর্বে বীরভূম এবং পূর্বে রাজমহল পাহাড় অঞ্চলটি। কাজেই জঙ্গলতরাই ও জঙ্গলমহলের সাধারণত সীমারেখা ছিল, যার ফলে জঙ্গলমহলের থেকে উৎখাত হয়ে সাঁওতালরা প্রথমেই বেছে নেয় জঙ্গলতরাইকে। ১৭৯০-এর আগে যে এই অঞ্চলে সাঁওতালদের আগমন ঘটেনি তার প্রমান পাওয়া যায় যে মেজর ব্রাউন এই অঞ্চলে সার্ভে করার সময় একবারও সাঁওতালদের সম্পর্কে কোনো কথা উল্লেখ করেননি। তবে এ বিষয়ে নির্ভরযোগ্য বিবরণ পাওয়া যায় ফ্রান্সিস বুকাননের রিপোর্ট থেকে। ১৮০৯-১০ সালে বুকানন ভাগলপুর অঞ্চল পরিদর্শন করেছিলেন এবং তখনকার ভাগলপুর বলতে বোঝাত মুঙ্গের এবং বর্তমান সাঁওতাল পরগণার উত্তরপূর্বের দুই তৃতীয়াংশ অঞ্চলকে, সেখানে তিনি লক্ষ করেছিলেন যে ৫০০টি সাঁওতাল পরিবার এই অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছে এবং পালামৌ, রামগড় ও বীরভূম অঞ্চল থেকে জমিদারদের অত্যাচার থেকে পালিয়ে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ এখানে বসতি স্থাপন করে।[৮১] আবার সাদারল্যান্ডের

বর্ণনায় পাওয়া যায় সাঁওতালরা ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে গোড্ডা মহকুমা এবং ১৮২৭ খ্রিস্টাব্দের এর চূড়ান্ত উত্তর অভিমুখে যাত্রা শুরু করে।[৮২] অন্যদিকে ক্যাপ্টেন শেরউইলের বিবরণ অনুসারে ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে দামিন-ই-কোহ অঞ্চলে সাঁওতাল জনজাতির সংখ্যা ছিল ৮৩,২৬৫ জন।[৮৩] মিস্টার ওয়ার্ড 'দামিন-ই-কোহ' পরিমাপকালীন সময়ে সিংভূম ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে পাতসুন্ডায় ৩টি, বারকপের ২৭টি মিলিয়ে মোট ৩০টি সাঁওতাল গ্রাম লক্ষ্য করেছিলেন। অবশ্য পরবর্তীতে তারা সিংভূম পরিত্যাগ করে।[৮৪] ১৯০১ সালের আদমশুমারী অনুসারে অভিপ্রয়াণের পরিমাপ ছিল পূর্বদিকে ১১৭০০০ জন এবং পশ্চিমদিকে ৮৩০০০ এর বেশি। তবে ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে এই জেলার দক্ষিণ থেকে পশ্চিমে সাঁওতালদের ব্যাপক অভিপ্রয়াণ ঘটেছিল।[৮৫] এই সময় প্রায় ৩১০০০ সাঁওতাল আসামে চা বাগানে চলে যায় এবং বেশকিছু জলপাইগুড়ি অঞ্চলে বসবাস শুরু করে। এ প্রসঙ্গে এল.এস.এস.ও'ম্যালে তাঁর ডিস্ট্রিক্ট গ্যাজেটিয়ারে উল্লেখ করেন—'The chief reason for their emigration from the district appears to be that they are an extremely prolific race and that the cultivable portion of the Jungles in the Santal Parganas is becoming exhausted.'[৮৬] এছাড়া সাঁওতাল পরগণায় অন্য অধিবাসীদের বাস ছিল যেমন—মাড়োয়ারি, ভোজপুরি, বিহারের ব্যবসাদার; যারা এই সহজ সরল সাঁওতালদের ঠকিয়ে নিজেদের সম্পদশালী করে তুলেছিল। এরা সাঁওতালদের দ্বারা 'দিকু বা বহিরাগত' আখ্যায় ভূষিত হয়।

ঐতিহ্যশালী সাঁওতাল সমাজ ও সংস্কৃতি

সাঁওতাল সমাজের স্তর বিন্যাস :

সাঁওতালি গাঁথার সাক্ষ্য অনুযায়ী সাঁওতাল জাতির আদিম পিতা ও মাতা হলেন পিলচু হাড়াম ও পিলচু বুড়ি। পরবর্তীতে ভাই ও বোনের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ হলে তারা সাতটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে তৈরি করে—'হাঁসদা', 'হেমব্রম', 'মুর্মু', 'মারান্ডি', 'সরেন', কিস্কু' ও'টুডু'।[৮৭] পরবর্তীকালে তাদের মধ্যে যুক্ত হয় বাস্কে, বেসরা, পাঁওরিয়া, চোড়ে ও বেদিয়া (যদিও এটি বর্তমানে লুপ্ত)। সাঁওতালদের এই গোষ্ঠী বিভেদ সম্পন্ন হয়েছিল সাসাংবেদে থাকাকালীন পর্বে। এ সম্পর্কে একটি গানও রয়েছে—

“হিহিড়ি পিপিড়িতে জন্মেছিলুম মোরা
খোজ কামানে মোদের খোঁজ নিয়েছিলেন খোদা (ঈশ্বর)
হারাতা পাহাড়ে বেড়েছিলুম মোরা
সাসাংবেদে হয়েছিল মোদের জাতভাগ।”[৮৮]

হার্বাট রিজলে তাঁর *Tribes and Castes Of Bengal* গ্রন্থে বেশ কিছু সাঁওতালি বর্ণ ও তাদের নামের অর্থ উল্লেখ করেছেন। যথা—‘বেদিয়া’(ভেড়া), ‘বেসরা’(বাজপাখি), ‘হেমব্রম’(সুপারি), ‘মারান্ডি’(ঘাস), ‘মুর্মু’(নীলগাই) এবং ‘সরেন’(নক্ষত্র মণ্ডল)।[৮৯] এই প্রত্যেকটি ভিন্ন ভিন্ন গোত্রগুলির ভিন্ন ভিন্ন ধর্মীয় প্রতীক রয়েছে,যা নিম্নরূপ।[৯০]

গোত্র	প্রতীক	গোত্র	প্রতীক
হাঁসদা	হাঁস	হেমব্রম	সুপারি
মুর্মু	নীল গাই	কিস্কু	শঙ্খচীল
সরেন	সপ্তর্ষী	মার্ডি	মেরাদাঘাস
বেসরা	বাগপাখি	বাস্কে	পান্তা ভাত
চঁড়ে	গিরগিটি	পাঁউরিয়া	পায়রা
বেদিয়া	ভেড়া	টুডু	জানা নাই

প্রতিটি সাঁওতালি গোত্রের উপগোত্র আছে, এই উপগোত্রগুলিকে সাঁওতালি পরিভাষায় ‘খুণ্ডস’(khundas) বলা হয়। রামদাম টুডু রেস্কা *খেরওয়াল বংশা ধরম পুঁথি*- গ্রন্থে এই উপগোত্রগুলির তালিকা উল্লেখ করেছেন। আবার ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে তাঁর *পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ* গ্রন্থেও উক্ত সকল উপগোত্রের তালিকা দিয়েছেন।[৯১] তাদের প্রতিটি গোষ্ঠীর প্রতীকও পৃথক, এমনকি তাদের পূজা-পার্বণের রীতিনীতিও ভিন্ন। সাঁওতালদের মৌখিক ঐতিহ্য সাক্ষ্য দেয় যে, কিস্কুরা রাজ্যপাট চালাতো বলে তারা ‘কিস্কু রাজা’ হিসেবে পরিচিত হত। সরেনরা ছিলেন অত্যন্ত আবেগপ্রবণ ও রাগী তাই তারা সিপাহীর কাজে যুক্ত থাকতেন এবং তারা পরিচিত ছিলেন ‘সরেন সিপাহী’ হিসেবে। মান্ডি গোত্রের মানুষেরা কৃষিকার্যে সুনিপুণ হওয়ায় তারা ‘মান্ডি কিষাড়’ নামে পরিচিতি ছিলেন। মুর্মুরা পূজার্চনা ও পুরোহিতের কাজ করায় তারা ‘মুর্মু ঠাকুর’ হিসেবে পরিচিত লাভ করে। হেমব্রমরা দেওয়ান এর কাজ করত বলে তাদের ‘কুয়ার’ বলা হত।

সাঁওতাল সমাজে বাস্কেরা ব্যবসায়িক কাজে ব্যস্ত থাকত। হাঁসদা ও টুডুরা লোহার জিনিস বানাত ও উৎসবে বাদ্যযন্ত্র বাজাত। এছাড়া হেমব্রমদের 'সততা' গুণ ছিল, টুডুরা 'শিল্পী' হিসেবে পরিচিত ছিল (বিশেষত লোহা ও কাঠের কাজ)। আর বেসরাদের সুন্দরী মেয়েরা নৃত্যগীতে পটিয়সী ছিল।[৯২] আবার চঁড়ে গোষ্ঠীরা ডগুকা ও পাঁউরিয়ারা নিষিদ্ধ কাজে কর্মরত হওয়ায় সাঁওতাল সমাজের নিম্নস্তরে অবস্থান করত।

সাঁওতাল গ্রামীণ কাঠামো :

গ্রাম হল সাঁওতালদের গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের মূলভিত্তি। সাঁওতাল গ্রাম সমাজ ভৌগোলিক বা ইতিহাসগত দিক থেকে অবস্থিত কোনো গ্রাম নয়, বরং কিছু রীতি নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত সামগ্রিক ব্যবস্থা। যে কোনো অঞ্চলে সাঁওতালদের নতুন বসতি স্থাপন তাদের ঐতিহ্যকে অনুসরণ করে চলে। এককভাবে কোনো সাঁওতাল অকর্ষিত জমিতে বসতি স্থাপন করতে পারে না। গ্রাম পত্তনের সঙ্গে সঙ্গে গড়ে ওঠে কৃষি ও সমাজ সংক্রান্ত নানান নিয়ম কানুন এবং তা পরিচালিত হয় গ্রামের কয়েক জন বিশেষ ব্যক্তিবর্গের দ্বারা। যাদের নিম্নে বর্ণনা দেওয়া হল—

ক) **মাঝি :-** সাঁওতালদের প্রতিটি গ্রামে একজন করে গ্রাম প্রধান থাকে, যাকে মাঝি বা মানঝি বলে। তিনি সাঁওতালি গ্রামে সর্বোচ্চ প্রশাসনিক স্তরে অবস্থান করেন এবং তিনি নির্বাচনের দ্বারা নির্বাচিত হন। আবার প্রতিটি গ্রামে প্রতিটি মাঝির কিছুজন সহযোগী থাকে। উক্ত গ্রামে বসবাস স্থাপন থেকে শুরু করে গ্রাম ও পরিবারের প্রত্যেকটি উৎসব অনুষ্ঠানের জন্য মাঝির অনুমতি আবশ্যক। এই প্রশাসনিক কাজের বিনিময়ে তিনি নিষ্কর জমি ভোগ করেন ও শিকারের অংশ লাভ করেন। গ্রাম্য পরিমণ্ডলের অভ্যন্তরে ও বাহ্যিক সকল বিষয়ে তিনিই হলেন জনপ্রিতিনিধি। গ্রামের স্বার্থ বিঘ্নিত হওয়ার কারণ ঘটলে তিনি এক জনসাধারণের জমায়েত আমন্ত্রণ করেন, যেখানে গ্রামের প্রতিনিধিত্ব করেন মাঝির পাঁচজন বরিষ্ঠ সহযোগী।[৯৩] নিজস্ব গ্রামীণ বিষয়কে তারা বর্হিঅঞ্চলে প্রকাশে অনিচ্ছুক, এমনকি প্রতিবেশী দুই গ্রামের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও জমায়েত আলোচনায় বসে পরগণাতে আবেদন জানায়। পরগণা হল অনেকগুলি গ্রামের সমষ্টি এবং পরগণার অধিবেশনকে বলে পঞ্চায়েত, সেখানে সকল গ্রামের মাঝি ও প্রতিটি গ্রাম থেকে অনেক গণ্যমান্য ব্যাক্তিরা উপস্থিত থাকেন।[৯৪] গ্রাম প্রধানের সহযোগীর মতো

পরগণাতেও সহযোগী থাকে, যাকে বলা হয় ‘দেশ মাঝি’। সাঁওতালি ঐতিহ্য অনুযায়ী পরগণা এক টাকা, আধসের ঘি, এবং চার স্কোড় (পরিমাপের একক) শস্য পান ও দেশমাঝি তার অর্ধেক পায়। তবে গ্রাম প্রধান এবং পরগণার উপর রয়েছে জনগণ এবং তারাই প্রকৃত জনপ্রতিনিধি। প্রতিবছর মাঘ মাসে গ্রামের সকলে এক স্থানে জমায়েত হয়ে দেবতার উদ্দেশ্যে অর্ঘ্য নিবেদন করেন, এরপর গ্রাম প্রধান ও তার সহযোগীকে পদত্যাগ করতে হয়। যদিও এর কিছুদিন পর পুনরায় তারা তাদের পদ ফিরে পান।[৯৫] সেখানে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যাক্তি যোগ্যতা প্রমাণে ব্যর্থ হলে জনগণ অন্যজনকে সেই জায়গায় নির্বাচিত করেন এবং পুনর্নির্বাচন করারও ব্যবস্থা থাকে। এই গ্রামপ্রধানরা আবার প্রধান ও মুস্তাজির নামে পরিচিতিপায়।[৯৬] এক্ষেত্রে প্রধান হলেন সরকারি কর্মচারী, যিনি রাজস্ব আদায় করেন আবার গ্রাম প্রধানের দায়িত্বও পালন করেন। হান্ডি দ্বারা তাকে অনুমোদন করা হয় বলে এঁদের ‘Handi Manjhi’ বা ‘Liquer Chief’ও বলা হয়।

খ) **পারানিক :-** গ্রামপ্রধানের সহকারীরা পরিচিত হন পারানিক নামে। যদি মাঝি না থাকেন বা মারা যান অথবা তার পুত্র সন্তান না থাকলে পারানিকই প্রধানের পদ অলঙ্কৃত করেন। তিনি আপন ক্ষমতাবলে সাঁওতালি পঞ্চায়েতে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী।

গ) **জগমাঝি :-** সামাজিক কাজকর্ম সম্পাদনে মাঝিকে সাহায্য করে জগমাঝি। তিনি সাঁওতালি সমাজের বিবাহ, জন্ম ও যুবক-যুবতীদের মধ্যে ‘Custom Morum’ হিসেবে কাজ করতেন।[৯৭] তিনি আবার যুবক-যুবতীদের সর্দারও, তিনি খেয়াল রাখতেন সমাজে যাতে কোনো খারাপ কাজ না হয়। এছাড়াও তিনি জন্ম সংস্কারের ছাটিয়ার কালে, বিবাহ সম্পর্কিত বিষয় দেখাশোনা করেন।[৯৮] কোনো সাঁওতাল যুবতী বিবাহ পূর্বকালে গর্ভবতী হয়ে পড়লে জগমাঝির দায়িত্ব ছিল উক্ত দোষীকে খুঁজে বের করা, আর যদি তিনি তা না করতে পারতেন তবে মাঝির গোয়ালঘরে গ্রামের জনগণ কর্তৃক প্রহৃত হতেন ও তার জরিমানা হত। এছাড়াও এলাকার বাইরে কোথাও উৎসব হলে উক্ত নৃত্যগীতের অনুষ্ঠানে যুবক-যুবতীদের নিয়ে যাওয়া ও ফিরিয়ে নিয়ে আসার কাজ করতেন, আবার তিনি এর সঙ্গে সঙ্গে নৃত্যগীতের পরিচালনাও করতেন।[৯৯] ২০০৩

সালের শারদীয়া সংখ্যায় *আদিবাসী জগৎ* নামক পত্রিকার 'স্বরাজ' নামক প্রবন্ধে হরিসাধন সরেন মন্তব্য করেন—পুরাকালে জগমাঝির শাসন খুব কঠোর ছিল, এই কারনেই গ্রামও নির্দিষ্ট শাসনের মধ্যে থাকত।[১০০] তাই শুচিব্রত সেন বলেছেন—'He (The Jagmanjhi) was the moral censor of the village'.[১০১]

ঘ) **জগপারানিক :-** জগমাঝির সহযোগী ছিলেন জগপারানিক। তিনি জগমাঝির অনুপস্থিতিতে কার্য সম্পাদন করেন এবং জগমাঝি না থাকলে তিনি সেই পদের অধিকারী হন।

ঙ) **গোডেত :-** সাঁওতাল সমাজের শেষ ধর্মনিরপেক্ষ গ্রামীণ প্রশাসক ছিলেন গোডেত বা গডেত, তিনি আসলে মাঝির পিওন। কোনো সভাসমিতির দিনক্ষণ, তারিখ, কোনো ভালোমন্দ সংবাদ এই গোডেতের মাধ্যমেই গ্রামবাসীরা জানতে পারে। পূজা-পার্বণ, উৎসব অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় গোডেতকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হয়। কোনো পূজা-পার্বণের জন্য বাড়ি বাড়ি চাঁদা সংগ্রহ, চাল, মুরগী সংগ্রহ করার ভার তার উপরে থাকে। সমাজের কেউ মারা গেলে মৃতের বাড়ি থেকে একমাত্র প্রথম তাকেই সংবাদ দেওয়া হয়। অতঃপর এই গোডেতের মাধ্যমেই সারা গ্রাম মৃত্যু সংবাদটি জানতে পারে। গ্রামবাসী যেহেতু এই গোডেতের মাধ্যমে এতকিছু জানতে পারত, তাই তাকে বড় মাঝিও বলা হয়।[১০২] অবশ্য এই পদটিও বংশানুক্রমিক। সাঁওতালদের ঐতিহ্যে এই পদের অত্যন্ত গুরুত্ব রয়েছে, তারা বিশ্বাস করতেন মারাংবুরু স্বয়ং ঈশ্বরের গডেত ছিলেন। এমনকি পরিস্থিতির স্বাপেক্ষে তিনি মাঝি ও পরগণার প্রধান হয়ে উঠতেন।[১০৩]

চ) **নায়কে :-** নায়কে হলেন সাঁওতাল সমাজের পুরোহিত, এই পদ হল বংশানুক্রমিক। গ্রামের মূল দেবস্থান ও অন্যান্য জায়গায় পূজা-পার্বণের দায়িত্ব তাঁর। তিনি সকল গ্রামবাসীর পক্ষ থেকে সারা বছর ধরে গ্রামের বিভিন্ন দেবস্থান, জাহেরথান, মাগসীম বোঙ্গাথান, গটশিম বোঙ্গাথান, শিম বোঙ্গাথান, সেঁদরা বোঙ্গাথানে পূজা করেন। সাধারণভাবে মাঝির বংশের ছোট ভাই নায়কে পদ পান।[১০৪] বিপদের সময় দেবতাদের প্রসন্ন করার দায়িত্বও তাঁর। এছাড়া বিবাহ অনুষ্ঠান, বাহা উৎসব প্রভৃতি সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন।

ছ) **কুডীম নায়কে:-** নায়কের সহকারী পদ হল কুডীম নায়কে। বংশানুক্রমিক পদের অধিকারী কুডীম নায়কে ভূত, প্রেত, পেত্নী ও ডাইনি এই সকল অপদেবতার পূজা করেন। তিনি শিকারের আগে ভালো শিকারের আশায় ও শিকারীরা যাতে অক্ষত অবস্থায় ফিরে আসতে পারে তার জন্য নিজের উরু চিরে দিয়ে পারগালইট ও সিমাগাড়ে ঠাকুরের পূজা দেন। তিনি নিজের এমনকি অপরের বাড়ির গৃহদেবতার পূজার স্থানে প্রবেশ করতে পারেন না।

জ) **দিহরি :-** সাঁওতালদের শিকারের আহ্বায়ক হলেন দিহিরি। এটি একপ্রকার পাহাড়িয়া শব্দ। দিহরি একজন সাধারণ সাঁওতাল, যিনি শিকারের পৌরহিত্য, উৎসর্গকারী এর শিকারের প্রভু। তিনি শাল গাছের ডাল ঝুলিয়ে শিকারের দিন ও স্থান ঠিক করে সকলকে জানিয়ে দেন। তাঁর নেতৃত্বে শিকার কার্যও সম্পন্ন হয়। এইক্ষেত্রে কোনোরূপ সমস্যা হলে তা মাঝির পরিষদে বিচারের জন্য তোলা হয়। সেই বিচার সভার নাম—'ল-বির-বাইসি'।[১০৫]

সাঁওতাল শাসন ব্যবস্থা :- সাঁওতালদের ত্রি-স্তরীয় প্রশাসন ব্যবস্থার সর্বোচ্চ ও প্রথম গুরুত্বপূর্ণ স্তর হল গ্রাম পঞ্চায়েত। এ বিষয়ে শরৎচন্দ্র রায় বলেন, জনজাতি গুলির সবচেয়ে প্রাচীন ব্যবস্থা গুলির মধ্যে অন্যতম হল গ্রাম পঞ্চায়েত এবং গ্রামের প্রতিটি সদস্যকে সূর্য দেবতা ও পঞ্চায়েতের নামে শপথ গ্রহণ করতে হতো।[১০৬] এ সম্পর্কে সাঁওতালি গাঁথায় বলা রয়েছে—

"সিরমারে সিং বোঙ্গা
ওতেরে পঞ্চ"[১০৭]

(অর্থাৎ আকাশে রয়েছে সূর্য দেবতা এবং নীচে রয়েছে পঞ্চায়েত)।

সাধারণত 'মাঘাসীম' উৎসবের সময় গ্রামের সকল পরিবারের প্রধানদের অনুমতিক্রমে জাহের থানে পঞ্চায়েতের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং সেখানে নতুন সদস্যদের নির্বাচিত করা হয়, সেই সঙ্গে পুরোনো সদস্যদের পদত্যাগ করতে হত। এই প্রকার পদ্ধতি 'মারে লাগলে নাওয়্যা রওউর' নামে পরিচিত এবং এই নির্বাচনের দ্বারা মাঝি, পারাণিক, জগমাঝি নির্বাচিত হত। আর উক্ত সমগ্র ঘটনার তদারকি করত পিরবিচের নামক স্থানীয় বিধিবর্হির্ভূত বিচারালয়। এর উপরে থাকে জেলার সকল মাঝিদের নিয়ে গঠিত

‘লামাহের বাইসের’ নামক পরিষদ। ‘লামাহের বাইসের’ নামক পরিষদের উপর রয়েছে ‘ভারত জাকাত মাঝি মারোয়া’ নামক প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে মার্ক প্রফেনবার্গার বলেন—‘Which have provide a moving mechanism among dispersed Santal communities in both time and space’.[১০৮] সাঁওতাল প্রশাসনিক ব্যবস্থার দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরে ছিল গ্রামীণ প্রশাসকগণ ও গিরা ব্যবস্থা।[১০৯] এক্ষেত্রে একটি বিশেষ বিষয় হল সাঁওতালসমাজের সমতাবাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল মন্ডালী ব্যবস্থা। এই সমাজে সকল পরিবারের প্রধানদের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। সমতাবাদের বিশেষ লক্ষণ অনুসারে মাঝির পোশাকও অন্যান্য সাঁওতালদের মতোই হয়ে থাকে। গ্রামের প্রতিটি পরিবারের প্রধানদের দিয়ে গঠিত ‘গ্রামীণ পরিষদ ব্যবস্থা’ হল সাঁওতাল জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। সামাজিক সম্মান হারানো সাঁওতালদের কাছে পরিচয় হারানোর মতো বিষয় এবং সাঁওতালদের রাজনীতি এই সকল সামাজিক ব্যবস্থা ঘিরেই আবর্তিত হয়। এই সাঁওতাল সমাজের ঐতিহ্যগত কাঠামো যেকোনো সরকারের আমলাতান্ত্রিক পরিকাঠামোর থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

সাঁওতাল সমাজের খাদ্যাভ্যাস ও পোশাক পরিচ্ছদ

সাঁওতালরা তাদের কৃষিকাজ সূচনা করেছিল জঙ্গল পরিষ্কার করে ঝুম চাষের মাধ্যমে। তাদের চাষের জমি ‘বার্জ’ নামে পরিচিত ছিল। এছাড়া তারা বাড়ির জমি চাষ করত, এর সঙ্গে সঙ্গে শিকার, জলাশয় থেকে মাছ ধরা ও পশুপালন করত। শেরউইল সাঁওতালদের খাদ্যাভাস ও আনন্দ বিনোদন সম্পর্কে বলেন—‘The Santal eats his buffalo beef, kids, poultry, pork or pigeons, enjoys a hearty carouse enlivened with the spirit pachwai and dance with his wives and comrades to express his joy and thankfullness’.[১১০] সাধারণত আমরা সাঁওতালদের খাবারকে দুই ভাগে ভাগ করতে পারি—ক) দানাশস্য ও সবজি খ) দানা শষ্য ছাড়া অন্য কাঁচা ও পোড়ানো খাবার। পি.ও.বোডিং সাঁওতালদের খাবারের যে তালিকা দিয়েছেন তা হল—

১) ১৪ রকম সিম গোত্রীয় উদ্ভিদ।

২) ১৮ রকম চাষাবাদের দ্বারা উৎপাদিত সবজি।

৩) ৫৯ রকমের বন্য উদ্ভিদের পাতা।

৪) ২৪ রকম মাশরুম।

৫) ১০ ধরনের রেজিন ।

৬) ৬৫ রকমের ফল।

৭) ২৫ রকমের কন্দ ।

উপরিউক্ত শস্য ছাড়াও সাধারণত গৃহপালিত পশু (কুকুর, বিড়াল , ঘোড়া) ও বিভিন্ন বন্যপ্রাণী যেমন শিয়াল, চিতাবাঘ, পাঁচ ধরনের ইদুঁর, দুই ধরনের সাপ, টিকটিকি, কচ্ছপ, কুমির, ৭২ রকমের পাখি ও তার ডিম, ৩০ ধরনের মাছের পাশাপাশি ১৬ রকমের তৈলবীজ ও বাদাম জাতীয় দানাশস্য।[১১১] সাঁওতালরা ধামিন এবং পাথুরে সাপ খেত এবং সাঁওতালরা শক্ত মাংস চিবিয়ে খেতে বিশেষভাবে পছন্দ করে।[১১২] সাঁওতালদের খাদ্যাভ্যাস প্রসঙ্গে জনৈক মিশনারি মান সাহেবকে বলেছিলেন, যেখানে একটি ইদুঁরকে উপবাস করে থাকতে হয় সেখানেও সাঁওতালরা জীবনধারণ করতে পারে।[১১৩] ঢেঁকি ছাঁটা চাল ও আতপ চাল দিয়ে বানানো পিঠে তাদের প্রিয় খাবার। তারা বাঁশ গাছের অঙ্কুর দিয়ে হান্ডুয়া তৈরি করে এবং তারা রান্নার কাজে মহুয়া তেল ব্যবহার করে।[১১৪] এর সঙ্গে সঙ্গে তারা ঘুটিং নামক পাথর থেকে চুন তৈরি করে তামাক খেত। সাঁওতালরা যে পচা মাংস খেত সে সম্পর্কে চারুলাল মুখার্জি বলেন– ‘With an embarrassed look the Santals confessed that they eat carrion, but added that they cook if in an outer house’.[১১৫] সাঁওতালদের প্রিয় পানীয় খাবার হল হাঁড়িয়া বা পচাই, যা ভাত ও রানু গাছের শিকড় দিয়ে তৈরি করা হয়।

পোশাক পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে সাঁওতাল মেয়েরা সাত কিউবিট পরিমাপ শাড়ীর অর্ধাংশ নিম্নাংশে জড়িয়ে বাকি অর্ধাংশ বাম কাধে রেখে সামনের দিকে ঝুলিয়ে রাখত, কিন্তু কোনো ঘোমটা ব্যবহার করত না।[১১৬] তাদের মাথার চুলকে মাথার পেছনে আবের মত শক্ত করে বেঁধে ফুল, পাতা গুঁজে সাজিয়ে রাখে। সাঁওতাল মহিলারা শরীরের উর্দ্ধাংশে গামছাও জড়িয়ে রাখে, বছর দশকের মেয়েরা লেহেঙ্গাঁর মত পোশাক পরে আবার কাঁথা বস্ত্র পরে একই ভঙ্গিতে। তাদের এক প্রকার পোশাক পরার ভঙ্গি হল

‘লেবডা’, গোগোক’ এবং ‘লেবড়া রাকাপ’।[১১৭] ছেলেরা ছোট বস্ত্র কোমরে বেঁধে শেষ অংশ পিছনের দিকে কোমরে গুঁজে নেয়, যা অনেকটা বাঙালিদের ধুতি পরার মত, আর শিশুরা কটিবাস পরে, যা অতি অপর্যাপ্ত পোশাক।[১১৮]

সাঁওতালি মেয়েরা অলংকার ব্যবহার করে মাথার চুলে ও কানের উপরে ফুল গুঁজে। সাঁওতাল জনজাতির মধ্যে যারা অবস্থাপন্ন তারা ধাতব অলংকার পরিধান করে। বিশেষত তারা পিতলের অলংকারই সাধারণত ব্যবহার করে এবং পায়ে একপ্রকার নুপুর পরে যার এক একটার ওজন আড়াই সের।[১১৯] এছাড়া তারা পায়ের আঙুলে চুটকি ব্যবহার করে এক সের ওজনের, যা ‘খারুয়া’ নামে পরিচিত। শেরউইল-এর মতে সাঁওতাল রমনীরা ৩৪ পাউণ্ড পিতল পরে থাকতে পরে। তাদের হাতের কব্জির অলংকারের নাম ‘ফোরা সেকম’। তারা ‘টার্ড’ নামক ধাগা জাতীয় অলংকার পরে। এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের আংটি টাকামুডাম, মাথার অলংকার ‘ঝিপঝিপি’, কোমর বিছার নাম ‘ডান্ডা ঝিনঝির’ ও কানের অলংকার ‘ঝিনকা’ ইত্যাদি ব্যবহার করে।[১২০]

সাঁওতাল বসত বাড়ি নির্মাণ

সাঁওতালদের বাড়িগুলি মূলত ‘কুলহি’ বা রাস্তার দুপাশে গড়ে ওঠে। প্রতিটি বাড়িতে দুই থেকে তিনটি কক্ষ থাকবে আর এই বাড়ির স্তম্ভগুলির উচ্চতা প্রায় তিন কিউবিট পরিমাপের, যা খড়পোড়া ও গোবর দিয়ে প্লাস্টার করে তৈরি করা হয়। বাঁশ ও শালগুড়ির দুদিকে ভালোকরে মাটি লেপে বাড়ির দেওয়াল তৈরি করা হয়। পলাশ ও আসান গাছ দিয়ে বাড়ির উপরের বিম বা কড়ি তৈরি করা হয়।[১২১] শাল কাঠ দিয়ে তৈরি করা হত ঘড়ের বর্গা, ঘরের উপরে দুই থেকে তিন ইঞ্চির পুরু খড়ের ছাউনি থাকে, তবে সাঁওতালদের সামর্থ্য অনুযায়ী প্রত্যকের বাড়ির আকৃতি ও গঠন আলাদা রকম হয়। এদের বাড়ির বিভিন্ন মাপ ছিল – ১১/৫ কিউবিট, ১২/৫ কিউবিট, ১৩/৫ কিউবিট। অর্থবানদের বাড়ির মাপ ছিল ১৭/৭ কিউবিট। বাড়িগুলিতে কোনো জানালা থাকে না, তারা ঘরের দেওয়ালে নানা শিল্প নৈপূণ্য ফুটিয়ে তুলত। তবে সাঁওতালদের মধ্যে ৫/৭ কিউবিট মাপের কোনো বাড়ি থাকে না কিছু অন্ধ বিশ্বাসের জন্য।

জন্ম সংস্কার

সাঁওতালদের জন্মহার কম হওয়ায় সন্তান জন্ম এদের কাছে প্রায় উৎসবের মতো। সন্তানের লিঙ্গ ক্ষেত্রে বৈষম্যগত দৃষ্টিভঙ্গি তাদের না থাকলেও কর্মক্ষেত্রের প্রাধান্যে তাদের মধ্যে পুত্র সন্তানের কামনা বেশী। পৃথিবীর সকল জাতির মতই গর্ভবতী নারীরা খুব যত্নে লালিত হয়। গর্ভবর্তী অবস্থায় সাঁওতাল নারিরা নানা নিয়ম মেনে চলে। যেমন— নদী, জঙ্গল ও মাঠে যাওয়া সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ থাকে। শিশুর জন্মের পরে যে অনুষ্ঠান হয় তার নাম 'সাড়িম ডাল'।[১২২] এই অনুষ্ঠান পালনের প্রক্রিয়া ঘড়ের চালায় জোরে জোরে লাঠি দিয়ে তিনবার আঘাত দেওয়া হয়। প্রাথমিক ভাবে শিশুদের জন্ম সংক্রান্ত সমস্ত কাজ করেন দাইমা ও ধাই। তবে প্রসবের সময় সমস্যা তৈরি হলে ভৌতিক বা অশুভ শক্তির অপসারণ করতে ওঝা ডাকা হয়।[১২৩] মাতৃক্রোড় থেকে শিশুর সংযোগ ব্যবচ্ছেদ হিসেবে নাড়ি কাটা হয় তীর দিয়ে আর গর্ভের ফুল বাড়ির ভিতরে মাটির নীচে পুঁতে দেওয়া হয়।[১২৪] শিশুর জন্মমুহূর্ত থেকে সমগ্র পরিবার ও গ্রাম অশৌচব্রত পালন করে কোনো পূজাজাতীয় শুভকার্য সম্পন্ন করে না। পরিবারের সুযোগ অনুযায়ী ১/৩/৫/৭ দিনে অশৌচ শুদ্ধ অনুষ্ঠান করা হয়, যা 'জনম ছাটিয়ার' নামে পরিচিত। এক সাঁওতাল পরিবারে সাধারণত মেয়ে হলে তিনদিন ও ছেলে হলে পাঁচদিন পর এই শুদ্ধি অনুষ্ঠান করা হয়। ঐ দিন নাপিত সকলের চুল কামিয়ে দেন, নায়েককে দিয়ে প্রথম শুরু হলে শেষ হয় শিশুর পিতাকে দিয়ে, তারপরেই এই চুল কামানো পর্ব সমাপ্ত হয়। এরপর ধাইমা একটি জলপূর্ণ পাত্র ও শূন্য পাত্র নিয়ে শিশুটিকে বাইরে নিয়ে আসেন। এরপর শিশুর মাথার সমগ্র চুল মুণ্ডন করে চুলগুলি খালি পাত্রে ভরা হয় আর যে তীর দিয়ে নাড়ী কাটা হয়েছিল তাতে দুটো সুতো বেঁধে জলাশয়ে গিয়ে স্নানপর্ব সম্পন্ন করা হয়। এরপর পুরুষদের স্নান পর্ব সমাপ্ত হলে ধাইমা তেল, হলুদ ও সিঁদুর নিয়ে গ্রামের সকল মহিলাদের সাথে স্নানে যায়। পুকুরের পাশে মাটিতে ধাইমা সিঁদুর দিয়ে পাঁচটি দাগ কেটে দেয় যাকে বলে 'পুকুর বা জলাশয় কেনা'।[১২৫] পরবর্তী পর্যায়ে ধাইমা সুতোয় শিশুর চুল বেঁধে জলে ফেলে অবশিষ্ট সুতোটিকে হলুদ মাখিয়ে বাড়ি নিয়ে এসে শিশুটির কোমড়ে ঘুনসি হিসাবে বেঁধে দেয়।[১২৬] শিশুর ধাইমা বাড়ির উঠোনের চালের নীচে গোবর জল দিলে শিশুটির মা শিশুটিকে নিয়ে এসে সেখানে বসায়। এরপর একপাত্র নিমজল (অনেকে বলেন নিমপাতা খিছুড়ি) সবাই-কে দেওয়া

হয় আর এভাবেই অশৌচ সমাপ্ত হয় এবং এর পাঁচদিন পর কামান পর্ব শেষ হয়। এক্ষেত্রে ধাইমা ছেলে হলে তিন হাত কাপড়, একমন ধান আর নাড়ি কাটার জন্য একখানা বালা পায়, আর মেয়েদের ক্ষেত্রে দুইমন ধান ও বাকী সব একই মাত্রায় পায়। শিশুর নামকরণের সময় ছেলে হলে ঠাকুরদার ও মেয়ে হলে ঠাকুরমার নাম অনুসারে নামকরণ করা হয়। তবে কোনো পুরুষ ঘর জামাই থাকলে শিশুর নামকরণ দাদু ও দিদার নামানুসারে করা হয়।এক্ষেত্রে শিশুদের দুটি নাম থাকে তার মধ্যে একটি প্রধান নাম ও অপরটিকে বলা হয় 'বাহনা'।[১২৭] সাঁওতাল শিশুদের জন্য অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান চাঁছো ছাটিয়ার নামে পরিচিত। কলোনেল ক্যাম্পবেলের উল্লেখ অনুযায়ী–"A ceremony which is observed any time before marriage, it seems to be the admission of the child to full privileges as a member of the Santhal community. At the same time there is the idea of the purification connected with it at the close of the ceremony the following formula is repeated – we appeal to you five men; we were black like crows now white as white paddy birds, you five men are our witnesses."[১২৮] এই অনুষ্ঠানের দ্বারা শিশুরা তাদের সম্প্রদায়ভুক্ত হয়। এই উৎসবের নির্দিষ্ট কোনো সময় না থাকলেও তা সাধারণত বিবাহের পূর্বে সম্পন্ন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে সকলে মিলিত হয়ে হাঁড়িয়া পান করে এবং তাদের পূর্বপুরুষদের দেশ ভ্রমণের কাহিনী বিবৃত করেন। এক্ষেত্রে হাঁড়িয়া পান, ছাটিয়ার গান এছাড়াও অন্যান্য গান গেয়ে থাকে, এই সময় প্রতিটি শিশুর জন্য সকলে চারবার হাঁড়িয়া পান করে। তবে জনমও চাঁছো ছাটিয়ারের ক্ষেত্রে কোনো নৈবেদ্য নিবেদনের বিষয় থাকে না। কথিত আছে যে, কোনো শিশুর চাঁছো ছাটিয়ার না হলে তার বিবাহ হয় না এবং ঐ অবস্থায় কারো মৃত্যু হলে তার সৎকারও করা হয় না, এমনকি তার ভস্ম নদীতে বিসর্জনও দেওয়া হয় না।[১২৯]

মৃত্যু সংস্কার

সাঁওতালদের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার কতগুলি বিধি-নিয়ম আছে, যেমন গর্ভবতী নারীকে দাহ করা হয় না, মৃত শিশুকে দাহ করা হয় না, এমনকি বারো থেকে পনেরো দিনে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে স্বজন ভোজন করানো হয়। কেউ মারা গেলে তার আত্মা বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য বাড়ির দরজা খুলে রাখা হয়।[১৩০] মৃত ব্যক্তিকে কাপড়, বাটি, টাকা, পয়সা,

খাঁড়া, তীরধনুক, কাঠি ও বাঁশি দিয়ে সাজানো হয়, এরপর চারজনে সেই খাটিয়া সমেত মৃতদেহ বাইরে নিয়ে আসে। সেখানে বাড়ির মেয়েরা মৃতদেহে তেলহলুদ মাখায় ও কপালে সিদুঁর পরিয়ে দেয়।[১৩১] পরে 'ডাবী ডাকার' (যে ব্যক্তি মৃতদেহকে চিতায় তুলে দেয়) নেতৃত্বে মৃতদেহকে শশ্মানে নিয়ে যাওয়া হয়। খারাপ আত্মার বাধা দূর করার জন্য মৃতদেহ নিয়ে যাবার সময় বীজ ও তুলা ছড়ানো হয়।[১৩২] পাশাপাশি জলা ও নদীর পাশে সাঁওতালদের নিজের জায়গাতেই কাঠের পিলারের চিতাতে শবদেহের মাথা দক্ষিণদিকে শুইয়ে দেওয়া হয়। এরপর ডাবিডাকা চিতার চারিদিকে তিনপাক ঘুরিয়ে চিতায় চাপিয়ে একটি মুরগীর ছানাকে মহুয়ার ডাল দিয়ে চোখ বিঁধিয়ে চিতার পিলারে ঝুলিয়ে দেয়। এই সংস্কার কার্যকে ডঃ ক্যাম্পবেল তাঁর *Santal To English Dictionary* গ্রন্থে 'বুলান' নামে আখ্যায়িত করেছেন।[১৩৩] এরপর মৃতের উত্তরাধিকারী তার কাপড়ের কিছু অংশ মহুয়া গাছের ডালে বেঁধে আগুন লাগিয়ে চিতায় আগুন দেয় এবং উপস্থিত সকলে একটু করে কাঠ চিতায় দেয়। পুরোপুরি ভস্মীভূত হবার আগে তার কিছু হাড় সংগ্রহ করে মাটির পাত্রে ভরে ও সকলে স্নান সেরে বাড়ি ফেরে। মৃত্যুর পাঁচদিন পর 'তেলনাহান' অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামের চৌরাস্তার মোড়ে কয়েকজন ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে সামান্য কিছু আচার অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে, তবে এর পূর্বে তাদের মাথার চুল, দাড়ি কামানো হয়। তারাবাড়ি ফিরে আসলে মারাংবুরু এবং লিটার উদ্দেশ্যে মুরগী ও হাঁড়িয়া নিবেদন করা হয়। এর সঙ্গে মৃত ব্যক্তির আত্মার উদ্দেশ্যেও হাড়িয়া উৎসর্গ করা হয়। চিতা থেকে নিয়ে আসা হাড়িগুলিকে জল দিয়ে পরিষ্কার করে হলুদ রঙের কাপড়ে জড়িয়ে নির্দিষ্ট বস্তায় ভরে তা দামোদর নদীতে নিক্ষেপ করা হয়।[১৩৪] এর পনেরো দিন পরে যে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান হয়, তার নাম 'ভাঁড়ান'।[১৩৫] শ্রাদ্ধের দিন সকালে গোবর জল দিয়ে ঘর বাড়ি পরিষ্কার করে বাড়ির মাঝখানে মহুয়া ডাল পোতা হয়, তারপর মুরগী, ছাগল, শুয়োর ও শেষে পায়রা কুড়ুল দ্বারা বলি দিয়ে পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়। এই সময় 'ভাঁড়ান' বিন্তি পাঠের সঙ্গে আত্মীয় স্বজনের জন্য খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা থাকে। এই সময় প্রচুর হাঁড়িয়া পানের ব্যবস্থা থাকে। এইভাবে সমগ্র পরিবারটি অশৌচ মুক্ত হয়।

সেঁকা বা পোড়া চিহ্ন

সাঁওতালদের আদিম মত অনুসারে সাঁওতাল পুরুষদের হাতে সেঁকা নেওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রথার প্রচলন রয়েছে। সাঁওতাল পুরুষরা যদি শরীরে সেঁকা বা পোড়া চিহ্ন না নেয়, তা হলে তারা পরজগতে শুঁয়োপোকার মত পোকা হয়ে (গাছের ছালের মত মোটা) জন্ম নেবে।[১৩৬] এই কারণেই ভয়ে সকল সাঁওতাল পুরুষরা পোড়া যন্ত্রণা সহ্য করে। সাধারণত বাম হাতে এই সেঁকা দেওয়া হয়, কেউ পাঁচটা বা সাতটা করে সেঁকা নেয়। চুরুট বা সিগারেটের মত করে কাপড়ের নল তৈরি করে তাতে আগুন ধরিয়ে সেঁকা দেবার স্থানে বসিয়ে সেঁকা দেওয়া হয়, যতক্ষণ কাপড় না পোড়ে ততক্ষণ তা রাখা হয় ও পরে পুড়ে গেলে ছাই চাপা হাতে বসিয়ে দেওয়া হয়। সেখানে ফোসকা পড়ে ঘা হয়ে যেত ও পরে সেই ঘা শুকিয়ে পোড়া চিহ্ন বা সেঁকা থেকে যায়। তারা এই ঘা শুকানোর জন্য সিলম নামক শৈবাল ব্যবহার করে।[১৩৭]

উলকি বা খোদা

মেয়েরাও ছেলেদের মত শুয়োপোকার হাত থেকে বাঁচার জন্য উলকি খোদাই করে তা বুকে ও হাতে নেয়। এই উলকির নির্দিষ্ট কোনো আকৃতি নেই, যা মূলত সৌন্দর্য বোধের সঙ্গে মিলিয়ে আঁকা হয়।[১৩৮] তবে কখনও হাতের মণিবন্ধের কাছেও উলকি টানা হয়, এক্ষেত্রে প্রথমে কাঠি দিয়ে ভুসার কালিতে দাগ দিয়ে চিহ্ন এঁকে দেওয়া হয় এবং পরে সূচ দিয়ে সেই দাগে দাগ ফুটিয়ে উলকি তৈরি করা এবং সেই জায়গায় হলুদ লাগিয়ে রাখা হয়। যারা এই উলকি তৈরি করে তারা খুদনি নামে পরিচিত।[১৩৯] এই উলকির বিষয়বস্তু হিসাবে সমাজের নানা বিষয়কে সাংকেতিক আকারে প্রকাশ করা হয়।

বিবাহ অনুষ্ঠান

যথার্থ বিবাহকালীন বয়সে গোত্র ও বর্ণ দেখে সাঁওতাল মেয়েদের বিয়ের ব্যবস্থা করা হয়। বিবাহযোগ্য পাত্র প্রথমে ঘটকের মাধ্যমে জগমাঝির বাড়িতে যায়, তারপর তাকে নিয়ে পাত্রীর বাড়িতে যাওয়া হয়। এই সময়ের অনুষ্ঠানটি 'সাগুন পাজা' নামে পরিচিত। বিজোড় সংখ্যক পাত্রপক্ষের পাত্রীর বাড়িতে আগমন শুভ লক্ষণ হিসেবে মানা হয়।

এছাড়া শুভ লক্ষণ হিসেবে জল ভর্তি কলস, পণ্য বোঝাই গরুর গাড়ি, বাঘ বা গরুর পায়ের ছাপ, কোকিল পাখির ডাক, গাভীর বাছুরকে স্তনদান, ডানদিক থেকে বাঁদিকে শেয়ালের প্রস্থান বিবেচিত হয়, অন্যদিকে শূন্য কলসি, মাথায় মোট বহন, সাপ বা আগুন, মৃত গবাদি পশু, গাছ বা ডাল কাটা ও জামা কাপড় পরিষ্কার করা লক্ষণকে অশুভ হিসেবে ধরা হয়। বিবাহের সময় অপদেবতার কুনজর থেকে রক্ষা পেতে পাত্র পাত্রীর বিবাহের পূর্বে আমগাছের সাথে বিবাহ দেওয়া হয়, ঝাড়খণ্ডে এই বিবাহ 'আমবিহা' নামে পরিচিত। 'সাগুন পাজার' পরে অর্থাৎ কন্যা নির্বাচন শেষ হলে খাওয়া-দাওয়ার পর্বকে 'জমঞ্চ' বলা হয়। পাত্রপক্ষরা ও কনের গ্রামের গণ্যমান্যরা কনের বাড়িতে এলে কনের বাড়ির লোকেরা তাদের অভ্যর্থনা জানায়, এই সংস্কারকে 'গড জহার' বলে। এরপর সকলকে খাবার খাওয়ানো ও হাঁড়িয়া দিয়ে সম্মান জানানো হয়। পরবর্তী সময়ে 'আতুমাঝির' নেতৃত্বে মৌডলী বা দেনাপাওনার কথা শুরু হয়।[১৪০] দেনাপাওনা ঠিক হলে বিয়ের দিন ধার্য করার পর উভয়পক্ষ জগমাঝির তত্ত্বাবধানে গ্রামবাসীদের হাঁড়িয়া খাইয়ে অভ্যর্থনার মাধ্যমে নিমন্ত্রণাদি সম্পন্ন করে।

সাঁওতাল সমাজে বাল্যবিবাহের প্রচলন নেই, এমনকি ১৮৫৫ সালের আগে পর্যন্ত ২৫ বছরের কম বয়সীদের বিবাহের কোনো নিদর্শন পাওয়া যায়নি।[১৪১] প্রকৃতির সন্তান হওয়ায় সাঁওতাল সমাজের ছেলে-মেয়েরা নিজেদের মধ্যে খোলামেলা মেলামেশা করে চলতে পারে। এ প্রসঙ্গে চারুলাল মুখার্জী উল্লেখ করেন—'With the abundant freedom in social intercourse such as these tribes enjoy, their marriages are generally love marriages'.[১৪২] আবারা এল.এস.এস.ও'ম্যালে তাঁর ডিস্ট্রিক গেজেটিয়ারে উল্লেখ করেন—'Sexual intercourse before marriage is tolerated expect between the members of the same sect'.[১৪৩] আর্য সমাজের মত সাঁওতাল সমাজেও বিয়ের এক-তিন-পাঁচদিন আগে গায়ে হলুদের অনুষ্ঠান হয়। আগে বরের বাড়িতে গায়ে হলুদ হবার পর কনের বাড়িতে হলুদ পাঠিয়ে দেওয়া হয়। গায়ে হলুদের অনুষ্ঠানে প্রথমে মাঝি হাড়াম, নায়কে, জগমাঝি ও গ্রামের অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিদের হলুদ দেওয়ার পর পাত্রের গায়ে হলুদ দেওয়া হয়। বর ও কনের গায়ে হলুদ মাখান গ্রামের দু-জন কুমারী মেয়ে, যারা 'তিততি কুড়ি' বলে পরিচিত। বিয়ের প্রাক-মুহূর্তে 'দাঃ বাপলা' বা 'জলবিবাহ' হয়, এরপর বরের পায়ের কনিষ্ঠ আঙ্গুল থেকে কান পর্যন্ত

একটি সুতো জড়িয়ে দেওয়া হয় যেটি পরে হাতে বেঁধে দেওয়া হয়, এই অনুষ্ঠান ‘সুতীম তল’ নামে পরিচিত। এরপর পাত্র-পাত্রী উভয়ের বাড়িতে হয় ‘কান্ডাদাঃ’ অনুষ্ঠান, এতে উভয়ের বাড়িতে গর্ত করে তার উপর জোয়াল রেখে তরবারী বা খাড়ায় জল ঢালা হয় যেটি পাত্র এবং পাত্রীর গায়ে এসে পড়ে। এরপরই হয় ‘আমবিহা’, এরপর পাত্র-পাত্রীর মা উভয়কেই গুড় ভাত খাইয়ে দেয় যা ‘গুড়দাকা’ অনুষ্ঠান নামে পরিচিত। এসবের পর মাঝির থানে প্রণাম করার পর বিয়ের পথে অগ্রসর হতে হয়। বরযাত্রী কন্যার বাড়িতে পৌঁছলে অভ্যর্থনা হিসেবে বর ও হবুশালা কোলাকুলি করে, যা ‘শারদীড়হি’ অনুষ্ঠান নামে পরিচিত। এই সময় উভয় উভয়কে পান খাওয়ায় ও বর হবুশালাকে হলুদ টুপি পরিয়ে দেয়। এরপর বিবাহ আসরে বর ও কনেকে মুখোমুখি দাঁড় করানো হয় এবং তারা একে অপরকে আমশাখা দিয়ে জল ছিটিয়ে দেয় ও বর শালপাতায় রাখা সিঁদুর কনের সিঁথিতে তিনবার লাগিয়ে দেওয়ার পর বিয়ে শেষ হয়। বিয়ের চতুর্থ দিনে বর শ্বশুরবাড়ি এলে অনুষ্ঠিত হয় ‘চীডিকুটাম’ উৎসব, ঐ দিন স্বামী-স্ত্রী প্রথম সহবাস করে। আর্য সংস্কৃতিতে যেমন আট প্রকার বিবাহ অনুষ্ঠান রয়েছে, তেমনি সাঁওতাল সমাজেও কয়েক প্রকার বিবাহ রয়েছে। যেমন—

১) টুঙকি দিপিল বাপলা : এক্ষেত্রে দরিদ্র পরিবারের কন্যাকে বাঁশ বা বেতের ঝুড়িতে করে বরের বাড়ি নিয়ে আসা হয়।

২) অর আদের বাপলা : কন্যার পছন্দ না থাকলে বর কন্যাকে জোর করে নিজের বাড়িতে নিয়ে এসে বিয়ে করে।

৩) ঞির বল বাপলা : এটি অর আদের বাপলা এর উলটো পদ্ধতি।

৪) ইতুৎ সিঁদুর বাপলা : কোনো ছেলে মেয়ের সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে দিলে তার স্ত্রী হয়ে যায় এবং এক্ষেত্রে মেয়ে রাজি না থাকলে সিঁদুর দান ছাড়াই ‘সাঙ্গা বিয়ে’ হয় নয়তো ‘ছাডুই মেয়ে’ হয়ে সমাজে থাকতে হয়।

৫) কিরিঞ জাঁওয়ায় বাপলা : কোনো কুমারী মেয়ে গর্ভবতী হলে এবং দোষী ব্যক্তির নাম প্রকাশ না পেলে বর কিনে বিবাহ সম্পন্ন হয়।

৬) সাঙ্গা: বিধবা বা স্বামী পরিত্যক্তার বিয়েকে সাঙ্গা বলে এবং এক্ষেত্রে সিঁদুর দান হয় না।

৭) চৌউডাল বাপলা : এই বিয়ে হল সমাজ অস্বীকৃত বিয়ে, এতে পাত্র-পাত্রী নিজেদের ইচ্ছামত স্বামী-স্ত্রীর মত বসবাস করতে থাকে এবং বিয়ের পর ছেলে বাবা মায়ের থেকে আলাদাভাবে বসবাস করে।[১৪৪]

দেওয়াল চিত্র ও আলপনা

সাঁওতাল সমাজে আলপনার বহুল ব্যবহার লক্ষণীয়। সাধারণত চাল বেটে উৎসবের দিনে, সংক্রান্তির দিনে, বাদনা পরবের সময় এই আলপনা দেওয়া হয়। বিয়ের সময় ও অন্যান্য যে কোনো উৎসবেই গৃহাভিমুখী পায়ের ছাপের আলপনাই বেশি আঁকা হয় এবং আলপনার কাজ সাধারণত মেয়েরাই করে। পাতা ও গাছের ছাল থেকে রঙ তৈরি করে এবং বাজার থেকে রঙ কিনে এসব আলপনা দেওয়া হয়। অপদেবতার ভয়ে বাড়ির জানালাগুলি সংকীর্ণ হওয়ায় বাড়ির দেওয়ালগুলি বড় বড় হয়, সেখানে লতা, পাতা, ফুল, পশু, পাখির আলপনা করা হয়। আবার আলপনার পাশাপাশি সাঁওতালরা বাড়ির দেওয়ালে নানান চিত্র অঙ্কন করে, যা তাদের শিল্প সত্তার বিশেষ পরিচয় বহন করে। এই দেওয়াল চিত্রে পরিবেশের নানান বিষয়কে সাংকেতিক আকারে প্রকাশ করা হয় এবং দেওয়াল চিত্রে চিত্রিত বিষয়বস্তুর উপর নির্ভর করে সেই বাড়ির মানুষজনদের বৈশিষ্ট্যকে প্রতিফলিত করা হয়। বিশেষত গুরুত্বপূর্ণ পরবের পাক মুহূর্তে সাঁওতাল গ্রামে এই দেওয়াল চিত্র বেশি দেখা যায়।[১৪৫]

আনন্দ বিনোদন

নাচ :- নৃত্য সাঁওতাল জনজীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত এবং প্রকৃতির রূপকে আপন খেয়ালের ছন্দে তাদের নাচে প্রতিফলিত হয়। পাকদান, ডাহর এবং লাউড়িয়া ছাড়া বেশিরভাগ নাচে নারী পুরুষ একসাথে নাচে। উৎসব অনুষ্ঠান ছাড়াও সারাদিনের কাজ শেষে তারা রাত্রিবেলায় নাচ পরিবেশন করে থাকে। এই সমাজে যেসব নাচ লক্ষ করা যায়, সেগুলি হল— লাগড়ে (সাধারণত নাচ), দং (বিয়ের নাচ), ডাহার (বড় এক ধরনের নাচ), সহরায় (কৃষিকাজের সাথে যুক্ত নাচ), বাহা (ফুল উৎসবের নাচ), ভুঙ্গাঁর

(শিকারের সময় পুরুষদের নাচ), এছাড়াও রয়েছে লাতয়, হুমতি, ঝিকা, রিনজা ও গুলাউরি প্রভৃতি। গান ব্যতিরেকে যেসব নাচ হয় যেমন পাকদান, ডম এবং লাউড়িয়া প্রভৃতি।[১৪৬] এইসব নাচ মূলত দলবদ্ধভাবে পরিবেশন করা হয়, যা সাঁওতালদের গোষ্ঠীবদ্ধতার বিশেষ পরিচিতিকে বহন করে।

গান :- নাচের মত গান হল সাঁওতাল সমাজের অন্যতম অঙ্গ। পড়ন্ত বেলার আলো আধাঁরিতে সাঁওতাল মেয়েরা মিহি গলায় গান করে প্রকৃতির সুরে নিজেদের মিলিয়ে দেয়। সারাদিনের ক্লান্তি দূর করার জন্যই তারা রাত্রিতে নাচ গান করে থাকে।[১৪৭] গানের সময় চওড়া করতাল, ধামসা, মাদল, হারমোনিয়ামও ব্যবহৃত হয়। সাঁওতালি ভাষায় গানকে বলা হয় 'সেরেঞ' এবং সাঁওতালি গানগুলিকে সাধারণত দু-ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—'দঙ সেরেঞ' বা বিবাহ বিষয়ক গান এবং অন্যান্য গান। বিবাহ সম্বন্ধীয় গানগুলি হল—ছামড়া সেরেঞ, এগের সেরেঞ, গুডাদাঃ সেরেঞ, সিন্দুর দান সেরেঞ, কান্ডাদাঃ সেরেঞ প্রভৃতি; এছাড়া অন্যান্য গানগুলি হল—কারাম সেরেঞ, ডান্টা সেরেঞ, পাতা সেরেঞ ও সহরায় সেরেঞ।

শিকার :- সাঁওতাল জনজীবনে শিকারের গুরুত্ব অপরিসীম। আদিম সময়ে শিকার চার-পাঁচদিন ধরে চলত, এই শিকারের নেতৃত্বে থাকেন দিহরি নামক পদাধিকারী। একটি বৃহত্তর এলাকা জুড়ে একজন দিহরি থাকেন এবং তিনিই শিকারের ক্ষেত্র, দিন-ক্ষণ ও শাল পাতার দ্বারা গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে শিকারের বার্তা প্রেরণ করেন। দিহরি শিকারের দিন ধার্য করলে ঐ দিন সকলে সমতল ভূমিতে একত্রিত হয়ে নিজেদের নিরাপদে বাড়ি ফেরার মঙ্গল প্রার্থনা জানিয়ে মুরগী ও রক্ত মাখা আতপচাল দেবতা ও বনদেবীর উদ্দেশ্যে অর্পণ করে শিকারে যাত্রা শুরু করে। ঢাক, ঢোল, নাগরা ও শাকোয়া সহযোগে শিকার যাত্রায় প্রথম দিনে সকলে একত্রিত হয়ে মৌলির লাড্ডু খায়, এরপর ভাত তরকারি খায় এবং সারাদিন চলে নাচ গানের আসর ও দিহরির বিচার সভা। শিকার যাত্রার পূর্বে শিকারিদের মিলিত হওয়ার স্থান 'দুপডুপটৌন্ডি' এবং শিকার শেষে মিলিত হওয়ার স্থান 'গিপিতিটৌন্ডি' নামে পরিচিত। শিকারের সময় কেউ একা শিকার করলে সে গর্দান পায় আর বাকি মাংস গ্রামের লোকেদের মধ্যে ভাগ হয়ে যায়। দুজনে শিকার করলে যার তীরে পশু মারা যায় সে গর্দান পায় আর যার তীরে পশুটি আঘাত পায়

সেও মাংসের ভাগ পায়। সাঁওতাল সমাজের রীতি অনুযায়ী শিকার করার সময় তারা অন্য গ্রামের উপর দিয়ে গেলে সেখানকার মহিলারা তাদের পা ধুইয়ে দেয়। শিকার শেষে দ্বিতীয় দিনে তারা গ্রামে প্রত্যাবর্তন করে।[১৪৮]

ধর্মবিশ্বাস ও দেবদেবী :- সাঁওতালি ভাষায় দেবদেবী বোঙ্গা নামে পরিচিত। তাদের পুরাণ অনুযায়ী পৃথিবীতে অনেক বোঙ্গা আছে, যার মধ্যে বেশির ভাগ শয়তান ও ক্ষতিকারক। তাই শয়তানের উদ্দেশ্যে বলি দিয়ে তারা তাদের তুষ্ট রাখে। তারা মনে করেন ঠাকুরজীউ শুধু ভাল, তিনি বৃষ্টি দেন, ফসল ফলান, তিনি ভাল তাই কিছু উৎসর্গ করতে হয় না। তারা মনে করে স্বর্গ ও নরক রূপী 'হারানপুরী'র অস্তিত্ব রয়েছে।[১৪৯] তাদের ধারণা অনুযায়ী নরকে রয়েছে ইচকুণ্ড বা নরক কুণ্ড। সাঁওতালদের ধর্ম চর্চা ও পূজা পাঠের নাম বোঙ্গাবুরু, বোঙ্গা অর্থে দেবতা ও বুরু অর্থে পর্বত। দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন মারাংবুরু, যার অর্থ সবচেয়ে উচুঁ পর্বত। তারা মনেকরে সকল দেবতারা পর্বতে বাস করে। তাদের মতে প্রতিটি বোঙ্গাই বা দেবতাই হল তাদের জন্য ভগবান প্রেরিত গডেত বা দূত। সাঁওতাল ধর্মবিশ্বাস অনুসারে সিংবোঙ্গা হল সূর্যদেবতা; যিনি বৃষ্টি আনেন, কল্যাণ করেন, অন্ধকার দূরীভূত করেন। সাঁওতালদের ধারণা অনুসারে সূর্য পুরুষ, চন্দ্র তার স্ত্রী এবং তারারা তাদের সন্তান-সন্ততি। জমির উর্বরতা ও ফসল ফলানোর দেবীমাতৃকা হলেন জাহের এড়াঃ। প্রতিটি গ্রামে মাঝির বাড়ির কাছে শালগাছের তলায় মাটির উচু বেদী করা জাহের এড়াঃ থান রয়েছে আর এই শাল গাছের পাশে মহুয়া গাছের তলায় গোঁসাই-এর থান। সাঁওতাল সমাজে মূর্তি পূজার প্রচলন নেই। গৃহদেবতা ও গোপন দেবতা ছাড়া সাঁওতাল সমাজের প্রতিটি দেবতাই প্রকৃতিতে বিরাজমান। নায়কে বিভিন্ন দেবতার গোত্র অনুযায়ী মুরগী, ভেড়া, মোষ ও ছাগল উৎসর্গের দ্বারা পূজা সম্পূর্ণ করেন। কুড়াম নায়কে অপদেবতাদের সন্তুষ্টি করতে নিজের রক্ত উৎসর্গ করেন। ওঝারা নিজেদের শ্রীবৃদ্ধির জন্য 'সিংবাহনী', 'কামরু-গুরু', 'সিধাগুরু', 'গান্ডো-গুরু', 'বুয়াং-গুরু' প্রভৃতি দেবতার পূজা করেন। সাঁওতাল ঐতিহ্য অনুসারে ধরম হল পার্থিব শৃঙ্খলা, সততা ও পবিত্রতার প্রতীক এবং এর ভিত্তিতে সাঁওতাল সমাজে কতকগুলি ধরম রয়েছে, যেমন—সারি, সারনা, বাহা, জাহের ও সাধু ধরম।[১৫০] সাঁওতাল ধর্মবিশ্বাসে আরও যেসব দেবতাবর্গ রয়েছে তারা হলেন—'মাঁড়েকো তুরুইকো' (ইনি গ্রাম সংসদের দেবতা), পরগণা বোঙ্গা (ইনি ডাইনিদের দেবতা), মাঝি

বোঙ্গা (মাঝির আত্মা), সীমা বোঙ্গা (সীমানার দেবতা), এছাড়াও রয়েছে বীর বোঙ্গা প্রভৃতি।

উৎসব অনুষ্ঠান:- সাঁওতাল সমাজে সারা বছর ধরে বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠিত হয় এবং যার মধ্যে বেশীরভাগই কৃষিভিত্তিক উৎসব। এই সকল উৎসবগুলির মধ্যে প্রধান উৎসব হল সহরায়। বর্তমানে শীতকালে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হলেও আগে আশ্বিন মাসে ফসল সংগ্রহ করার সময় এই অনুষ্ঠান পালিত হত। এই অনুষ্ঠানের সময় হাঁড়িয়া প্রস্তুত করে আত্মীয় স্বজনদের খাওয়ানো হয়। এই সময় নায়কে তার স্ত্রীর কাছে না ঘুমিয়ে মাদুর পেতে মাটিতে ঘুমায়। গড়েত মুরগি জোগাড় করে দেবতার কাছে তা উৎসর্গ করার পর সুরমা পোলাও রান্না করে সবাই উৎসাহ ভরে খায়। এরপর গরুকে স্নান করিয়ে তার শিঙে তেল মাখিয়ে মাথায় সিঁদুর লাগিয়ে দেওয়া হয়। গরুর আশীর্বাদ পাওয়ার জন্য যুবক-যুবতীরা রাত্রে গোয়াল ঘরে ঘুরেঘুরে গান বাজনা করে। সকালে ছেলেরা গাই নিয়ে মাঠে যায় ও মাঝির উঠানে ডান্টা নাচ করে। এই অনুষ্ঠানের সময় প্রত্যেক বাড়িতে মুরগী ও শূকরের মাংস দিয়ে বোঙ্গা পূজা করা হয়। অশৌচ মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত এই অনুষ্ঠান স্থগিত রাখা হয়। এই সব অনুষ্ঠানের সম্পর্কে এস.এস.এস.ও'ম্যালে তাঁর ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে বলেন—'This time onwards the people must cease to eat according to their heart's desire and hard life recommenced giving themselves upto dancing, eating, drinking, singing and sexual license'.[১৫১] পৌষ সংক্রান্তির দিন শাকরাত অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। এই উৎসবের আগের দিন পুরুষরা মাছ ধরে নিয়ে আসে আর মেয়েরা কেক পিঠে তৈরি করে তাদের পূর্বপুরুষদের উৎসর্গ করে। এরপরেই জগমাঝি তীরধনুকের 'চানমারির' জোগার করে। তারপর গ্রামের মোড়ে এড়ণ্ড গাছ পুঁতে তীর নিশানার অনুষ্ঠান হয় এবং চানমারির খুঁটি কেটে জগমাঝি তার বাড়ি নিয়ে আসে, একে 'মাঝি ডুন্ডে' বলে। এই সময় সকলে হাঁড়িয়া পান করে যুদ্ধ নাচ ও অন্যান্য নাচ করে। এই মাঘ মাসে তারা খড় কাটবার নাম করে মুরগী ও মদ দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে, যা 'মাঘ মুরগী' অনুষ্ঠান নামে পরিচিত। বছরের প্রথম উৎসব হল এরোছিম বা বাইন পরব, মাঘাসীম হল বছর শেষের উৎসব। আষাঢ় মাসে বাইন উৎসবের মধ্যদিয়ে বীজ রোপন শুরু হয় এবং মুরগী ও গরুর দুধ গ্রাম দেবতাকে উৎসর্গ করা হয়। বৃষ্টির সঠিক জোগান ও পোকার হাত থেকে যাতে ফসল

নষ্ট না হয়, তার জন্য ‘হরিয়ীড় সিম’ উৎসব আর ভাল বৃষ্টিরজন্য ‘লাগড়ে উৎসব’ অনুষ্ঠিত হয়। ভাদ্র মাসে নতুন ইড়ি ও গুনদলি ফল দিয়ে দেবতাদের পূজানুষ্ঠান করা হয়, যা ‘ইড়ি গুনদলি’ নামে পরিচিত। আশ্বিন মাসে হয় দাশাঁয় পরব, এই পরবের মূল আকর্ষণ হল নাচ। এই সময় গৃহস্থের বাড়ি বাড়ি নৃত্য প্রদর্শন করা হয়। অগ্রহায়ণ মাসে শুয়োর ও ভেড়া বলি দেওয়া জাহের সম্বন্ধীয় পরগণায় ‘জানখড়ি বলি’ নামে পরিচিত এবং এই অনুষ্ঠানে নতুন চাল দিয়ে সুরুয়া ও লগা রান্না করা হয়। সাঁওতালদের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ও ধর্ম বিষয়ক অতি পবিত্র উৎসব হল ‘বাহা’। ফাল্গুন মাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশী তিথি থেকে বাহা পরবের সূচনা হয়। পবিত্র ‘সারি সারঞ্জাম’ এর উদ্দেশ্যে শাল গাছে পূর্ব পুরুষের সত্য সন্ধানের পবিত্র বাণীর উৎসব পালন করা হয়। পূজার দিনে যুবকরা শালগাছ কেটে জাহের থানের পাশে শালগাছ দিয়ে চালাঘর বানায় তারপর আলপনা দিয়ে প্রথম দিনে ‘স্নান ও দ্বিতীয় দিনে অর্ঘ্য প্রদান করে।[১৫২]

অপরাধ ও দণ্ড ব্যবস্থা :- সাঁওতাল সমাজ তিনটি স্তর কাঠামোর দ্বারা পরিচালিত হয়। প্রথম স্তর গ্রামপ্রধানের বৈঠক বা পঞ্চায়েতি, দ্বিতীয় স্তর পরগণা বৈঠক এবং তৃতীয় স্তর সর্বোচ্চ শিকার বৈঠক। গ্রামপ্রধানের বৈঠকে গ্রাম প্রধান ও পাঁচজন সহকারী পরগণা বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। পরগণার প্রধান আর তাকে সাহায্য করেন পরগণার অধীনস্থ মাঝি এবং প্রতিবেশী পাঁচজন ব্যক্তি। শিকার বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন দিহরি বা শিকারের তত্ত্বাবধায়ক, যেখানে বিভিন্ন গ্রামের জনগণ, পরগণার প্রধান ও মাঝিরা উপস্থিত থাকে। সর্বস্তরীয় বিচারের শেষ বিচার হিসাবে শিকার আবেদন করা হয়। নরবলী, অপহরণ, অসতর্কিত খুন, অন্যের স্ত্রীকে নিয়ে পালানো, যুবতীকে জোর করে সিঁদুর দান, ধর্ষণ ইত্যাদি অপরাধের শাস্তি মৃত্যদণ্ড। পরের স্ত্রীকে নিয়ে পালানোর জন্য অপরাধীকে বন্য পশুর মত বধ করা হয়। যুবতীর সিঁথিতে জোর করে সিঁদুর পরালে অপরাধীর ডান হাত কেটে নেওয়া হত এবং টাকু নামক অস্ত্রের সাহায্যে অপরাধীর এক চোখ তুলে নেওয়া হয়।[১৫৩]

চিকিৎসা পদ্ধতি :- প্রকৃতির সন্তানরূপে সাঁওতাল জনজীবনের বনভূমির গুরুত্ব অপরিসীম। বনভূমি থেকেই সাঁওতালরা তাদের জীবনধারনের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যেমন—কাঠ, মধু, মোম, খাদ্য ও ঔষধি লাভ করে। এই প্রসঙ্গে স্যার উইলিয়াম হান্টার

মন্তব্য করেছেন—‘The Jungle indeed, is their unfailing friend’[১৫৪] সাঁওতালরা প্রকৃতির ভারসাম্যকে বজায় রেখে তাদের জীবনধারা পরিচালনা করে তাই ঔষধির ক্ষেত্রেও তারা পুরোপুরি প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। সাঁওতালদের ধারণা অনুযায়ী মানুষের শরীর হল ‘কল গাড়ি’ (kol Gadi) অর্থাৎ ইঞ্জিন চালিত পরিবহন, যা পরিচালিত হয় ‘শিরস’-এর দ্বারা, এখানে শিরস মানে শরীরের বিভিন্ন যন্ত্রাংশ। এইভাবে যন্ত্রাংশের বিচারে সাঁওতালদের যৌক্তিক চিন্তাধারা আছে এবং তারা শরীরের অসুস্থতাকে কখনোই ভগবান কর্তৃক প্রভাব ভাবে না, তারা যুক্তি সহকারে বিষয়টি পর্যালোচনা করে। বিভিন্ন রোগ জীবাণু সম্পর্কে তাদের যথার্থ ধারণা রয়েছে, যাকে তারা তেজো ‘Tejo’ বলে; তেজো বলতে কীটানু ও জীবাণুকে বোঝায় এবং তারা সমস্ত রোগের কারণ হিসেবে এই জীবানুকে দায়ী করে। তবে মহামারীর ক্ষেত্রে তারা ডাইনি প্রথাকে দায়ী করে, যা আসে ‘কুগুলী পুখ্রী’ এর গর্ত থেকে এবং এই ক্ষেত্রে তারা ওঝা প্রথায় বিশ্বাসী। সাঁওতালরা রোগের চিকিৎসার জন্য সাধারণত ওঝা বা গুনীনের স্মরণাপন্ন হয়, তবে প্রথমেই তারা রোগীকে ওঝার কাছে নিয়ে যায় না। প্রথমে রোগ দেখা দিলে তারা ঘরোয়া টোটকা অর্থাৎ গাছ-গাছড়ার মূল, পাতা, ফল, ফুল, বিভিন্ন ধরনের ঘাস ইত্যাদি ব্যবহার করে, আর লক্ষ্য করে এর দ্বারা কেমন কাজ হচ্ছে। যদি ভালো কাজ না হয়, তখন তারা ওঝার কাছে রোগীকে নিয়ে যায়। ওঝারা সম্মোহনী বিদ্যার দ্বারা রোগের চিকিৎসা করে, ঝাড়ফুঁক করে। কিন্তু এরপরও রোগ না সারলে তারা জান বা গুনীনের কাছে রোগীকে নিয়ে যায়। অর্থাৎ তাদের রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা পদ্ধতি ছিল প্রাচীনপন্থী। অন্যান্য জনজাতির মতো সাঁওতালরা আজও অনেক ক্ষেত্রে তাদের ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসা ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল। তারা মনে করে প্রকৃতির মধ্যেই সমস্ত ধরণের রোগ সারানোর প্রয়োজনীয় বনৌষধি আছে। সাঁওতালদের ভেষজ সম্পর্কিত এই জ্ঞানের কোনো লিখিত তথ্য না থাকলেও শ্রুতির আকারে বংশ পরম্পরায় চলে আসছে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে। অধ্যাপক শুচিব্রত সেন মনে করেন, সাঁওতালদের এই ঔষধিবিদ্যা আয়ুর্বেদিক বা অন্যান্য লোক চিকিৎসা পদ্ধতির প্রভাব ছাড়ায় সময়ের সাথে সাথে ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করেছে।[১৫৫] তবে এক্ষেত্রে সাঁওতালদের দারুণভাবে সাহায্য করে তাদের ‘এথনো-বোটানি’ (Ethno-Botany) সম্পর্কিত জ্ঞান। এথনো-বোটানি বলতে বোঝায় একটি অঞ্চলের স্থানীয় মানুষজনের

দ্বারা প্রথাগত জ্ঞানের মাধ্যমে ওই অঞ্চলের উদ্ভিদ ও তাদের ব্যবহারিক প্রয়োগ বিষয়ে চর্চা। সাঁওতালরা যেভাবে ভেষজ ঔষধ তৈরি করে তা একটি শিল্প বলা যেতে পারে। সাঁওতাল সমাজের ঔষধের বিভিন্ন ভাগগুলি হল—শিরা, পাউডার, মিশ্রণ, উদ্ভিদ তেল, সতেজ জুস, মালিশের জন্য বাম ইত্যাদি।[১৫৬] আবার ঔষধ সংগ্রহ করার একটি নির্দিষ্ট নিয়ম থাকে। শুধু গাছ-গাছাড়ি দিয়েই নয় অনেক সময় বিভিন্ন প্রাকৃতিক বস্তুকে রোগ নিরাময়ের কাজে ব্যবহার করে। এ বিষয়ে কর্ণেল ওয়ার্ডেন বলেন, সাঁওতালরা উষ্ণপ্রস্রবনের জল ব্যবহার করত চুলকানি, ক্ষত ও অন্যান্য চামড়ার রোগ নিরাময়ের কাজে।[১৫৭]

উপরিউক্ত সাঁওতাল জনজাতির প্রাসঙ্গিকতায় যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি উঠে আসে সেটি হল এক সামগ্রিক কৌম সমাজের বিভিন্ন ধারা। যদিও একথা বলা যায় যে "Culture or civilization taken in its wide ethnographic sense, is that complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society".[১৫৮] তাহলে দেখা যায় যে এর সবকটি বৈশিষ্ট্যই সাঁওতাল সমাজে বিদ্যমান ছিল। Knowledge বা জ্ঞান বলতে শুধু পুঁথিগত বিদ্যায় বোঝায় না, প্লেটো যাকে বলেছেন 'knowledge is virtue'.[১৫৯] আর এই virtue বা মূল্যবোধ এই জনজাতিকে পুঁথিগত বিদ্যা থেকে আহরণ করতে হয়নি, এছিল তাদের ঐতিহ্যজাত। ইতিহাসেরও যে একটি নান্দনিক বোধ থাকে সে কথা আমরা জেনেছি মার্ক ব্লখের *The Historians Craft* বই থেকে। সৌন্দর্যের উপলব্ধি মানুষের জন্মগত। আর সেই সৌন্দর্য বোধই প্রায়োগিক দিক থেকে সাঁওতাল জনজাতি প্রতিফলিত করেছে তাদের সংগীত, নৃত্য ও বিভিন্ন দেওয়াল পটচিত্রে ও চিত্রের অলংকরণে।

<u>তথ্যসূত্র :</u>

১. Sen, Suchibrata, *The Santals of Jungle Mahals Through the Ages*, Ashadeep Publication, Kolkata, 2013, p.43.

২. O'Malley, L.S.S., *Bengal District Gazetteers: Santal Parganas*, The Bengal Secretariat Book Depot, Calcutta, First Published 1910, Reprint Logos Press, New Delhi, 1984. p.96.

৩. Risley, H.H, *The Tribes and Castes of Bengal*, Vol-II, The Bengal Secretariat Press, Calcutta, 1891, p.224.

৪. উদ্ধৃত : মিশ্র, শিবেন্দু শেখর, *সাঁওতাল সমাজ, সংস্কৃতি ও সংগ্রাম,* লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, ২০১৭, পৃ. ৫।

৫. মিশ্র, শিবেন্দু শেখর, *সাঁওতাল সমাজ, সংস্কৃতি ও সংগ্রাম,* লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, ২০১৭,পৃ.৫।

৬. তদেব, পৃ. ৭।

৭. Hembram, P.C., 'Santhal Worldview: Mixing of Pleasure and Pain', in Nita Mathur (ed.), *Santhal Worldview,* Concept Publishing Company, New Delhi, 2001, p.128.

৮. মিশ্র, শিবেন্দু শেখর, *সাঁওতাল সমাজ, সংস্কৃতি ও সংগ্রাম,* লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, ২০১৭, পৃ. ২৭।

৯. Bodding, P.O., *Traditions and Institutions of the Santals*, Gyan Publishing House, New Delhi, First Published 1942, Reprint 2016, p.3.

১০. মিশ্র, শিবেন্দু শেখর, *সাঁওতাল সমাজ সংস্কৃতি ও সংগ্রাম,* লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, ২০১৭, পৃ. ২৭।

১১. Bodding, P.O., *Traditions and Institutions of the Santals*, Gyan Publishing House, New Delhi, First Published 1942, Reprint 2016, p.4.

১২. Maghi, C.P., 'Santal Language and Culture', *in* Nita Mathur (ed.), *Santhal worldview*, Concept Publishing Company, New Delhi, 2001, p.93.

১৩. O' Malley, L.S.S., *Bengal District Gazetteers: Santal Parganas*, The Bengal Secretariat Book Depot, Calcutta, First Published 1910, Reprint Logos Press, New Delhi, 1984. p.118.

১৪. ভৌমিক, সুরেন্দ্র মোহন, *সাঁওতালী কথা,* রাণীশ্রী প্রেস, কলকাতা, ১৯৫৫, পৃ. ৭।

১৫. তদেব, পৃ. ৮।

১৬. Roy, S.C, *The Mundas and Their Country*, Gyan Publishing House, New Delhi, First Published 1912, Reprint 2017, pp.18-19.

১৭. Dalton, E.T., *Descriptive Ethnology of Bengal*, Office of the Superintendent Govt. Print, Calcutta, First Published 1872, Reprint 1960, pp.206-07.

১৮. Peal, S.E, 'On some Traces of Kol-Mon-Aham: The Eastern Naga Hills', *in Royal Asiatic Society's Journal, Bengal*, Vol- LXV, p.20.

১৯. Risley, H.H., *The Tribes and Castes of Bengal*, Vol-II, The Bengal Secretariat Press, Calcutta, 1819, p.46.

২০. Man, E.G., *Sonthalia and the Sonthals*, Geo Wyman and Co., Calcatta, 1867, p.12.

২১. Guha, B.R., *Racial Elements in Population*, Oxford University Press, Delhi, 1944, pp.39-41.

২২. Bodding, P.O., 'Mangolian Race marks among the Santals', in *Journal of Asiatic Society of Bengal*, Calcutta, 1904, part- III, p.26.

২৩. Bodding, P.O., '*Mangolian Race marks among the Santals'*, in Journal of Asiatic Society of Bengal, Calcutta, 1904, part- III, p.17.

২৪. O' Malley, L.S.S., *Bengal District Gazetteers: Santal Parganas*, The Bengal Secretariat Book Depot, Calcutta, First Published 1910, Reprint Logos Press, New Delhi, 1984, p. 23.

২৫. Banerjee, A., 'The Pre-Historic Tools of Santal Parganas', in P.C. Roychoudhury's Bihar District Gazetteer : Santal Parganas, The Superintendent Secretariat Press, Bihar, Patna, 1965, p.991.

২৬. Ibid, p.993.

২৭. Ibid, p.997.

২৮. O' Malley, L.S.S., *Bengal District Gazetteers: Santal Parganas*, The Bengal Secretariat Book Depot, Calcutta, First Published 1910, Reprint Logos Press, New Delhi, 1984. p.24.

২৯. রায়, নীহাররঞ্জন, *বাঙালীর ইতিহাস আদিপর্ব,* দে'জ পাবলিকেশন, কলকাতা, ১৯৫১, পৃ. ১০০।

৩০. Alexander Cunningham, *The Ancient Geography of India*, Turner and Co., London, 1871, p.508.

৩১. রায়, নীহাররঞ্জন, বাঙালীর ইতিহাস আদিপর্ব, দে'জ পাবলিকেশন, কলকাতা, ১৯৫১, পৃ. ৯৯।

৩২. Sarkar, Dineshchandra, *Journal of Ancient Indian History*, Dept of Ancient Indian History and Culture, University of Calcutta, Vol.1-2, 1971-73, p.45.

৩৩. Sinha, C.P.N., *Sectional Presidential Address (Ancient India) Proceedings*, IHC; 55th Session , 1948, p.19.

৩৪. O' Malley, L.S.S., *Bengal District Gazetteers: Santal Parganas*, The Bengal Secretariat Book Depot, Calcutta, First Published 1910, Reprint Logos Press, New Delhi, 1984. p.25.

৩৫. Stewart, C., *History of Bengal*, Black Parry and Co., London, 1813, pp. 77-78.

৩৬. Ibid, pp.118-131.

৩৭. রায়, শশীভূষণ, 'সাঁওতাল পরগণা-অতীত ও বর্তমান', উল্লেখিত *সাঁওতাল বিদ্রোহ: সমাজ ও জীবন,* কমল চৌধুরী, (সম্পাদনা), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ২৫।

৩৮. Roy Choudhury, P.C., *Bihar District Gazetteer : Santal Parganas,* The Superintendent Secretariat Press, Bihar, Patna, 1965, pp.54-55.

৩৯. Crawford, D.G., 'The legend of Gabriel Boughton', Indian Medical Gazetteer, 1909, p.6, collected copy in https://pdfs.semanticscholar.org/0aa9/ac4f5b592c7eddfc531a2ebec10f42ec3560.pdf

৪০. Stewart, C., *History of Bengal,* Black Parry and CO., London, 1813, pp.180-181.

৪১. Dutta, K.K, *Alivardi and His Times*, University of Calcutta, 1939, p.9.

৪২. Hill, S.C., *Bengal in 1756-57*, Vol-I, Published for the Government of India, London, 1905, pp. 111-210.

৪৩. Dutta, K.K., *Selection From the Judicial Records of the Bhagalpur District office 1792-1805*, State Central Record Office Political Department, Bihar, Patna, 1968, p.8.

৪৪. Dutta. K.K., *The Comprehensive History of Bihar,* Vol-III, Part-I, Kashi Prasad Jayaswal Research Institute, Bihar, Patna, 1976, p.153.

৪৫. Mcpherson, H., *Final Report on the Survey and Settlement Operation in the District of Santal Parganas*, The Bengal Secretariat Book Depot, Calcutta, 1909, p.26.

৪৬. O' Malley, L.S.S., *Bengal District Gazetteers: Santal Parganas*, The Bengal Secretariat Book Depot, Calcutta, First Published 1910, Reprint Logos Press, New Delhi, 1984. p.36.

৪৭. Dutta, K.K., *The Comprehensive History of Bihar*, Vol.III, Part-I, Kashi Prasad Jayaswal Research Institute, Bihar, Patna, 1976, p.156.

৪৮. Brawne, James, *India Tracts,* Logographic Press, Bhagalpur, 1788, p. 56.

৪৯. Dutta, K.K., *The Comprehensive History of Bihar*, Vol. III, Part-I, Kashi Prasad Jayaswal Research Institute, Bihar, Patna, 1976, p.153.

৫০. Brawne, James, *India Tracts*, Logographic Press, Bhagalpur, 1788, pp.62-68.

৫১. Captain Sherwill, 'Note on a Tour through the Rajmahal Hills', in *Asiatic Society of Bengal,* Calcutta, 1851, p.62.

৫২. Dutta, K.K., *The Comprehensive History of Bihar,* Vol.III, Part-I, Kashi Prasad Jayaswal Research Institute, Bihar, Patna, 1976, p.159.

৫৩. Ibid, p.159.

৫৪. Roy choudhury, P.C., *Bihar District Gazetteer : Santal Parganas,* The Superintendent Secretariat Press, Bihar, Patna, 1965, p.67.

৫৫. Ibid, p.71.

৫৬. Ibid, p.73.

৫৭. Dutta, K.K., *The Comprehensive History of Bihar*, Vol.III, Part-I, Kashi Prasad Jayaswal Research Institute, Bihar, Patna, 1976, p.178.

৫৮. টুডু, বুদ্ধেশ্বর, *সাঁওতাল স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস,* জ্ঞানপীঠ পাবলিকেশন, কলকাতা, ২০১৫, পৃ. ২১।

৫৯. Hunter, W.W., *The Annals of Rural Bengal*, Smith, Elder, and Co., London, 1868, p.161.

৬০. বাস্কে, ধীরেন্দ্রনাথ, *সাঁওতাল গণসংগ্রামের ইতিহাস,* বাস্কে পাবলিকেশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৭৬, ষষ্ঠ সংস্করণ ২০০৩, পৃ. ২২।

৬১. O' Malley, L.S.S., *Bengal District Gazetteers: Santal Parganas*, The Bengal Secretariat Book Depot, Calcutta, First Published 1910, Reprint Logos Press, New Delhi, 1984. p.56.

৬২. Hunter, W.W., *The Annals of Rural Bengal*, Smith, Elder & Co., London, First Published in 1868, Reprint West Bengal District Gazeetters, Government of West Bengal, Calcutta, 1996, p.371.

৬৩. Datta, K.K., *The Santal Insurrection of 1855-57,* Firma KLM Private Limited, Calcutta, Frist Edition 1940, Second Edition 2001, p.8.

৬৪. O' Malley, L.S.S., *Bengal District Gazetteers: Santal Parganas*, The Bengal Secretariat Book Depot, Calcutta, First Published 1910, Reprint Logos Press, New Delhi, 1984. p.47.

৬৫. Ibid.p.54.

৬৬. Datta, K.K., *The Santal Insurrection of 1855-57*, Firma KLM Private Limited, Calcutta, Frist Edition 1940, Second Edition 2001, p.54.

৬৭. O' Malley, L.S.S., *Bengal District Gazetteers: Santal Parganas*, The Bengal Secretariat Book Depot, Calcutta, First Published 1910, Reprint Logos Press, New Delhi, 1984. p.1.

৬৮. Mcpherson, H., *Final Report on the Survey and Settlement operation in the District of Santal Parganas*, The Bengal Secretariat Book Depot, Calcutta, 1909, p.26.

৬৯. Ball, V., Geology of the Rajmahal Hills, Memoir of the Geo-logical Survey of India, 13(2), 1877, pp.13-15.

৭০. O' Malley, L.S.S., *Bengal District Gazetteers: Santal Parganas*, The Bengal Secretariat Book Depot, Calcutta, First Published 1910, Reprint Logos Press, New Delhi, 1984. p.11.

৭১. Ibid, p.11.

৭২. রায়, শশীভুষণ, 'সাঁওতাল পরগণা অতীত ও বর্তমান', উল্লেখিত *সাঁওতাল বিদ্রোহ: সমাজ ও জীবন,* চৌধুরী, কমল, (সম্পা), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ৮৪।

৭৩. তদেব, পৃ. ৮৪ ।

৭৪. Man, E.G., *Sonthalia and the Sonthals*, Geo.wyman and Co., Calcutta, 1867, p.35.

৭৫. Ibid, p.36.

৭৬. Ibid, p.36.

৭৭. Ibid, p.37.

৭৮. O’ Malley, L.S.S., *Bengal District Gazetteers: Santal Parganas*, The Bengal Secretariat Book Depot, Calcutta, First Published 1910, Reprint Logos Press, New Delhi, 1984. pp.95-96.

৭৯. Ibid, p.97.

৮০. Bradley-Birt, F.B., *The Story of an Indian Upland*, Smith, Elder, and Co., London, 1905, p.133.

৮১. Buchanan, Francis, *An Account of the District of Bhagalpur in 1810-11,* The Patna Law Press, Bihar, Patna, 1939, p.264.

৮২. Sutherland, H.C., *Report on the Management of the Rajmahal Hills,* Dated 8 june, 1819, Deputy Commissioner’s Record Room, Dumka, 1819.

৮৩. Mukherjee, Charulal, *The Santals*, Gyan Poblishing House, New Delhi, First Published in 1962, Reprint 2017, p.41.

৮৪. Oldham, W.B., *Some Historical and Ethnical Aspects of the Burdwan district*, Bengal Secretariat press, Calcutta, 1984, p.xxii.

৮৫. O’ Malley, L.S.S., *Bengal District Gazetteers: Santal Parganas*, The Bengal Secretariat Book Depot, Calcutta, First Published 1910, Reprint Logos Press, New Delhi, 1984. p.63.

৮৬. Ibid, p.64.

৮৭. Mukherjee, Charulal, *The Santals*, Gyan Poblishing House, New Delhi, First Published in 1962, Reprint 2017, p.110.

৮৮. ভৌমিক, সুরেন্দ্র মোহন, *সাঁওতালী কথা,* রাণীশ্রী প্রেস, কলকাতা, ১৯৫৫, পৃ. ১০-১১।

৮৯. Risley, H.H., *The Tribes and Castes of Bengal*, Vol.II., The Bengal Secretariat Press, Calcutta, 1819, p.125.

৯০. মিশ্র, শিবেন্দু শেখর, *সাঁওতাল: সমাজ সংস্কৃতি ও সংগ্রাম,* লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার,কলকাতা, ২০১৭, পৃ. ৩২।

৯১. তদেব, পৃ. ৩৭।

৯২. O' Malley, L.S.S., *Bengal District Gazetteers: Santal Parganas,* The Bengal Secretariat Book Depot, Calcutta, First Published 1910, Reprint Logos Press, New Delhi, 1984. p.107.

৯৩. Ibid, p.107.

৯৪. Ibid, p.108.

৯৫. Ibid, p.110.

৯৬. Ibid, p.110.

৯৭. ভৌমিক, সুরেন্দ্র মোহন, *সাঁওতালী কথা,* রাণীশ্রী প্রেস, কলকাতা, ১৯৫৫, পৃ.১১৪।

৯৮. মিশ্র, শিবেন্দু শেখর, *সাঁওতাল: সমাজ সংস্কৃতি ও সংগ্রাম,* লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, ২০১৭,পৃ. 44।

৯৯. সরেন, লক্ষণ, 'সাঁওতাল সমাজ তত্ত্ব', *আদিবাসী জগৎ পত্রিকা,* শারদীয়া সংখ্যা, ২০০১,পৃ. ৩৫।

১০০. Sen, Suchibrata, *The Santals of Jungle Mahals Through the Ages,* Ashadeep publication, Kolkata, 2013, p.56.

১০১. ভৌমিক, সুরেন্দ্র মোহন, *সাঁওতালী কথা,* রাণীশ্রী প্রেস, কলকাতা, ১৯৫৫, পৃ. ১০-১১৫।

১০২. O’ Malley, L.S.S., *Bengal District Gazetteers: Santal Parganas*, The Bengal Secretariat Book Depot, Calcutta, First Published 1910, Reprint Logos Press, New Delhi, 1984. p.111.

১০৩. মিশ্র, শিবেন্দু শেখর, *সাঁওতাল সমাজ সংস্কৃতি ও সংগ্রাম,* লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, ২০১৭, পৃ. ৪৬।

১০৪. O’ Malley, L.S.S., *Bengal District Gazetteers: Santal Parganas*, The Bengal Secretariat Book Depot, Calcutta, First Published 1910, Reprint Logos Press, New Delhi, 1984. p.108.

১০৫. Poffenberger, Mark, ‘The struggle for Forest Control In Jungle Mahals of West Bengal 1750-1990’, in Mark Poffenberger and Betsy McGean, (eds.), *Village Voices, Forest Choices*, Oxford University Press 1996, Oxford India Paperbacks 1998, Delhi, p.134.

১০৬. রায়, শরৎচন্দ্র, *ভারতবর্ষের মানব ও মানব সমাজ,* দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৩৮, পৃ. ৪৫।

১০৭. তদেব, পৃ. ৪৬।

১০৮. O’ Malley, L.S.S., *Bengal District Gazetteers: Santal Parganas*, The Bengal Secretariat Book Depot, Calcutta, First Published 1910, Reprint Logos Press, New Delhi, 1984. p.111.

১০৯. Sherwill, Captain, ‘Notes Upon a tour through the Rajmahal Hills’, *Journal of the Asiatic Society of Bengal,* Calcutta, 1851, pp.1-7.

১১০. O’ Malley, L.S.S., *Bengal District Gazetteers: Santal Parganas*, The Bengal Secretariat Book Depot, Calcutta, First Published 1910, Reprint Logos Press, New Delhi, 1984. p.103.

১১১. Ibid, p.201.

১১২. Man, E.G, *Sonthalia and the Sonthals*, Geo Wyman and Co., Calcutta, 1867, p.72.

১১৩. Campbell, A., *Santali to English Dictionary*, The Santal Mission press, pokhuria, Manbhum, 1899, p.234.

১১৪. Mukherjee, Charulal, *The Santals*, Gyan Poblishing House, New Delhi, First Published in 1962, Reprint, 2017, p.71.

১১৫. Ibid, p.83.

১১৬. Campbell, A., *Santali to English Dictionary*, The Santal Mission press, pokhuria, Manbhum, 1899, p.43.

১১৭. Sen, Suchibrata, *The Santals of Jungle Mahals Through the Ages*, Ashadeep publication, Kolkata, 2013, p.58.

১১৮. Mukherjee, Charulal, *The Santals*, Gyan Poblishing House, New Delhi, First Published in 1962, Reprint, 2017, p.86.

১১৯. Ibid, p.87.

১২০. Ibid, p.66.

১২১. মিশ্র, শিবেন্দু শেখর, *সাঁওতাল সমাজ সংস্কৃতি ও সংগ্রাম,* লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, ২০১৭, পৃ. ৪৯।

১২২. Mukherjee, Charulal, *The Santals*, Gyan Poblishing House, New Delhi, First Published in 1962, Reprint, 2017, p.187.

১২৩. O’ Malley, L.S.S., *Bengal District Gazetteers: Santal Parganas*, The Bengal Secretariat Book Depot, Calcutta, First Published 1910, Reprint Logos Press, New Delhi, 1984. p.130.

১২৪. Ibid, p.131.

১২৫. ভৌমিক, সুরেন্দ্র মোহন, *সাঁওতালী কথা,* রাণীশ্রী প্রেস, কলকাতা, ১৯৫৫, পৃ. ১০-২০।

১২৬. O’ Malley, L.S.S., *Bengal District Gazetteers: Santal Parganas*, The Bengal Secretariat Book Depot, Calcutta, First Published 1910, Reprint Logos Press, New Delhi, 1984. p.132.

১২৭. ভৌমিক, সুরেন্দ্র মোহন, *সাঁওতালী কথা,* রাণীশ্রী প্রেস, কলকাতা, ১৯৫৫, পৃ. ১০।

১২৮. O’ Malley, L.S.S., *Bengal District Gazetteers: Santal Parganas*, The Bengal Secretariat Book Depot, Calcutta, First Published 1910, Reprint Logos Press, New Delhi, 1984. p.132.

১২৯. Ibid, p.142.

১৩০. ভৌমিক, সুরেন্দ্র মোহন, *সাঁওতালী কথা,* রাণীশ্রী প্রেস, কলকাতা, ১৯৫৫, পৃ. ১১।

১৩১. Mukherjee, Charulal, *The Santals*, Gyan Poblishing House, New Delhi, First Published in 1962, Reprint, 2017, p.221.

১৩২. Ibid, p.222.

১৩৩. Ibid, p.227.

১৩৪. মিশ্র, শিবেন্দু শেখর, *সাঁওতাল সমাজ সংস্কৃতি ও সংগ্রাম,* লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, ২০১৭,পৃ. ৭০।

১৩৫. Bodding, P.O., *Traditions and Institutions of the Santals,* Gyan Publishing house, New Delhi, First Published 1942, Reprint 2016, p.28.

১৩৬. Mukherjee, Charulal, *The Santals*, Gyan Poblishing House, New Delhi, First Published in 1962, Reprint 2017, p.191.

১৩৭. Bodding, P.O., *Traditions and Institutions of the Santals*, Gyan Publishing house, New Delhi, First Published 1942, Reprint 2016, p.28.

১৩৮. Mukherjee, Charulal, *The Santals*, Gyan Poblishing House, New Delhi, First Published in 1962, Reprint, 2017, p.193.

১৩৯. মিশ্র, শিবেন্দু শেখর, *সাঁওতাল সমাজ সংস্কৃতি ও সংগ্রাম,* লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, ২০১৭,পৃ. ৫৮।

১৪০. O' Malley, L.S.S., *Bengal District Gazetteers: Santal Parganas*, The Bengal Secretariat Book Depot, Calcutta, First Published 1910, Reprint Logos Press, New Delhi, 1984. p.133.

১৪১. Mukherjee, Charulal, *The Santals*, Gyan Poblishing House, New Delhi, First Published in 1962, Reprint, 2017, p.196.

১৪২. O' Malley, L.S.S., *Bengal District Gazetteers: Santal Parganas*, The Bengal Secretariat Book Depot, Calcutta, First Published 1910, Reprint Logos Press, New Delhi, 1984. p.134.

১৪৩. মিশ্র, শিবেন্দু শেখর, *সাঁওতাল: সমাজ সংস্কৃতি ও সংগ্রাম,* লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, ২০১৭,পৃ. ৬৩।

১৪৪. তদেব, পৃ. ৬৪।

১৪৫. O' Malley, L.S.S., *Bengal District Gazetteers: Santal Parganas*, The Bengal Secretariat Book Depot, Calcutta, First Published 1910, Reprint Logos Press, New Delhi, 1984, p.105.

১৪৬. মিশ্র, শিবেন্দু শেখর, *সাঁওতাল সমাজ সংস্কৃতি ও সংগ্রাম,* লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, ২০১৭, পৃ. ১০৭।

১৪৭. তদেব, পৃ. ৯১।

১৪৮. O' Malley, L.S.S., *Bengal District Gazetteers: Santal Parganas*, The Bengal Secretariat Book Depot, Calcutta, First Published 1910, Reprint Logos Press, New Delhi, 1984, p.120.

১৪৯. ভৌমিক, সুরেন্দ্র মোহন, *সাঁওতালী কথা,* রাণীশ্রী প্রেস, কলকাতা, ১৯৫৫, পৃ. ১৮।

১৫০. O' Malley, L.S.S., *Bengal District Gazetteers: Santal Parganas*, The Bengal Secretariat Book Depot, Calcutta, First Published 1910, Reprint Logos Press, New Delhi, 1984, p.129.

১৫১. মিশ্র, শিবেন্দু শেখর, *সাঁওতাল: সমাজ সংস্কৃতি ও সংগ্রাম,* লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, ২০১৭, পৃ. ৭৬।

১৫২. ভৌমিক, সুরেন্দ্র মোহন, *সাঁওতালী কথা,* রাণীশ্রী প্রেস, কলকাতা, ১৯৫৫, পৃ. ১৯।

১৫৩. Hunter, W.W., *Annals of Rural Bengal*, Smith, Elder & Co., London, First Published in 1868, Reprint West Bengal District Gazeetters, Government of West Bengal, Calcutta, 1996, p.146.

১৫৪. Bodding, P.O., *Traditions and Institutions of the Santals*, Gyan Publishing House, New Delhi, First Published 1942, Reprint 2016, p.31.

১৫৫. Sen, Suchibrata, *The Santals of Jungle Mahals Through the Ages*, Ashadeep publication, Kolkata, 2013, p.131.

১৫৬. D.C. Pal and S.S.K. Jain, Tribal Medicine, Naya Prakash, Culcutta, 1998, pp.18-21.

১৫৭. O’ Malley, L.S.S., *Bengal District Gazetteers: Santal Parganas*, The Bengal Secretariat Book Depot, Calcutta, First Published 1910, Reprint Logos Press, New Delhi, 1984. p.11.

১৫৮. John Monaghan and Peter Just, *Social cultural Anthropology : A very short Introduction*, Oxford University Press, New York, 2000, p.35.

১৫৯. Justin Clark, *Virtue as Knowledge and Unity in Early Plato* in https://www.alexandria.ucsb.edu/lib/ark:/48907/f3mw2f48#:~:text=Description%3A,and%20piety)%20form%20a%20unity

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রশাসনিক ব্যবস্থা, মিশনারি ও হিন্দু সংস্কৃতির প্রভাব

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রশাসনিক ব্যবস্থা, মিশনারি ও হিন্দু সংস্কৃতির প্রভাব

ঔপনিবেশিক ও উত্তর ঔপনিবেশিক সময় পর্বের যে তিনটি কাঠামো আদিবাসী সমাজের ভাঙনের সূচনা করেছিল সেগুলি হল প্রশাসনিক ব্যবস্থা, খ্রিস্টান মিশনারিদের প্রভাব ও হিন্দু ধর্মের আত্তীকরণ প্রচেষ্টা। ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির সূচনা কাল থেকেই ঔপনিবেশিক শক্তি দ্বিবিধ উপায়ে বিভিন্ন আদিবাসী বিদ্রোহ দমনে সচেষ্ট ছিল। এর একটি হল দমনমূলক আর অন্যটি হল সমঝোতামূলক নীতি। অষ্টাদশ শতাব্দীর সত্তরের দশকে ভাগলপুর অঞ্চলে যে পাহাড়িয়া বিদ্রোহ সংঘটিত হয় সেখানে লক্ষ্য করা যায় যে, একদিকে ওয়ারেন হেষ্টিংসের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ক্যাপ্টেন ব্রুক তাদের বিরুদ্ধে সৈন্য বাহিনীর প্রয়োগ ঘটান। অন্যদিকে তেমনি ক্যাপ্টেন ব্রাউন ও অগাস্টাস ক্লিভল্যান্ড পাহাড়িয়াদের ক্ষেত্রে অনুসরণ করেন সমঝোতা নীতি। ক্লিভল্যান্ডের মতে, 'To make friends therefore with the hill chiefs is with all due submission, an object worthy the attention of government'.[১] এই অনুমতি পাওয়ার পর পাহাড়িয়া সর্দারদের বশীভূত করা হয়। এই নীতির ধারাবাহিকতা পরবর্তী পর্যায়গুলিতে অল্প বিস্তর বজায় ছিল। কিন্তু আদিবাসী বা সাঁওতালদের ক্ষেত্রে মূল আঘাত কোনটি? প্রসঙ্গত সুরেন্দ্র ঝা (Surendra Jha) দেখিয়েছেন, 'The basic social fabric which underwent a revenge was the village community'.[২] যদিও এই গ্রাম সমাজ কেন্দ্রিক তাত্ত্বিক বিতর্ক অদ্যপি বর্তমান, তথাপি সাঁওতাল গ্রাম সমাজের ক্রমিক অবনমন এক ঐতিহাসিক সত্য। সাঁওতাল গ্রাম সমাজের উপর দ্বিতীয় আঘাত আসে মিশনারিদের কার্যকলাপ ও আদিবাসীদের ধর্মান্তকরণের মধ্য দিয়ে। বস্তুতপক্ষে সাঁওতালরা যেহেতু হিন্দু বা মুসলমান কোনো ধর্মেরই অঙ্গীভূত নয়, সেহেতু মিশনারিদের ধারনা ছিল যে এদের ধর্মান্তরিত করলে খুব বেশি প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হবে না। মিশনারিদের সম্পর্কে S. Mahato উল্লেখ করেছেন—

"The missionaries had exerted considerable influence among the illiterate and poor tribals. The missions have done secular and temporal services in order to improve their lot. There is no doubt that they have been

instrumental in bringing about the changing land systems in the 19th century chotanagpur. It was in favour of the tribals-both christian and non-christian with the difference that Christian tribals took the benefit and the non-christians did not"[৩].

১৮৫৫-৫৬ খ্রিস্টাব্দে সাঁওতাল বিদ্রোহের পর ব্যাপকভাবে তাদের ধর্মান্তরিত করা হয়। সন্দেহ নেই মিশনারিরা বিভিন্ন সেবামূলক কাজ ও শিক্ষা বিস্তারের দ্বারা সাঁওতালদের অনেক উপকার করেছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে একথা মনে রাখা দরকার যে, খ্রিস্টান ও অ-খ্রিস্টানদের মধ্যে এক বিভাজন রেখা তৈরি হয়, যা সাঁওতালদের গোষ্ঠী স্বাতন্ত্র্যতা ও সাংস্কৃতিক সংহতিতে আঘাত হেনেছিল। কিন্তু ঐতিহ্যের আকর্ষণ একেবারেই শেষ হয়ে যায়নি, যার ফলে খ্রিষ্টান সাঁওতালদের মধ্যে তৈরি হয় এক দ্বৈত মানসিকতা বা Dichonomy. প্রদীপ চট্টোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন, '...The santhal valued their communal integrity above everything else in the world. Anything that was threatening to this communal integrity was beyond their torerance. Christianity was often conceived as one such disintegrating force, which, for the average Santhal was unacceptable'[৪]. ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলন এক সময় পশ্চিমী ভাবাদর্শের থেকে হিন্দু ঐতিহ্যের দিকে তাকিয়ে ছিল। বঙ্কিম, বিবেকানন্দ, দয়ানন্দ সরস্বতী রচনা করেছিলেন এই ভাবাদর্শ, যার থেকে উদ্ভব হয় চরমপন্থী রাজনীতি। সাঁওতাল বা আদিবাসীরা এই মতাদর্শগত রাজনীতি না বুঝলেও তাদের রাজনৈতিক চেতনায় ঘটে এক পরিবর্তন। খেরওয়াড় বা সাপাহড় আন্দোলনের উদ্ভব এই ভাবেই। খ্রিষ্টান পরিষেবা যেমন তাদের শিক্ষিত করে তুলেছিল, হিন্দু মতাদর্শ তেমনি তাদের পরিবর্তিত রাজনৈতিক পন্থায় উৎসাহিত করে তোলে। সাঁওতাল পরগণার সাঁওতালদের প্রভাবাচ্ছন্ন সংস্কার মুখ আন্দোলন যথা, খেরওয়াড়, সাপাহড় প্রভৃতি পর্যবসিত হয় রাজনৈতিক চেতনায়। নবেন্দু দত্ত মজুমদারের কথায়, 'This change in the character of Santal reaction is marked by a shift in the emphasis from the socio-religious of the political aspect, together with an increasing reliance on the forces inherent in their own community and culture, rather than on the adoption of alien socio-religious practices'[৫]. ঝাড়খন্ড আন্দোলনের মতাদর্শগত পটভূমি এরই মাধ্যমে রূপায়িত হয়।

প্রশাসনিক ব্যবস্থা

আদিবাসীদের সমাজ-সংস্কৃতির অবক্ষয়ের মূলে অন্যতম কারণ ছিল ঔপনিবেশিক ও উত্তর ঔপনিবেশিক সময়ের প্রশাসনিক কার্যপ্রণালী। প্রাচীন ও মধ্যযুগে শাসকবর্গের সঙ্গে আদিবাসীদের একটি দ্বান্দ্বিক রূপ থাকলেও আদিবাসীদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে কাঠামোগত কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। কিন্তু ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে ঔপনিবেশিক সরকার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের মাধ্যমে সমগ্র ভারতবর্ষে যে ধরনের প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তুলেছিল, তাতে ভারতবর্ষের অন্যান্য সম্প্রদায়ের পাশাপাশি সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল আদিবাসী তথা জনজাতি গোষ্ঠীগুলো। এ প্রসঙ্গে সংযুক্তা দাসগুপ্ত উল্লেখ করেন যে—'Tribal communities, moreover, have been considered to be isolated and static, whose traditional society and economy collapsed under the pressure of new economic and political forces unleashed under colonial rule'.[৬] ব্রিটিশদের কেন্দ্রীভূত শাসন ব্যবস্থায় আদিবাসীদের ঐতিহ্য স্বরূপ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, পঞ্চায়েত, মণ্ডলী ব্যবস্থার মতো স্বাধীন প্রতিষ্ঠানগুলি ধ্বংসের মুখোমুখি হয়। মূলত ব্রিটিশদের কর সংগ্রহের পদ্ধতি, পুলিশি ব্যবস্থা, বিচার পদ্ধতি আদিবাসীদের কাঠামোগত পরিবর্তনে মূখ্য ভূমিকা পালন করে। এর সঙ্গে আবগারি নীতি, ভূমি আইন, জঙ্গল আইনের দ্বারা আদিবাসীদের সমাজ-সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িত বিষয়গুলোকে বিচ্ছিন্ন করা হয়। এ প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র রায় মন্তব্য করেন *যে*—"ব্রিটিশ পদ্ধতির আইন ও শাসন জনজাতীয় সংহতিকে আরও বিনষ্ট করেছে এবং তাদের পূর্ব প্রতিষ্ঠিত 'পঞ্চের' অর্থাৎ নিজস্ব সামাজিক কর্তৃত্বকে খর্ব করে দিয়েছে। পূর্বে সম্পত্তির উত্তরাধিকার ইত্যাদি বিষয়ে জনজাতীয় সামাজিক প্রথাগুলিকে স্বীকার করে নিয়ে গভর্নমেন্ট যে সব নির্দেশ দিতেন আদালত আবার সেগুলিকে অস্বীকার করত। দৃষ্টান্ত-পিতৃসম্পত্তিতে মেয়ের অধিকার। এই জনজাতীয় প্রথাকে অস্বীকার করে আদালত ব্রিটিশ ভারতীয় প্রথা অনুসারে দায়াধিকার আইনের বলে মামলা বিচার করত, যেটা জনজাতিদের সামাজিক জীবনের মৌলিক ব্যবস্থা ও আত্মীয়তা নীতির বিরোধী।"[৭] অন্যদিকে স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে আদিবাসীদের স্বতন্ত্র রাখার প্রশ্নে ঔপনিবেশিক শাসক এবং স্বাধীন ভারতের শাসকের দৃষ্টিভঙ্গিতে তেমন কোনো পার্থক্য দেখা যায়নি। ঔপনিবেশিক সরকারের পৃথকীকরণ এবং স্বাধীনতার

পরবর্তী সরকারের আত্তীকরণ নীতি কার্যকরী করতে যে সমস্ত নীতি নির্ধারণ করা হয়, তার কোনোটাতেই আদিবাসী গ্রামীণ সংগঠন ব্যবস্থাকে যুক্ত করতে পারেনি। স্বাধীন ভারতের প্রভুত্বকামী ও সুরক্ষামূলক যে আদিবাসী নীতি রয়েছে তা আসলে ঔপনিবেশিক সরকারের গৃহীত নীতির প্রলম্বিত রূপ।

ভারতবর্ষে আদিবাসী গোষ্ঠীদের মধ্যে প্রথম রাজমহলের পাহাড়িয়া গোষ্ঠী ব্রিটিশ শাসনের আওতায় আসে। ১৮২৪-৩৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তৎকালীন ভাগলপুরের কমিশনার মি.ওয়ার্ড ১,৩৫৬ বর্গমাইল বিস্তৃত কৃষি জমি পিলার দিয়ে ঘিরে তৈরি করেন 'দামিন-ই-কোহ'। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল রাজমহল, পাকুড়, গোড্ডা এবং দুমকার বেশ কিছু অংশ। ১৮৫৫-৫৬ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহের পর এই এলাকাটি 'সাঁওতাল পরগণা' নামে পরিচিত হয়। আর এই সাঁওতাল পরগণার আদি বাসিন্দা ছিল পাহাড়িয়া নামে জনজাতি। ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন বড়লার্ট ওয়ারেন হেস্টিংস বর্বর পাহাড়িয়াদের দমন করতে ৮০০ সৈন্যের দল পাঠান, আর তখন থেকেই এই এলাকায় ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে এই এলাকায় ব্রিটিশ নীতির প্রবর্তক হিসাবে অগাস্টাস ক্লিভল্যান্ড ছিলেন অন্যতম। তাঁর প্রচেষ্টায় ১৭৮২ সালে এই এলাকা সাধারণ আদালতের অধিকার থেকে বিচ্ছিন্ন হয় এবং পাহাড়িয়া সর্দারদের নিয়ে 'পাহাড়িয়া পরিষদ' গড়ে ওঠে। এই পরিষদের নিয়মগুলি ১৭৯৬ সালে আইনে পরিণত হয় এবং ১৭৯৬ সালের ১নং রেগুলেশন (Regulation 1 of 1796) নামে পরিচিত হয়। ১৭৯৬ সাল থেকে ১৮২৭ সাল পর্যন্ত এই এলাকাটি এইভাবে বিশেষ শাসন ব্যবস্থায় শাসিত হয়। ইংরেজরা রাজস্ব লাভের আশায় এই অঞ্চলের পাহাড়িয়াদের উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিল। আর এদের জন্যই রাজমহল পাহাড়ের পাদদেশে এক বিরাট খাস জমি তৈরি করা হয়। কিন্তু পাহাড়িয়ারা ঝুম চাষ ব্যতীত অন্য কিছু জানত না এবং জঙ্গল কেটে পতিত জমি উদ্ধারে তাদের কোনো উৎসাহ ছিল না। আর ঠিক সেই সময়ে বহিরাগত হিসাবে আগত সাঁওতালরাই একমাত্র বিকল্প হয়ে উঠল। প্রথম দিকে চাষবাসের জন্য সাঁওতালদের কোনো রাজস্ব দিতে না হলেও পরবর্তীকালে চাষবাসের শ্রীবৃদ্ধি ঘটলে এই এলাকাটিও জমিদারী শোষণের শিকার হয়। যার ফলস্বরূপ ১৮৫৫ সালে সাঁওতাল বিদ্রোহ সংগঠিত হয় এবং পরবর্তীতে 'সাঁওতাল পরগণা' নামে সাঁওতালরা আলাদা ভূখণ্ড লাভ করলেও তাদের স্বাতন্ত্র্যতা ফিরে আসেনি। বরং

প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে আরো কঠোরভাবে প্রয়োগ করে সাঁওতালদের স্বাধীন প্রতিষ্ঠানগুলিকে ধ্বংস করা হয়।[৮]

ঔপনিবেশিক যুগের পূর্বে আদিবাসীদের জীবন ধারা ছিল গোষ্ঠীবদ্ধ, স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং ভারতের অন্যান্য অঞ্চল থেকে বিচ্ছিন্ন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন দেশের অভ্যন্তরে ক্রমপ্রসারের সঙ্গে সঙ্গে শত শত বছরের স্বতন্ত্র আদিম গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনে আঘাত নিয়ে আসে। ব্রিটিশদের প্রবর্তিত মুদ্রা ভিত্তিক অর্থনীতি ও তার সহযোগী জমিদার-মহাজনী শোষণের চাপে আদিবাসীদের পণ্য বিনিময় সূচক স্বয়ংসম্পূর্ণ সমাজ জীবন চূড়ান্ত ভাঙনের মুখে এসে দাঁড়ায়। কাজেই শত শত বছরের স্বতন্ত্র এই সমাজ মূল জীবনধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মুক্তির পথ খোঁজে বিদ্রোহের মাধ্যমে। জমির অধিকার, জঙ্গলের অধিকার, ফসলের অধিকার ফিরে পাওয়ার স্বপ্ন তারা দেখতে থাকে। আর সাঁওতাল বিদ্রোহ ছিল সেই সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের পুনরুদ্ধারের বিদ্রোহ। সমাজ-সংস্কৃতিকে রক্ষার তাগিদেই যে এই বিদ্রোহ সংগঠিত হয়েছিল তা সাঁওতাল বিদ্রোহের গানে আমরা দেখতে পাই—

“নেরা নিয়া, নিরু নিয়া,
ডিঁড়া নিয়া ভিটা নিয়া,
হায়রে হায়রে! মাপাঃক্ গপচ্ দ,
নুরিচ্ নাঁড়াড় গাই-কাড়া, নাচেল লৌগিৎ পাচেল লৌগিৎ,
সেদায় লেকা বেতাবেতেৎ এ্রাম রুওয়ৌড় লৌগিৎ
তবে দে বোন হুল গেয়া হো”।[৯]

অর্থাৎ,

“স্ত্রী-পুত্রের জন্য,
জায়গা বাস্তু-ভিটার জন্য,
হায়! হায়! এ মারামারি, এ কাটাকাটি
গো-মহিষ লাঙ্গল ধন-সম্পত্তির জন্য,
পূর্বের মত আবার ফিরে পাবার জন্য
আমরা বিদ্রোহ করব।”

১৮৫৫-৫৬ এর সাঁওতাল বিদ্রোহ তার স্বাতন্ত্র্যতা, পরিসরের ব্যাপ্তি ও নেতৃত্বের চেতনার অভিব্যক্তিতে এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। সেই সঙ্গে বিদ্রোহের চরিত্রে সাঁওতালদের যে সাংস্কৃতিক মর্যাদাবোধ, সেটি তাকে পৃথক করেছে অন্যান্য অভ্যুত্থানগুলির থেকে। এই বিদ্রোহে অর্থনৈতিক কারণ ছাড়াও সাংস্কৃতিক মর্যাদাবোধের প্রশ্ন সাঁওতালদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। কারণ সাঁওতাল সংস্কৃতির সত্তাও এক ভিন্ন সংস্কৃতির পরিসরের মাধ্যমে ঋদ্ধ হয়ে উঠেছিল তাদের স্বাধীন চেতনা। এক দিকে হিন্দু দিকুদের অবজ্ঞা, অন্যদিকে ব্রিটিশ রাজস্ব নীতির নাগপাশ। আর সেখান থেকে পরিত্রাণের উপায় হিসাবে সাঁওতালরা বিদ্রোহে নামে। এ প্রসঙ্গে *বেঙ্গল ডিসট্রিক্ট গেজেটিয়ার ফর সান্তাল পরগণায়* বলা হয়—"সাঁওতাল বিদ্রোহের পশ্চাতে ছিল জমির একচ্ছত্র অধিকার প্রতিষ্ঠার আকাঙ্খা এবং তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল স্বাধীন সাঁওতালদের স্বাধীনতা স্পৃহা, যার ফলে তারা ধ্বনি তুলেছিল : তাদের নিজ নিজ দলপতির অধীন সাঁওতাল রাজ্য চাই।"[১০] একদিকে জমি হারিয়ে যখন সাঁওতাল গ্রামীণ সংগঠনগুলি বিপর্যস্ত, সেই সঙ্গে যুক্ত হয় 'কামিয়তি' নামের দাস প্রথা। যখন সাঁওতালদের ঠকিয়ে বিপুল পরিমাণ জমি মহাজনেরা বে-আইনিভাবে দখল করে, তখন সেই জমি চাষ করার জন্য দরকার হয় শ্রমিকের। আর এই কাজে সেই এলাকায় সাঁওতালদের কোনো বিকল্প ছিল না। কাজেই ঋণের বদলে জমি বন্ধক নয়, ব্যক্তি সাঁওতালই এসে গেল বন্ধকের আওতায়। আর সেইখান থেকে সূত্রপাত হয় কামিয়তি নামের দাস প্রথার, যা ছিল সাঁওতালদের ঐতিহ্য বিরোধী। ডঃ ওলাভ্ হোডনে কামিয়তি প্রথার বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন—"At the time of borrowing they had to sign a bond. These bonds were of two kinds : the borrower had to serve either as a Kamioti bondsman or as a Harwati. Gradually, then he became the serf of the moneylenders or landholders. A kamioti bondsman bound himself and his heirs to serve the lender until the money was repaid with interest. He generally lived in the house of the landholder or moneylender and worked as his domestic servant. A Harwati bondsman in similar way bound himself by being a kind of outdoor labourer working for the lender whenever his service was required".[১১] এই ধরনের ব্যবস্থায় জমিদার-মহাজনেরা ব্রিটিশদের থানা-পুলিশ ও আইনের সক্রিয় সমর্থন লাভ করত। আবার এই প্রথার সঙ্গে মহাজনেরা আর একটি কৌশল প্রয়োগ করে। অনেক সময় সাঁওতালদের হাল, বলদ, গোরু ইত্যাদি চাষের

উপকরণসমূহ বাজেয়াপ্ত করে নিত। যার ফলস্বরূপ যে সামান্য জমিটুকু অবশিষ্ট ছিল, তাও আর চাষ করা সম্ভব হয়ে উঠত না। এ প্রসঙ্গে দুমকার তৎকালীন ডেপুটি কমিশনার অ্যান্টনি ইডেন তাঁর একটি রিপোর্টে উল্লেখ করেন – 'This system of illegl cattle lifting was the cause of the late insurrection'.[১২]

অন্যদিকে দুমকা অঞ্চলে রেললাইন পাতার কাজ শুরু হলে প্রচুর শ্রমিকের দরকার পড়ে। আর এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে মহাজনের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কিছু সাঁওতাল নগদ মজুরির বিনিময়ে কাজে যোগ দেয়। কিন্তু সেখানেও ইউরোপীয় সাহেবরা তাদের নানা ভাবে ঠকাতে লাগলো। তার চেয়েও যা মারাত্মক তা হল, সাঁওতাল নারীদের ইজ্জত নষ্ট হতে লাগলো। সন্ত্রাসের বিষয়ে বিনয়ভূষণ চৌধুরী উল্লেখ করেন যে– 'The nearly universal violence during the course of the insurgency, however, reflected pervasive anti-European sentiments at the time'.[১৩] তাই এই বিদ্রোহে সাঁওতাল পুরুষদের পাশাপাশি নারীদের অংশগ্রহণ তাদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক মর্যাদা বোধের প্রশ্নকে আরো জোরালো করে তোলে। *'সংবাদ প্রভাকর'* নারী বাহিনীর উল্লেখ প্রসঙ্গে এক প্রতিবেদনে বলে–"ইংলিসম্যান পত্রে কোনো সংবাদদাতা লিখিয়াছেন যে একজন সাঁওতাল-পত্নী সাঁওতালদের অধ্যক্ষ হইয়া তাহারদিগকে চালনা করিতেছে, দুরাত্মারা তাহাকে ঈশ্বরীর ন্যায় মান্য করে ও পূজা করিয়া থাকে, ঐ রমণী সাতিশয় বলিষ্ঠ, রণকৌশল বিলক্ষণ জ্ঞাত আছে, সে রাজসেনাদিগকে দেখিলে এমত সুকৌশলে আপন দলবল লইয়া জঙ্গলে প্রবেশ করে ও গোপন হয়, যে সেনাপতির কোনক্রমেই তাহারদিগের অনুসন্ধান করিতে পারে না।"[১৪] আবার বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করে নারীরাও যে মৃত্যুবরণ করেছিল তার যথাযথ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। লেফটেন্যান্ট যোগানের অধীনে ভাগলপুর হিল রেঞ্জার্স বাহিনির সঙ্গে লড়াইয়ে এক পুরুষবেশী নারী মৃত্যুবরণ করে। এই ঘটনাটি ৭ই ফেব্রুয়ারি ১৮৫৬ সালে *'সংবাদ ভাস্করে'* এ প্রকাশিত হয়। সেখানে বলা হয়–"যানারোহী এক সান্তাল সরদার ঐ দলের সঙ্গে ছিল, গুলি দ্বারা তাহার পঞ্চত্ব লাভ হইয়াছে, তাহার মৃত্যুর পরে প্রকাশ পায় যে ঐ সরদার পুরুষ নহে, রমণী পুরুষ বেশে আসিয়া ছিল।"[১৫] সাঁওতালদের স্বতন্ত্র সমাজ-সংস্কৃতিকে রক্ষার তাগিদে সাঁওতাল নারীরা প্রাণ বিসর্জন দিতেও দ্বিধা বোধ করেনি, যার উল্লেখ পাওয়া যায় সাঁওতালি গানেও। লিটিপাড়া

অঞ্চলে ডাটো মাঝির মেয়ে সাঁওতাল বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব দিতে ভয় পায়নি। ইংরেজদের হাতে ধরা পড়ার পর তাকে আমগাছে ফাঁসি দেওয়া হয়। এই ঘটনাকে নিয়ে সাঁওতালি গানে বলা হয়—

"দশ হাত কিনৌ যুদি
কৌরুলাং সাহেব
সাওয়ালাঃ পাহাড়ে
আমগাছি উপরে
ডাটো মাঁঝি বিটিয়া পৌসি ভেল
গুপিকানদার দিপটি বৌবু
জবাব দিতে দিতে
হোয়লো দমেদম।"[১৬]

অন্য একটি গানেও দুই জন সাঁওতাল নারীর ফাঁসি দেওয়ার ঘটনা প্রসঙ্গে বলা হয়—

"আমগাছি উপরে দেবি ছন্‌দর বেটা
দুও ছঁড়ি পৌসি ভেল
ভাদো মাঁঝি পারগানা
জবাব দিতে দিতে হবে দমেদম।"[১৭]

অর্থনৈতিক কারণের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক বিপর্যয় এবং তা পুনরুদ্ধারের আশায় যে এই বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল, তা তৎকালীন বিভিন্ন সরকারি রিপোর্ট ও পত্রিকার প্রতিবেদন থেকেও স্পষ্ট, যা নিম্নে দেওয়া হল—

১) সংবাদ প্রভাকর, ২০শে জুলাই ১৮৫৫

"...আমরা অবগত হইলাম যে রেইলওয়ের কর্ম্মচারিরা সাঁওতালজাতির যুবতি স্ত্রীলোকদিগকে ধরিয়া বলৎকার করিয়াছেন, কোনো কোনো স্ত্রীলোকদিগকে ধরিয়া পাঁচ সাত দিবস আপনাদিগের নিকট রাখিয়াছেন, তাহাদিগের উদ্যান হইতে বল দ্বারা ফল কাষ্ঠাদি লইয়াছেন তাহার মূল্য দেন নাই, সাওতাল লোকদিগকে পরিশ্রম করিয়াছেন অথচ মূল্য কিছুই দেন নাই, বলবান জাতি এত অত্যাচার কেন সহ্য করিবেন? এ

বিষয়ের বিশেষ তদন্ত অতি আবশ্যক, যাহারা চিরকাল রাজানুগত তাহারা বিনা কারণে রাজবিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছে এ কথা কে বলিবেন?"[১৮]

২) সমাচার সুধাবর্ষণ, ১৩ই জুলাই, ১৮৫৫

"...কেহ বলে যে রেইলওয়ে সংক্রান্ত কর্মচারিরা সাঁওতাল জাতীয় স্ত্রীলোক ধরিয়া বলাৎকার করিয়াছিল তাহাতেই তাহারা ঐক্য হইয়া যুদ্ধ সজ্জা করিয়াছে, কেহ আবার বলেন যে রাজস্ব সংগ্রহ বিষয় অত্যাচার হইয়াছিল, যাহা হউক বিস্তারিত জ্ঞাত হইয়া আমি পরে লিখিব"।[১৯]

৩) Hindoo Patriot, The Sounthal Outbreak, 19th july, 1855

"…It is evident that the employees of the Railway company have to answer for much of the disposition which led to the rising. It is stated that compulsory labour has been exacted of the Sounthals, but what seems to have exhausted their patience is the violation of their women".[২০]

৪) Friend Of India, 19th August, 1855

"…It is asserted in more than one letter, and in the most positive terms, that the Santals employed on the Rail have not been paid either for their daily labor, or for their fowls, eggs, goats and other articles they have sold to the Railway establishment, and their women have been insulted."[২১]

৫) Letter Copy Book, District Collectorate, Dumka Office, No. 12

To

H Stainforth, Commissioner, Dated Bowsee, 26.1.1856

"4th…as regards the attachment of cattle, you are I presume, ofcourse, aware that this system of illegal attachment was the cause of the late insurrection and I under the mistaken impression that I was vested in my new appointment with certain discretionary power, endeavoured to put a stop to it. I do not understand how these attachment and the sale of cattle by thousands can be legal. They are all plough cattle. No notice is ever

served. ...the cattle are at once driven back and sold most frequently by people who have nothing to do with the land. ...The whole thing is simply plunder. I endeavoured to stop this in a simple manner and can only regret that my endeavour have again failed to meet your approval.

5th-The Santhals are now loud in their complaints of the way in which their cattle are driven off.

A.Eden, D. C”[২২]

এই দিক থেকে ১৮৫৫-৫৬ এর সাঁওতাল বিদ্রোহ তাদের হারানো ঐতিহ্য ফিরে পাওয়ার শেষ সশস্ত্র সংগ্রাম। বিভিন্ন তথ্যের নিরিখে বিদ্রোহের কারণগুলি পর্যালোচনা করলে সার্বিকভাবে একটি বক্তব্যই উঠে আসে তা হল মর্যাদা হানি, আর্থিক কারণ, ধর্মীয় উপস্থিতি ইত্যাদি ব্যাখ্যার উপরেও এই বিদ্রোহ ছিল সাঁওতালদের স্বপ্নের স্বভূমি ফিরে পাওয়ার চেষ্টা। তাই একদিক থেকে এই বিদ্রোহ সাঁওতাল সত্তা এবং অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই। ‘দামিন-ই-কোহ’-এর জঙ্গলময় ভূমিকে চাষযোগ্য করে নিজেদের ঐতিহ্য অনুসারে সাঁওতাল রাজ্য প্রতিষ্ঠার যে স্বপ্ন সাঁওতালরা দেখেছিল, কালক্রমে ঔপনিবেশিক শাসন এবং দিকুদের আধিপত্যে সেই স্বপ্নের অবসান ঘটে। ঔপনিবেশিক পরিণতির পদাঙ্ক অনুসরণ করেই দিকু হিন্দুরা অর্থনৈতিক আধিপত্যের সঙ্গে দাবি করেছিল সাংস্কৃতিক আধিপত্য। অন্যদিকে নিজেদের স্বতন্ত্র সমাজ-সংস্কৃতিকে রক্ষার তাগিদেই সাঁওতালরা বিদ্রোহে নামে। বিদ্রোহের প্রত্যেকটি পদক্ষেপে সাঁওতালরা যেভাবে তাদের ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়গুলি সামনে রেখে নিজেদের মধ্যে ঐক্য গড়ে তোলে, তা তাদের সাংস্কৃতিক লড়াইয়ের বিষয়কে আরো জোরালো করে তোলে। এ প্রসঙ্গে রণজিৎ গুহ *মারেহাপড়াম রেয়াঃক কাথা*-এর উল্লেখ করে বলেন যে, পবিত্র শাল পাতা প্রেরণের মাধ্যমেই এই ঐক্য গড়ে উঠেছিল। আবার আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্রের বিরুদ্ধে শুধুমাত্র তীর-ধনুক দিয়ে লড়াই করা যায় না। কিন্তু পঞ্চাশ হাজার সাঁওতালদের এই বিদ্রোহ ইংরেজদের স্বযত্ন-লালিত স্পর্ধাকে ধ্বংস করেছিল। এ প্রসঙ্গে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মেজর জার্ভিস উল্লেখ করেন যে—‘একে কি লড়াই বলে? ওরা তীর চালিয়ে আমাদের লোকদের মারে বটে কিন্তু এভাবে বুক ফুলিয়ে বন্দুকের সামনে এগিয়ে আসতে পারে এমন মানুষ আমি আগে দেখিনি। স্বাধীনতা লাভের জন্য এমনি

করে মৃত্যুর দিকে ছুটে চলতে কোনো জাতিকেই দেখা যায়নি।'[২৩] সুতরাং নিজেদের সমাজ-সংস্কৃতিকে রক্ষার তাগিদে মৃত্যুবরণ করতেও সাঁওতালরা দ্বিধাবোধ করেনি।

তবে এই বিদ্রোহে সাঁওতালদের সাংস্কৃতিক মর্যাদাবোধের বিষয়টিকে তৎকালীন সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহাসিকরা দেখাননি। তাছাড়া বিবরণ দাতাদের অনেকেই উপদ্রুত অঞ্চলের ম্যাজিস্ট্রেট্ বা কালেক্টর রূপে প্রশাসন যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত থাকায় তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ ও মান-মর্যাদার প্রশ্নও ঘটনাগুলির সঙ্গে জড়িত ছিল। সুতরাং তারা তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ অনুযায়ী কোনো ঘটনাকে বিকৃতভাবে পরিবেশন কিংবা ঘটনার গুরুত্ব হ্রাসের চেষ্টা করবেন, তা স্বাভাবিক। তাই সাঁওতাল বিদ্রোহ নিয়েও বিতর্ক অব্যাহত। বিশেষ করে বিদ্রোহের সূচনা থেকেই সাঁওতালদের 'অসভ্য' বলার প্রবণতাটি লক্ষণীয়। ০২-০৮-১৮৫৫ তারিখে হিন্দু পেট্রিয়টে লেখা হয় যে—'Barbarians are incapable of conceving a political purpose, and the movement of the Santals is no exception to the general history of such irruptions'.[২৪] পরবর্তীতে কার্ল মার্কস তাঁর *Notes on Indian History* তে বিদ্রোকে স্বাগত জানিয়েও বলেন, এই আন্দোলনের হোতা একদল 'Savaged Tribe'.[২৫] আবার রজনীপাম দত্তের অভিমত হল, এই বিদ্রোহ '...Primitive and spontaneous forms of isolated acts of revenge and violence'.[২৬] স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর *'ইংরেজদের আতঙ্ক'* প্রবন্ধে সাঁওতালদের প্রতি ব্রিটিশদের নির্মম অত্যাচারের তীব্র সমালোচনা করেও বলেন যে, সাঁওতালরা 'বন্য' জাতি।[২৭] অন্যদিকে ঐতিহাসিক কালীকিংকর দত্ত তাঁর *The Santal insurrection of 1855-57* গ্রন্থে এই বিদ্রোহকে 'rude tribe'-দের বিদ্রোহ বলে উল্লেখ করেন।[২৮] আবার বিংশ শতাব্দীর আটের দশকে ঐতিহাসিক রণজিৎ গুহ তাঁর *The Elementary Aspects of peasant Insurgency in colonial India* গ্রন্থে সাঁওতাল বিদ্রোহকে 'নিম্নবর্গের আন্দোলন' হিসেবে চিহ্নিত করেন।[২৯] সুতরাং সাধারণ মানুষ থেকে পণ্ডিতবর্গ প্রত্যেকেই সাঁওতাল জনজাতিকে 'বর্বর', 'অসভ্য' অথবা 'নিম্নবর্গ' বলে চিহ্নিত করে তাদের স্বতন্ত্র সমাজ-সংস্কৃতিকে অস্বীকার করার চেষ্টা করেছেন। আদিবাসীরা যেমন কোনো বর্গের অন্তর্ভুক্ত ছিল না আবার তাদের কোনো লিখিত উপাদান না থাকলেও মৌখিক আকারে শত শত বছর ধরে সমাজ- সংস্কৃতি বিরাজ মান। কিন্তু তাদের ভাষা না জানার জন্য উচ্চশ্রেণীর মানুষের কাছে তা বোধগম্য

হয়ে ওঠেনি। ফলে এই বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে সাঁওতালদের সমাজ-সংস্কৃতিকে রক্ষার যে স্বাধীন চেতনা, তা প্রকাশ পায়নি। এ প্রসঙ্গে ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে তাঁর *সাঁওতাল গণসংগ্রামের ইতিহাস গ্রন্থে* আক্ষেপের সঙ্গে বলেন যে— "কিন্তু সেদিন কলিকাতার সমস্ত সংবাদপত্র, 'ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া' থেকে 'সংবাদ প্রভাকর' পর্যন্ত সাঁওতালদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য আন্দোলন আরম্ভ করেছিল। দুঃখের বিষয়, সাঁওতালদের স্বপক্ষে কথা বলবার কেউ ছিল না। এমন কি সমস্ত বিষয়টি নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষণেরও কোনো চেষ্টা হয় নাই। একটা নিরীহ জাতি, যারা রাজনীতির ধার ধারে না, তারা কেন বেপরোয়াভাবে জীবনের মায়া ছেড়ে মরিয়া হয়ে উঠেছিল, তা তদন্তও হল না। ভারতের ইতিহাসকে শোষণ ও শাসনব্যবস্থার প্রয়োজন অনুযায়ী সাজাতে হবে তো! তাই শোষণ ও শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম দেখা দিয়েছিল, তারা সেদিন তা আড়াল করে রাখবার চেষ্টা করেছিল।"[৩০]

যে প্রশাসনিক কাঠামোর বিরুদ্ধে সাঁওতাল বিদ্রোহ সংগঠিত হয়েছিল, বিদ্রোহের পরবর্তী সময়ে মাঝি, পরগণাইৎদের প্রশাসনিক ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করে সাঁওতাল সমাজকে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত করে আরো জটিল করে তোলা হয়। ঔপনিবেশিক সরকার ১৮৫৫ সালের ৩৭নং আইন অনুসারে বীরভূম ও ভাগলপুরকে বাদ দিয়ে 'সাঁওতাল পরগণা' নামে নন রেগুলেটেড জেলা গঠন করলেও সাঁওতালরা পূর্বের সেই স্বাতন্ত্র্যতা ফিরে পায়নি। পুরো এলাকা জুড়ে একের পর এক প্রশাসনিক ব্যবস্থার প্রচলন করে সাঁওতালদের গ্রামীণ সংগঠনগুলিকে পুরোপুরি ভাবে ভেঙ্গে দেওয়া হয়। বিদ্রোহ পরবর্তী যেসব বিধি-বিধান সাঁওতাল পরগণায় বলবৎ করা হয়, তা নিম্নে দেওয়া হল—

১) সাঁওতাল পরগণা অ্যাক্ট ৩৭ অফ ১৮৫৫।

২) সাঁওতাল পুলিশ রুল ১৮৫৬।

৩) সাঁওতাল পরগণা সেটেলমেন্ট রেগুলেশন ১৮৭২।

৪) সিডিউল ডিসট্রিক্ট অ্যাক্ট ১৮৭৪।

৫) সাঁওতাল পরগণা রেন্ট রেগুলেশন ১৮৮৬।

৬) সাঁওতাল পরগণা জাস্টিস রেগুলেশন ১৮৯৩।

৭) সাঁওতাল পরগণা রুরাল পুলিশ রেগুলেশন ১৯১০।

৮) সাঁওতাল সিভিল রুল ১৯৪৬।

৯) সাঁওতাল পরগণা টেনেন্সি অ্যাক্ট ১৯৪৯।

সাঁওতাল পরগণায় সু-প্রশাসন ব্যবস্থার জন্য সমগ্র জেলাটিকে চারটি উপজেলায় বিভক্ত করা হয়। যথা— ১) গোড্ডা ২) দুমকা ৩) দেওঘর ৪) রাজমহল। আর এই চারটি উপজেলায় চারটি অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার এবং তাদের এক জন করে সহকারী পদাধিকারী নিয়োগ করা হয়। এছাড়া প্রশাসনের সঙ্গে সাধারণ মানুষের প্রত্যক্ষ যোগাযোগের জন্য নিম্নলিখিত তিনটি ব্যবস্থা করা হয়— ১) সাঁওতালদের এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশানরের মধ্যে কোনো মধ্যস্থতাকারী থাকবে না। ২) এবার থেকে সাঁওতালরা সরাসরি মৌখিকভাবে তাদের অভিযোগ জানাতে পারবে। আমলার সাহায্য অথবা লিখিত অভিযোগ লাগবে না। ৩) ফৌজদারি অপরাধের বিচার সাঁওতালরা নিজেরাই সাক্ষীর সাহায্যে করতে পারবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় ১৮৫৫ সালের ৩৭নং আইনের ১নং ধারা অনুযায়ী বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির ভূমি রাজস্ব আইন ছাড়া সমস্ত আইনই বহাল রাখে। এই জেলার প্রশাসনকে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কর্মকর্তা এবং আধিকারীকদের তত্ত্বাবধায়ন ও এক্তিয়ারে রাখা হয়। আবার নাগরিক ও ফৌজদারির বিচার এবং রাজস্ব আদায়ের সমস্ত ক্ষমতাই ব্রিটিশ সরকারের দ্বারা পরিচালিত হয়। অন্যদিকে ১৮৫৬ সালের মধ্যে এই জেলায় পুলিশি ব্যবস্থা গড়ে ওঠে এবং ১৯৩৮ সালে এই জেলায় ১৬টি পুলিশ স্টেশন স্থাপন করা হয়। ফলস্বরূপ ১৯৫০ সালের মধ্যেই গোটা এলাকাটি পুলিশি নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। এই পুলিশি এবং বিচার ব্যবস্থার সঙ্গে মাঝি ও পরগণাইৎদের যুক্ত করা হলেও তাদের অধিকার ছিল কেবলমাত্র তদারকি করা। তাছাড়া এই ব্যবস্থাগুলি কখনই সাঁওতাল ঐতিহ্য অনুযায়ী পরিচালিত হয়নি। তবে পূর্বের ন্যায় সাঁওতালরা অধিকার না পেলেও সন্তুষ্ট ছিল। কিন্তু ১৮৬৩ সালে বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নর সিসিল বিডন ঘোষণা করেন যে, সাঁওতাল পরগণার শাসন ব্যবস্থাকে পুরোপুরি ভাবে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির অন্যান্য জেলার মতো করা উচিত। এ সম্পর্কে বাংলার প্রশাসনিক রিপোর্টে বলা হয় *যে*—“In 1863 Lieutenant Governor,

Sir Cecil Beadon, being advised by the Advocate General, declared that there was no reason for exempting the Santal Parganas from the general laws, and he directed that the district should be brought as soon as practicable under the laws in force in other parts of Bengal Province”.[৩১] ফলস্বরূপ বাংলায় প্রযোজ্য সাধারণ আইন যেমন স্ট্যাম্প অ্যাক্ট ও সিভিল প্রসিডিউর কোড বাংলার লেফটেন্যান্ট জেনারেলের আদেশে বাস্তবায়িত হয়েছিল। এই সব আইনের দ্বারা জমিদাররা বিভিন্ন ভাবে সুবিধা নিতে থাকে এবং পুনরায় দিকুদের অনুপ্রবেশ ঘটে। যার দরুন সাঁওতালদের লাখ লাখ একর জমি অবৈধভাবে হস্তান্তর হতে থাকে এবং পুনরায় মাঝি ও পরগণাইৎদের সামান্য অধিকারটুকুও চলে যায়। এর ফলে ১৮৭১ সালে আবার বিদ্রোহের পরিস্থিতি দেখা দেয়। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নরওয়ের মিশনারি স্ক্রেফসরুড সাতজন মাঝিকে নিয়ে কোলকাতা আসেন এবং ছোটলাট জর্জ ক্যাম্পেবেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জমিদারি ও মহাজনি শোষণ-অত্যাচারের কথা তুলে ধরেন। আবার একটা বিদ্রোহ হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন। ছোটোলাট তাদের ক্ষোভের কারণগুলি অনুধাবন করে অবিলম্বে তা নিরসন করার প্রতিশ্রুতি দেন। পরবর্তী সময়ে স্ক্রেফসরুড সাঁওতাল পরগণার কমিশনারকে চিঠি লিখে বিষয়টি সম্পর্কে অবগত করেন। সেই চিঠিতে বলা হয়—“In 1871 the Santals became restless and troublessome on account of their oppressors and were on the point of rising again when we, to avert a repetition of 1855, took some of their chiefs and overchiefs with us to Calcutta and laid the matter before his Honor Sir George Campbell. This resulted in the Santhal settlement of 1872.”[৩২] এই পরিস্থিতির মোকাবিলায় ব্রিটিশ সরকার ১৮৭২ সালে সাঁওতাল পরগণা ভূমি বন্দোবস্ত আইন লাগু করে সাঁওতালদের জমি রক্ষার কথা বললেও জমিদার ও সরকার জমির পরিচালনার দায়িত্বে থাকে। এই আইনে মাঝি, পরগণাইৎদের জমি রেকর্ড করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও সেই ক্ষমতা থাকে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের ওপর, ফলে অনেক ক্ষেত্রেই দিকুরা সুবিধা লাভ করে। অন্যদিকে ১৮৮৬ সালের রাজস্ব আইন চালু হলে পুনরায় খাজনা বৃদ্ধি পায় এবং সেই সঙ্গে এই সমস্ত আইনের দ্বারা জমিদারদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয় বিপুল সংখ্যক ইউরোপীয়রা, যারা খাজনা বৃদ্ধির কাজে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তৎকালীন সাঁওতাল পরগণার সেটেলমেন্ট অফিসার ব্রাউন উড উল্লেখ করেন যে—“It

is painful to find that the lead in the practice of rack-renting, or at any rate full renting the Sonthals, and harassing them by constant enhancements, charges for privileges never before charged, and the like has undoubtedly been taken by European speculators who mainly owe their footing to farms which they obtained from the officers of government. They have made fortunes but they have left to government a legacy of political trouble".[৩৩] এছাড়া ১৯৪৬ সালের দেওয়ানী আইন প্রবর্তন করা হলেও বিশেষ কিছু পরিবর্তন ঘটেনি। ফলত সাঁওতালদের ঐতিহ্য রক্ষার স্বার্থে এই সমস্ত আইন বলা হলেও কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় সাঁওতালদের স্বার্থ রক্ষা করতে পারেনি। বিদ্রোহ পরবর্তী ঔপনিবেশিক সরকারের প্রশাসনিক ব্যবস্থার প্রভাব সম্পর্কে বিনয়ভূষণ চৌধুরি উল্লেখ করেন যে—"Santhal society was exposed to new and political forces which tended to undermine their traditional institutions. By then the alien domination was too firmly entrenched to be casually meddled with. The government did not opt for any radical plan of breaking away from the established orders. Its measures were half-hearted from the beginning. The lost lands of santhals were not retrieved. Nor were the dispossessed manjhis reinstated. Nothing was done to moderating the recent rent increases".[৩৪]

স্বাধীনতার পরবর্তীকালে আদিবাসীদের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনার নামে নানান উন্নয়নমূলক মডেল ও নিয়ম-নীতি গড়ে ওঠে। সেখানে আদিবাসীদের ঐতিহ্য অনুসরণ করে বিধি-নিয়ম প্রবর্তনের কথা বলা হলেও বাস্তবে দেখা যায় ব্রিটিশদের প্রবর্তিত নিয়মগুলি নতুন রূপে চালু করা হয়। এ প্রসঙ্গে শুচিব্রত সেন তাঁর *পূর্ব ভারতের আদিবাসী অস্তিতের সংকট* গ্রন্থে মন্তব্য করেন যে—"নতুন সরকার ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পরিবর্তে পশ্চিমী মতাদর্শ ভিত্তিক গণতন্ত্রের অন্ধ অনুকরণ করতে গিয়ে জাতীয় সত্তার মূল কেন্দ্রটিকে হারালো। কমলালেবুর সরবতের জায়গা দখল করল হুইস্কি এবং নেতৃবৃন্দ জাতি গঠন শুরু করলে ব্রিটিশ রাজের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত আমলাতন্ত্র, সৈন্যবাহিনি এবং পুলিশ দিয়ে। স্বাভাবিক ভাবেই এই এলিট সরকারের কাছে আদিবাসী জীবনের মূল সত্তার প্রশ্নটি বোধগম্য ছিল না। বিভিন্ন আদিবাসীর সাংস্কৃতিক সত্তাগুলি হল অবহেলিত এবং তাদের আত্মপ্রতিষ্ঠার ইচ্ছাগুলোকে ব্যাখ্যা করা হল ভুলভাবে। বস্তুতপক্ষে এলিট এবং আদিবাসী সংস্কৃতির

তফাত স্বাধীনতার পরে অনেক বেশী প্রকাশ্যে এসে পড়ল। কেন্দ্র এবং প্রান্ত সীমার তফাত প্রায় দুর্লঙ্ঘ হয়ে দাঁড়াল।"[৩৫] ১৯৫৫ সালের সাঁওতাল পরগণা অ্যাক্টে তারই প্রতিফলন পাওয়া যায়। যা নিম্নে একটি ছকের মাধ্যমে দেখানো হল—

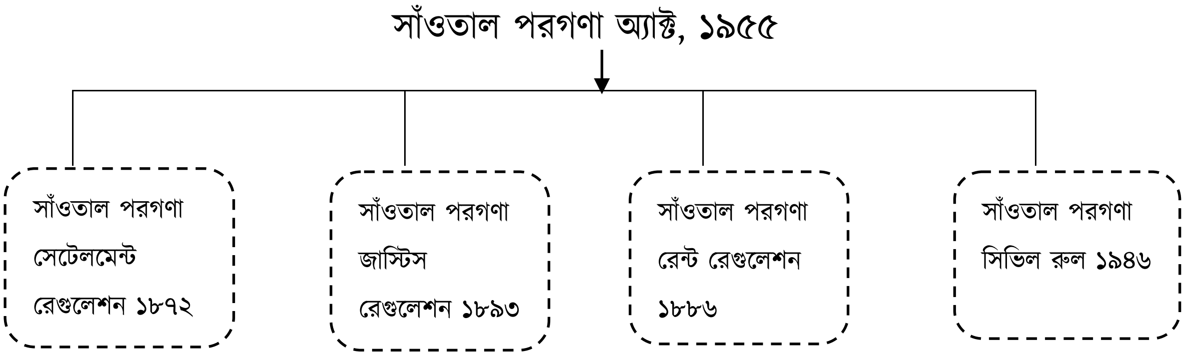

এই সমস্ত পুরনো আইনের সঙ্গে যেসব নতুন আইন করা হয়, তাতেও আদি ঐতিহ্য অনুসারে মাঝি ও পরগণাইৎদের পূর্ব ক্ষমতা বিদ্যমান ছিল না। অন্যদিকে জঙ্গল ও ভূমি আইনকে ব্যবসায়িক স্বার্থে কঠোরভাবে প্রয়োগ করে সাঁওতালদের পূর্বে বিদ্যমান সামান্য অধিকারটাও কেড়ে নেওয়া হয়। এর পাশাপাশি শিল্পায়নের নামে এক বৃহৎ সংখ্যক দিকুদের প্রবেশ ঘটে এবং অবৈধভাবে সাঁওতালদের জমি দখল করে। ফলস্বরূপ সাঁওতালদের গ্রামীণ সংগঠনগুলি পুরোপুরি ভাবে ধ্বংস হয়ে পরে। যার দরুন সাঁওতালদের সমাজ সংস্কৃতি নতুন চ্যালেঞ্জের সামনে এসে পড়ে।

সাঁওতাল পরগণায় ব্রিটিশদের প্রবর্তিত রীতিনীতি ও শাসনব্যবস্থার দ্বারা সাঁওতালদের গোষ্ঠীগত স্বায়ত্তশাসনের কোনো ব্যবস্থা ইংরেজ সরকার তৈরি করতে পারেনি। সরকার যখন যেমন ইচ্ছা বিধান ও ব্যবস্থা তৈরি করে এই অঞ্চলে প্রয়োগ করেছে। আবার অন্যদিকে ব্রিটিশ সরকার নিজেদের পলিসি সার্থক করার জন্য মাঝে মাঝে মাঝি, পরগণাইৎদের দিয়ে রেগুলেশন বা আধা রেগুলেশন ব্যবস্থাকে কালেক্টর, কমিশনার এবং এজেন্টদের মাধ্যমে সেই পলিসিকে চালু করবার কাজে লাগিয়েছে। তাছাড়া দেওয়ানি ব্যাপার সাধারণ আদালতের অধীন থাকলেও ফৌজদারি ব্যাপারে কমিশনার সাহেব প্রধান ছিলেন। বিশেষ করে জমির জন্যই আদিবাসীরা বেশি বিচলিত হয়েছিল। ব্রিটিশ সরকার প্রথম প্রথম কতগুলি আইন করে আদিবাসীদের জমি রক্ষার কথা বললেও পরবর্তী সময়ে ব্যাপক হারে জমি জরিপ করে নতুন বন্দোবস্তের মাধ্যমে

ভূমিকর প্রথা প্রবর্তন করে। অন্যদিকে স্বাধীনতার পরবর্তীকালে আদিবাসীদের ঐতিহ্য রক্ষার স্বার্থে নানান নিয়ম-নীতি চালু করলেও কার্যক্ষেত্রে আদিবাসীরা তাদের ঐতিহ্যকে ফিরে পায়নি।

মিশনারিদের প্রভাব

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মিশনারিরা রাজশক্তির সহায়তায় ধর্মান্তকরণের কাজ শুরু করে। এই ধর্মান্তকরণের সঙ্গে মিশনারিদের একটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য অবশ্যই ছিল। কারণ তারা বিশ্বাস করতেন ভারতবর্ষের মানুষ খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করলে এবং ব্রিটিশ শাসনে থাকলে উন্নত হবে। সেই সঙ্গে খ্রিস্টান সাম্রাজ্যবাদ যে একটি অতি উচ্চ ধরনের আদর্শ খ্রিস্টান পাদরি সমাজ সেটা মনে করতেন। কিন্তু ধর্ম প্রচারের কাজ আরম্ভ করার পর মিশনারিরা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, ভারতবর্ষের উচ্চবর্ণের হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে তাদের ধর্ম প্রচার কখনই প্রসার লাভ করতে পারবে না। বলা বাহুল্য, বর্ণ হিন্দুদের মধ্যে কিছু আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত মানুষেরা খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করলেও, উনিশ শতকের প্রারম্ভেই সেখানে একটা প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। অন্যদিকে অনার্যদের মধ্যে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের কোনো বাধা নেই, একথা অনুধাবন করে স্যার রিচার্ড টেমপল (Richard Temple) মিশনারিদের উদ্দেশ্যে বলেন—'I may remind you of the fortunate fact that in India out of 200 million British subjects (exclusive of native stock) 18 million are aboriginal races and 9 million are no caste at all. Thus 27 million are out of the pull of the principal oriental religions and their minds present a tabula rasa on which Christianity may work'.[৩৬] ফলত আদিবাসী সমাজ মিশনারিদের ধর্মাভিযানের লক্ষ্য হয়ে ওঠে এবং আদিবাসী সমাজের এক বৃহৎ অংশকে ধর্মান্তরিত করতে সক্ষম হয়। ভারতবর্ষের উচ্চশ্রেণিবর্গ কখনই আদিবাসীদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতির কথা ভাবেনি বা তাদের স্বতন্ত্র সমাজ-সংস্কৃতিকে মর্যাদা দেয়নি। কাজেই এটি দখল করল খ্রিস্টান মিশনারিরা।

ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই খ্রিস্টানধর্মের সঙ্গে আদিবাসীদের যোগসূত্রের সূচনা। আমেরিকান ব্যাপটিস্ট ফরেন মিশন সোসাইটির অধীনস্থ কিছু প্রোটেস্ট্যান্ট মিশনারির পরিচালনা ও অনুপ্রেরণায় আদিবাসী তথা সাঁওতালদের খ্রিস্টান

পরিমন্ডলে আনার প্রথম প্রয়াস নেওয়া হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে ইংল্যান্ডের চার্চ মিশনারি সোসাইটি এই কাজে যুক্ত হয়। তবে, সাঁওতাল বিদ্রোহের পরবর্তী সময়ে মিশনারিদের ধর্মান্তকরণের প্রচেষ্টা দ্রুততার সঙ্গে বৃদ্ধি পায়। কারণ তৎকালীন আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি, শ্রমদাস প্রথা এবং সাঁওতাল বিদ্রোহের ব্যর্থতা মিশনারিদের প্রকল্পিত পদক্ষেপকে আরো সুদৃঢ় করেছিল। এ প্রসঙ্গে ডাব্লিউ.জে. কালশ উল্লেখ করেন যে—"The gospel of Christianity came even at times, as succour to the tribals when legislations on land had failed to protect their land rights and privileges. Also, the drive to come under Christian missionary influence is believed to have resulted from their materialistic concern, namely to alleviate poverty and to seek relief from the oppression of the landlords and moneylenders".[৩৭] বাস্তবিকভাবে, যখন সাঁওতাল বিদ্রোহ পুরোপুরি ব্যর্থ হয়ে পড়ে, তখন বেশি পরিমাণে মিশনারিদের তৎপরতা লক্ষ করা যায়। বিশেষ করে 'ইউনাইটেড ফ্রি চার্জ অফ স্কটল্যান্ড', 'আমেরিকান ব্যাপটিস্ট মিশন' সাঁওতালদের খ্রিস্টধর্মের আদর্শে দীক্ষিত করার প্রচেষ্টা শুরু করে। তবে এই মিশনারিরা কেবলমাত্র গ্রেট ব্রিটেন নয়, নানা ইউরোপীয় দেশ থেকে ভারতবর্ষে এসেছিল। যেমন— জার্মানি, ইতালি, পোর্তুগাল, ফ্রান্স, নরওয়ে, ডেনমার্ক, আর্মেনিয়া প্রভৃতি। বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার সাঁওতালদের মধ্যে প্রধানত ছয়টি মিশনারি সোসাইটি ব্যাপকভাবে কাজ করেছিল। সেই ছয়টি সোসাইটি হল[৩৮]—

১) আমেরিকান ব্যাপটিস্ট মিশন

২) নর্দান ইভানজেলিক্যাল লুথারণ চার্চ

৩) মেথডিস্ট মিশনারি সোসাইটি

৪) রোমান ক্যাথলিক মিশন

৫) লন্ডনের ব্যাপটিস্ট মিশনারি সোসাইটি

৬) চার্চ মিশনারি সোসাইটি

মিশনারি কার্যকলাপে আদিবাসী সমাজ ব্যবস্থায় পরিবর্তন ঘটলেও মিশনারিগণই প্রথম আদিবাসীদের চর্চার আলোতে নিয়ে আসেন। তবে মিশনারিরা আদিবাসীদের ধর্মান্তকরণের পাশাপাশি কিছু গঠনমূলক কাজও করেন। বিশেষ করে আদিবাসীদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তারে যথেষ্ট উদ্যোগ নেয়; কিন্তু আদিবাসীদের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারেনি। প্রথম দিকে জমিদার ও মহাজন বিরোধী আন্দোলনে মিশনারিরা সাহায্য করলেও পরবর্তীতে রাজশক্তির সঙ্গে বিরোধ দেখা দেওয়ায় সেখান থেকে সরে আসে। কারণ সেই সময় জমিদারদের স্বার্থ বস্তুত ব্রিটিশদের রাজস্ব ভাণ্ডারের একটা প্রধান ভিত্তিরূপেই স্থাপিত হয়েছিল। কাজেই মিশনারি প্ররোচিত জমিদার বিরোধী আন্দোলনে কোনো বড় রকমের সরকারি সাহায্য লাভে সমর্থ হয়নি। এ ক্ষেত্রে বলাবাহুল্য, ১৮৫৯ সালে ‘ভুঁইহারি আইন’ (Bengal Act II of 1869) পাস করার ক্ষেত্রে মিশনারিরা কার্যকরী ভূমিকা নেয় আবার ১৯০৮ সালে ছোটনাগপুর প্রজাস্বত্ব আইন পাস করবার ব্যাপারে জেসুইট মিশনারিদের প্রচেষ্টা অনেকখানি কাজ করেছিল। কিন্তু পরবর্তীতে রাজশক্তির সঙ্গে বিরোধ দেখা দেওয়ায় এই ধরনের পথ ছেড়ে শিক্ষা পদ্ধতির ভেতর দিয়ে ধর্মপ্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করে। ১৯১১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে এ বিষয়ে বলা হয় যে, ‘মিশনারিরা আদিবাসীদের অবশ্য এভাবে প্রলুব্ধ করে না যে, খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করলে তারা আদিবাসীদের জমি আদায়ের ব্যাপারে সাহায্য করবে।[৩৯] তবে মিশনারিদের শিক্ষা বিস্তারের ফলে আদিবাসী সমাজ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকারবোধ সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, মুণ্ডা বিপ্লবী বিরসা চাইবাসার মিশনারি উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। আবার ১৯১১ সালে হাজারিবাগের সেন্ট কলম্বাস কলেজের আদিবাসী ছাত্র জে.বারথলমেন (J. Bartholmun) প্রথম আদিবাসীদের স্বতন্ত্র রাজ্য হিসেবে ঝাড়খন্ডের দাবি করেন।[৪০]

কিন্তু মিশনারিরা শিক্ষা বিস্তার ও সেবা মূলক কাজের মধ্য দিয়ে পাশ্চাত্য ধাঁচে আদিবাসীদের মধ্যে একটি ‘শ্রেণি’ গড়ে তুলতে চেয়েছিল, তা তাদের ধর্মান্তকরণের প্রয়াসের মধ্যেই স্পষ্টতই দৃশ্যমান ছিল। ঐতিহাসিকভাবে বলতে গেলে খ্রিস্টান মিশনারিরা তাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা, অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণ সহকারে তাদের লেখার মাধ্যমে ভারতে আদিবাসী অধ্যয়নের ক্ষেত্রে অগ্রগামী ছিলেন। যদিও তাদের লেখাগুলি

প্রায়ই পক্ষপাতমূলক ছিল, তবুও তারা আদিবাসীদের সম্পর্কে তথ্যের একটি অমূল্য উৎস তৈরি করেছিল। একই ভাবে মিশনারিরা সাঁওতালদের ভাষা সাহিত্যের নথিপত্রের ক্ষেত্রে অনেক অবদান রেখেছিল, যা পূর্বে মৌখিক আকারে বিদ্যমান ছিল। যদিও সাঁওতাল পরগণা ও অন্যান্য আদিবাসী অঞ্চলে মিশনারিদের কার্যক্রমের সুবিধা ও উপযোগিতা সম্পর্কে মতের তীব্র বৈপরীত্য রয়েছে। একদল পণ্ডিত মিশনারিদের কল্যাণকর সেবাকে স্মরণ করে তাদের কৃতিত্বকে অতিরঞ্জিত করেছেন বলে মনে করা হয়। তবে অন্য একটি মতে, মিশনারিদের প্রচেষ্টাকে নিন্দা করা উচিত এবং তাদের আদিবাসী তথা সাঁওতালদের গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজ কাঠামোকে বিভক্ত করার জন্য দায়ী করা উচিত বলে মনে করে। কে.এম.পানিক্করের মতো ঐতিহাসিক ভারতে ঔপনিবেশিক শাসনের সঙ্গে মিশনারি কার্যক্রমকে যুক্ত করার প্রসঙ্গে যুক্তি দেন যে, খ্রিস্টান মিশনারিরা আদিবাসীদের মধ্যে সামাজিক বিভাজন তৈরি করার এজেন্ট হিসাবে কাজ করেছিল এবং বেশির ভাগই তারা পশ্চিমী সভ্যতার সমালোচনাহীন সমর্থক ছিল।[৪১] এ প্রসঙ্গে কুমার সুরেশ সিং ইতিহাস কংগ্রেসের ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দের অধিবেশনের সভাপতির অভিভাষণে বলেন—‘Missionaries in close collaboration with the Raj, sought to create a now bastion of support for it among the backward communities of India’.[৪২] আবার সুষান দেভলের মতো পণ্ডিত যুক্তি দেন যে, সাঁওতালদের মধ্যে মিশনারিদের শিক্ষামূলক উদ্যোগ বাস্তবে আদিবাসীদের সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধির অসম্মানে অবদান রেখেছিল।[৪৩] এ প্রসঙ্গে ভেরিয়ার এলুইন মত দেন যে, মিশনারির দল আদিবাসীকে তার গোষ্ঠীগত সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ভিত্তি থেকে উৎখাত করে একেবারে নতুন একটা সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে ছেড়ে দিয়েছিল। তিনি আরো বলেন যে—‘মিশনারিদের কার্যকলাপে কতগুলো দীনহীন আদিবাসীর বদলে কতগুলো দীনহীন ধর্মান্তরিত খ্রিস্টান তৈরি হয়েছে, এই মাত্র।’[৪৪] কাজেই খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে আদিবাসীরা কতখানি স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করতে পেরেছিল তা নিয়ে একটা প্রশ্ন থেকেই যায়। কারণ তারা যে বাধ্য হয়ে খ্রিস্টানধর্ম গ্রহণ করেছিল তা তাদের বিভিন্ন গান গাথায় প্রতিফলিত হয়েছে। এই রকমই একটি হল—

“হড়মো হপনবাবু লেঃফ্‌লেকা
ডানডা হপনবাবু চৌমুক্‌ লেকাঃ

চেকাতে বাং বাবুম্ রহডঃ কান্
নিঞ্‌তেমা বাং সৌরে চান্দোগে
বেনাও লিদিং যিসুমাসি কিন
চিলৌও কিদিঞ।"[৪৫]

অর্থাৎ,

"গা'টি তোমার, ভাইটি, ছিল চক্‌চকে পিছ্‌লে যাবার মতো। কোমরটি ছিল ছিপ্‌ছিপে চাবুকের মতো। শরীর এখন অমন শুকিয়ে যাচ্ছে কেন?
আমার আপনা থেকে তো নয় বউদি, চান্দো (বিধাতা) গড়ে তুলেছিল আমাকে, যিশু মুসাতে জুটে দুরবস্থা ঘটালে।"

আবার বাংলা সাহিত্যেও মিশনারি এবং তার সঙ্গে সম্পর্কিত সমাজের নানা দিকের কথা উঠে এসেছে, যা ইতিহাসগতভাবে সাহিত্য পরিসরে প্রামাণ্য দলিল বলা যেতে পারে। সুবোধ ঘোষের 'চতুর্থ পানিপথের যুদ্ধ' একটি চরিত্রকেন্দ্রিক গল্প। এই গল্পের স্টিফান হোরোকে নিয়ে গড়ে উঠেছে দ্বন্দ্ব। আদিবাসী সমাজ-সংস্কৃতি ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মন্থন গল্পটির মূল বিষয়। গল্পে দেখা যায় ফাদার লিন্ডনের প্রিয় ছাত্র স্টিফান হোরো মিশনারি শিক্ষা থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে। অন্যদিকে হোরোকে বশে আনার জন্য উঠে পড়ে লাগেন ফাদার। নিউ টেস্টামেন্ট থেকে ডেভিডের গাথাগুলো নির্ভুল আবৃত্তি করান হেরোকে, গুড ফ্রাইডের ছুটিতে ফিরে আসার আগে হেরোকে হাতে টাকা গুঁজে দেন। অর্থাৎ নিজ সমাজ-সংস্কৃতি থেকে হেরোকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য ফাদার লিন্ডন শিক্ষাকে পণ্য হিসাবে ব্যবহার করেন। আবার নিজ সমাজ-সংস্কৃতিকে তাচ্ছিল্য করার জন্য ফাদার লিন্ডন হেরোকে উদ্দেশ্য করে বলেন—'মুরমুরা বোঙা পুজো করে, ওদের সঙ্গে মেলামেশা কি উচিত হল ? বড়ো ভুল করেছে হোরো। ... হোরো খৃস্টান হয়েও আখড়াতে গিয়ে মাদল বাজিয়েছে। ... জংলীদের সঙ্গে মিশে দুদিন সেন্ডেরা করেছে হোরো।'[৪৬] মিশনারিদের মিশন যেন অন্যকিছু ছিল, গল্পে সে কথায় বর্ণিত। আবার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এর 'একটি শত্রুর কাহিনী' গল্পে জোসেফ ইম্যানুয়েল-এর পরিচয় পাওয়া যায়। যার জন্মগত নাম ডোঙা সাঁওতাল। কিন্তু খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করার পর তার নাম হয় জোসেফ ইম্যানুয়েল। জোসেফ-এর আদব-কায়দায়, ভেতরে-বাইরে দুই সত্তার বদল ঘটেছিল। আর এই বদলে যাওয়ার কথা সকলকে

নিরন্তর জানাতে চেষ্টা চালাত। স্বপ্ন দেখত বিদেশ যাওয়ার। 'ইণ্ডিয়ান বলে নিজের পরিচয়টাকে ডোঙা সাহেব ভুলে যেতে চায়; তার কাছে এই পরিচয় অগৌরবের, পরম লজ্জার।'[৪৭] এইভাবে মিশনারি শিক্ষা ও শিক্ষাদান পদ্ধতি আদিবাসীদের মধ্যে বিভেদ তৈরি করে। অন্যদিকে বনফুলের 'দুইটি ছবি' গল্পে এক ব্যতিক্রমী জীবনাভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। গল্পে দেখা যায় মিস্টার মাজিয়া তার বাবার মৃত্যুর পূর্বে আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষ হলেও বাবার মৃত্যুর পরবর্তী সময়ে খ্রিস্টানধর্ম গ্রহণ করে। তার এই ধর্মান্তকরণের প্রসঙ্গে বলে ওঠে, "বাবার মৃত্যুর পর আমাদের বড় দুরবস্থা হইয়াছিল। একজন সহৃদয় মিশনারি সাহেব আসিয়া আমাদের খ্রীস্টধর্মে দীক্ষা দেন। তাঁহারই অনুগ্রহে আমি লেখাপড়া শিখি। ...মাঝি উপাধিকেই আমি 'মাজিয়া' করিয়াছি।'[৪৮] আর্থিক সংকট থেকে পরিত্রাণের জন্য মিস্টার মাজিয়াকে প্রথমে খ্রিস্টধর্মের দীক্ষা নিতে হয়েছিল এবং মাঝি পদবি পরিবর্তন করতে হয়েছিল। ধর্মমতে পরিবর্তন তার প্রভাব পরে সমাজ-সংস্কৃতির ওপর। মিশনারিদের সেবামূলক কাজকর্মের আড়ালে ধর্মান্তকরণ যে আসল উদ্দেশ্য ছিল তা একাধিক বাংলা গল্প ও উপন্যাসে তার প্রতিফলন পাওয়া যায়।

১৮১৮ সালে চার্টার অ্যাক্টের মাধ্যমে মিশনারিরা ভারতবর্ষে আনুষ্ঠানিকভাবে ধর্ম প্রচারে ছাড়পত্র লাভ করে এবং ব্রিটিশ রাজশক্তির সহযোগিতায় ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে মিশন স্থাপনে উদ্যোগী হয়। বিশেষ করে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের পর মিশনারিরা আদিবাসী গ্রামগুলিকে তাদের ধর্ম প্রচারের একটি বড় ক্ষেত্র হিসেবে দেখেছিল। কারণ ঔপনিবেশিক কর্মকর্তা এবং খ্রিস্টান মিশনারি উভয়ই এমন একটি পৃথক অংশকে চিহ্নিত করতে পেরেছিল, যাদের নিজস্ব জীবন জীবিকা ছিল এবং বর্ণ হিন্দু সমাজের বাইরে ছিল। যাদেরকে বর্ণ হিন্দুরা অসভ্য, বর্বর, জংলী হিসেব প্রতিভাত করেছিল। ফলত মিশনারিরা সহজেই উপলব্ধি করতে পেরেছিল এই সমাজের মধ্যে ধর্ম প্রচারকে সহজেই ত্বরান্বিত করা যাবে। আদিবাসী অঞ্চলে প্রথম মিশন স্থাপিত হয় ১৮১৮ সালে, উড়িষ্যার বালেশ্বরে। তবে সাঁওতাল পরগণা অঞ্চলে উনিশ শতকের ত্রিশের দশক থেকেই খ্রিস্টানধর্ম প্রচারকদের প্রবেশ ঘটলেও সাঁওতাল বিদ্রোহের পূর্বে এই এলাকায় কোনো স্থায়ী মিশন বা কেন্দ্র গড়ে ওঠেনি। ১৮৫৫-৫৬ সালের হুলের পর অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এই এলাকায় স্থায়ীভাবে মিশন স্থাপনের কাজ শুরু

হয়। ব্যাপস্টিট মিশনারি সোসাইটির ধর্ম প্রচারক রেভারেন্ড.এ.লেক্সলি রাজমহলে খ্রিস্টধর্ম প্রচারে উদ্যোগী হন। তিনি উনিশ শতকের তিরিশের দশকে তৎকালীন ‘দামিন-ই-কোহ’-তে এসেছিলেন। তবে ১৮৪১ সালে শারীরিক অসুস্থতার কারণে ভারত ত্যাগ করেন। পরবর্তী সময়ে ব্যাপস্টিট মিশনারি রেভারেন্ড.আর.জে.এলিস বীরভূম জেলা ও সাঁওতাল পরগণার দক্ষিণাংশে কিছু প্রাথমিক কাজ সম্পন্ন করেন। কিন্তু ১৮৬৪ সালের শেষভাগে তাকে হঠাৎ বদলি করা এবং তার জায়গায় ব্যাপস্টিট মিশনারি মি.ই.সি জনসনকে প্রেরণ করা হয়। তিনি সাঁওতাল পরগণার ‘বেলবনি’ নামক সাঁওতাল গ্রামে প্রথম একটি কার্যালয় স্থাপন করেন। তবে এই অঞ্চলে মিশনারি কার্যক্রম গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন রেভারেন্ড.এল.ও.স্ক্রেফসরুড(Rev.L.O.Skrefsrud) ও রেভারেন্ড.এইচ.পি. বোরেসেন (Rev.H.P.Borresen). তাদের প্রচেষ্টায় সাঁওতাল পরগণার ‘বেনাগড়িয়ায়’ ১৮৬৭ সালে ২৬ই সেপ্টেম্বর ‘নর্দান ইভ্যানজেলিক্যাল লুথেরিয়ান মিশন’ প্রতিষ্ঠিত হয়। বলাবাহুল্য, এই মিশন প্রতিষ্ঠায় ই.সি. জনসনেরও যথেষ্ট অবদান ছিল। কারণ জনসন যে সময় বেলবনিতে সাঁওতালদের জন্য কাজকর্মে রত ছিলেন তখনই ড্যানিস মিশনারি বোরেসেন এবং তাঁর নরওয়েজিয়ান সহযোগী স্ক্রেফসরুডের সঙ্গে পরিচিত হন। তাঁরা দুজনেই গোসনার মিশনের মিশনারি ছিলেন এবং কিছু সময়ের জন্য পুরুলিয়ার কোল ও হিন্দুদের জন্য কাজ করেছিলেন। কিন্তু ১৮৬৫ সালের শেষের দিকে রাঁচির প্রধান মিশনারি রেভারেন্ড.ফার্দার বাৎসের সঙ্গে মত পার্থক্যের দরুন গোসনার মিশন ত্যাগ করেন এবং দুজনেই মিশনের কাজের জন্য নতুন জায়গার সন্ধান করতে থাকেন। সেই সময় জনসন তাদেরকে সাঁওতালদের মধ্যে কাজ করার জন্য প্রস্তাব দেন এবং বেনাগড়িয়ার সন্ধান দেন।[৪৯]

সাঁওতাল সমাজের লিপি ও সাহিত্যের বিকাশের ইতিহাসে এই মিশনের অবদান ছিল অপরিসীম। বেশিরভাগ সাঁওতালি ভাষা সাহিত্যের বই এই মিশন থেকে মুদ্রিত হয়েছিল। ১৯১০ সালে এই মিশনের নতুন নামকরণ করা হয়, ‘সান্তাল মিশন অফ নর্দান চার্চেস’। আবার এই মিশনকে ‘ইন্ডিয়ান হোম মিশন’ হিসাবে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা করা হয়। ১৯১১ সালে এই লুথেরান মিশনের সদর দপ্তর বেনাগড়িয়ার থেকে

দুমকায় স্থানান্তরিত করা হয়। এই মিশনে কর্মরত কয়েক জন গুরুত্বপূর্ণ মিশনারি হলেন[৫০]—

১) রেভারেন্ড.লারস.ওলসন স্ক্রেফসরুড

২) রেভারেন্ড.এডওয়ার্ড.সি.জনসন

৩) রেভারেন্ড.এইচ.পি.বোরেসন

৪) রেভারেন্ড.এডওয়ার্ড.কর্নেলিয়াস

৫) রেভারেন্ড.এফ.টি.কোল

৬) ডাক্তার গ্রাহাম

৭) রেভারেন্ড.স্কটিশ

৮) রেভারেন্ড.পি.ও.বোডিং

৯) রেভারেন্ড. আর.আর.রোজেনল্যান্ড

১০) রেভারেন্ড.জে.গসডাল

এই মিশন সাঁওতালদের কাছে 'ইন্ডিয়ান হোম মিশন' নামেও পরিচিত ছিল। কারণ মিশনের পরিচালন সমিতির সদস্যরা চেয়েছিলেন এই মিশনের কাজকর্মের জন্য ভারতবর্ষ থেকে অর্থ সংগ্রহ করা হবে। ১৮৬৮ সাল থেকে ১৮৭২ সাল পর্যন্ত ভারতবর্ষ থেকে অর্থ সংগ্রহের পরিমাণ ছিল প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা। তবে ১৮৭৭ সাল থেকে এই অনুদান সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায় এবং ভবিষ্যতে বিদেশি অনুদানের ওপর নির্ভরশীল হতে হয়। পরবর্তীতে ইন্ডিয়ান হোম মিশন নামে কাজকর্ম চালিয়ে গেলেও পূর্বের সেই চরিত্র আর বজায় ছিল না। অন্যদিকে এই মিশনের কাজকর্ম 'ব্যাপটিস্ট' আদর্শে পরিচালিত হতে থাকে। কারণ ভারতের অন্যান্য ব্যাপটিস্ট চার্চের সঙ্গে এই মিশনকে যুক্ত করা হয়। তবে এই মিশন ব্যাপটিস্ট আদর্শে পরিচালিত হলেও অন্যান্য মিশন থেকে ভিন্ন ধারা অবলম্বন করে। এই মিশনকে সাঁওতাল চার্চ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য এখানকার জনসাধারণের রীতিনীতি ও ঐতিহ্যকে অনুসরণ করার জন্য গুরুত্ব দেওয়া হয়। স্ক্রেফসরুডের এক বিবৃতিতে বলা হয়, 'সাঁওতালদের পূর্ব পুরুষদের ঠাকুর ও খ্রিস্টানদের ঈশ্বর এক ও অভিন্ন।'[৫১] সুতরাং এই মিশনের কাজকর্মে সাঁওতালদের

ঐতিহ্যকে যে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল তা পরিষ্কার। এই মিশন ছাড়াও ১৮৭০ সালের মধ্যে সাঁওতাল পরগণার বিভিন্ন এলাকায় একাধিক মিশন গড়ে ওঠে। 'ফ্রি চার্চ অফ স্কটল্যান্ড' জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম অংশের মধ্যে কার্যকরী ভূমিকা নেয়। অন্যান্য মিশন যেমন, 'পাকুড়ের আমেরিকান মেথডিস্ট এফিস্কোনাল', জামতাড়ায় 'প্লাইমাইথ ব্রাদারের মিশন', কারমার্টার ও মিহিজামে 'আমেরিকান সেভেন্থ ডে অ্যাডভেনসিরা' কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। আবার মিস্টার হেয়গার্ট সাহেব একটি নতুন মিশন প্রতিষ্ঠা করেন; যার প্রধান কার্যালয় ছিল বেথেলে। দুমকার কুমারাবাদ এবং ধরমপুরে এই মিশনের দুটি শাখা ছিল। এছাড়াও দেওঘর মহকুমায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, 'খ্রিস্টান ওমেন্স বোর্ড' এর মিশন। ফ্রেড্রিক থমাস কোল বা রেভারেন্ড কোল এই এলাকায় 'তালঝারি' মিশনের প্রতিষ্ঠা করেন।

সাঁওতাল পরগণায় এই সমস্ত মিশনগুলি সাঁওতালদের ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশের পাশাপাশি সেবা ও শিক্ষামূলক নানান উদ্যোগ গ্রহণ করে। মিশনারিগণ সাঁওতালদের শিক্ষিত করার জন্য এই জেলায় একাধিক বিদ্যালয় স্থাপন করে। এক্ষেত্রে চার্চ মিশনারি সোসাইটি ও ইন্ডিয়ান হোম মিশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ১৮৬০ সালের মধ্যেই সাঁওতাল পরগণায় ৬৫০ জন ছাত্রসহ ১২টি বালক ও ২০টি বালিকা বিদ্যালয় গড়ে ওঠে। আবার ১৯০৩-০৪ সালের মধ্যে দুমকা, কাঠিকুন্ড, বেনাগড়িয়ার, তালঝারি, সাহেবগঞ্জ, মধুপুর, পাকুড় প্রভৃতি জায়গায় প্রাথমিক বিদ্যালয়, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও কারিগরী বিদ্যালয় গড়ে ওঠে। সাঁওতালদের মধ্যে এ ধরনের শিক্ষামূলক প্রকল্প ঔপনিবেশিক সরকার দ্বারা প্রশংসিত হয় এবং অনেকক্ষেত্রে তা সরকারি অনুদান লাভ করে। কিন্তু আদিবাসীদের মধ্যে মিশনারিদের এই শিক্ষামূলক প্রকল্পের অন্তরালে ধর্মান্তকরণের যে একটা প্রয়াস ছিল তা লক্ষণীয়। মিশনারিরা আদিবাসীদের শিক্ষাদানের মাধ্যমে পশ্চিমাবর্গের অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছিল এবং অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় মিশনারি স্কুলে পড়া ছাত্রছাত্রীদের খ্রিস্টানধর্মের বাণী প্রচারের কাজে লাগানো হয়। এর উদাহরণ হিসাবে পি.ও. বোডিং এর এক লেখায় 'সোনা' নামক সাঁওতাল মেয়ের জীবন কাহিনি গুরুত্বপুর্ণ দৃষ্টান্ত রাখে। সেক্ষেত্রে দেখা যায় 'সোনা' মিশনারি স্কুলে শিক্ষালাভ করার সুযোগ পায় এবং তার প্রভাবে বহু আদিবাসী ধর্মান্তরিত হয়।[৫২] মিশন স্কুলগুলিতে পশ্চিমী শিক্ষাদানের পাশাপাশি আদিবাসী সমাজ ও ধর্মকে নানা ভাবে হেয়

করা হয়। আদিবাসী ছেলে মেয়েদের মিশনারি স্কুলে ভরতি হওয়ার পর কোনো রকম নাচ-গান করা যেত না, সমস্ত শরীরে ঢাকা পোশাক পরতে হত, উলকি আঁকা অপরাধ ছিল। অর্থাৎ মিশন স্কুলে পড়া ছেলে মেয়েদের তাদের ঐতিহ্যশালী সমাজ কাঠামো থেকে বিচ্ছিন্ন করার প্রচেষ্টা করা হয়।[৫৩] এ প্রসঙ্গে শুচিব্রত সেন তাঁর *ভারতের আদিবাসী* গ্রন্থে মন্তব্য করেন, 'খ্রিস্টানদের প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন বিদ্যালয় স্থাপনের একটি সুদূর প্রসারী ফল হল তাদের মধ্যে একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব। এরা পরবর্তীকালে বিভিন্ন আদিবাসী বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিল এবং স্বাধীনতার পরে সংসদীয় রাজনীতিতে এদের প্রাধান্য ছিল বা এখনও আছে। এর অন্য একটি অনিবার্য ফলশ্রুতি হল সাধারণ মুন্ডা জনগণ থেকে এদের দুরত্ব। জনজাতি হিসেবে এক হলেও শ্রেণীগত ভাবে এরা তথাকথিত এলিট শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হন, যদিও উচ্চবর্গের এলিটরা রাজনৈতিকভাবে এদের ব্যবহার করলেও সামাজিক স্বীকৃতিতে ছিলেন পরান্মুখ।[৫৪] আবার মেরিন কেরিন মনে করেন ব্রিটিশ শাসনের অধীনে তাদের জন্য নতুন শিক্ষাদান প্রক্রিয়াটিকেই শুধুমাত্র ব্যবহার করা হয়নি। এই সময় অত্যন্ত সুনিশ্চিত উপায়ে সাঁওতালি জ্ঞান জগৎকে পশ্চিমাবর্গগুলির আওতাভুক্ত করা হয়। মিশনারিদের এই ধরনের শিক্ষামূলক উদ্যোগ আদিবাসী তথা সাঁওতালদের স্বতন্ত্র সমাজ ও সংস্কৃতিকে সংকটাপন্ন করে তোলে।[৫৫]

অন্যদিকে মিশনারিদের সেবামূলক প্রকল্পের মধ্যে সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ ছিল চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান। সেই সময় সাঁওতাল পরগণায় সাঁওতালদের মধ্যে আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কে বিশেষ ধারণা ছিল না। মিশনারিদের মাধ্যমে এই জেলায় আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। ১৯০২ সালে জোহান সেন নামে এক ডেনিশ ধর্ম প্রচারক দম্পতির আগমনের মধ্য দিয়ে সাঁওতাল মিশনে চিকিৎসার কাজ শুরু হয়। তবে অসুস্থতা ও অন্যান্য কারণে কিছুদিনের মধ্যেই তাঁদের ডেনমার্কে ফিরে যেতে হয়। ১৯১৫ সালে ডঃ খ্রিস্টিন লার্সেন (Christine Larsen) এবং ডঃ বি.বি.বোর্গ ডেনমার্ক থেকে ভারতে আসেন। ডঃ লার্সেন দুমকা ও মাহারোতে কাজ করেন। ১৯২৩ সালে পি.ও.বোডিং মহুলপাহাড়িতে চলে আসেন এবং সেখানে তিনি ১৯২৩-৩৪ সাল পর্যন্ত একটি ছোট হাসপাতাল পরিচালনা করেন। বেনাগড়িয়ার হাসপাতালের জন্য ডঃ বোর্গ ১৯১৫-২৮ সাল পর্যন্ত সেখানে কাজ চালিয়ে যান। আবার ডঃ ব্যানার্জী নামে এক জন

বাঙালি খ্রিস্টান ডাক্তার ১৯২১ সালে বেনাগড়িয়ার হাসপাতালে যোগ দেন এবং সেখানে বহু বছর কাজ করেন। তবে মিশনারিরা অনেক ক্ষেত্রে এই চিকিৎসা পরিষেবাগুলিকে ধর্মান্তকরণের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেন।[৫৬] মিশনারি গবেষক ওলাভ হড্‌নে তাঁর *The seed bore fruit : A short History of the Santal mission of the northern churches (1867-1967)* গ্রন্থে এরকম একটি ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন। সেখানে দেখা যায় সুলুংগা গ্রামের বাসিন্দা মাক্র পরগণাৎ খ্রিষ্টধর্মের বিরুদ্ধে সক্রিয় বিরোধিতা করেছিলেন এবং তিনি সমস্ত মাঝি সম্প্রদায়ের লোকদের জড় করে সিদ্ধান্ত নেন যে, এক বিশেষ দিনে তারা মিশনারিদের এখান থেকে তাড়িয়ে দেবে। আর ধর্মান্তরিত সাঁওতালদেরও এক ঘরে করবে এবং তাদের সমাজ থেকে বের করে দেবে। কিন্তু এই ঘটনা ঘটার আগে পূর্বের অপরাধে মাক্র পরগণাৎ গ্রেপ্তার হন। প্রায় আট মাস পরে ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়ে মাক্র জেল থেকে ফিরে আসেন। স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের আশায় সে বহু সাঁওতাল বৈদ্যের শরণাপন্ন হন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। অবশেষে তাকে বেনাগড়িয়ার মিশনে নিয়ে আসা হয়। এই সময় স্ক্রেফসরুড তার কাছে গেলেন, তার জন্য প্রার্থনা করলেন এবং তাকে কিছু ঔষধ দিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই মাক্র সুস্থ হয়ে উঠলে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে এবং তার ছোটো ভাই নারানও খ্রিস্টানুসারী হন। অর্থাৎ এক্ষেত্রে দেখা যায় খ্রিস্টধর্মের বিরোধী মাক্র পরগণাৎকে খ্রিস্টধর্মের আওতায় নিয়ে আসার জন্য স্ক্রেফসরুড সাহেব চিকিৎসা পরিষেবাকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেন।[৫৭] তবে খ্রিস্টধর্মের প্রচার ও আদিবাসীদের ধর্মান্তকরণ মিশনারিদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল এবং এই বিষয়টি তারা কখনোই গোপন করেননি। *'The Fifty First Annual Report of the Santal Mission of the Northern Churches 1917-18'* এ উল্লেখিত আছে যে, 'The spread of christianity among the Santals is due more to the simple testimony of the village people than to anything else'.[৫৮] এই ধর্মান্তকরণে প্রথম দিকে বাধা অবশ্য এসেছিল, কেননা সাঁওতালরা তাদের ঐতিহ্য সমৃদ্ধ সমাজ সংস্কৃতিকে পরিত্যাগ করতে চায়নি। কিন্তু অন্যান্য ধর্ম প্রচারকদের তুলনায় খ্রিস্টানধর্ম প্রচারকরা আধ্যাত্মিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জাগতিক উন্নতির ব্যাপারে বিশেষ সজাগ ছিলেন এবং এটি সাঁওতালদের বেশি আকর্ষিত করেছিল। এর মধ্যে প্রধান হল শিক্ষা ও স্বাস্থ্য '...That a Santal who

had acquired some education, by the help of this may improve his position in life'.[৫৯]

এই পরিষেবাগুলি সাঁওতালদের মধ্যে একটি বড় প্রভাব ফেলেছিল এবং পরবর্তী সময়ে যা তাদেরকে খ্রিস্টধর্মের অধীনে নিয়ে আসে। এই সমস্ত সেবা পেয়ে সাঁওতালরা ধীরে ধীরে মিশনারিদের অনুগত হয়ে ওঠে এবং এভাবে সাঁওতালরা ধর্মান্তরিত হয়। অবিলম্বে এই ধর্মান্তরিত সাঁওতালরা প্রতিবেশীদের মধ্যে ধর্মপ্রচারের ধারণা ছড়িয়ে দিতে শুরু করে। বেনাগড়িয়া ও মহুলপাহাড়ির মিশন এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী কার্যকরী ভূমিকা রাখে। সাঁওতাল পরগণা জেলায় কতজন সাঁওতাল খ্রিস্টান হয়েছিলেন তার হিসেব পাওয়া যায় তৎকালীন আদমসুমারী রিপোর্টে। এল.এস.এস.ও'ম্যালে তাঁর *সান্তাল পরগণা ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার্সে* ধর্মান্তরিত সাঁওতালদের পরিসংখ্যান তুলে ধরেন। সেখানে দেখা যায় ১৮৭২ সালে ৩৯২ জন, ১৮৮৯ সালে ৩০৫৬ জন এবং ১৯০১ সালে ৯৮৭৫ জন সাঁওতাল খ্রিস্টানধর্ম গ্রহণ করেছিল।[৬০] আবার পি.সি. রায়চৌধুরী উল্লেখ করেন সাঁওতাল পরগণায় ৩-৪ শতাংশ সাঁওতাল খ্রিস্টানধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন।[৬১] ধর্মান্তরিত খ্রিস্টান সাঁওতালদের পরিচয় রক্ষা করার জন্য মিশনারিরা বেশ কিছু বিধি নিষেধ আরোপ করতে শুরু করে। যেমন মদ্যপান, ঐতিহ্যবাহী বোঙ্গা পুজো, দলগত নাচ নিষিদ্ধ করা হয়। তাছাড়া ঐতিহ্যবাহী সাঁওতালদের দেওয়াল চিত্রের পরিবর্তে খ্রিস্টের পরিচায়ক 'ক্রস চিহ্ন' আঁকা বাধ্যতামূলক করা হয়। আর এই 'ক্রস চিহ্ন' আঁকা বাড়িগুলিকে বিশেষ আর্থিক সুবিধা দানের কথা বলা হয় এবং বিভিন্ন কর থেকে সেই সমস্ত বাড়িগুলিকে মুক্ত করা হয়। এই সমস্ত নিয়মগুলি সাঁওতালদের মধ্যে বিভ্রান্তি ও বিভাজন তৈরি করে। ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশে উল্লেখযোগ্য অবদান থাকা সত্ত্বেও মিশনারিরা সাঁওতালদের মধ্যে দলাদলি সৃষ্টির জন্য দায়ী ছিল। আর এর ফলেই পরবর্তীতে সাঁওতালদের গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। যা শেষ পর্যন্ত সাঁওতালদের স্বতন্ত্র ঐতিহ্যবাহী কাঠামোতে আঘাত হানে।

হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাব

দুটি গোষ্ঠী দীর্ঘকালব্যাপী পাশাপাশি অবস্থান করলে উভয়ের মধ্যে পারস্পারিক আদান-প্রদান হওয়া এক ঐতিহাসিক অনিবার্যতা। ভারতবর্ষে প্রাচীনকাল থেকেই ব্রাহ্মণ্য ও

আদিবাসী সম্পর্কের পরিচয় পাওয়া যায়। রামায়ণে শম্বুক এবং মহাভারতে একলব্যের উল্লেখ রয়েছে। তারা উভয়ই আদিবাসী এবং উভয়ই ব্রাহ্মণের ঔদ্ধত্যের শিকার হয়েছিল, যাকে 'হিন্দুধর্ম' বলা হয় সেটি আসলে আধুনিক কালের নির্মাণ। এক সময় ব্রাহ্মণ্য ধর্মই সর্বাঙ্গীণ আধিপত্য বিস্তার করেছিল। এই ধর্ম ও সংস্কৃতি কালে কালে বৌদ্ধ ধর্মকেও আত্মসাৎ করে নেয়। রেনেসাঁ যুগে হিন্দুধর্ম থেকে কিছুটা পৃথক হয়ে যে 'ব্রাহ্ম' ধর্মের উৎপত্তি হয়, তা পরবর্তী সময়ে হিন্দুধর্মের মধ্যে বিলীন হয়ে যায়। আদিবাসীদের ক্ষেত্রে এই হিন্দু ধর্মীয় সংস্কৃতি কতটা প্রভাব বিস্তার করেছিল, সেটি মূল আলোচ্য বিষয়। তবে এই নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতান্তর রয়েছে। প্রথমেই অবশ্য উল্লেখ করা দরকার আদিবাসীরা কখনোই হিন্দু চতুবর্ণাশ্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। এক্ষেত্রে পার্থ চ্যাটার্জীকে উল্লেখ করে বলা যায়, রেনেসাঁর সময় বাঙালি হিন্দু সংস্কৃতির যে জাগরণ ঘটেছিল, সেই "Inner-Domain"-এর সঙ্গে আদিবাসীদের "Inner-Domain"-এর সুস্পষ্ট পার্থক্য বর্তমান।[৬২] এই আলোচনায় প্রবেশ করার পূর্বে উভয় সংস্কৃতির একটি সংজ্ঞা নিরূপণ করা প্রয়োজন। ব্রাহ্মণ্য বা হিন্দু সংস্কৃতি আহৃত হয়েছিল মূলত মনুসংহিতা এবং বিভিন্ন পুরাণ ও মহাকাব্যিক সূত্র থেকে। কিন্তু আদিবাসীদের ক্ষেত্রে এর কোনোটিই বিবেচ্য ছিল না। যে কোনো আদিবাসী গোষ্ঠী তার স্বতন্ত্র মর্যাদার জন্য সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয় তার সংস্কৃতিকে। সংস্কৃতি সম্পর্কে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন—"কমল-হীরের পাথরটাকেই বলে বিদ্যে, আর ওর থেকে যে আলো ঠিকরে পড়ে তাকেই বলে কালচার।"[৬৩] এখানে পুঁথিগত বিদ্যার এবং সংস্কৃতির একটা সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায়। অন্যদিকে ইউরোপীয় সংস্কৃতিতেও এই বিদ্যালাভকেই মূল বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

ইংল্যান্ডে ভিক্টোরিয়ান যুগে সংস্কৃতিবান বলতে তাকেই বোঝানো হত, যে বিদ্যালয়ে যায়, শেকস্‌পিয়ার পড়ে এবং শ্যাম্পেনে চুমুক দেয়। পশ্চিমী শিক্ষার ফলে আমরা প্রধানত অঙ্গিভূত করেছি প্রথাভিত্তিক শিক্ষা লাভকে। অথচ বিখ্যাত সাংস্কৃতিক বিশেষজ্ঞ লরেন্স গ্রসবার্গ (Lawrence Grossberg) বলেন যে, তিনি অধিকাংশ সংস্কৃতির ইতিহাসকে বিবেচনা করেছেন—'Against its frustratingly euro-centric and euro-modern inheritances and tendencies'.[৬৪] কিন্তু এর প্রয়োগ হল 'It is about the contemporary struggle in their thought imagination and the

posibilities for action as a part of the larger contextual struggles over modernity itself'.[৬৫] ইউরোপ কেন্দ্রিকতার বাইরে বেরিয়ে আসার সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আধুনিকতার বিশ্লেষণ তার মূল লক্ষ্য। যেখানে আদিবাসী সমাজ আধুনিকতার কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত কি না সেটিও প্রভূত বিতর্কের। এই পরিপ্রেক্ষিতেই বলা যেতে পারে, এই সংজ্ঞা আদিবাসীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। আবার এমিল ডুর্খাইমের মতে সমাজ থেকেই এর উৎপত্তি।[৬৬] অন্যদিকে ১৮৭১ সালে নৃতত্ত্ববিদ এডওয়ার্ড টেলর (Edward Tylor) সংস্কৃতির যে সংজ্ঞা নিরূপণ করেন তা অনেকটাই আদিবাসীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তাঁর মতে—"Culture or civilisation taken in its wide (comparative) ethnographic scene is that complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom and any other capabilities and habits acquired by man as a number of society".[৬৭] এখানে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয়টি হল কোনো প্রথাগত বিদ্যার কথা নেই। এই পরিপ্রেক্ষিতে রেমন্ড উইলিয়াম (Raymond William) মনে করেন সংস্কৃতি হল 'a particular way of life'.[৬৮] কিন্তু বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠীদের মধ্যে সাংস্কৃতিক পার্থক্য আছে। এই পার্থক্য কেন? এ প্রসঙ্গে জার্মান নৃতত্ত্ববিদ ফ্রাঞ্জ বোয়াস (Frantz Boas) বলেন—"Environment, culture as well as physical, had a determing effect on the way one views the world".[৬৯] বস্তুতপক্ষে এই সংজ্ঞা সাংস্কৃতিক আপেক্ষিকতাবাদ (Cultural Relativm). আদিবাসী সংস্কৃতি তার বিভিন্ন গোষ্ঠী স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও পরিবেশ ও স্ব-সমাজ থেকেই জন্ম নিয়েছে। সুতরাং পরিবেশ ও সমাজের ভিন্নতা সংস্কৃতির ভিন্নতাকেই চিহ্নিত করে।

ভারতীয় প্রেক্ষাপটে ঔপনিবেশিক সরকার আদিবাসীদের 'ট্রাইব' নাম দিয়ে অন্যান্য জাতি বা গোষ্ঠী থেকে পৃথকভাবে দেখানোর চেষ্টা করে, তেমনি অন্যদিকে আদিবাসীদের ওপর হিন্দু প্রভাবের বিতর্কের সূত্রপাত ঘটে ঔপনিবেশিক সরকারের করা সেনসাস্ রিপোর্টের মাধ্যমেই। বিভিন্ন সেনসাস্ রিপোর্টে আদিবাসীদের ধর্ম হিসেবে 'জড়োপাসনা' বা 'অ্যানিমিজম'-এর উল্লেখ থাকলেও পরবর্তীতে তাদের নিম্ন হিন্দু হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করা হয়। ১৮৯১ সালে ভারতের সেনসাস্ কমিশনার জে.এ.বেইনস বলেন বহু জনজাতি গোষ্ঠী বর্তমানে হিন্দু হয়ে গেছে। আবার হার্বার্ট রিজলে তাঁর ১৯১১ সালের সেনসাস্ রিপোর্টে উল্লেখ করেন, হিন্দুধর্ম এবং

জড়োপাসনার মধ্যে কোনো স্পষ্ট পার্থক্য করা সম্ভব নয়। ১৯২১ সালের বোম্বাইয়ের সেনসাস্ সুপারিন্টেন্ডেন্ট বলেন—"আমার বলতে কোনো দ্বিধা নেই যে অ্যানিমিজম বা জড়োপাসনা কথাটাকে ধর্মের সংজ্ঞা হিসেবে একেবারে বাতিল করে দেওয়া উচিত। যাদের 'অ্যানিমিস্ট' নামে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে, তাদের সকলকেই 'হিন্দু' নামে তালিকাভুক্ত করা উচিত।"[৭০] এ প্রসঙ্গে ১৮৮৪ সালে বাংলা প্রেসিডেন্সির প্রশাসন ভারত সরকারের কাছে লেখা এক চিঠিতে উল্লেখ করেন—'১৮৮১ এর আদমশুমারি থেকে বোঝা যায় কী দ্রুত গতিতে আদিম জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় বিশ্বাস লোপ পেয়ে যাচ্ছে এবং কীভাবে আদিম গোষ্ঠীগুলি হিন্দু ব্যবস্থার অঙ্গীভূত হয়ে পড়ছে।'[৭১]

তবে, আদিবাসী ও হিন্দু সম্পর্কের বিষয়ে নৃতত্ত্ববিদ, সমাজতত্ত্ববিদ ও ঐতিহাসিকদের মধ্যে একটি বিতর্কের অবকাশ রয়েছে। প্রাচীন নৃতাত্ত্বিকদের মধ্যে ফারসাইথ (Forsyth) তাঁর *The Highlands of Central India* গ্রন্থে উল্লেখ করেন—"বৈগা, ভীল, গোন্দ, কোল, কোরকু ও সাঁওতাল প্রভৃতি বিশিষ্ট জনজাতিদের মধ্যে কারা ভারতের প্রকৃত আদিম অধিবাসী অথবা কারা প্রথমে ভারতে এসে বসতি স্থাপন করেছে, তা সম্ভবত কখনোই জানা যাবে না। ... এদের আচার ধর্ম ও ভাষার সঙ্গে হিন্দুদের আচার ধর্ম ও ভাষা এমনভাবে মিশে গেছে যে তাদের আদিম বৈশিষ্ট্য এখন খুঁজে বের করা অসম্ভব। আধুনিক হিন্দু ধর্মাবলম্বী বিরাট জাতিগুলির সঙ্গে এরাও ক্রমশ মিশে যেতে চলেছে, তবুও এদের বর্তমান অবস্থা হিন্দু সমাজ থেকে অনেক ব্যাপারে বিশিষ্ট এবং পৃথক।"[৭২] ভাষার মাধ্যমে হিন্দু প্রভাবের কথা বলতে গিয়ে ই. টি. ডালটন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *Descriptive Ethnology of Bengal (1872)* এ হিন্দু ও আদিবাসী সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোনো পরিবর্তনের কথা না বললেও খাঁটি আদিবাসী আর হিন্দু আদিবাসী বলে দুটি ভাগের কথা বলেন। তাঁর মতে—'আদিবাসীরা তাদের আদিভাষা ভুলে গেছে, তাদের গোড়ার ইতিহাস অবিকৃত রাখেনি; আচার এবং ধর্মের বিষয়ে তারা বেশ হিন্দুভাবাপন্ন। নিজ ঐতিহ্য থেকে প্রধানত বিচ্যুতি ঘটেছে ভাষার ক্ষেত্রে।'[৭৩] এ পরিবর্তনের নিপুণতম বিশ্লেষণ আমরা পাই সরকারি আমলা রিজলের লেখায়। তিনি তাঁর—*The Tribes and Castes of Bengal (1891)* গ্রন্থে আদিবাসীরা সম্পূর্ণভাবে হিন্দু হয়ে গেছে বলে মন্তব্য করেন এবং এক্ষেত্রে তিনি চারটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আদিবাসীদের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের বিলুপ্তকরণকে বর্ণনা করেন।[৭৪] আবার ১৯১৫ সালে

প্রকাশিত এক লেখায় তিনি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন, বর্তমান সময়ে সমগ্র ভারতবর্ষে আদিবাসীরা ধীরে ধীরে এবং তাদের অজ্ঞাতসারে ‘জাতিতে’ রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে।[৭৫] এক্ষেত্রে জি. এস. ঘোরে (G.S.Ghurye) আবার আদিবাসীদের ‘backward section of Hindu society’ বলে অভিহিত করেন।[৭৬] পরবর্তীকালে অবশ্য তিনি এই ধারণা থেকে সরে এসেছেন।

ইতিহাসগতভাবে এটা লক্ষণীয় যে, কিছু জনজাতির মধ্যে সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের বিষয়টির প্রতি একরকম আসক্তি রয়েছে। ভৌগোলিক পরিমণ্ডল, অন্যান্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে পাশাপাশি বসবাস, কৃষি অর্থনীতি ও আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়াগুলি সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের জন্য মূলত দায়ী। পারিপার্শ্বিক ধর্মীয় বিশ্বাসের সঙ্গে সমঝোতার বিষয়টিও (বিশেষ করে হিন্দুধর্মের) গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, জাতিপ্রথার কঠোরতার বাইরে বেরিয়ে যা ভারতীয় সমাজব্যবস্থাকে একটি বিশেষ গতিদান করে। আর তা হল নিম্নবর্গের মানুষের দ্বারা উচ্চবর্গের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের অনুকরণ। এম.এন. শ্রীনিবাস ১৯৫২ সালে প্রকাশিত এক পত্রে এই সমন্বয়ের বিষয়টিকে ‘সংস্কৃতায়ন’ (Sanskritisation) বলে উল্লেখ করেন। এক্ষেত্রে বলা বাহুল্য এম.এন. শ্রীনিবাস ব্রাহ্মণ্য প্রভাব অপেক্ষা ‘সংস্কৃতায়ন’ শব্দটি বেশি ব্যবহার করেন। জাতি প্রথা ছিল হিন্দু ধর্মের মূল বিষয়। আর এই জাতি প্রথাকে ভিত্তি করেই তিনি তাঁর মতামতকে উপস্থাপিত করেছেন। যদিও ১৯৫০ সালে প্রখ্যাত ভাষাবিদ এবং ঐতিহাসিক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ‘সংস্কৃতায়ন’ (Sanskritisation) এর মডেল নিয়ে সমালোচনা করেছেন। এম.এন. শ্রীনিবাস বিষয়টিকে গঠনগতভাবে ব্যবহার করলেও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সংস্কৃতিগত দিক থেকে বিচার করেছেন। তবে মূল বিতর্কের সূত্রপাত ঘটে এম.এন. শ্রীনিবাস এর মতামতকে ঘিরেই। তিনি তাঁর *Social Change in Modern India (1982)* গ্রন্থে বলেছেন যে, ‘Sanskrtization is the process by which a low Hindu caste or tribal or other group, changes its customs, rituals, ideology and way of life in the direction of a high and frequently twice – born caste’.[৭৭] আবার ডি.এন. মজুমদারের মতে বহু শতক ধরে বিভিন্ন ভাবে এই সমন্বয়ের বিষয়টি চলে আসছে। তিনি বলেন প্রথম পর্যায়ে এর সূত্রপাত হয়েছিল যখন হিন্দুরা সাঁওতালদের শূকর পালন ও এর মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ করে। আর এর দ্বিতীয়

পর্যায়ে ছিল তাদের ঐতিহ্যগত রীতিনীতির সঙ্গে হিন্দু ধর্মের দেবতা কালী, দুর্গা ও অন্যান্যদের ধীরে ধীরে গ্রহণ করা। এই সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের তৃতীয় পর্যায়ে স্বাভাবিক ভাবেই উঠে আসে উচ্চশ্রেণীর ভাষার আত্তীকরণ। আর এই ভাবেই হিন্দু ধর্মের কিছু রীতিনীতি গ্রহণ করে সাঁওতালরা উচ্চতর সামাজিক সমন্বয়ের পথে নিজেদের উত্তরণ ঘটায়।[৭৮] অন্যদিকে নির্মল কুমার বসু তাঁর *হিন্দু সমাজের গড়ন (১৯৪১)* গ্রন্থে বলেন— 'ব্রাহ্মণ্য সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থার সহিত সেই সমাজে প্রচলিত ছোট-বড়র ভেদাভেদও কোল ভাষাভাষী জাতিবৃন্দের মধ্যে সংক্রমিত হওয়ার ফলে, তাহারা কার্যত হিন্দু সমাজের অন্তর্গত একটি জাতিতে পরিণত হইল'।[৭৯] হিন্দু সমাজব্যবস্থায় তাদের আত্তীকরণ জনজাতীয় সমাজকে এক রকম নিশ্চয়তা প্রদান করে এবং এটা নিশ্চিত করে যে এই সমাজব্যবস্থার গঠনমূলক কার্যকলাপ অন্যান্য সম্প্রদায়ের থেকে সুরক্ষিত। আর এই প্রভাবের মূলে তিনি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আধিপত্যকে দায়ী করেছেন। তাঁর কথায়— 'Culture…flows from politically and economically dominant one. In social Matters too the former occupies a higher status in contrast to the last'.[৮০] আবার নিম্নবর্গের (Subaltern) ইতিহাসবিদগণ সংস্কৃতায়ন প্রক্রিয়া সম্পর্কে এক নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁদের মতে সংস্কৃতায়ন হল এক ধরনের রূপান্তর প্রক্রিয়া। অর্থাৎ আদিবাসীদের নিজস্ব চেতনায় সশস্ত্র বিদ্রোহের ব্যর্থতার ফলে একদিকে আত্মানুসন্ধান আর অন্যদিকে হিন্দু আধিপত্যের প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। এই আলোচনা প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আদিবাসীদের মধ্যে কিছু কিছু হিন্দু প্রভাব প্রবেশ করলেও তারা সম্পূর্ণ হিন্দু হয়ে গিয়েছিল এটা কখনোই বলা যাবে না। এই প্রসঙ্গে ভার্জিনিয়াস জাক্সা (Virginus Xaxa) তাঁর '*Transformation of Tribes in India: Terms of Discourse*' নামক প্রবন্ধে উল্লেখ করেন যে, 'Indeed, the whole argument of the transformation of tribe into caste seems to be misplaced and even erroneous'.[৮১] আবার বিনয়ভূষণ চৌধুরি তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন আদিবাসীদের পক্ষে হিন্দু ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম ছিল। কারণ সাঁওতালদের যে মাঝি প্রথা বা সমাজ সংগঠন ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল সেটির জন্য মূলত দায়ী ছিল বহিরাগত হিন্দুরা। রাষ্ট্রের সঙ্গে মিলিত ভাবেই তারা আদিবাসী আন্দোলনগুলিকে ধ্বংস করে।[৮২]

এই সাংস্কৃতিক আদান প্রদানের ক্ষেত্রে অনেকেই আবার 'ট্রাইবালাইজেসন' (Tribalisation) বা 'জনজাতিকরণের' পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। নীহাররঞ্জন রায় তাঁর *বাঙ্গালীর ইতিহাস (১৯৪৯)* গ্রন্থে দেখানোর চেষ্টা করেন কোথাও কোথাও হিন্দু সমাজের ওপর আদিবাসী সংস্কৃতির প্রভাব সুস্পষ্ট। তিনি মনে করেন বাঙালিদের মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত বহু জিনিসই সাঁওতাল জনজাতি থেকে প্রাপ্ত। যেমন—ধান, দূর্বা, কলা, নারকেল, সিন্দুর, সুপারি ইত্যাদি। পিতা মাতার মৃত্যু হলে মস্তক মুন্ডন বা দামোদরে (হিন্দুদের ক্ষেত্রে গঙ্গা) অস্থি বিসর্জন সাঁওতালদের প্রথা থেকেই আহরিত। এমনকি কোনো শুভ কাজের আগে আভ্যুদায়িক বা পিতৃ-পুরুষের পুজোও জনজাতি প্রথা।[৮৩] এ সম্পর্কে আবার পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন তাঁর *ভারতের সংস্কৃতি* গ্রন্থে বলেছেন যে, 'শ্রাদ্ধ' সম্পর্কিত ধারণাটাই আর্যদের ছিল না। মহাভারত থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি দেখিয়েছেন যে, নিমির পুত্র আত্রেয় তাঁর পিতার শ্রাদ্ধ করার পর আক্ষেপ করেছিলেন,

'ন চ শ্রুত; ময়া পূর্ব;
ন দৈবীঋষিভি কৃতম্'।[৮৪]

অর্থাৎ আমি এ (শ্রাদ্ধ) সম্পর্কে কখনো পূর্বে শুনিনি, দেব-ঋষিরাও এই কাজ করেননি। যখন অন্যান্য ঋষিরা এসে বললেন, এর পর থেকেই এই প্রথা চালু হল। বস্তুত এই প্রথা জনজাতি সাঁওতালদের থেকে আহৃত। এ প্রসঙ্গে সুধীররঞ্জন দাস বলেছেন যে, 'অষ্ট্রিকগণই লিঙ্গ ও যোনি পূজার উদ্ভাবন করিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে লিঙ্গ শব্দও অষ্ট্রিক ভাষা হইতে উদ্ভূত। ধর্মানুষ্ঠান উত্থাপনের নিয়ম-নিষ্ঠাও অষ্ট্রিকগণ কর্তৃকই প্রবর্তিত হইয়াছে। বরণ করিবার প্রথা, আলপনাচিত্রণ প্রভৃতিও অষ্ট্রিকগোষ্ঠীরই দান।'[৮৫] আবার ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, বাংলার লৌকিক মানুষ প্রকৃতিতে অষ্ট্রিকভাষী অনার্য প্রভাবই ছিল সর্বাধিক।[৮৬] ভাষাবিদগণ প্রমাণ করেছেন যে সংস্কৃত ভাষার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে সাঁওতালি শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। পরিমল চন্দ্র মিত্র তাঁর *Santhali: The Base Of World Language* গ্রন্থে কোল শব্দ কীভাবে বৈদিকে, প্রাকৃতে ও সংস্কৃতে রূপ লাভ করেছে তার উদাহরণ দিয়েছেন।[৮৭] আবার শরৎচন্দ্র রায়ের মতে আদিবাসীরাই প্রথম পঞ্চায়েত ব্যবস্থার প্রবর্তক। সাক্ষ্য দেওয়ার পূর্বে আদিবাসীরা শপথ নিয়ে বলতেন—

'সিরমারে সিঙ্গ বোঙ্গা
ওতরে পঞ্চ।'[৮৮]

অর্থাৎ আকাশে সূর্যদেবতা ও পৃথিবীতে পঞ্চের নামে শপথ নিয়ে বলছি। কিন্তু কুমার সুরেশ সিং এর আলোচনা একটু ভিন্ন ধরনের। তাঁর মতে বহিরাগত সব হিন্দু গোষ্ঠীর ওপর আদিবাসী সংস্কৃতির প্রভাব সমান গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। উচ্চবর্ণ বা উচ্চবর্গের ক্ষেত্রে এ প্রভাব পড়েনি, থাকলেও তা নগণ্য।[৮৯] ক্ষেত্রসমীক্ষায় উঠে আসা তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায়, সাঁওতাল পরগণায় বিভিন্ন নিম্নহিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে (বিশেষ করে তেলি, ডোম, গোয়ালা, হাড়ি, মুচি) আদিবাসী সংস্কৃতির প্রভাব কিছুটা ছিল। এর উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, দুমকা জেলার 'চুটো নাথ' (আদিবাসীদের বোঙ্গার একটি রূপ) নামে এক দেবস্থানের কথা। এই দেবতা একটি শিলাখণ্ড রূপে প্রতিষ্ঠিত। যার প্রধান পূজারী আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষ। যেখানে নিম্ন জাতির হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষেরা নানান মানত পূরণের উদ্দেশ্যে আসেন। এই দেবতার প্রধান অর্ঘ্য হাঁড়িয়া। নিম্নহিন্দুর মানুষেরা এই সমস্ত অর্ঘ্য ও মোরগ বলিদানের মধ্যে দিয়ে সেখানে পূজার্চনা করে থাকে। আবার এই এলাকায় আদিবাসীদের বিবাহের বিভিন্ন রীতিনীতি নিম্ন হিন্দুদের মধ্যে বর্তমান। যেমন, পাত্র-পাত্রীর শাল পাতায় বসে বিবাহ কার্য করা, বিবাহের পূর্বে জলকে নিমন্ত্রণ করা, গাছকে পুজো দেওয়া প্রভৃতি। কিন্তু সেখানকার ব্রাহ্মণদের মধ্যে এর কোনো প্রভাব ছিল না।[৯০] তাই কুমার সুরেশ সিং এর মতামতের সঙ্গে ক্ষেত্রসমীক্ষায় উঠে আসা তথ্যের অনেক মিল পাওয়া যায়। কিন্তু সংস্কৃতির বিনিময় একমুখী থাকে না। দুটি ভিন্ন সংস্কৃতি পরস্পরের সংস্পর্শে তার প্রভাবশালী আপাত উৎকৃষ্ট দিকগুলি অন্য পক্ষ গ্রহণ করে। প্রতিদ্বন্দ্বী দুইটি জনগোষ্ঠী পরস্পরের সম্মুখীন হলে তাদের প্রাথমিক সংঘাতের অবসানে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান শুরু হয়। এক্ষেত্রেও যে তার ব্যতিক্রম হয়নি, তা কলিয়ানগুরুর *হড়কোরেন মারে হাপড়ামকো রেয়া:ক কাথা* গ্রন্থে তার সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে।

অষ্টাদশ শতকের শেষ ও ঊনবিংশ শতকের প্রথম দিকে বহিরাগত হিসেবে সাঁওতালরা সাঁওতাল পরগণায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। তবে সাঁওতাল পরগণায় শুধু সাঁওতালদের বসবাস ছিল না; অন্যান্য জনজাতির পাশাপাশি বহু হিন্দু জাতির মানুষের বসবাস ছিল। পাহাড় ও জঙ্গলময় এই এলাকাটির আদি বাসিন্দা ছিল, পাহাড়িয়া নামে এক জনজাতি। পাহাড়িয়ারা চাষবাসের প্রতি অনীহা দেখালে ১৮৩৭ সালে জেমস পন্টেট দামিন-ই-কোহ কে সাঁওতালদের জন্য উন্মুক্ত করে দেন।[৯১] সাঁওতালরা সেখানকার জঙ্গলময় ভূমি পরিষ্কার করে চাষবাস শুরু করে এবং ধীরে ধীরে

তারা পূর্বের পশুচারণ বৃত্তির পরিবর্তে স্থায়ী কৃষকে পরিণত হয়। সাঁওতালরা যখনই তাদের পুরাতন বৃত্তি ছেড়ে স্থায়ী কৃষিকে রূপান্তরিত হয়েছে তখনই কৃষিকাজের প্রয়োজনে হিন্দু জাতির মানুষের সঙ্গে নানান ভাবে আদান-প্রদান ঘটতে থাকে। তাছাড়া, কৃষিকাজের শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে বহু হিন্দু ব্যবসায়ী, মহাজনরা এই অঞ্চলে স্থায়ী বসবাস শুরু করে। ১৮৫৫-৫৬ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহের ফলে সাঁওতালরা নিজস্ব ভূখণ্ড লাভ করলেও কোনো আইনই দিকুদের অনুপ্রবেশকে রোধ করতে পারেনি। তৎকালীন সেন্‌সাস রিপোর্টের পরিসংখ্যানে এটা পরিষ্কার যে বিদ্রোহ পরবর্তী সময়ে হিন্দুদের সংখ্যা দ্রুততার সঙ্গে বৃদ্ধি পায়। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে আদিবাসীদের উন্নয়নে নেহেরুর নেওয়া পরিকল্পনাগুলি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আদিবাসী অঞ্চলগুলোতে এক বৃহৎ সংখ্যক হিন্দুদের প্রবেশ ঘটে। অন্যদিকে অভিপ্রয়াণের দরুন এই অঞ্চলের সাঁওতালরা দিন মজুরের কাজে হিন্দু এলাকায় যুক্ত হয়। এক্ষেত্রে দেখা যায়, আদিবাসী জনগোষ্ঠী স্পষ্টতই আঞ্চলিক উন্নয়নের সুফল পেতে ব্যর্থ হয়েছে। নিজের এলাকায় দিকু অধিবাসীদের সঙ্গে শিল্প বা সরকারি চাকরী, কলেজে ভর্তির জন্য, এমনকি তাদের নিজস্ব জমি ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেনি। কাজেই তাদেরকে রুজি-রোজগারের সন্ধানে নিজের এলাকা ছেড়ে বাইরে যেতে হয়েছে আর তাদের এলাকা দখল করেছে বহিরাগত দিকু বা হিন্দুরা। সাঁওতাল পরগণা ও ছোটোনাগপুর এলাকায় অভিবাসন প্রক্রিয়ায় (Immigration) আগত হিন্দু ও নিজেদের এলাকা ছেড়ে চলে (Emigration) যাওয়া সাঁওতালদের পরিসংখ্যান মাইরন ওয়েইনার (Myron Weiner) তাঁর *Son of the Soil: Migration and Ethnic Conflict in India* গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে বর্ণনা দিয়েছেন। গ্রন্থটিতে প্রাপ্ত একটি পরিসংখ্যান নিম্নরূপ[৯২]—

বছর	অভিবাসন(**Immigration**)	স্বভূমিত্যাগ (**Emigration**)
১৮৯১	৯৬,০০০	৩৩৩,০০০
১৯০১	১৭৯,০০০	২৮২,০০০
১৯১১	২৯৩,০০০	৭০৭,০০০
১৯২১	৩০৭,০০০	৯৪৭,০০০
১৯৩১	৩০৭,০০০	জানা নেই
১৯৪১	জানা নেই	জানা নেই
১৯৫১	৪৮০,০০০	জানা নেই
১৯৬১	৯৩৫,৬০০	জানা নেই

বর্তমান গবেষকের ক্ষেত্রসমীক্ষায় উঠে আসা তথ্যের সঙ্গে এই পরিসংখ্যানের অনেক ক্ষেত্রেই মিল পাওয়া যায়। কারণ সাঁওতাল বিদ্রোহের পরবর্তী সময়ে সাঁওতাল পরগণায় হিন্দুদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। তেমনি অন্যদিকে সাঁওতালদের স্বভূমি ত্যাগের পাশাপাশি সাঁওতাল চাষীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ১৮৭২ এর প্রথম সেনসাস্ এই জেলায় সাঁওতালদের সংখ্যা ছিল ৬,৫৯৪ জন, ১৯০১-এর জনগণনায় সেটা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৪৭,২২১ জনে আবার ১৯৩১ এ এর সংখ্যা হয় ৬৪,০৭৯ জন।[৯৩] ফলে হিন্দু জাতির মানুষের সঙ্গে সহাবস্থান ও কর্মসূত্রে এখানকার সাঁওতালরা নানাভাবে তাদের সংস্কৃতি, চিন্তা-চেতনা ও ভাবধারার দ্বারা প্রভাবিত হয়। এ প্রসঙ্গে নির্মল কুমার বসু তাঁর *'The Hindu method of Tribal absorption'* প্রবন্ধে উল্লেখ করেন যে—'Different agents and contact situations and the backward and tribal communities tried to absorb themselves in the Hindu religion and society by giving farewell to their own age-old customs, rituals, values and other creative forms of expressions'.[৯৪] এই প্রবন্ধে অবশ্য নির্মল কুমার বসু মূলত মুণ্ডাদের ওপর হিন্দু প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেছেন। সাঁওতালদের প্রসঙ্গ প্রায় আসেনি বললেই চলে, এখনও লক্ষ করলে দেখা যায় যে সাঁওতাল গ্রামগুলি হিন্দু বসতি থেকে স্বতন্ত্র অবস্থান করে। বস্তুতপক্ষে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সাঁওতাল-হিন্দু সহাবস্থান থাকলেও সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই পার্থক্য বিদ্যমান। ক্ষেত্রসমীক্ষায় অবশ্য দেখা যায় যে, তারা বর্তমানে দুর্গা, কালী, লক্ষী ও সরস্বতী পুজোয় অংশগ্রহণ করলেও সেগুলি তাদের সংস্কৃতির অঙ্গীভূত হয়ে ওঠেনি। বিশেষত ভাষার ক্ষেত্রে তো একথা সর্বাংশে সত্য। রেভারেন্ড. জন. হফম্যান (Rev. John Hoffman) তাঁর *Encyclopaedia Mundarica* গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন, "Since The Mundas can not continue much longer as a separate people language is doomed to disappear altogether from the list of living languages in a comparatively short time".[৯৫] এ প্রসঙ্গে সুহৃদ ভৌমিক (Suhrid Bhowmik) আরো বলেছেন যে, 'The Ho language is a by product of the Munda language, just like prakrit form to sanskrit. The Santals are the largest tribe in India to retain an aboriginal language to the present day'.[৯৬] আবার সীতাকান্ত মহাপাত্রের মতে, সাঁওতালদের দেবতা আবাহন মন্ত্র এবং মোরিয়া সংগীত মনে করিয়ে দেয় কৃষির সমৃদ্ধির জন্যে বৈদিক মন্ত্রের প্রার্থনা।[৯৭]

হিন্দু ধর্মের সঙ্গে ঐতিহ্যবাহী সাঁওতাল ধর্মের সচেতন বিকাশের এই প্রক্রিয়ার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সংগ্রামটি ১৮৭১ সালের খেরওয়াড় আন্দোলনের মাধ্যমে সংঘটিত হয়েছিল। সাঁওতাল পরগণার সাঁওতাল সমাজ হিন্দু সমাজ-সংস্কৃতি ও ধর্মের দ্বারা কতটা প্রভাবিত হয়েছিল, তার গভীরতা নির্ধারণে ঔপনিবেশিক সময়ে গড়ে ওঠা 'খেরওয়াড়' বা 'সাপাহড়' আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ১৮৫৫ সালের হুলের ব্যর্থতার পরও সাঁওতালদের মন থেকে স্বাধীন সাঁওতালরাজ গঠনের স্বপ্ন ম্লান হয়ে যায়নি। বিভিন্ন কারণে হুলের পরবর্তী সময়েও সাঁওতালদের মধ্যে ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব অব্যাহত ছিল। তারা ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সরাসরি সংঘর্ষে আসার নীতি ত্যাগ করলেও বিভিন্ন ভাবে সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টির কৌশল অবলম্বন করে।[৯৮] বিদ্রোহের পরবর্তী সময়ে ব্রিটিশ সরকার 'সাঁওতাল পরগণা' নামে স্বতন্ত্র ভূখণ্ড গঠন করলেও সাঁওতালরা বিশেষভাবে লাভবান হয়নি। পুনরায় খাজনা বৃদ্ধি পায়, মাঝিদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয় এবং মহাজনদের অত্যাচার বাড়তে থাকে। আবার সেই সঙ্গে নতুন আদমশুমারি করার ঘোষণা সাঁওতালদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার করে, যা খেরওয়াড় আন্দোলনের পটভূমি তৈরি করে। ১৮৬১, ১৮৬৫ সালের আন্দোলন থেকে এমনকি ১৮৫৫ সালের হুল থেকেও খেরওয়াড় আন্দোলন স্বতন্ত্র ছিল। পূর্বের আন্দোলনগুলির মতো উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে বিশেষ পার্থক্য না থাকলেও আন্দোলন পরিচালনার কৌশলগত বা আদর্শের দিক দিয়ে অনেকটাই পৃথক ছিল। মূলত এই আন্দোলনের দুটি দিক ছিল—১) রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ২) সামাজিক-ধর্মীয়। প্রথম উদ্দেশ্যের মধ্যে ছিল খাজনা আরোপ ও বৃদ্ধি প্রতিরোধ করা এবং সাঁওতাল অঞ্চল থেকে ব্রিটিশ ও তাদের সহযোগীদের তাড়িয়ে স্বাধীন সাঁওতালরাজ গঠন করা। আর দ্বিতীয় উদ্দেশ্যের মধ্যে ছিল, সাঁওতাল সমাজের পুনরুজ্জীবনের জন্য সংস্কার প্রবর্তন করা। আর এ জন্যই এই আন্দোলনে সাঁওতালরাজের প্রতীক হিসেবে 'খেরওয়াড়' নামটির প্রচলন হয়।[৯৯] স্বতন্ত্র জনজাতি হিসেবে এটাই ছিল তাদের আদি নাম। ১৮৫৫ সালে সাঁওতাল বিদ্রোহে সিধু-কানহু নিজস্ব ধর্মের কথা বললেও অন্য ধর্মের মাধ্যমে উত্তরণের কথা বলেননি। কিন্ত খেরওয়াড় আন্দোলনে সাঁওতালদের উত্তরণের পন্থা হিসেবে হিন্দু ধর্মের মতাদর্শ ও সংস্কৃতি গ্রহণের কথা বলা হয়। এই আন্দোলন হিন্দু ধর্ম সংস্কৃতির দ্বারা কতটা প্রভাবিত হয়েছিল তা আমাদের দেখার বিষয়।

বার বার ব্যর্থ হওয়ার ফলে সাঁওতালরা বিশ্বাস করতে থাকে যে, তাদের সমাজ ব্যবস্থায় কিছু ত্রুটি রয়েছে এবং এই ত্রুটি প্রতিবেশী হিন্দুদের কাছ থেকে সংস্কার করতে হবে। এ প্রসঙ্গে শুচিব্রত সেন মন্তব্য করেন যে— "কোনো জাতি বা গোষ্ঠী পরাজয়ের পর মাঝে মাঝেই নিজের দিকে ফিরে তাকায়। এক সময় ইংরেজরা আসার পর বাংলায় যে রেনেসাঁ দেখা দিয়েছিল সেটিও ছিল ইংরেজদের শ্রেষ্ঠত্বের পরিপ্রেক্ষিতে বাঙালির আত্মানুসন্ধানের ফল। ১৮৫৫ সালের বিদ্রোহ এবং তার পরবর্তী দুর্দশার কারণ খুঁজতে গিয়ে সাঁওতালরা মনে করল যে তাদের সমাজ ব্যবস্থায় কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি আছে, যেগুলি সংশোধন করা দরকার। চোখের সামনে ইংরেজ ও হিন্দুদের দেখেছিল তারা, তাদের সঙ্গে তুলনায় নিজেদের অসহায়তার বিষয়টি তাদের ভাবিয়েছিল।"[১০০] আর সেখান থেকেই হিন্দু সংস্কৃতি গ্রহণের মনোভাব তৈরি হয়। এই আন্দোলনে হিন্দু ধর্মের প্রভাব সম্পর্কে পাকুড়ের তৎকালীন জমিদার তরাসনাথ পাণ্ডে বলেন যে—"সমাজ এবং ধর্মের সংস্করারের জন্যই এই আন্দোলন। এর মূলে ছিল হিন্দুদের মতো বৈষয়িক এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ। এই জন্যই তারা কোনো কোনো হিন্দু বাবাজীর সাহায্য চায়। এসব বাবাজীরা মাঝে মধ্যে সাঁওতাল অঞ্চল পরিক্রমা করে, যাদের কাছ থেকে সাঁওতালরা হিন্দু ধর্ম ও শাস্ত্র সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে এবং তা অন্যদেরও বোঝাতে চায়। এই ভাবেই সংস্কার আন্দোলনের সূচনা। তারা বলে, তারা হিন্দু, তারা পবিত্র পৈতে পরে, গলায় পরে রুদ্রাক্ষের মালা। আগে তারা সব ধরনের মাংস খেত এখন তা অপবিত্র জিনিস বলে বাদ দিয়েছে। তাদের পোষাক-পরিচ্ছদেও অনেক পরিবর্তন এসেছে। আগেকার মতো খাট লেঙ্গটি তারা আর পরে না, তার বদলে পরে হিন্দুদের মতো করে ধুতি। নৈতিক জীবন এখন অনেক বেশি নিয়ন্ত্রিত। সূর্য, দুর্গা, কালী এবং অন্যান্য আরো হিন্দু দেবদেবীর প্রচলন হয়েছে। তাদের গুরুকে তারা হিন্দুদের ভাষা নকল করে বাবাজী বলে এবং সর্বত্র তার সম্মান। খেরওয়াড়দের মধ্যে ধর্মের বাঁধন দৃঢ়, সব সামাজিক ও ধর্মানুষ্ঠানে তারা অন্য সাঁওতালদের এড়িয়ে চলে।"[১০১]

১৮৭১ সালে জুলাই মাসে সাঁওতালরা যখন গোড্ডায় ধান সংগ্রহের জন্য সমবেত হয়, তখন তাদের নানান প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়। সাঁওতালদের জন্য বরাদ্দ শস্য মহাজন ও হিন্দুদের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া হয়। গোড্ডা সাব ডিভিশনের

তালদিহা গ্রামের ভগীরথ মাঝি এই অবস্থার বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে প্রতিবাদ করেন এবং এই ধরনের বৈষম্যের বিরুদ্ধে সাঁওতালদের পক্ষে লড়াই করার প্রতিশ্রুতি দেন। এই আন্দোলনে ভগীরথ মাঝির সহযোগী ছিলেন জ্ঞান পরগনাইৎ এবং মাতাদিন নামে এক হিন্দু। ভগীরথ মাঝি নিজেকে ঈশ্বরের অভিষিক্ত বলে দাবী করেন এবং নতুন একটি সাঁওতালরাজ প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দেন। সেই সঙ্গে তিনি ঘোষণা করেন সাঁওতালদের স্বর্ণযুগ তখনই পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হবে যদি সাঁওতালরা প্রকৃত দেবতা হিন্দু রামচন্দ্র বা চান্দোকে পুজো করে। তাঁর মতে সাঁওতালদের নিপীড়ন একটি সত্য ঈশ্বরের উপাসনা ত্যাগ করার এবং অন্য ছোট ও অশুভ আত্মার উপসনা করার জন্য শাস্তির ফল ছিল। দক্ষিণ ভাগলপুরের বাউসীর একটি পুরোনো হিন্দু মন্দিরে ভগীরথ মাঝি একটি সভা ডাকেন এবং তিনি বৈষ্ণব মঙ্গলদাস গোঁসাই এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এমনকি তিনি ‘বাবাজী’ উপাধি নিয়েছিলেন, যা হিন্দুদের কাছ থেকে গ্রহণ করা। তিনি সাঁওতালদের এই দুর্দশা থেকে মুক্তির জন্য শুদ্ধিকরণের কথা বলেন। তিনি শুদ্ধিকরণের পন্থা হিসেবে মুরগি, শুয়োর হত্যা ও খাওয়া নিষিদ্ধ করেন এবং মদ্যপান ও নাচগান বন্ধ করার আদেশ জারি করেন। বলা বাহুল্য, এগুলি সবই ছিল সাঁওতাল ঐতিহ্য বিরোধী এবং হিন্দুত্বের অনুসারী। সিধু-কানহু হয়তো সাঁওতালদের চারিত্রিক শুদ্ধতার কথা ভেবেছিলেন। কিন্তু এই শুদ্ধতা অর্জনের উপায় সম্পর্কে তাদের কোনো নির্দেশ ছিল না। ভগীরথ পরিচালিত আন্দোলনে সর্বপ্রথম এটি লক্ষ করা যায়। ১৮৭৪ সালের দুর্ভিক্ষের সময় মায়ানমার থেকে চাল এলে তা সাঁওতালদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছিল। তখন ভগীরথ দাবী করেন যে এটা ‘চাঁদো বোঙ্গা’ আমাদের জন্য পাঠিয়েছে। তাই এই চাল যেন শুয়োর ও মুরগী দ্বারা অপবিত্র না করা হয়। পরবর্তীতে ভগীরথকে গ্রেপ্তার করা হলে তার অনুগামীরা ‘বাবাজী’ উপাধি নিয়ে এই আন্দোলন চালিয়ে যায়। ১৮৮০-৮১ সালে এই আন্দোলন আবারও জোরদার হয়ে ওঠে। সাঁওতাল পরগণার দেওঘর অঞ্চলে দুবিয়া গোঁসাই নামে একজন ধর্ম প্রচারকের আবির্ভাব ঘটে। এই সময় সাঁওতাল পরগণায় আদমশুমারি করার ঘোষণা করলে সাঁওতালরা উৎশৃঙ্খল হয়ে পড়ে। তারা মনে করে যে, এই আদমশুমারি তাদেরকে নানান সংকটের মধ্যে ফেলবে। তাছাড়া তাদের মনে বিশ্বাস গড়ে ওঠে যে, যেহেতু তারা সবাই দুবিয়া গোঁসাই-এর খাতায় নাম লিখিয়েছে, তাই আর কোনো জায়গায় নাম লেখার প্রয়োজন নেই। ১৯১৯

সাল পর্যন্ত এই আন্দোলন বজায় ছিল। এই সময় খেরওয়াড়রা তিনটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। যথা সাপাই, সামরা ও বাবাজী। আর এই তিন গোষ্ঠীই 'রাম চাঁদোর' পুজো করত।[১০২] আবার ১৯০৩ সালে বাগান মাঝির নেতৃত্বে এই সমাজ সংস্কার আন্দোলন 'সাপা হড়' নামে নতুন রূপ লাভ করে।[১০৩] এই আন্দোলনে বাগান মাঝির নির্দেশিত পালনীয় নিয়ম কানুন সম্পর্কে টি.হেমব্রম তাঁর *The Santals' (1996)* নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে– "Bagan Majhi supported the practice of the Sapha Hor, the daily purificatory bath and abstinence from meat and liquor. Since the days were of the national 'Quit India' movement, he added to his teaching the exclusive use of Khadi clothing and exhorted the Santals not to dance anywhere except in their village. In May 1930, 210 Santals were invested with sacred thread or Janeo. All Janeo dhari regarded themselves socially superiour to those who did not wear the thread. They were reluctant to intermarry or to have social intercourse with the non-Janeo dhari Santals, thus they absorbed to themselves the caste discrimination of the Hidnuised community".[১০৪] তবে ১৯৩৮ সালে ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে 'সাপা হড়' আন্দোলনের প্রভাব কমে আসে এবং পরবর্তীতে এর অনেক সদস্য ঝাড়খণ্ড পার্টিতে যোগদান করে।

নতুন এই সাপা আন্দোলনের ফলে সাঁওতালদের মধ্যে হিন্দুদের সংস্কারগুলি শুধুমাত্র বিশ্বাসের প্রশ্ন ছিল না, এগুলি ছিল দৈনন্দিন জীবনচর্চার অপরিহার্য অঙ্গ। শুয়োর ও মুরগি মেরে ফেলার সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলনের অতিদ্রুত বিস্তারকে দৃষ্টান্ত হিসেবে নেওয়া যায়। কারণ শুয়োর ও মুরগি পালন তাদের জীবিকার একটি অবলম্বন আবার মদ্যপান তাদের যৌথ সমাজ জীবন এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানের অঙ্গ। এই শুদ্ধাচার আন্দোলনে সাঁওতালদের উপবীত ধারণ, কপালে টিকা নেওয়া, রোজ স্নান করা প্রভৃতি বিষয়গুলি পালন করার কথা বলা হয়, যা প্রধানত হিন্দু উচ্চবর্ণের ধারণা। তাছাড়া সাঁওতাল বা মাঝি নামের পরিবর্তে খেরওয়াড়, রাম হিন্দু, রাম চাঁদো প্রভৃতি হিন্দু নামের ব্যবহারের প্রবণতা দেখা দেয়। আবার বিভিন্ন হিন্দু দেব-দেবী যেমন, সিংহ বাহিনী, মহাদেব, রাম, কালী প্রভৃতি সাঁওতালদের কাছে পূজিত হতে থাকে। সাঁওতালদের সামাজিক-ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে হিন্দু ধর্মের প্রভাব সম্পর্কে রিজলে একটি উদাহরণ তুলে ধরেন। সেখানে তিনি বলেন– "The term Thakur or

Thakur jiu which the Santhals used to mean the supreme being was actually borrowed from the Hindus. The word Thakur did not exist in the original religious pantheon of the Santhals as it a Hindu Word and there force, might have been adopted by them later."[১০৫] সাঁওতালরা বিশ্বাস করে যে বোঙ্গারা প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য দায়ী। তাই তারা সর্বদা উপাসনা এবং বিভিন্ন ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালনের মাধ্যমে তাদের সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করে। কখনো কখনো এই উপাসনা পদ্ধতি ও আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে হিন্দু ধর্মের প্রভাব লক্ষ করা যায়। আবার জে.ট্রয়সি বলেন মারাং বুরু হিন্দু শিবের সমকক্ষ ছিল।[১০৬] হিন্দু আত্তীকরণ প্রক্রিয়ায় সাঁওতালরা বিভিন্ন হিন্দু দেবদেবীর উৎসবকে গ্রহণ করেছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় সাঁওতালরা হিন্দু কালীপুজোর সময় সহরায় উৎসব পালন করে এবং মহাদেবের সম্মানে পাতা উৎসবের ক্ষেত্রে মোড়োকো-তুরুইকো পূজার মিল দেখা যায়। অন্যদিকে মাথুর দেখিয়েছেন 'ওঝা' প্রতিষ্ঠানটিও হিন্দু সংস্কৃতি থেকে আমদানি করা হয়েছে। 'ওঝা' দ্বারা আমন্ত্রিত বোঙ্গাগুলির বেশীরভাগই হিন্দু বংশোদ্ভুত। শুধুমাত্র হিন্দু ধর্ম থেকে 'ওঝা' শব্দটি গৃহীত হয়েছে তাই নয়, এর সঙ্গে যে মন্ত্রগুলি আবৃত্তি করা হয় তা সংস্কৃত উৎসের।[১০৭] বিভিন্ন হিন্দু দেব-দেবীর নাম, মন্ত্রের আত্তীকরণ ঘটার প্রসঙ্গে নবেন্দু দত্ত মজুমদার উল্লেখ করেন যে, সাঁওতালদের ভাষা যখন অন্যদের ভাষাদের সংস্পর্শে এসেছিল তখন এটি ঘটেছিল।[১০৮]

এই খেরওয়াড় বা সাপাহড় আন্দোলন যে হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল, তা তৎকালীন বিভিন্ন সরকারি রিপোর্টে উল্লেখ পাওয়া যায়। যা নিম্নে দেওয়া হল—

১) ভাগলপুর বিভাগের কমিশনার (৭ই অক্টোবর, ১৮৭৪)

১৮৭৪ সালের ২৪শে জুলাই সাঁওতাল নেতা ভগীরথের নির্দেশে দক্ষিণ ভাগলপুরের এক হিন্দু মন্দিরে ১২০০ জন সাঁওতালের জমায়েত হয়। কিছুদিনের মধ্যে তারই উদ্যোগে তারদিহা নামক জায়গায় আরো একটি নতুন মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয়। সেই মন্দিরের পুরোহিত সাঁওতাল হলেও, সেখানকার পুজোর সব অনুষ্ঠান হিন্দু রীতিতে পরিচালিত হয়। এখানে সাঁওতালদের শুচি বা পবিত্র করার উদ্দেশ্যে সাঁওতালদের মুরগি ও শুয়োর মারার নির্দেশও দেওয়া হয়।[১০৯]

২) সাঁওতাল পরগণার সহকারী কমিশনার (১লা অক্টোবর, ১৮৭৪)

সমগ্র উত্তর সাঁওতাল পরগণা জুড়ে মোরগ ও শুয়োর মারার অভিযান চলছে। দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলেও তা ছড়িয়ে পড়েছে। আবার তারদিহার মন্দিরে ভগীরথকে ঘিরে সাঁওতালরা হিন্দু রীতিতে নানান অনুষ্ঠান করছে। মাতাদিন নামে এক হিন্দু ভগীরথের কপালে লাল রঙের টিকা পরিয়েছে।[১১০]

৩) ভাগলপুর বিভাগের কমিশনারের বার্ষিক প্রতিবেদন (১৮৭৪-৭৫)

গোটা ব্যাপারটা ঘটেছে ভগীরথ ও মাতাদিন নামে এক হিন্দুর মধ্যে যোগসাজসে; মাতাদিন ভগীরথের পুরনো সাগরেদ। বাউসীর মন্দিরে ধর্মানুষ্ঠান চলে দুই থেকে তিনদিন ধরে আবার তালদিহার মন্দিরে মহাদেবের পুজোর জন্য নানান ব্যবস্থা করা হয় এবং অশুচি জীবজন্তু মারার জন্য ভগীরথের হুকুম নামা এখান থেকে ঘোষণা করা হয়। এই নতুন আন্দোলন খুব দ্রুততার সঙ্গে গোটা সাঁওতাল পরগণায় ছড়িয়ে পড়েছে। ভগীরথের অনুগামী ধোনামাঝি ও জ্ঞান মাঝির এই শুদ্ধি আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা ছিল। জ্ঞান মাঝি প্রচার করে যে ভগীরথের নির্দেশ অনুযায়ী শুদ্ধাচারী না হলে সাঁওতালদের এক বড় বিপদ আসন্ন কারণ খ্রিষ্টান এক পাদ্রী গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াচ্ছে তার হাতে তারা জাত খোয়াবে।[১১১]

৪) ভাগলপুর বিভাগের কমিশনার (২৫শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৫)

সাম্প্রতিককালে অনেকেই বলছে, কীভাবে হিন্দু ধর্ম সাঁওতালদের চিন্তাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। এই আন্দোলনে আমরা ব্যাঘাত সৃষ্টি করব না; সাঁওতালদের ধর্মীয় চিন্তা ভাবনার প্রকাশে আমরা বাধা দেব না। কেবল আমাদের সতর্ক থাকতে হবে, যাতে এর সঙ্গে সন্দেহজনক সব রাজনৈতিক সম্পর্ককে বন্ধ করা যায়।[১১২]

৫) ভাগলপুর বিভাগের কমিশনার (৯ই মার্চ, ১৮৭৫)

সাম্প্রতিক ধর্মীয় আন্দোলনের হিন্দুমুখীনতা ভগীরথ মাঝির নেতৃত্বেই গড়ে উঠেছে। এটা তার নিজস্ব স্বার্থসিদ্ধির কৌশল মাত্র। শুয়োর, মুরগি প্রতিপালন সাঁওতাল অর্থনীতির একটি বিশেষ দিক; অথচ ভগীরথের আদেশে বিনা দ্বিধায় সাঁওতালরা বিপুল সংখ্যায় এই সমস্ত জীবজন্তুকে অশুচি ভেবে মেরে ফেলছে। এটা যেন নতুন ধর্ম

সম্পর্কে তাদের আন্তরিকতার পরীক্ষা। সরকারি খাস মহল দামিন-ই-কোহতে এই নতুন আন্দোলন সব চাইতে বেশি ছড়িয়েছে। এই সময়েই সাঁওতালরা তাদের গোষ্ঠী আদি নাম 'খেরওয়াড়' কথাটা ব্যবহার করতে শুরু করে। নতুন ধর্মে দীক্ষিত সাঁওতালরা এই নামে নিজেদের পরিচয় দিচ্ছে।[১১৩]

৬) সাঁওতাল পরগণার সহকারী কমিশনার (১৬ই মার্চ, ১৮৯১)

দেওঘর ও জামতাড়া মহকুমায় দেখা গেল, অজস্র বেনামী চিঠি লোকের হাতে হাতে ঘুরছে। তাতে লেখা সব শুয়োর মেরে ফেলতে হবে। উদ্দেশ্যে সম্ভবত এটা জানানো যে তারা শুদ্ধ বা হিন্দু হয়ে গেছে। পালগঞ্জের দুবিয়া গোঁসাই-এর নাম এই সময় থেকে শোনা যায়। বহু সাঁওতাল তার সাক্ষাতের জন্য পালগঞ্জে আসে। জিজ্ঞেস করলে তারা আসল কথাটা বলতে চাই না। হান্ডোয়া অঞ্চল থেকে আসা একটা বড় দল বলে, তারা গোরু ইত্যাদি সওদার জন্য পালগঞ্জ যাচ্ছে। বেনামী চিঠির সংখ্যা বাড়তে থাকে। তাদের ভাষায় হেরফের আছে; তবে তাদের জবাব একই রকমের। আসন্ন এক বিপর্যয় এড়াতে সাঁওতালরা রোজ ভগবানের নাম জপ করবে এবং পালগঞ্জে গিয়ে গোঁসাই এর সঙ্গে দেখাও করবে। সব মোরগ, শুয়োর মেরে ফেলতে হবে; রবিবার কোনো কাজ করবে না। কোনো কোনো জায়গায় চিঠিতে নির্দেশ ছিল, সাদা রঙের ছাগলকে মেরে ফেলতে হবে। চতুর্দিকে অজানিত এক আশঙ্কাবোধ। সর্বত্র সাঁওতালদের চোখেমুখে স্বাভাবিক খুশির চিহ্ন নেই। ১৮৮১ সালের আদমশুমারির প্রস্তুতি চলাকালীন সাঁওতালরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে বাধা দিচ্ছে। পাকুড়ের সহ কমিশনার ক্যাম্পবেলকে তারা বলে, তারা খেরওয়াড়, আদমশুমারির দায়-দায়িত্ব থেকে তারা মুক্ত। এটা তাদের এক নেতা ভগীরথ মাঝির নির্দেশ। কোনো কোনো জায়গায় তারা বলছে, তাদের নাম বাবা ভগীরথের খাতায় উঠেছে। তাই নতুন করে আদমশুমারিতে তারা আর নাম লেখাবে না। কেউ কেউ বলছে যদি লেখাতেই হয় তবে হিন্দু হিসাবে নাম লেখাবে; সাঁওতাল হিসেবে নয়।[১১৪]

৭) ডাব্লিউ.এম. স্মিথ, দুমকার মহকুমা শাসক (১৮৮১)

দুমকা মহকুমায় ১৮৮১ সালের আদমশুমারিতে নথিভুক্ত খেরওয়াড়ের সংখ্যা ৫৯০৬ জন আর আদি সাঁওতালদের সংখ্যা ১,২৬,৫৬২ জন। দামিন-ই-কোহ'-র যে অংশে

দুমকা মহকুমা পড়েছে সেখানে খেরওয়াড়দের সংখ্যা অনুপাতে কম। কিন্তু আদি সাঁওতালদের সঙ্গে তারা কোনো রকম যোগাযোগ রাখে না। বস্তুত তারা স্বীকারই করে না যে, আদতে তারা সাঁওতাল। তাদের সাঁওতাল বা মাঝি ডাকা পছন্দ নয়। তারা বলে আমরা খেরওয়াড়, রাম হিন্দু খেরওয়াড়।[১১৫]

৮) এস.এস.জোনস, রাজমহলের সহকারী কমিশনার (১৮৮১)

খেরওয়াড় আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য হল, সাঁওতালরা যাতে ধর্মীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে হিন্দুদের সঙ্গে মেলামেশা করতে পারে। এর উপায় হল হিন্দু সমাজের অঙ্গীভূত হওয়া। তারা কালী পূজো করে, বৈদ্যনাথ এবং দেওঘর তাদের তীর্থস্থান। মোরগ, শুয়োর ইত্যাদি তারা মেরে ফেলে। এদের বদলে হিন্দু খেরওয়াড়রা পোষে পায়রা, ছাগল আর ভেড়া। উত্তেজক সুরা জাতীয় পানীয় তাদের পক্ষে সম্পূর্ণ বর্জনীয়।[১১৬]

৯) ডাব্লিউ.এইচ.রাট্রে; দুমকার সহকারী ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর (১৮৮১)

খেরওয়াড়রা হিন্দুধর্মানুগামী। মোরগ বা শুয়োরের মাংস খাবে না; বস্তুত, হিন্দুরা যা খাবে না, তারাও তা খাবে না। পুরাতনপন্থী সাঁওতালদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক নেই। পূজানুষ্ঠানের রীতি হিন্দুদের মতোই।[১১৭]

১০) ডাব্লিউ এম স্মিথ, দুমকার মহকুমা শাসক (১৮৮১)

খেরওয়াড়রা নিজেদের বিশিষ্ট সম্প্রদায় বলে ভাবে। আমার সঙ্গে যাদের সাক্ষাৎ ঘটেছে অনেকেই বাউসীর গোঁসাই মঙ্গলদাসের দেওয়া কাগজপত্র সঙ্গে রাখে। মঙ্গলদাসের অনুগামী বলেই এ কাগজে তাদের পরিচয় লেখা আছে।[১১৮]

১১) ক্যাপ্টেন কারনাক, সহকারী কমিশনার (১৮৮১)

খেরওয়াড়রা নিজেদের সম্পূর্ণ আলাদা ভাবে। নতুন ধর্মান্তরিত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে যা হয়, এখানেও তাই হয়েছে। পুরোনো ধর্মের প্রতি তাদের প্রবল বিতৃষ্ণা। বিশেষ করে, আদি সাঁওতালদের সঙ্গে তারা সম্পর্ক রাখতে চায় না। আমি এক জন খেরওয়াড়ের কথা জানি, যে হঠাৎ করে রাগের বসে এক অশুদ্ধ সাঁওতাল পরিবারের তিন-চারটি মোরগ মেরে ফেলেছে। তাদের বলে, নতুন ধর্ম গ্রহণ না করলে তাদের পক্ষে ফল খারাপ

হবে। আচার-আচারণেও খেরওয়াড়রা অন্য সাঁওতালদের চেয়ে অনেক নিয়মনিষ্ঠ। কোনো রকম মাংস বা উত্তেজক পানীয় তারা খায় না। বিশেষ করে সাঁওতালদের সর্বনাশের মূল হাঁড়িয়া তারা ছোঁয় না। সাধারণ ভাবে তারা বেশি বুদ্ধিমান। তাদের বেশ কয়েক জন গুরু এবং গোঁসাই আছে যারা মূলত হিন্দু। তাদের মধ্যে অন্যতম হল বাউসীর মঙ্গলদাস গোঁসাই। অন্যান্য গুরুদের মধ্যে আছে ঠাকুর গোঁসাই, চন্দ্র সাধু। যারা সকলেই নীচু জাতের হিন্দু। হিন্দু ধর্মের সঙ্গে তাদের আত্মিক সম্পর্কের কথা বোঝাতে খেরওয়াড়রা বাউসীর বিখ্যাত মেলায় নিয়মিত যায়।[১১৯]

সাঁওতালদের এই সংস্কার আন্দোলন এবং অন্যান্য জনজাতিদের সমধর্মী আন্দোলনের উৎপত্তি এবং বিকাশ সম্পর্কে নানা ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে খেরওয়াড় বা সাপাহড় আন্দোলনকে একটি সামাজিক ও ধর্মীয় আন্দোলন হিসেবে দেখার প্রবণতা দেখা যায়। সাঁওতালদের ইতিহাসে ১৮৫৫-৫৬ সালের হুল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। শুধুমাত্র কয়েকটি অর্থনৈতিক অভিযোগ দূর করার জন্য তারা হুলে নামেনি, তাদের লক্ষ্য ছিল রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা আর গোষ্ঠী হিসাবে পদমর্যাদার উন্নয়ন। কিন্তু হুলের ব্যর্থতার পর সাঁওতালরা উপলব্ধি করে যে, সহিংস পথ বা অন্য কোনো রাজনৈতিক উপায়ে তাদের লক্ষ্য পূরণ হওয়া সম্ভব হবে না। রাজনৈতিক পথ পরিহার করে তারা হিন্দুদের মূল্যবোধ এবং আচার অনুষ্ঠান গ্রহণের মধ্য দিয়ে পদমর্যাদা বাড়ানোর জন্য সচেষ্ট হয়। হুলের ঠিক পরেই খেরওয়াড় আন্দোলনে এই প্রবণতার চরম প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। এ প্রসঙ্গে মার্টিন ওরান্স বলেন যে—'That socio- religious consciousness among the Santals developed due to their acculturation with Hinduism, a process which had started will force the outbreak of the Santal revolt'.[১২০] প্রকৃতপক্ষে হিন্দু ধর্মের সঙ্গে সংস্কৃতিক যোগাযোগ সাঁওতালদের বিশ্বাস করাতে পেরেছিল যে, তাদের সাংস্কৃতিক চর্চার উন্নতি এবং গোষ্ঠী ভাবনার পুনরুত্থান ঘটানোর একমাত্র উপায় হল হিন্দুদের সাংস্কৃতিক অনুশীলন গ্রহণ করা। যখনই সাঁওতালদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছে তখনই সাঁওতালরা হিন্দু বিশ্বাস ও সংস্কার অনুশীলনের প্রতি অগ্রাধিকার দেখায় কারণ সাঁওতালরা মেনে নিয়েছিল হিন্দুরা পদমর্যাদায় উন্নততর, আর তারা নিকৃষ্ট। এই মেনে নেওয়ার উপলব্ধিকে মার্টিন ওরান্স 'Rank Concession Syndrome' বলে উল্লেখ

করেছেন।[১২১] কিন্তু বিনয়ভূষণ চৌধুরি এই রাজনৈতিক পদমর্যাদার থেকে অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠা পাওয়ার কথা বলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন—'The Santal acculturation with Hinduism did not emerge merely for the sake of cultural upliftment. It has also needed to relieve the economic distress of Santal'.[১২২] তিনি মনে করেন সামাজিক-ধর্মীয় সংস্কারের জন্য সমস্ত বাহ্যিক কর্মকাণ্ডের উপর ভিত্তি করে একটি স্বাধীন সাঁওতালরাজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য সর্বদা সাঁওতালদের অনুপ্রাণিত করেছিল। তাঁর মতে, হিন্দু ধর্মের সঙ্গে সাঁওতাল সংস্কৃতির সংযোগ শুধুমাত্র সাংস্কৃতিক উন্নতির জন্য হয়নি। বরং সাঁওতালদের অর্থনৈতিক দুরবস্থা দূর করার জন্যই এর প্রয়োজন ছিল। কারণ ঊনবিংশ শতাব্দী জুড়ে সাঁওতালরা ব্রিটিশ সরকার, জমিদার ও মহাজনদের দ্বারা এত বেশী শোষণ ও নির্যাতনের শিকার হয়েছিল যে তারা কার্যত ধ্বংসের মুখে পড়েছিল। খেরওয়াড় আন্দোলনের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য অর্থাৎ খাজনা আরোপ ও বৃদ্ধি প্রতিরোধ করা এবং সাঁওতাল অঞ্চল থেকে দিকুদের তাড়িয়ে দেওয়ার মত বিষয়গুলি ১৮৫৫-৫৬ সালের বিদ্রোহের মতই ছিল। শুধু মাত্র ১৮৫৫-৫৬ সালের ব্যর্থতার দরুন খেরওয়াড় আন্দোলনে কৌশল পরিবর্তন করতে প্ররোচিত করেছিল। নরওয়েজিয়ান ধর্ম প্রচারক এল. স্ক্রেফসরুড দ্য স্টেটম্যান এবং দ্য ফ্রেন্ড অফ ইন্ডিয়া পত্রিকায় লেখা এক চিঠিতেও একই বক্তব্য রাখেন। সেখানে তিনি বলেন—'The Kherwar movement was a rabid, socialistic, political agitation, the religion being only a means towards an end'.[১২৩]

অন্যদিকে বিনয়ভূষণ চৌধুরি মনে করেন মার্টিন ওরান্স এই সাংস্কৃতিক তাৎপর্যকেই শুধুমাত্র আলোচনা করতে গিয়ে এর বৃহত্তর রাজনৈতিক পরিমণ্ডলকে উপেক্ষা করেছেন। আবার মার্টিন ওরান্স, রাজনৈতিক পন্থার বর্জন অপরিহার্য হল বলেই হিন্দু মূল্যবোধের অনুকরণ সাঁওতালদের কাছে অপরিহার্য হয়েছিল বলে যে মতামত তুলে ধরেন তার বিরোধিতায় বিনয়ভূষণ চৌধুরি উল্লেখ করেন, হুলের ব্যর্থতার পর সহিংস উপায়ের কার্যকারিতা সম্পর্কে সাঁওতালদের মনে অবিশ্বাসের বাতাবরণ তৈরি হওয়ার অর্থ এই নয় যে, তারা তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থেকে সরে এসেছিল। রাজনৈতিক পথ সর্বতোভাবে পরিহার করার প্রশ্নই ওঠে না। কারণ সেই সময়কার সাঁওতাল মানসিকতার দৃঢ় প্রত্যয় ছিল যে, স্বাধীন সাঁওতালরাজের প্রতিষ্ঠা না হলে

দিকুদের প্রভুত্বের অবসান ঘটবে না। দিকুদের সঙ্গে তারা যে জটিল সম্পর্কের কথা ভাবছিল তা একান্তভাবেই রাজনৈতিক। সাঁওতাল নেতাদের ধারণা ছিল, স্বাধীন সাঁওতালরাজ প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য সম্পর্কে গোটা সাঁওতাল অঞ্চলে সঙ্ঘবদ্ধ প্রচার করতে হবে। একসময়ে তারা যে মহান জাতি ছিল, সেই ধারণা প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে দিকুরা পুরনো কায়দায় চলতে পারবে না। তাই সাঁওতালদের অতীত ইতিহাস জাগ্রত করার পন্থা হিসেবে সাঁওতাল নেতারা খেরওয়াড় নামের ব্যবহার করে। কিন্তু তাদের কাছে শুধু সাঁওতালরাজ প্রতিষ্ঠা করাই মূল লক্ষ্য ছিল না। পাশাপাশি ব্যক্তি বা সমাজ জীবনে যা কিছু ত্রুটি দূর করার কথা বলা হয়। তাই এই সংস্কার আন্দোলনের লক্ষ্য শুধুমাত্র পদমর্যাদার উন্নয়ন নয়; তা বৃহত্তর রাজনৈতিক সংগ্রামের প্রস্তুতির একটি বিশেষ পদক্ষেপ।[১২৪] আবার হার্ডিম্যান মনে করেন সংস্কারের আদর্শ হিসেবে জনজাতিরা যে মূল্যবোধ অনুসরণ করে, তা ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠায় তার বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।[১২৫] রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক পদমর্যাদা বা নিম্নবর্গের চেতনার দিক থেকে হলেও এই আন্দোলনে সাঁওতাল সমাজ হিন্দু ধর্মের দ্বারা যে প্রভাবিত হয়েছিল তা প্রত্যেকেই স্বীকার করে নিয়েছেন।

স্বাধীন ভারতে রাষ্ট্র যেভাবে আধুনিকরণ ও উন্নয়নের পথ বেছে নেয়, সেটি কোনোভাবেই আদিবাসী সংস্কৃতির ঐতিহ্যের সঙ্গে সংহতিপূর্ণ নয়। অন্যদিকে সাংবিধানিক রীতি-নীতিতে আদিবাসীদের ঐতিহ্যের রক্ষাকবচ হিসেবে নানান ব্যবস্থা থাকলেও এই সাংবিধানিক পদ্ধতি ও নির্বাচনী রাজনীতি উচ্চবর্গ বা সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু ভাবধারায় পরিচালিত, যেখানে আদিবাসীরা প্রান্তিক থেকে গেছে। আবার স্বাধীন ভারতে আদিবাসীদের উন্নয়নের ব্যাপারে যে সব পরিকল্পনা নেওয়া হয় তার দায়িত্বে থাকে দিকু অর্থাৎ হিন্দুরা। ফলত আদিবাসী সমাজ উচ্চবর্গ বা হিন্দু সংস্কৃতির ভাবধারা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে বা কখনও স্বেচ্ছায় নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য তা গ্রহণ করেছে। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে হিন্দুত্বকরণ প্রক্রিয়ার বিশেষ দৃষ্টান্ত হচ্ছে সরকারি ভাবে আদিবাসীদের ধর্মের উল্লেখ না পাওয়া। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে আদিবাসী তথা অনগ্রসর সম্প্রদায়ের জনগণকে উন্নত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালু করা হয় এবং এর প্রয়োজনীয়তাও অনস্বীকার্য। কিন্তু গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এই সংরক্ষণ ব্যবস্থার নিয়ম-নীতির মাধ্যমে আদিবাসীদের হিন্দুকরণ প্রক্রিয়া

জোরদার হয়েছে। সংরক্ষণ ব্যবস্থার সুযোগ লাভের আশায় সরকারিভাবে কাস্ট সার্টিফিকেটের প্রয়োজন এসে পড়ে এবং এই কাস্ট সার্টিফিকেটে বা বিভিন্ন সরকারি কাগজে ধর্মের জায়গায় আদিবাসীদের নিজস্ব কোনো ধর্মের উল্লেখ না থাকায় 'হিন্দুইজম' বা 'অন্যান্য' লিখতে বাধ্য হয়।[১২৬] ১৯৯১ সালের আদমশুমারি চলাকালীন এই জনগোষ্ঠীর শিক্ষিত অংশ নিজস্ব ধর্মের উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তা আজও লিপিবদ্ধ করা হয়নি। ফলে এক বৃহৎ সংখ্যক মানুষ হিন্দুধর্মকে নিজেদের ধর্ম হিসেবে মেনে নিয়েছেন। ২০০১ সালের জনগণনায় জনগোষ্ঠীর বৃহৎ অংশ নিজস্ব ধর্মের কথা বললেও তা সাংবিধানিক মান্যতা পায়নি। তারা তাদের ধর্ম হিসেবে 'সারি' বা 'সারনা' ধর্মের কথা বলেন। 'সারনা' অর্থে বোঝায় একটি পবিত্র স্থান বা ছোটগাছের ঝোপ সমন্বিত এক পবিত্র ভূমিখণ্ড। যে ধর্মে জাত-বর্ণ ব্যবস্থার অস্তিত্ব নেই, আছে প্রকৃতির বর্ণনা এবং গোষ্ঠী চেতনা। এই স্বতন্ত্র ধর্মীয় ভাবনা সম্পর্কে মেরিন কেরিন উল্লেখ করেন যে ১৯৭০ সাল নাগাদ সাঁওতাল গুরু বেসনাও 'সারনা ধরম' নামে এক ধর্ম আন্দোলনের সূচনা করেন। 'সারনা ধরম' এ প্রকৃতির উপাসনার মধ্য দিয়ে সাঁওতালরা এক নতুন মূল্যবোধ ও সাম্যের অধিকার লাভ করে। এটি তাদের সামাজিক শ্রেণিবিন্যাস ও বর্ণবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল এবং আদিবাসী জনসমাজকে নতুন করে ফিরে পাওয়া ধর্মীয় জ্ঞানজগৎ সম্বন্ধে আত্মবিশ্বাস যোগাতে সক্ষম হয়েছিল, কিন্তু আজ পর্যন্ত তাকে ধর্মের স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি।[১২৭] ফলত আদিবাসীরা ধর্মের কলামে 'হিন্দু' বা 'অন্যান্য' উল্লেখ করতে বাধ্য হচ্ছেন। এর মূলে হিন্দুত্বকরণের সুপ্ত প্রয়াসও রয়েছে, তা পরিষ্কার।

এই আদিবাসী সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থা বর্ণবিভক্ত সমাজের থেকে স্বতন্ত্র। এ বিষয়ে হিন্দুত্ববাদীরা চিরকালই ছিলেন উদাসীন ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিরুদ্ধবাদী। তবে ১৯৩১ সালে জাতীয় কংগ্রেস থেকে মুসলিমরা মুখ ফিরিয়ে নিলে জনসমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে আদিবাসীদের জাতীয় রাজনীতিতে সংযুক্তিকরণের ভাবনা গড়ে ওঠে। আর এই সংযুক্তিকরণের প্রয়াসের মাধ্যমে আদিবাসীদের জাতীয় কংগ্রেসের প্রচারকগণ আদিবাসীদের হিন্দু ভাবধারা বা হিন্দু বর্গের অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছিল। এ প্রসঙ্গে ১৯৩১ সালে সাঁওতাল পরগণার ডেপুটি কমিশনার বিহার ও উড়িষ্যা সরকারের মুখ্যসচিব এম.ডি.হ্যালেটকে লেখা এক চিঠির বিবরণীতে সেই তথ্যই উঠে আসে।

সেখানে সাঁওতাল পরগণার ডেপুটি কমিশনার হ্যালেটকে *বলেন*– 'I understand that the Congress preachers tried to convert the Santals to Hinduism, telling them that their present degraded position as aborginals is the fault of the British Government'.[১২৮] নির্বাচনী রাজনীতির এক বৃহৎ সংখ্যক লোক আদিবাসী সমাজের মানুষ হওয়ায় বিভিন্ন হিন্দু সংগঠন এবং আদিবাসী রাজনীতিবিদদের প্রচেষ্টায় স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে হিন্দুত্বকরণ প্রক্রিয়া দ্রুততার সঙ্গে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রথম দিকে সেনসাস্ রিপোর্টে অর্থাৎ ১৯৩১ সাল পর্যন্ত আদিবাসীদের ধর্ম হিসেবে 'জড়োপাসনার' (Animism) কথা বলা হলেও পরবর্তীতে তাদের নিম্ন হিন্দু হিসেবে দেখার প্রবণতা দেখা যায়। বলা বাহুল্য, স্বাধীনতার এত বছর পরেও সেনসাস্ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই প্রবণতা বজায় রয়েছে। অন্যদিকে এই সংরক্ষণ ব্যবস্থার সুবিধার্থে বহু মানুষ সরকারি চাকরি লাভ করেছেন। ফলে আদিবাসী সমাজের মধ্যে 'সুবিধাভোগী-এলিট' শ্রেণির আবির্ভাব ঘটেছে। যারা তাদের গোষ্ঠীভাবনা, সমাজ-সংস্কৃতি থেকে দূরে সরে হিন্দু ভাবধারায় নিজেদের মেলানোর চেষ্টা করেছে। এমনকি তারা অনেক ক্ষেত্রে হিন্দু নাম ও গোত্রের ব্যবহার করছে। আর এই হিন্দু ভাবধারা গ্রহণের মানসিকতা সাঁওতাল জনমানুষে বিভক্ত গোষ্ঠী চেতনার জন্ম দেয়, যা স্বতন্ত্র গোষ্ঠীকেন্দ্রিক সাঁওতাল সমাজ কাঠামোয় কখনোই কাম্য ছিল না। বর্তমান গবেষকের ক্ষেত্রসমীক্ষায় উঠে আসা তথ্যে সেই বিভক্ত গোষ্ঠী ভাবনার প্রতিফলন লক্ষ করা গেছে। এ প্রসঙ্গে জামতাড়া জেলার ফতেহপুর ব্লকের মান্দন মারান্ডি আক্ষেপ করে বলেন–'S.T সার্টিফিকেটের দৌলতে চাকরি পেয়ে, কেউ কেউ আবার স্বামী স্ত্রী চাকরিজীবী আবার কোনো কোনো পরিবারে সবাই বা প্রায় সবাই কর্মরত আছেন; তারা সমাজ সংস্কৃতি মানুষজনকে ভুলে গেছেন। সমাজ এদের কাছে অনেক কিছুই আশা করে। ...(তারা) সাঁওতাল জাতি পরিচয় দিতে কুণ্ঠা বোধ করেন এবং নিজেদেরকে হিন্দু সংস্কৃতির সঙ্গে মেলানোর চেষ্টা করে'।[১২৯] আবার বাংলা সাহিত্যে আদিবাসীদের ওপর উচ্চবর্গের সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদী দ্বান্দ্বিক রূপ (Cultural Politics) এবং আদিবাসী হিন্দু সম্পর্কের টানাপোড়েনের দৈনন্দিন ঘটনা উঠে এসেছে, যা ইতিহাসগত ভাবে সাহিত্যের পরিসরে প্রামাণ্য দলিল বলা যেতে পারে। এক্ষেত্রে তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মহুলবনীর সেরেঞ' গল্প এবং সেই গল্প অবলম্বনে নির্মিত চলচ্চিত্র (শেখর দাস পরিচালিত, মহুলবনীর সেরেঞ, ২০০৪) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আবার মহাশ্বেতা দেবীর *'কবি বন্দ্যঘটি*

গাঞ্ঞির জীবন ও মৃত্যু' (১৯৬৭) উপন্যাসে ঐতিহাসিক চরিত্র আদিবাসী চুয়াড় কলহন জন্মের দোষ স্খলনে বদ্ধপরিকর। সে চূয়াড় জন্ম থেকে মুক্তি পেতে মরিয়া, সে চেয়েছে *'অভয়া মঙ্গল'* রচয়িতা ব্রাহ্মণ কবি বন্দ্যঘটি গাঞ্ঞি হতে।

এছাড়াও, ১৯২৫ সালে আরএসএস প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় তারা 'বনবাসী আশ্রয়' প্রতিষ্ঠা করে হিন্দুত্বকরণের প্রক্রিয়া চালিয়ে যাচ্ছে। এই হিন্দুত্বকরণ প্রক্রিয়ার ফলে আদিবাসী সমাজ জীবনে নানান পরিবর্তন ঘটে চলেছে। যেমন, বিবাহের সময় সিঁদুরের ব্যবহার, সাঁওতাল নারীর পায়ে আলতার ব্যবহার, হিন্দুদের চরক পূজার পালন, এমনকি বিষ্ণুপুরাণে যে রাস নাচের কথা বর্ণিত আছে তার সঙ্গে সাঁওতালি নাচের মিল এসেছে। তাছাড়া সাঁওতালদের দাঁশাই পরব হল দুর্গাপূজা, সহরায় অনুষ্ঠানে বৈষ্ণব গান করা, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে 'হরিবোল' ধ্বনির ব্যবহার করা।[১৩০] সাঁওতাল সমাজে ভূত-প্রেত, ডাইনি প্রভৃতি অশুভ শক্তির বিশ্বাস রয়েছে এবং এই সব অশুভ শক্তির হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য হিন্দু পদ্ধতিতে হিন্দু ব্রাহ্মণের দ্বারা বিভিন্ন পূজার্চনা করে থাকে। ক্ষেত্রসমীক্ষায় দেখা যায় যে জামতাড়া জেলায় 'দোবই' নামে এক হিন্দু দেবতার যথেষ্ট জনপ্রিয়তা রয়েছে। প্রত্যেক সোমবার সেখানে হাজার হাজার মানুষের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। সেখানে সাঁওতাল গোষ্ঠীর মানুষদেরও উপস্থিতি দেখা যায় এবং তারা সেখানে নানান সমস্যার প্রতিকারের উপায় হিসেবে মানত করে। হিন্দু পদ্ধতির মাধ্যমে সেই দেবতাকে তুষ্ট করার জন্য নানান ধরনের ব্যবস্থাপনা করে থাকে।[১৩১]

আদিবাসীদের উপর হিন্দু সংস্কৃতির প্রভাব সংক্রান্ত যে বিতর্ক তা মূলত সীমাবদ্ধ অ-আদিবাসী ঐতিহাসিক ও নৃতত্ত্ববিদদের মধ্যে। আদিবাসী সংক্রান্ত বা আদিবাসীদের ভাষায় তাদের নিজস্ব লিখিত তথ্যের অভাব এর একটা বিশেষ কারণ। এই বিতর্কে যে বিষয়টি অবহেলিত থেকে গেছে তা হল হিন্দু, খ্রিষ্টান ও মুসলমানদের সঙ্গে আদিবাসীদের ধর্মের মূল পার্থক্য। খ্রিষ্টান ও ইসলাম উভয়ই প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম এবং নির্দিষ্ট ধর্মগ্রন্থ ভিত্তিক, যেমন বাইবেল ও কোরান। হিন্দু ধর্ম বিভিন্ন শাস্ত্রের যোগফল হলেও সেই অর্থে তার কোনো নির্দিষ্ট ধর্ম গ্রন্থ নেই। মূর্তিপূজা অবশ্য তার অন্যতম বিষেশত্ব। আদিবাসী ধর্মে মূর্তিপূজার কোনো স্থান নেই, সবটাই প্রকৃতি নির্ধারক অর্থাৎ

বৃক্ষ, পাহাড় ও শিলাখণ্ড; এমনকি সাঁওতাল ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা 'ঠাকুরজীউ'-এর কোনো মূর্তি নেই। আশ্চর্যের বিষয় এটাই যে হিন্দু ধর্মের কিছু বর্ণনার মধ্যেই কিছু বিরোধী ভাষাও আছে। রামায়ণে বর্ণিত রামের বনবাস প্রসঙ্গে জানা যায় যে তিনি যখন দশরথের মৃত্যু সংবাদ সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার পর পিতার শ্রাদ্ধের আয়োজন করছিলেন তখন সেখানে উপস্থিত হয় ঋষি জাবালি; উপস্থিত হয়ে তিনি বলেন যে শ্রাদ্ধ ও স্বর্গ অর্থহীন। মর্ত্যে পূর্বপুরুষকে জল দান করলে তা সেখানে পৌঁছাতেই পারে না। অন্যদিকে উপনিষদেও পাওয়া যায় সত্যবানের কথা। সে পিতৃ পরিচয়হীন হওয়া সত্ত্বেও ঋষি গৌতম তার ব্রাহ্মণত্ব স্বীকার করে শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উল্লেখ গুরুত্বপূর্ণ,

"...অব্রাহ্মণ নহ তুমি তাত
তুমি দ্বিজোত্তম, তুমি সত্যকুলজাত"[১৩২]

হিন্দু ধর্মের সম্প্রসারণশীল চরিত্রকে স্বীকার করেও বলা যায় যে সেটি অনেকটা খোলামেলা ছিল। মন্দিরে পুজো না দিয়েও যে কেউ হিন্দু হতে পারে। এর ফলে তার আবেদনে আদিবাসীদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা অনেক বেশী ছিল।

ইতিহাসের নিয়ত ঘাত-প্রতিঘাতে সংস্কৃতির পরিবর্তন অনিবার্য। নিম্নবর্গের ঐতিহাসিক রণজিৎ গুহ, দামোদর দাস ধর্মানন্দ কৌশাম্বিকে উদ্ধৃত করে এর একটি সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। প্রথমত রণজিৎ গুহের বক্তব্য হল, ক্ষমতার প্রতি উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গের যে মনোভাব তার কেন্দ্রবিন্দুতে আছে ধর্ম। এর প্রকাশ ঘটে বিভিন্ন কথন ও পৌরাণিক কাহিনিতে। কখনও বা আচার-অনুষ্ঠানে, আবার কখনও কথন রীতি-নীতিতে। কিন্তু এর অধ্যায়ন সহজ নয়, কারণ লিখিত ভাষ্যের স্বচ্ছতা এই সমগ্রে অনুপস্থিত। মৌখিক লোককথার পরম্পরাতেই তার প্রধান অবলম্বন। অতীতের আদিবাসী ইতিহাস ছাপিয়ে পরবর্তী উন্নয়নের পর্যায়ে এসে পরে; পুরানো যা কিছু উপাদান অবশিষ্ট থাকে, তা নতুন সামাজিক স্তরের সঙ্গে মিলে মিশে যায়। এই সংমিশ্রণেই প্রাত্যহিক জীবন আর চিন্তাশীল মননের সংস্কৃতি প্রকাশ পেয়েছে। সমান্তরাল ঐতিহ্যের আকর্ষণ, উচ্চজাতির প্রধানত ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ভার তাকে বদলায়, আত্মসাৎ করে।[১৩৩] ধর্মের সঙ্গে রাজনীতি বা ক্ষমতার এক সুস্পষ্ট উদাহরণ

খুঁজে পাওয়া যায়। ১৯৩১ এর সেনসাস্ চলাকালীন হিন্দুদের প্রকাশিত একাধিক প্রচার পত্রের নিরিখে বলা যায় বাঙালি হিন্দুরা চিরকালই আদিবাসীদের অবজ্ঞা ও শোষণ করে এসেছে। সাঁওতালরা এই কারণেই তাদের 'দিকু' নামে চিহ্নিত করেছে। ১৯২০ পর থেকে হিন্দু আধিপত্যে পরিচালিত বাংলার কংগ্রেস ক্রমশ মুসলমান জোতদারদের সমর্থন হারাচ্ছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে আদিবাসী জনগণকে কাছে টানার প্রক্রিয়াটি লক্ষণীয় ছিল। "বাংলা, আসাম ও বিহার অঞ্চলের লক্ষ লক্ষ সাঁওতাল, গারো, ভালু, বানাই, খাসিয়া, ওঁরাও, মুন্ডা, মিকির, মিরি, মিসমি, লুসাই, কুকী, লালুং, কাছাড়ী, রাঢ়, মেচ প্রভৃতি জনজাতি রামায়ণ মহাভারতের যুগ থেকেই বসবাস করে আসছে। হিন্দুস্থানের উপরোক্ত আদিবাসীগণ সকলেই মূলত হিন্দু। গত ১৯২১ সালে লোকগণনার সময় ইহাদিগের অধিকাংশকেই 'হিন্দু' না লিখিয়া জড়োপাসনা (Animist) লেখা হইয়াছে। ইহাদ্বারা এই সকল সরল ও ধার্মিক ভ্রাতা ভগ্নিদের প্রতি অন্যায় করা হইয়াছে।"[১৩৪]

পক্ষান্তরে একথাও বলা যায় যে, আদিবাসীদের হিন্দু ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার পশ্চাতে কার্যকরী ছিল আত্মরক্ষার তাগিদ এবং এক পরোক্ষ রাজনৈতিক বিবেচনা। রণজিৎ গুহ ১৮৫৫-৫৬ সালে সাঁওতাল বিদ্রোহে লক্ষ্য করেছেন সেই প্রসঙ্গে তাঁর *Elementary Aspects of Peasant Insurgency in colonial India* (1983) গ্রন্থের Negation এবং Solidarity অধ্যায়ে তার বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। পালকিতে সিধু-কানহু যাতায়াত বা দুর্গাপূজা সম্পূর্ণ করা সবই হিন্দু আচার অনুষ্ঠান গ্রহণের মাধ্যমে তাদেরই বিরূদ্ধাচরণ করা। "Involved in a bitter and bloody war against Hindu landlords and moneylenders, the rebels look to Hindu religious practice with a vengeance".[১৩৫] ওঁরাওদের 'টানা ভগৎ' আন্দোলন বা সাঁওতালদের 'সাপাহড়' আন্দোলন একই প্রক্রিয়ার অহিংস রূপ। স্বাধীনোত্তর ভারতে এই প্রক্রিয়া কিছুটা স্তিমিত হয়, বিশেষত ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। এটি আদিবাসীদের সামগ্রিক আন্দোলন। অরুণাভ ঘোষ তাঁর 'Probing the Jharkhand Question' নামক প্রবন্ধে উল্লেখ করেন যে,'...The agririan radicalisation of Jharkhand mukti morcha was combined with its interest in cultural revivalism. Its attempt to recive the ancient, practice of 'Tribal self government' virtually mobilised the Adibasi World of the region".[১৩৬]

বস্তুত এখান থেকেই আদিবাসীকরণ (Re-Tribalzation) এর ধারা লক্ষ করা যায়, যা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে রূপ লাভ করে। সারনা ধর্মের ও অলচিকি লিপির স্বীকৃতির দাবি তার অন্যতম উদাহরণ। কিছুটা হিন্দু ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত হলেও আদিবাসী বিশেষত্ব সাঁওতালদের মূল সাংস্কৃতিক ভিত্তি কিন্তু এখনও অটুট।

প্রশাসনিক পরিবর্তন, খৃষ্ট ধর্মের প্রচার এবং হিন্দু প্রভাব এই ত্রয়ীর অভিঘাত সাঁওতাল সমাজে এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন ঘটিয়েছিল। মনে রাখা দরকার যে এটি শুধু সাঁওতাল পরগণার সাঁওতালদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। প্রশ্ন উঠতে পারে যে এর ফলে এই জনজাতির স্ব-সত্তা বা আত্মপরিচয়ের সংকট কি দেখা দিয়েছিল? রাজনৈতিক ও পরিবেশগত প্রভাব যে কোনো জনজাতি জীবনে পরিবর্তন বহন করে আনে। খাদ্য সংগ্রাহক ও পশুচারক থেকে সাঁওতালরা রূপায়িত হয় কৃষিকে, অবশ্যই আদিবাসী সত্তাকে বিসর্জন দিয়ে নয়। এর থেকেই 'Tribe-peasant continuum' তত্ত্বটি আসে। আবার জমিহারা সাঁওতাল পরিবর্তিত হয় খনি শ্রমিক বা চা বাগানের কুলিতে। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে গণপরিষদ (Constituent Assembly) স্বীকার করেছিল আদিবাসী সমাজ সংগঠনের ভিন্নতা। Tribal Self Government বা TSG এরই বহিঃপ্রকাশ। নির্মল কুমার বোস এবং আন্দ্রে বেতে উভয়ই স্বীকার করেছেন যে, 'The nature of the interaction between broadly described as one of peaceful co-existence rather than one of conquest and subjugation'[১৩৭] উপনিবেশ পূর্ব যুগে এই পর্যবেক্ষণ সঠিক হলেও ঔপনিবেশিক যুগে আদিবাসী ও দিকু বা হিন্দুদের সম্পর্ক ছিল, 'a relationship of domination and subjugation' উপরোক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় প্রশাসন, খ্রিষ্টান মিশনারি ও হিন্দুত্বের সম্মিলিত ফলে আদিবাসী ও অ-আদিবাসীদের মধ্যে সম্পর্ক সম্প্রদায়গত বিরোধিতা থেকে রূপায়িত হয় শ্রেণি বিরোধে। অবশ্য এই শ্রেণি বিরোধ সাঁওতাল সমাজের নিজেদের মধ্যেও দেখা দিয়েছিল। শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সাঁওতালদের মধ্যে যে স্বল্প সংখ্যক মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব হয় তা সাধারণ সাঁওতালদের থেকে স্বতন্ত্র থাকতেই পছন্দ করত, আর এ ভাবেই সৃষ্টি হয় 'a class within a class' অর্থাৎ একই শ্রেণির মধ্যে অন্য একটি শ্রেণি। আর এই শ্রেণি বিভাজন পরবর্তীতে 'class contest' থেকে রূপ লাভ করে 'cultural contest'-এ।

তথ্যসূত্র :

১. O'.Malley, L.S.S., Bengal District Gazetteers : Santal Parganas, The Bengal Secretariat book Department, Calcutta, First Published in1910, Reprint 1984, p.23.

২. *Colonial Contradiction and village Community in Santal Parganas (Jharkhand),* 1872-1947, Proceeding of the Indian History Congress, 2005, pp.751-767.

৩. Mahato, S., The Mundari Khuntkatti and the Changing Land System in the 19th Century Chotanagpur, in Tarasankar Banerjee(ed.), *Changing Land system and Tribal Eastern India In the Modern Period*, Subarnarekha, Calcutta, 1989, p.104.

৪. Chattopadhay, Pradip, *Redefining Tribal Identity : The Changing Identity of the Santhals in south-west Bengal*, Primus books, Delhi, 2014, p.105.

৫. Dutta - Majumdar, Nabendu, *The Santal : A Study in Culture Change*, Delhi, Government of India Press, Delhi, 1956, p.62.

৬. Das Gupta, Sanjukta, *Adivasis and the Raj : Socio-economic Transition of the Hos, 1820-1932,* Orient Blackswan, Delhi, First Edition 2011, p.1-2.

৭. উদ্ধৃত : ঘোষ, সুবোধ, *ভারতের আদিবাসী,* ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ১৯২৮, চতুর্থ মুদ্রণ ২০১৮, পৃ.২০৪।

৮. তদেব, পৃ. ১৫৩-১৫৬।

৯. বাস্কে, ধীরেন্দ্রনাথ, *সাঁওতাল গণসংগ্রামের ইতিহাস,* বিজয়ন প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৭৬, ষষ্ঠ সংস্করণ ২০০৩, পৃ. ৪।

১০. উদ্ধৃত : বাস্কে, ধীরেন্দ্রনাথ, *সাঁওতাল গণসংগ্রামে নারী সমাজের ভূমিকা,* সুবর্ণরেখা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০০৬, পৃ. ৪।

১১. Olav Hodne, *The seed bore fruit : A short History of the Santal mission of the northern churches (1867-1967),* The Santal mission of the northern churches , Dumka, 1967, p.21.

১২. Letter Copy Book, Dumka, *Letter From A.Eden, Deputy Commissioner Of Bhagalpur to Stainforth*, Commissioner of Santal Parganas, Dated. 6 January 1856.

১৩. Chaudhuri, Binay Bhushan, S.C.Misra Memorial Lecture, *Reinterpretation Santal insurrections, The Hool of 1855*, Indian History Congress, 71 Sessions, Malda, 2011, p.35.

১৪. *সংবাদ প্রভাকর,* ১.০২.১৮৫৬।

১৫. *সংবাদ ভাস্কর,* ৭.০২.১৮৫৬।

১৬. উদ্ধৃত: বাস্কে, ধীরেন্দ্রনাথ, *সাঁওতাল গণসংগ্রামে নারী সমাজের ভূমিকা,* সুবর্ণরেখা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০০৬, পৃ.৬৪।

১৭. তদেব, ৬৫।

১৮. *সংবাদ প্রভাকর,* ২০.০৭.১৮৫৫।

১৯. *সমাচার সুধাবর্ষণ,* ১৩.০৭.১৮৫৫।

২০. Hindoo Patriot, *The Sounthal Outbreak*, 19th july, 1855.

২১. *Friend of India*, 19th August, 1855.

২২. Letter Copy Book, Dumka, *Letter From A.Eden, Deputy Commissioner Of Bhagalpur to Stainforth, Commissioner of Santal Parganas*, Dated. 6 January 1856.

২৩. Roy Choudhury, P.C., *1857 in Bihar : Chotonagpur and Santhal Parganas*, Gazetteer's Revision Branch, Revenue Department, Patna, Bihar, 1959, p.83.

২৪. *Hindoo Patriot*, 2.08.1855.

২৫. Karl, Marx, *Notes on Indian History (664-1858)*, Second Impression, Foreign Languages Publishing House, Moscow, 1947, p.149.

২৬. উদ্ধৃত:- সেন সুচিব্রত, 'সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫-৫৬) : ইতিহাসের এক দিগ্‌দর্শন', *কোরক সাহিত্য পত্রিকা,* পরাধীন ভারতের বিদ্রোহ, শারদ ২০২১, পৃ.৬১।

২৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'ইংরেজদের আতঙ্ক', *রবীন্দ্র রচনাবলী,* বিশ্বভারতী, ২০১২, দশম খন্ড, পৃ. ৫৩৭।

২৮. Dutta, Kalikinkar, *The Santal Insurrection of 1855-57*, Firma KLM Private Limited, First Edition 1940, Second Edition 2001, Calcutta, p.24.

২৯. Guha, Ranajit, *Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India*, Oxford University Press, Delhi, p.27.

৩০. বাস্কে, ধীরেন্দ্রনাথ, *সাঁওতাল গণসংগ্রামের ইতিহাস,* বিজয়ন প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৭৬, ষষ্ঠ সংস্করণ ২০০৩ , পৃ. ২।

৩১. *Report on the Administration of Bengal, 1871-72*, p.17.

৩২. *Letter from Skrefsud to the Deputy Commissioner, June 27, 1899 C.B.Dumka*, A copy of this letter was forwarded to the Lieutenant Governor of Bengal.

৩৩. *Bengal Judicial Proceedings*, July 1871, vol. 161, West Bengal State Archive.

৩৪. Chaudhuri, Binay Bhusan, 'Tribal Society in Transition', in Mushirul Hasan and Narayani Gupta (eds.), *India's Colonial Encounter*, Manohar, New Delhi, 2004, p.125.

৩৫. সেন, শুচিব্রত, *পূর্ব ভারতের আদিবাসী অস্তিত্বের সংকট,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০২ পৃ. ৭৮-৭৯।

৩৬. Jha, Surendra, 'Historigraphy of the Tribal Movement in colonial India (1770-1947)', in Dilip Kumar Ghosh and Ranjit Sen (eds.), *Indian Historiography and Analysis,* Vol-II, Institute of Historical Studies, Kolkata, 2018, p.318.

৩৭. Culshaw, W.J., *Tribal Heritage : A Study of the Santals,* Butterworth Press, London, 1949, pp.161-74.

৩৮. মিদ্দে, সুরঞ্জন (সম্পাদনা), *সাঁওতাল ও মিশনারি* , নান্দনিক, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ১৪।

৩৯. *Census of India*, 1911.

৪০. হেমব্রম, পরিমল, *স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কথা,* আদিবাসী সাহিত্য প্রকাশনী, হাওড়া, ২০১৮, পৃ. ৭০-৮১।

৪১. Chaudhuri, Tripathi, 'Evangelical or Imperial? Re-examinig the Missionary Agenda among the Santals, 1855-1885', in Sanjukta Dasguptaa and Rajsekhar Basu (eds.), *Narratives from Margins : Aspects of Adivasi History in India*, Primus Books, New Delhi, p.165.

৪২. Jha, Surendra, 'Historigraphy of the Tribal Movement in colonial India (1770-1947)', in Dilip Kumar Ghosh and Ranjit Sen (eds.), *Indian Historiography and Analysis,* Vol-II, Institute of Historical studies, Kolkata, 2018, p.152.

৪৩. Susana B.C. Devalle, *Discourses of Ethnicity : Culture and Protest in Jharkhand*, Sage, New Delhi, 1992, p.205.

৪৪. Elwin, Verrier, *The Aboriginals*, Oxford University Press, New Delhi, 1944, p.121.

৪৫. উদ্ধৃত : ঘোষ, সুবোধ, *ভারতের আদিবাসী,* ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ১৯২৮, চতুর্থ মুদ্রণ ২০১৮, পৃ. ১৫২।

৪৬. ঘোষ, সুবোধ, 'চতুর্থ পাণিপথের যুদ্ধ', *শ্রেষ্ঠ গল্প,* প্রকাশ ভবন, কলকাতা, ১৯৮৬, পৃ. ২০৮।

৪৭. গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ, 'একটি শত্রুর কাহিনী', *রচনাবলী* (৩ খন্ড), মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৯৫২, পৃ. ৪৮৭।

৪৮. বনফুল, 'দুইটি ছবি', *গল্প সমগ্র (৩ খন্ড),* গ্রন্থালয়, কলকাতা, ১৯৫৩, পৃ. ১৮৭।

৪৯. ওলাভ হড়্নে, 'সাঁওতাল সেবায় খ্রিস্টান মিশনারি : মিশনের প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ' (১৮৬৭-১৮৭৭), সুরঞ্জন মিদ্দে (সম্পাদনা), *সাঁওতাল ও মিশনারি,* নান্দনিক, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ১০৮-১১২।

৫০. মিদ্দে, সুরঞ্জন (সম্পাদনা), *সাঁওতাল ও মিশনারি,* নান্দনিক, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ১৫।

৫১. *The Six Annual Report of the Santal Mission of The Northern churches*, Benagoria, 1872, p.72.

৫২. Bodding, P.O., *Sona : En kristen santalkvindes liv oggjerning, Copenhagen :* den Nordiske, Santal Mission Churchs, Benagoria,1919, p.17.

৫৩. Sinha, S.P., *Conflict and Tension in Tribal Society,* Concept Publishing House, New Delhi, 1993, pp.148-49.

৫৪. সেন, শুচিব্রত, *ভারতের আদিবাসী : সমাজ, পরিবেশ ও সংগ্রাম,* বুকপোস্ট পাবলিকেশন, কলকাতা, ২০২১, পৃ. ৭৪।

৫৫. মেরিন কারিন, 'সাঁওতাল লেখকবর্গ : প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর', আদিবাসী ভারত বিশেষ সংখ্যা, *অনুষ্টুপ,* বর্ষ ৫৬, সংখ্যা ৪, কলকাতা, ২০২২, পৃ. ৭৩।

৫৬. Hansdak, Ivy. Imogene, *A Doctor among the Santals*, Ispck, Delhi, 2012, p.65.

৫৭. Olav Hodne, *The seed bore fruit : A short History of the Santal mission of the northern churches (1867-1967),* The Santal mission of the northern *churches*, Dumka, 1967, p.123.

৫৮. *The Fifty-First Annual Report of The Santal Mission of the Northern Churches* (The Indian home Mission to the Santals), Dumka, published by the Santal mission of the northern Churches 1919, p.3.

৫৯. Ibid, p.4.

৬০. O' Malley, L.S.S, *Bengal District Gazetters : Santal Parganas*, The Bengal Secretariat Book Dept, Calcutta, First Published in 1910, Reprint 1984, p.67.

৬১. Roy Choudhury, P.C., Bihar District Gazetteers : Santal parganas, The Superintendent Secretariat Press, Bihar, Patna, 1965, p.955.

৬২. Chatterjee, Partha, *The Nation and Its Fragments : Colonial and Post Colonial Histories*, Oxford University Press, New Delhi, 1993, p.6.

৬৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'শেষের কবিতা', *রবীন্দ্র উপন্যাস-সংগ্রহ,* বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, ১৯৯০, পৃ. ১১০৮।

৬৪. Lawrence Grossberg, *Cultural Studies in The Future Tense*, Orient Blackswan Pvt. Ltd, New Delhi, p.3.

৬৫. Ibid, p.6.

৬৬. Emile Durkheim, *Durkheimian Sociology : Cultural Studies,* Cambridge University Press, London, Reprint 1992, p.49.

৬৭. J. Monaghan and Peter Just, *Social and Cultural Anthropology,* Oxford University Press, New York, 2000, p.13.

৬৮. Raymond Williams, *Culture and Society : Essential Writings*, Jim McGuigan(eds.), SAGE Publication, USA, p.283.

৬৯. J. Monaghan and Peter Just, *Social and Cultural Anthropology*, Oxford University Press, New York, 2000, p.37.

৭০. *Census of India*, 1921, Vol. VII, Bihar and Orissa, Part – I.

৭১. Quoted in H.H. Risley, *The Tribes and Castes of Bengal*, Introductory Essay, Vol-I, Bengal Secretariat Press, Calcutta, 1892, p.iii.

৭২. Forsyth, J., *The Highlands of Central India : Notes on Their forests and Wild Tribes*, Natural History and Sports, Chaman and Hall Ltd., London, 1889, p.141.

৭৩. Dalton, E.T., *Descriptive Ethnology of Bengal*, The Superitendent of Government of Bengal, Calcutta, 1872, p. 21.

৭৪. Risley, H.H., *Tribes and Castes of Bengal*, The Bengal Secectariat Press, Calcutta, 1892, p.11.

৭৫. Risley, H.H., *The People of India*, Thacker, Spink and Co., Calcutta, 1915, p.203.

৭৬. Ghurye, G.S., *The Scheduled Tribe*, Popular Prakashan, Bombay, 1943, p.120.

৭৭. Srinivas, M.N., *Social Change in Modern India*, New Delhi, Orient Logman, 1982, p.5.

৭৮. Mazumdar, D.N., 'A study of the Tribe-caste continnum and the process of sanskritization among the Bodo speaking Tribes of the Garo Hills', in K.S. Singh (ed.), *Tribal Situation in India*, Indian Institute of Advanced Study, Simla, 1972, p.266.

৭৯. বসু, নির্মল কুমার, *হিন্দু সমাজের গড়ন,* বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলকাতা, ১৯৪১, পৃ. ২২।

৮০. Bose, N.K., *Culture and Society in India*, Asia publishing House, New Delhi, 1967, p.214.

৮১. Xaxa, Virginius 'Transformation of Tribes in India : Terms of Discourse', *Economic and Political Weekly*, Vol.34, No.24, Jun. 12-18, 1999, p.1521.

৮২. Chaudhuri, Binay Bhushan, 'Adibasi Quest for a New Culture in colonial Bengal : Context, Ideology and Organization 1855-1932', in Sabysachi Bhattacharya(ed.), *A Comprehensive History of Modern Bengal 1700-1950*, Vol-3, The Asiatic Scoiety & Primus Books, Kolkata, 2020, p.92.

৮৩. রায়, নীহাররঞ্জন, *বাঙালির ইতিহাস : আদিপর্ব,* কলকাতা, পুনঃ প্রকাশ ১৯৮০, পৃ. ৬৮।

৮৪. সেন, ক্ষিতিমোহন, *ভারতের সংস্কৃতি,* বিশ্বভারতী, ১৯৬২, পৃ. ৬৮।

৮৫. উদ্ধৃত : সুকুমার সিকদার ও সারদা প্রসাদ কিস্কু (অনুবাদ ও সম্পাদনা), *রামদাস টুডু রেস্কা : খেরওয়াল বংশা ধরম পুঁথি,* নির্মল বুক এজেন্সি, কলকাতা, ২০০৭, পৃ. ৭২।

৮৬. চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার, *জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য,* মিত্র ও ঘোষ, কলিকাতা, ১৯৪৫, পৃ. ১২।

৮৭. Mitra, Parimala Chandra, *Santali: The Base of World Language*, Firma KLM Private Limited, Kolkata, 1988, p.85.

৮৮. রায়, শরৎচন্দ্র, *ভারতবর্ষের মানব ও মানব সমাজ,* কলকাতা, ১৯৩৮, পৃ. ৪৫।

৮৯. Kumar, Suresh Singh, *Tribal Society in India*, Monohar, New Delhi, Reprint 2020, p.133.

৯০. *ক্ষেত্র সমীক্ষা : চুটোনাথ মন্দির,* দুমকা, ঝাড়খন্ড, তারিখ – ৭.১২.২০২১.

৯১. O’ Malley, L.S.S., *Bengal District Gezetters : Santal Parganas*, The Bengal Secretariat book Department, Calcutta, First Published in 1910, Reprint 1984, p.25.

৯২. Myron Weiner, *Sons of the Soil : Migration and Ethnic Conflict in India,* Princeton University Press, USA, 1978, p.210.

৯৩. *Final Report on the survey and settlement operation in the District of Birbhum*, 1924-1932.

৯৪. Bose, Nirmal Kumar, ‘*Hindu Method of Tribal Absorption’,* Science and Culture, Vol.7, No.7, p.184, Reprinted in His Culture and Society in India, Bombay, Asia Publishing House, 1977, p.210.

৯৫. Quoted in P.O. Bodding, *Santal Medicine*, S.K. Bhoumik on Bodding, Calcutta, 1983, Originally Published in the Journal of Asiatic Society, (1927), Calcutta, Reprint, The Book Trust, Calcutta, 1983, p.11.

৯৬. Ibid, pp.12-13.

৯৭. Mahapatra, Sitakant, *The Tangled Web : Tribal Life and Culture of Orissa,* Orissa Sahitya Parishad, 1993, p.123-126.

৯৮. চৌধুরী, বিনয়ভূষণ, ‘ধর্ম ও পূর্ব-ভারতে কৃষক আন্দোলন : (১৮২৪-১৯০০)’, *পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ* (সম্পাদিত), ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০৫, পৃ. ১৭৯-১৮০।

৯৯. Datta-Majumder, Nabendu, *The Santals : A Study in Culture Change,* Government of India Press, Calcutta, 1956, p.31.

১০০. সেন, শুচিব্রত, *ভারতের আদিবাসী : সমাজ, পরিবেশ ও সংগ্রাম,* বুকপোস্ট পাবলিকেশন, কলকাতা, ২০২১, পৃ. ১৬০।

১০১. *Bengal Judicial proceedings, August 1881,* No.39-40, Appendix ‘C’ ; Reply to Question no.7 of Bhagalpur Commisoner’s Letter of 5th June 1881 to the Government of Bengal, Judicial Department,

'Note' by W Oldham, Deputy Commissioner of the Santal Pergunnuhs, (dated 16th march, 1881) on the State of Affairs in the Santal Pergunnahs.

১০২. Roy Choudhury, P.C., *Bihar District Gezetters : Santal Parganas*, The Superintendent Secretariat Press, Bihar, Patna, 1965, p .953.

১০৩. J. Toroisi, 'Hindu-Tribal Religious Interaction', in R.E. Hedlund and Beulah Herbert(eds.), *Culture and Evangelization*, Growth Research Centre, Madras, 1984, p.118.

১০৪. Hembrom, T., *The Santals : Anthropological-Theological Reflections on Santali and Biblical Creation Traditions*, Punthi Pustak, Calcutta, 1996, p.65.

১০৫. Risley, H.H., *Tribes and Castes of Bengal*, Vol.2, Calcutta, Firma KLM Private Limited, Reprint 1981, p.232.

১০৬. Troisi, J., *Tribal Religion*, Manohar Publications, Delhi, 1979, p.2.

১০৭. Mathur, Nita, 'Santhal concept of womb and seed', in Nita Mathur (ed.), *Santhal World view*, Concept Publishing Company, New Delhi, 2001, p.11.

১০৮. Datta-Majumder, Nabendu, *The Santals : A Study in Culture Change*, Government of India Press, Calcutta, 1956, p.113.

১০৯. *Bengal judicial proceedings*, March 1875 : G.N. Barlow, officiating Commissioner of Bhagalpur Division to the Deputy Comissioner of the Santhal Pergunnahs, 25 Feb, 1875.

১১০. *Bengal judicial proceedings*, Jhon Boxwell, officiating Deputy Commissioner of the Santhal Pergunnahs to the Comissioner of the Santhal Pergunnahs, 1st October, 1874.

১১১. *Bengal General Miscellaneous proceedings*, september 1875, File No. 133, Annual General Report, Bhagalpur Division, 1874-75.

১১২. *Bengal judicial proceedings,* November 1874, No. 1-3, G.N. Barlow, officiating Commissioner of Bhagalpur to Government of Bengal, Political Department, 7th October 1874.

১১৩. *Bengal judicial proceedings,* File No. 40-88, Note by G.N. Barlow, 9th March 1875.

১১৪. *Bengal judicial proceedings*, August 1881, No.39-40, Appendix 'A' Of Bhagalpur Commissioner's letter of 5th June 1881 to the Government of Bengal, Judicial Department, 'Note' by W Oldham, Deputy Commissioner of the Santal Pergunnuhs, (dated 16th march, 1881) on the State of Affairs in the Santhal Pergunnuhs.

১১৫. *Bengal judicial proceedings,* August 1881, No.39-40, Appendix 'C' Of Bhagalpur Commissioner's letter of 5th June 1881 to the Government of Bengal, Judicial Department, 'Note' by W Oldham, Deputy Commissioner of the Santal Pergunnuhs, (dated 16th march, 1881) on the State of Affairs in the Santhal Pergunnuhs.

১১৬. *Bengal judicial proceedings,* August 1881, No.39-40, Appendix 'D' Of Bhagalpur Commissioner's letter of 5th June 1881 to the Government of Bengal, Judicial Department, 'Note' by W Oldham, Deputy Commissioner of the Santal Pergunnuhs, (dated 16th march, 1881) on the State of Affairs in the Santhal Pergunnuhs.

১১৭. *Bengal judicial proceedings*, August 1881, No.39-40, Appendix 'C' Of Bhagalpur Commissioner's letter of 5th June 1881 to the Government of Bengal, Judicial Department, 'Note' by W Oldham, Deputy Commissioner of the Santal Pergunnuhs, (dated 16th march, 1881) on the State of Affairs in the Santhal Pergunnuhs.

১১৮. *Bengal judicial proceedings,* August 1881, No.39-40, Appendix 'C' Of Bhagalpur Commissioner's letter of 5th June 1881 to the Government of Bengal, Judicial Department, 'Note' by W Oldham, Deputy Commissioner of the Santal Pergunnuhs, (dated 16th march, 1881) on the State of Affairs in the Santhal Pergunnuhs.

১১৯. *Bengal judicial proceedings*, August 1881, No.39-40, Appendix 'C' Of Bhagalpur Commissioner's letter of 5th June 1881 to the Government of Bengal, Judicial Department, 'Note' by W Oldham, Deputy Commissioner of the Santal Pergunnuhs, (dated 16th march, 1881) on the State of Affairs in the Santhal Pergunnuhs.

১২০. Orans, Martin, *The Santal : A Tribe in Search of a great Tradition*, Wayne State University, Deroit, 1965, p.30.

১২১. Ibid, p.108.

১২৩. Chaudhuri, Binay Bhushan, 'Tribal Society in Transition', in Mushirul Hasan and Narayani Gupta (eds.), *India's Colonial Encounter*, Manohar, New Delhi, 2004, p.113.

১২৩. Quoted in Edward Duyker, *Tribal Gurrillas*, Oxford University Press, Bombay, 1987, p.113.

১২৪. চৌধুরী, বিনয়ভূষণ, 'ধর্ম ও পূর্ব-ভারতে কৃষক আন্দোলন : (১৮২৪-১৯০০)', *পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ*, (সম্পাদিত), ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০৫, পৃ. ১৯৫।

১২৫. উদ্ধৃত : চৌধুরী, বিনয়ভূষণ, 'ধর্ম ও পূর্ব-ভারতে কৃষক আন্দোলন : (১৮২৪-১৯০০)', *পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ,* (সম্পাদিত), ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০৫, পৃ. ১৯৬।

১২৬. হেমব্রম, পরিমল, *সাঁওতালি ভাষা-চর্চা ও বিকাশের ইতিবৃত্ত,* নির্মল বুক এজেন্সি, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ৯৯।

১২৭. মেরিন কারিন, 'সাঁওতাল লেখকবর্গ : প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর', আদিবাসী ভারত বিশেষ সংখ্যা, *অনুষ্টুপ,* বর্ষ ৫৬, সংখ্যা ৪, কলকাতা, ২০২২, পৃ. ৭৫।

১২৮. *Letter Copy Book, Commissioners's Office of the Santal Parganas*, Dumka, 18th April 1931, File No. 108/1931, Jharkhand State Archives, Ranchi.

১২৯. *সাক্ষাৎকার : মন্দন মারান্ডি,* ফতেহপুর, জামতাড়া, ঝাড়খন্ড, তারিখ – ১৫.০২.২০২২.

১৩০. মণ্ডল, অমলকুমার, *ভারতীয় আদিবাসী : সমাজ-সংস্কৃতি-সমস্যা-সংগ্রাম-সংকল্প,* দেশ প্রকাশন, কলকাতা ২০১৭, পৃ. ২৬৪।

১৩১. *ক্ষেত্রসমীক্ষা : জামতাড়া, দুমকা, দেওঘর, গোড্ডা,* তারিখ.১৭.০৫.২০২১-২০.০৬.২০২১.

১৩২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'ব্রাহ্মণ' *(কবিতা), চিত্রা কাব্যগ্রন্থ,* বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৮৯৫, পৃ. ৭২।

১৩৩. Kosambi, D.D., *An Introduction to the study of Indian History*, 2nd ed(Bombay), 1975, in রণজিৎ গুহ 'একটি অসুরের কাহিনী', *নিম্নবর্গের ইতিহাস,* গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদনা), আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৮, পৃ. ৬৭-৬৮।

১৩৪. *Census of India*, 1931, 1933, Chapter – X., p.394.

১৩৫. Guha, Ranajit, *Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India*, Oxford University Press, Delhi, 1983. p.71.

১৩৬. Ghosh, Arunabha, 'Probing the Jharkhand Question', *The Economic and Political Weekly,* May-4, 1991, p.1173.

১৩৭. Andre Beteille, *The Idea of Indigenous People,* Current Anthropology 39(2), New Delhi, p.189.

তৃতীয় অধ্যায়

সাঁওতাল পরগণার সাঁওতালদের অর্থনৈতিক অবস্থা ও অভিপ্রয়াণ

তৃতীয় অধ্যায়

সাঁওতাল পরগণার সাঁওতালদের অর্থনৈতিক অবস্থা ও অভিপ্রয়াণ

আদিবাসী তথা সাঁওতালদের অর্থনীতি মূলত অস্তিত্ব নির্ভর। তাই তাদের সমাজ-সংস্কৃতির বিবর্তনের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আবার অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে জড়িয়ে আছে অভিপ্রয়াণ বা অন্যত্র পরিযাত্রা। অর্থাৎ বলা যেতেই পারে আদিবাসীদের স্বতন্ত্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে তাদের সমাজ ও সংস্কৃতি গভীরভাবে সম্পৃক্ত এবং একে অপরের পরিপূরক। অন্যান্য জাতির অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে এই ব্যবস্থাই তাদের পৃথক রেখেছে বা স্বাতন্ত্র্যতা প্রদান করেছে। তাই সাঁওতালদের সমাজ-সংস্কৃতির বিবর্তন বা সংকট আলোচনার ক্ষেত্রে যদি অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে বাইরে রেখে আলোচনা করা হয়, তবে সেই আলোচনার কোনো প্রাসঙ্গিকতা থাকে না। সাঁওতাল পরগণার সাঁওতালরা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে সাঁওতাল পরগণায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। সেখানকার জঙ্গলময় ভূমিকে তারা তাদের কায়িক শ্রমের মাধ্যমে চাষের জমিতে রূপান্তরিত করে এবং সেই সময়ে ভূমি ও জঙ্গলের ওপর অধিকার তাদেরই ছিল। এই অধিকারের ওপর ভিত্তি করে সেখানে তারা এক স্বতন্ত্র সমাজ ও সংস্কৃতি গড়ে তোলে। যেখানে ছিল মাঝি নির্ভর গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন-যাপন প্রণালী, নিজস্ব বিচার ব্যবস্থা, উৎসব-অনুষ্ঠান ও চিকিৎসা পদ্ধতি। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ হলেও সেখানে নারীদের যথেষ্ট সম্মান দেওয়া হত। কিন্তু উপনিবেশ ও উপনিবেশ পরবর্তী সময়ে সরকারের নানান নিয়ম-নীতি ও পদক্ষেপের দরুন এই স্বতন্ত্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সংকটাপন্ন হয়ে পড়ে। যার দরুন তাদের সমাজ ও সংস্কৃতি বিবর্তনের ধারায় বাহিত হতে থাকে। কাজেই তাদের এই অর্থনৈতিক সংকট তৈরি করে সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংকট; ক্রমশ সেটি রূপ নিয়েছে আত্মপরিচয়ের সংকটে এবং শেষ পর্যন্ত অনিবার্যভাবে এসে পড়েছে অস্তিত্বের সংকট।

সারা বিশ্বজুড়ে জনজাতিদের অর্থনীতি মূলত তিনটি বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে আছে, আর তা হল—জল, জঙ্গল ও জমি। এদের মধ্যে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ হল জমি। জনজাতিদের ইতিহাসে, জমির অনুসন্ধান তাদের জীবনে অবিরত এক প্রয়াস। প্রসঙ্গত সাঁওতালরা এর ব্যতিক্রম নয় এবং তাদের জমির অধিকার পাওয়ার জন্যই উপনিবেশ

ও উত্তর ঔপনিবেশিক কালে সংগ্রাম চালিয়ে ছিল। তাদের এই জমির অনুসন্ধানের কথা বহু প্রাচীনকাল থেকেই উল্লেখ পাওয়া যায়। যাযাবর জীবন থেকে একদিনেই সাঁওতালরা কৃষিজীবীতে রূপান্তরিত হয়নি। খাদ্য সংগ্রহের অপ্রতুলতা, অন্যদিকে কৃষিব্যবস্থার বিস্তার ধীরে ধীরে সাঁওতাল জীবনে কৃষিচেতনার ধারণা গড়ে তুলেছিল। ডবলু.ডবলু.হান্টার উল্লেখ করেছেন যে, সাঁওতালি ভাষা এবং তাদের বিভিন্ন লৌকিক উৎসবে কৃষি সম্পর্কিত জ্ঞান প্রতিফলিত হয়।[১] এক্ষেত্রে এটা উল্লেখ করতে হবে যে, জনজাতি গোষ্ঠীর নিজস্ব লিখিত উপাদানের ভাণ্ডার কম হওয়ায় তাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতি বা অস্তিত্ব প্রধানত দুটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে, যা হল ঐতিহাসিক অতীত (Historical Past) ও ঐতিহ্যগত অতীত (Traditional Past)। প্রথমা ব্যানার্জী তাঁর 'Writing The Adivasi : Some historiographical notes' প্রবন্ধে উল্লেখ করেন যে, তিনি জনজাতিদের ইতিহাসের পরিবর্তে মিথ বা অতিকথাকে অধিকতর গুরুত্ব দেন।[২] কিন্তু তিনি জনজাতিদের মধ্যে কোন পৃথকীকরণ করেননি। অন্যদিকে বানার্ডস্ কোন (Bernards Chon) তাঁর *An Anthropologist Among The Historians and Other Essays* গ্রন্থে সাধারণভাবে ঐতিহাসিক অতীত ও ঐতিহ্যগত অতীত যে কথা দুটির উল্লেখ করেছেন, সেটি সাঁওতাল জনজাতির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হতে পারে।[৩] একথা সবারই জ্ঞাত যে ট্রাইব বা জনজাতি কোনো Homogeneous Category নয়। শবর, গারো প্রভৃতি জনজাতিদের সঙ্গে সাঁওতালদের তুলনা চলে না, যেহেতু তারা তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য দীর্ঘকাল ধরে রেখেছিল। যখন ঐতিহাসিক অতীত আলোচনায় তাদের তেমন প্রকাশ যথেষ্ট হয়ে ওঠে না, তখন আমরা স্বাভাবিক ভাবেই ঐতিহ্যগত অতীতকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকি। এ প্রসঙ্গে পি.ও. বোডিং যথাযথ ভাবে উল্লেখ করেছেন যে, 'As to their (Santals) traditions, it is possible to accord too high a place'.[৪] তাহলে স্বভাবতই প্রশ্ন এসে যায় যে, কোথা থেকে তাদের ঐতিহ্যসমূহ সংগ্রহ করা যেতে পারে? মূলত এগুলি প্রতিফলিত হয়েছে তাদের লোকগীতি, লোককথা এবং তাদের বিভিন্ন ধাঁধার মাধ্যমে, যেগুলি শতকের পর শতক পেরিয়ে তাদের স্মৃতির মণিকোঠায় আজও জীবিত হয়ে আছে। ঘটনাচক্রে ডবলু. জি. আর্চার (W.G. Archer)-এর এক মন্তব্য এই প্রসঙ্গে খুবই প্রাসঙ্গিক—'That only

through its songs do the attitudes of a tribes or caste become clear and it is not until the poetry has been understood that a tribe is understood'.[৫]

সাঁওতাল পরগণার সাঁওতালদের অর্থনৈতিক অবস্থার পর্যালোচনার ক্ষেত্রে ১৮৫৫ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহের গভীরে আলোকপাত না করেও, এটা নিশ্চিতভাবে উল্লেখ করা যায় যে, তাদের অর্থনীতি এর আগেও বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছিল। 'দামিন-ই-কোহ'-এর অভ্যন্তরে জমিদারি ব্যবস্থাপনায় নায়েব সেজোয়াল এবং জমিদারের গোমস্তা সাঁওতাল অর্থনীতিকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছিল। তবে অন্যান্য কারণ থাকলেও জমি সংক্রান্ত প্রশ্নগুলিই সবার প্রথমে আসে। এই সময় অর্থাৎ ঊনবিংশ শতকের প্রথম ভাগে 'দামিন-ই-কোহ' অঞ্চলে সাঁওতালরা নিজেদের কৃষিজীবী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল এবং তাদের পরিচয় ও মর্যাদা কৃষিকাজের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েছিল। এই প্রসঙ্গে কালসো (Culshaw) সঠিক ভাবে উপলব্ধি করেছিলেন—"No motive is so strong in a tribal people as the preservation of the life of the tribe and his moves albeit. The motive works for the most part at the unconscious level, and the Santal's land not only provides economic security but is a powerful link with his ancestors... Hunger drove them to despair, but this attachment to land provided also an emotional basis without which the rebellion might not have taken place".[৬] এক্ষেত্রে আমাদের মনে পড়ে যাই, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত কবিতা 'দুই বিঘা জমি'-র সেই বিখ্যাত পংক্তি গুলি—

'সপ্তপুরুষ যেথায় মানুষ সে মাটি সোনার বাড়া,
দৈন্যের দায়ে বেচিব সে মায়ে এমনি লক্ষীছাড়া!'[৭]

যদিও সাঁওতাল পরগণার সাঁওতালদের বসতি বা তাদের প্রতিষ্ঠা খুব প্রাচীন নয় তবুও তাদের আত্মিক আবেগ তাদের পূর্বপুরুষের ভাবনা ও সময়কালকে তুলে ধরে।

অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে এক ঐতিহাসিক অনিবার্যতায় সাঁওতালরা 'দামিন-ই-কোহ'-তে বসতি স্থাপন করতে শুরু করে। এ বিষয়ে ফ্রান্সিস বুকানন (Francis Buchanon) তাঁর রিপোর্টে উল্লেখ করেন যে—'জঙ্গল মহল' অর্থাৎ দক্ষিণ পশ্চিম বাংলায় জমিদারের অত্যাচার এবং একই সঙ্গে সিংভূমে জনবসতির আধিক্য

সাঁওতালদের 'দামিন-ই-কোহ' অঞ্চলে বসতি স্থাপনে উৎসাহিত করে।[৮] অন্যদিকে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির ব্যবসায়িক স্বার্থে রাজমহল এলাকায় প্রচুর জমির প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সেখানকার স্থানীয় বাসিন্দা পাহাড়িয়ারা চাষবাসে আগ্রহী ছিল না। তখন সরকার (অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি এবং উনিশ শতকের প্রথম দিকে) একটা খবর চারিদিকে ছড়িয়ে ছিল যে, যদি কেউ এই অঞ্চলের বনভূমি পরিষ্কার করে কৃষিযোগ্য জমি তৈরি করতে পারে, তবে সেই জমি তাদেরই হবে। এ প্রসঙ্গে ম্যাকফার্সন্ তাঁর রিপোর্টে উল্লেখ করেছেন যে– "Differing probably less from the inhabitants of the Hills than any ryots who could be induced to emigrate from the plains, and free from many of the objections which attach to the letter"।[৯] প্রায় সেই সময় থেকে পূর্বতন জঙ্গল মহল অর্থাৎ দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলা এবং সিংভূমের সাঁওতালদের জমিদাররা জমির অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছিল। তখন তারা সাদারল্যান্ডের অন্তর্গত 'দামিন-ই-কোহ' যা তৎকালীন সরকারি খাস জমি হিসেবে পরিচিত ছিল, সেখানে নানান সুবিধার কথা ভেবে বসতি স্থাপন করতে লাগল। তাছাড়া তখনও পর্যন্ত এই অঞ্চলটি জমিদারি শোষণের শিকার হয়নি। পরিশ্রমী সাঁওতালরা দিনরাত মাথার ঘাম পায়ে ফেলে জঞ্চল কেটে পরিষ্কার করে কৃষিযোগ্য জমি তৈরি করল এবং চাষবাস করতে লাগল। কিন্তু ঘন অরণ্যে ছিল হিংস্র পশু এবং শ্বাপদ; কিছু সংখ্যক সাঁওতালদের প্রাণ তাদের হাতে গেলেও শেষমেষ এখানেই তারা স্থায়ীভাবে বসবাস করতে লাগল। এ ব্যাপারে ডবলু.ডবলু.হান্টারের একটি লেখা উল্লেখযোগ্য— "But the intervenign valley between the hills and the pillers remained unoccupied, the wild highlandars carring and the low lander. Not daring to till then. From fertle country population was wanted and the Santals were discovered to be very people required".[১০] এই স্থানে যখন তারা কৃষিযোগ্য জমি তৈরি করল তখন তাদের কোনো খাজনা দিতে হত না। ১৮৩০ সালের ১৪ই জুলাই ভাগলপুরের কমিশনার J.R Ward তৎকালীন 'দামিন-ই-কোহ'-এর কমিশনার Lee Warner কে লেখা এক চিঠিতে বলেন যে—"The villages noted is the Captain Tanner's map were established and still occupied by the Santals, if they are correctly tackled down, having some cultivation among them and which probably will increase. The Santals are an industrious race of people, and if left unmolested, will effect the entire

clearance of the heavy jungles which from a beltalon the face of these hills”.[১১]

সাঁওতালরা যখন ‘দামিন-ই-কোহ’-তে বসবাস করতে আসে, তখন তাদের কাছে চাষবাস করার কোনো উপকরণ ছিল না। যেমন—গরু, লাঙল, বীজ ইত্যাদি। তাদের একমাত্র উপায় ছিল সেখানকার মহাজনের কাছ থেকে ঋণ নেওয়া এবং এর দরুন তারা একটি ভয়ানক শোষণের বৃত্তে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। আবার অন্যদিকে পার্শ্ববর্তী এলাকা (দুমকা, বারহাইত, ভাগলপুর) থেকে ব্যবসায়ীরা এসে খুব অল্প দামে সাঁওতালদের ফলন করা শস্য ক্রয় করে নিকটস্থ সিউড়ি এবং কলকাতায় পাঠাত। অশিক্ষিত সাঁওতালরা ছিল অত্যন্ত সহজ, সরল এবং সৎ মানুষ। ফলত তাদের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে ব্যবসায়ীরা তাদের নানান ভাবে ঠকিয়ে প্রচুর মুনাফা লাভ করত। এই ধূর্ত ও অনৈতিক ব্যবসায়ীরা সাঁওতালদের ওজনে ও দামেও ঠকাত। বর্ষাকালে আবার এই সব ব্যবসায়ীরা টাকা ধার দিত, কিন্তু টাকা ফেরত নেওয়ার সময় নানা ভাবে প্রতারণা করত। এই ব্যবসায়ী এবং মহাজনদের চতুরতায় অনেক অশিক্ষিত সাঁওতালরা বিভিন্ন লিখিত চুক্তির খাতায় অজান্তে টিপ ছাপ দিয়ে দিত। তারা এটাও জানত না যে কত টাকা ঋণ ও সুদ হিসাবে মোট কত টাকা মহাজনদের পরিশোধ করতে হবে, যার পরিণামে সাঁওতালদের অর্থনৈতিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে। প্রথমদিকে এখানকার সাঁওতালদের খাজনা দিতে না হলেও পরবর্তীকালে সাঁওতালদের চাষবাসের শ্রীবৃদ্ধি ঘটলে খাজনা ধার্য করা হয় এবং এই এলাকাটিও জমিদারের শোষণের আওতায় চলে আসে। ১৮৩৮ সালের হিসেব অনুযায়ী দেখা যায় এস্থানের বার্ষিক খাজনা ছিল দু-হাজার টাকা এবং এ অঞ্চলে মোট গ্রাম ছিল ৪০টি এবং জনসংখ্যা ছিল ৩০০০। ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে এই খাজনা বাড়িয়ে আবার ৪০৩৯১৮ টাকা ১৩ আনা ৫৫ পয়সা করা হয়। ইতিমধ্যে যে সাঁওতালদের সংখ্যা ছিল ৩০০০ তা বেড়ে হয় ৮২০০০ এবং ৭৯৫৪০ টি গ্রামের জায়গায় বেড়ে ১ হাজার ৪৭৩টি গ্রাম।[১২] ক্যাপ্টেন শেরউইল এর করা এই সমীক্ষা ‘Friend of India’ নামক এক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকাটি পরবর্তীকালে ‘Statesman’ নামে পরিচিত হয়। জনসংখ্যার নিরিখে সাঁওতালদের জমির রাজস্ব বৃদ্ধি আপাতভাবে পরস্পর বিরোধী মনে হতে পারে কিন্তু সাঁওতালদের জমির সম্প্রসারণ ছিল এর মূল কারণ। বাংলার সচিবের

তথ্য দপ্তর থেকে ১৯০৯ সালের এক বার্ষিক প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, সাঁওতাল পরগণার জনসংখ্যা ১৮৯৮ থেকে কমে ১০৯৭ হয়েছিল। তবুও বিতর্কিতভাবে এটাও উল্লিখিত ছিল যে ১৮৩৭-৩৮ বর্ষে সরকারি রাজস্ব ৬,৬৮২ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৮৫৪-৫৫ বর্ষের দিকে তা ৫৮,০৩৩ হয়েছিল। কিন্তু সরকারি রাজস্ব বৃদ্ধির পেছনে বার্ষিক মূল্যায়নের কোনো ভূমিকা ছিল না, বরং পুরোটাই সাঁওতাল কর্তৃক চাষবাসের শ্রীবৃদ্ধির কারণেই সম্ভব হয়েছিল বলে বেশ স্পষ্টভাবে উল্লেখ পাওয়া যায় বিডয়েল (Bidwell)-এর প্রতিবেদনে। ১৮৫১ সালে ক্যাপ্টেন শেরউইল তাঁর এক প্রতিবেদনে বেশ আত্মবিশ্বাসের সাথে বলেন যে 'দামিন-ই-কোহ'-তে সাঁওতালদের অধীনে থাকা চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ছিল ১,৬২,৫৬০ একর অর্থাৎ যা ৪,৯১,৭৪৪ বিঘা জমির সমতুল্য এবং পরবর্তী বছরে সরকারি করের পরিমাণ ৪৭,৫৫৫ টাকার অধিক হয়নি। সরকারি তদারকির গড় হিসাব অনুযায়ী 'দামিন–ই-কোহ'-এর অন্তর্ভুক্ত এবং সাঁওতালদের অধীনে থাকা উৎকৃষ্ট জমিগুলিতে প্রতি বিঘায় দেড় আনা কর ধার্য করা হয়েছিল, যা সর্বোচ্চ কর ব্যবস্থার তুলনায় স্বাভাবিক বলে গণ্য করা হয়। বিডয়েল এরকম কর ব্যবস্থাকে 'Indeed', বা যথযথ বলেই স্বীকৃতি দিয়েছিলেন।[১৩] বিভিন্ন রিপোর্টে রাজস্বের পরিমাণ সঠিক বলা হলেও অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় রাজস্বের হার অনেকটাই বেশি ছিল, যার জন্য সাঁওতালদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। প্রথম দিকে জে.পনন্টেট (J. Pantet) জমি সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করেন, কিন্তু পরবর্তীকালে সরকার সিদ্ধান্ত নেয় যে জমি সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যার সমাধান শুধুমাত্র মুনসিফ আদালতেই হবে। অশিক্ষিত দরিদ্র সাঁওতালদের আইনের ঘোরপ্যাচ ও উকিল–মুহুরির খরচ যোগানো এবং সেই সঙ্গে তাদের নিজস্ব জমি সংক্রান্ত কোনো রেকর্ড না থাকায় যথেষ্ট অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। তাছাড়া মুনসিফ আদালতে তাদের প্রবেশের অনুমতি ছিল না। তাই যা রায় বা আদেশ জারি করত, তাই বিচার হিসাবে সাঁওতালরা মানতে বাধ্য থাকতো। যার ফলে সাঁওতালদের যথেষ্ট অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। মজার ব্যাপার হল, ২৮ই মে এক বার্ষিক প্রতিবেদনে পনন্টেট সাহেব দেখান যে, এখন পর্যন্ত রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়গুলি সুষ্ঠভাবে পরিচালিত করা হয়েছে।[১৪] অন্যদিকে সাঁওতালদের আত্মমর্যাদায় সবথেকে বেশি আঘাত হেনেছিল 'কামিয়তি' বা চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক ব্যবস্থা। জমি অধিগ্রহণের পর মহাজনদের সেই

জমিগুলিতে কৃষিকাজের জন্য শ্রমিকের প্রয়োজন পড়ত। আর শ্রমিকের ব্যাপারে মহাজনদের কাছে সাঁওতাল শ্রমিক ছাড়া কোনো বিকল্প ছিল না। যতদিন পর্যন্ত সাঁওতালরা ঋণ শোধ করতে পারত না, ততদিন তাদের জমি মহাজনের কাছে বন্ধক থাকতো। ফলত, বংশপরম্পরায় তাদেরকে নিজের জমিতে শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে বাধ্য থাকতে হত। এই রকম দাসত্ব ব্যবস্থা, সাঁওতালদের আত্মমর্যাদায় চরম আঘাত হানে। ই.জি. ম্যানের মতানুসারে—'Under the kamiotee system, a poor man, borrowing rupees 5, 10 or 20, binds himself to work under the lender, till the loan is repaid, sometimes with no such conditions…He is always wanted to plough the lender's field when he is aught to be ploughing his own, and of course he is soon reduced to lowest rank, when the father dies, the son became the kamiotin his place and so it goes on, slavery in the name of hired labour'.[১৫] তাছাড়া সাঁওতালদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বড় অঙ্গ ছিল তাদের গবাদি পশু। কিন্তু স্থানীয় মহাজনেরা তাদের চাষের অন্যতম হাতিয়ার গবাদি পশুদের চুরি করে নিত। এপ্রসঙ্গে দুমকার ডেপুটি কমিশনার Anthony Eden এক চিঠির বিবৃতিতে কমিশনার Stainforth কে বলেন যে, 'This system of illegeal cattle lifting was the cause of the late insurrection'.[১৬]

১৮৫৫ সালে সাঁওতাল বিদ্রোহ সাঁওতাল পরগণার সাঁওতাল সমাজের মানুষের সামাজিক সংহতি ও অর্থনীতির অভাবনীয় ক্ষতি করেছিল। এই রকম সামন্ততান্ত্রিক শোষণমূলক ব্যবস্থা সাঁওতালদের মধ্যে চরম ক্ষোভ সৃষ্টি করে, যাকে দমন করতে তৎকালীন সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। ১৮৫৫ সালের ৩৭ নং রেগুলেশন অনুযায়ী, 'দামিন-ই-কোহ'-এর পরিবর্তে সাঁওতাল পরগণা নামে নতুন জেলা তৈরি করা হয়। ৫৫০০ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে ভাগলপুর ও বীরভূমকে বাদ দিয়ে নতুন জেলাটি গঠিত হয়েছিল, যার প্রধান কার্যালয় হয় দেওঘরে এবং পরবর্তীকালে দুমকায়। প্রশাসনিক কাজকর্মগুলোকে সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য বিদ্রোহের পরবর্তীকালে জেলাটিকে আইন বহির্ভূত বা নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত জেলা (Non-Regulation District) হিসেবে ঘোষণা করা হয়। সেখানে অ্যাসলি এডেনকে প্রথম ডেপুটি কমিশনার হিসেবে কার্যভার দেওয়া হয় এবং অন্যান্য আইনি দায়িত্ব দেওয়া হয় সাঁওতাল প্রধান ও পরগনা প্রধানদের ওপর। সাঁওতাল প্রধানগণ করমুক্ত জমি ব্যবহার

করলেও সাধারণ সাঁওতালদের অর্থনৈতিক অবস্থার তেমন কোনো সুরাহা হয়নি। এর কারণ হিসেবে বলা যায়, সাঁওতাল প্রধানদের হাতে কেবলমাত্র ফৌজদারি দায়িত্ব দেওয়া হয় আর দেওয়ানির দায়িত্ব থাকে সরকারের হাতে। উপরন্তু বিভিন্ন আইনও (Santal Pargana Settlement Regulation 1872, Santal Pargana Rent Regulation 1886, Santal Pargana Tenancy Act 1849) চাপিয়ে দেওয়া হয়। এই জেলার সাঁওতালদের কথা ভেবে ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে ৩৭নং এবং ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে ১০নং আইন দ্বারা অন্যান্য অঞ্চলের নিয়ম-নীতি থেকে পৃথক করা হলেও তা খুব একটা কার্যকরী হয়নি। ফলে ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে সাঁওতালরা পুনরায় বিদ্রোহ প্রবণ হয়ে পড়ে এবং 'সর্দারি' আন্দোলন (১৮৭১) গড়ে তোলে। সরকার পরিস্থিতির চাপে পড়ে বাধ্য হয়ে ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে ৩নং রেগুলেশন জারি করে, কিন্তু তাতেও এই এলাকার সাঁওতালদের শোচনীয় আর্থিক অবস্থার বিশেষ কিছু পরিবর্তন হয়নি। বরং সেভাবেই কামিয়তি-শ্রমিক ব্যবস্থা ও জমিদারি অত্যাচার বিনা বিঘ্নে চলতে থাকে।[১৭] সরকারি জমিদারগণ নির্বাচিত ভূসম্পত্তির উপর সাঁওতাল গ্রাম প্রধানের বিশেষ ক্ষমতা ও নেতৃত্বকে কোনো মান্যতা দিতেন না। স্থানীয় আদালতের রায় অনুযায়ী সরকারি জমিদারের নেতৃত্বকেই মর্যাদা দেওয়া হয়। অন্যদিকে সাঁওতাল পরগণায় ধীরে ধীরে বহিরাগতদের অনুপ্রবেশ ঘটতে থাকে, যার দরুন নতুন অনেক ভূস্বামীরও উদ্ভব হয়; ১৮৬৩ সালে Non-Regulation Act-এর পুনর্মোদনের মাধ্যমে। সাঁওতাল বিদ্রোহের পর বৃহৎ সংখ্যক অনুপ্রবেশকারীদের আগমন হতে থাকে। নতুন ধরনের ভূসম্পত্তি ব্যবস্থা গ্রামীণ প্রধানের উপর বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করে। নতুন ভূস্বামীদের স্বার্থে আঘাত হানলেই, জমিদারদের উৎখাত করা হত বা জমিদারি দায়িত্ব ও আধিপত্য থেকে বহিষ্কার করা হত। পুরাতন জমিদার পরিবার যেমন, পাকুড়ের ক্ষেমাসুন্দরী এক্ষেত্রে দারুণ ভূমিকা পালন করে। তারা এই রকম বলেন যে, গ্রাম প্রধানের তেমন কোনো রকম ঐতিহ্যগত অধিকার নেই এবং তাদেরকে শর্তসাপেক্ষে কৃষক হিসেবেই পরিগণিত করা হত। আদালতের রায় ও তার সমর্থকগণ এই রকম ভ্রান্তিমূলক কাজকে দারুণভাবে উৎসাহ দিয়েছিল, এই হল ভগ্নসমাজের পরিস্থিতি যেখানে প্রথাগত বা চিরাচরিত গ্রাম প্রধানদের যথেষ্ট সংখ্যায় বহিষ্কার করা হয়েছিল। ১৯০৯ সালে ম্যাকালপিন বলেন যে সাঁওতালদের জমি হারানোর মূল কারণ তাদের ঋণগ্রস্থতা।

১৮৫৫-৫৬ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল বন্ধক দেওয়া জমি স্থানীয় মহাজন ও জমিদারদের কাছে হস্তান্তরিত করা। যদিও সেটা সরকারি বিভিন্ন নতুন আইন অনুযায়ী সেই রকম সীমাবদ্ধ সংকীর্ণ প্রথাকে উৎসাহ দেওয়া হয়নি।[১৮] ডবলু.ডবলু. হান্টার ও বিনয়ভূষণ চৌধুরীকে উল্লেখ করে ধানাগারে বলেন যে– “The extension of cultivation to all arable reached saturation point by 1875. The growth of population and absence of alternative employment made the matter worse. This led to the rise of shere cropping system and the Jotedars or the middleman became the most powerful elements in Bengal’s agrarian social and economic structure. While the extension of the cultivation had reached a saturation point in Bengal proper, in Santal Parganas enough land (Jungle) was still available for cultivation”.[১৯] আবার ১৮৮৮ সালের এপ্রিল মাসে ভাগলপুরের কমিশনারকে লেখা এক চিঠিতে দুমকার ডেপুটি কমিশনার আর কার্টিয়ার্স বলেন যে–‘There was enough scope of agriculture was going on. He, however, lamented the role of the mahajanas and the futility of the Regulation 3 of 1872 which had been passed to prevent the prevalent usury system’.[২০] উত্তর ঔপনিবেশিক বা স্বাধীনতার সময়ে যে প্রশাসনিক কাঠামো আমরা পাই তা ব্রিটিশ প্রশাসনিক কাঠামোর ধারাবাহিকতা মাত্র। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের তিনটি স্তম্ভ সৈন্য বাহিনী, পুলিশ ও আমলাতন্ত্রকে বিনা পরিবর্তনেই গ্রহণ করা হয়। ফলে উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণি সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কৃষক ও আদিবাসী শোষণ অব্যাহত রাখে। এ প্রসঙ্গে Hugh Tinker সঠিক ভাবে পর্যবেক্ষণ করে বলেন যে—‘The perpetuation of many institutions of foreign origin, and the failure to preserve the Gandhian legacy, meant the indigenous custom and practice had to find its own level in an environment partially alien’.[২১]

তৎকালীন সাঁওতাল পরগণা বিহারের আইনি শাসনাধীনে ছিল। ছোটনাগপুরের পাহাড়ি এলাকায় প্রচুর সংখ্যক পিছিয়ে পড়া জনজাতি মানুষের বসবাস ছিল, সেই সব অঞ্চলের মাটি ছিল চাষের পক্ষে অনুপযুক্ত এবং দুমকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকা ব্যতীত অঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থাও ছিল অনুন্নত ও অপর্যাপ্ত। পৃথিবীর অন্যতম সেরা ও উৎকৃষ্ট খনিজ ভাণ্ডার হওয়া সত্ত্বেও ছোটনাগপুর অঞ্চলের মানুষের তীব্র দারিদ্র ছিল।

সাঁওতালদের অর্থনীতি প্রধানত ও প্রাথমিকভাবে চাষবাসের ওপর নির্ভরশীল। যেহেতু সেখানে শিল্পের উন্নয়নের অভাব ছিল, তাই জনসংখ্যার প্রাচুর্য যথেষ্ট চাপ সৃষ্টি করত। তার ওপর খরা, বন্যার মত ভয়ংকর প্রাকৃতিক বিপর্যয় তাদের পরিস্থিতিকে আরো গুরুতর ও মর্মস্পর্শী করে তুলত। ১৯৫১ সালের সাঁওতাল পরগণার জেলা ভিত্তিক সেনসাস্ সমীক্ষার প্রতিবেদন অনুসারে, আমরা সেই সব অঞ্চলে কৃষিকাজের শ্রীবৃদ্ধি লক্ষ করতে পারি। ১৯৩১ সালে সেখানকার গড়ে প্রকৃত এলাকায় ১,৬২,৮৩৬০ একর জমি এবং ১৯৫১ সালে তা বেড়ে দাড়ায় ১,৬৬,৭০০৩ একর জমি, যা চাষবাসের আওতায় আনা হয়েছিল। যদিও সাঁওতাল পরগণার সাঁওতালদের তৎকালীন দুর্বিষহ অবস্থার নিরিখে চাষবাসের শ্রীবৃদ্ধি আশানুরূপ হয়নি।[২২] পি.সি. রায়চৌধুরি তার ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারএ যথার্থভাবে পর্যালোচনা করে বলন যে—"Our conclusion is that agriculture also had not been able to bring to any marked improvement in the standard of living. If there has been any improvement in standard of living of the bulk of the population this has been due to the employment chances in revenues other than agriculture. Emigration is quite popular in this district. The Santals love to emigrate in particular seasons and find good wages for reaping the crops in many of the districts of Bihar and West Bengal. The collieries in Bihar and west Bengal absorb a sizeable section of santal population. The various hiant projects at Durgapur, Rourkella, Bhilai etc have got sprinkling of Santals. The tea district in Assam and North Bengal had a larger exodus of people of this district in the earlier and the flow still continue through in a slightly abated from. The post officers in the district received a very large amount of money orders sent from outside. A remarkable fact is that the indigenous population of the district invariably come back to their villages. The Santals particularly have brought back a high standard of life which they have imbibed from beyond the limits of the district".[২৩]

এই কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির অবনতির পিছনে বিভিন্ন কারণ ছিল। Aboriginal Lands Alienation Act 1954, The Money Lenders Act 1940 এবং Agriculural Debtors Act 1936 প্রভৃতি আইন বিশেষ করে সাঁওতালদের জমি বে-আইনি ভাবে ও জোরপূর্বক হাতিয়ে নেওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিকার করার আশায় বলবৎ করা হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু জোতদারদের মতো মধ্যস্থতাকারী মানুষের জন্য সাঁওতালরা

কোনো রকম সুবিধা ও নিরাপত্তা পায়নি। অর্থাৎ বলা যেতে পারে, সেইসব আইন বাস্তবিক দিক থেকে তেমনভাবে ফলপ্রসূ হয়ে ওঠেনি। স্বাধীনতার ঠিক পরেই ১৯৪৭ সালের সাঁওতাল পরগণায় প্রজাস্বত্ত্ব আইন বলবৎ করা হয়, তবে এক্ষেত্রেও ফলাফল প্রায় একই রকম থাকে। ১৯৬৩ সালের গেজেটিয়ারের রিভিসন সেকসন্ থেকে মে মাসে দ্রুত সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়েছিল। পালজোরি ব্লকের অন্তর্গত দুমকা-জামতাড়া রোডে (এলাকায়) মোট ৩১টি সাঁওতাল পরিবারের মধ্যে সমীক্ষা চালিয়ে এটি নজরে আসে যে, এর মধ্যে ১৭টি পরিবার রয়েছে যাদের আয় ১০০ টাকার কম, ৬টি পরিবারের আয় ১০০-২০০ টাকা এবং ৫টি পরিবারের আয় ২০০-৩০০ টাকা পর্যন্ত। অবশ্যই কৃষিকাজই ছিল পরিবারগুলির আয়ের প্রধান উৎস। পূর্বে উল্লিখিত আইনগুলির ত্রুটি ছিল এই যে, মহাজনরা সাঁওতালদের কাছ থেকে কোনো কিছু বন্ধক রাখতে পারবে না। অন্য কোনো বিকল্প না থাকার জন্য সাঁওতালদের বাধ্য হয়ে বা পরিস্থিতির চাপে জীবনধারণ ও সংসার চালানোর উদ্দেশ্যে মহাজনের কাছে বে-আইনিভাবে জমি বন্ধক রেখে টাকা ধার করতে হত এবং এই ভাবে টাকা শোধ দিতে না পারার জন্য অনেক সময় মহাজনরা সেই জমিগুলির মালিক হয়ে উঠত। ১৯৩৮ সালে সাঁওতাল পরগণার এক তদন্তমূলক প্রতিবেদন অনুযায়ী এটা স্পষ্টভাবে লক্ষণীয় যে রাঁচি ও মানভূমের তুলনায় সাঁওতাল পরগণার রাজস্বের হার ছিল অনেক বেশি। 'দামিন-ই-কোহ' অঞ্চলে প্রতি বিঘা জমিতে রাজস্বের গড় পরিমাণ ছিল ১৩ আনা ৩ পয়সা, যা স্বাভাবিকের তুলনায় অতিরিক্ত হিসেবে বিবেচিত হয়। তার পরিণামও এটাই ছিল যে, কৃষিকাজ তখনকার সাঁওতালদের জীবনে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য বা আলোড়ন সৃষ্টিকারী পরিবর্তন আনতে পারেনি।[২৪]

গঙ্গা তীরবর্তী সমভূমি অঞ্চলের সঙ্গে বিহারের দোঁয়াশ মাটি ভরপুর সমভূমি এলাকার পরিসর প্রায় সমান বলা যেতে পারে। চাষযোগ্য জমির বিচারে এই দুই বিশাল এলাকা কৃষিকাজকে দারুণ ভাবে প্রভাবিত করেছিল। ১৯৫৬ সালের সাঁওতাল পরগণার ডিস্ট্রিক্ট সেনসাস্‌ের ১৬০ নম্বর পাতার উল্লেখে পুরো এলাকার জমির শ্রেণীকরণের হিসাব পেয়ে থাকি।[২৫]

১) সম্পূর্ণ এলাকা : ১৩,৪৮৯,৫৩৬ একর

২) বীজ বপন : ১,৬৬৭,০০৩ একর

৩) একবারের বেশি বীজ বপন : ২৯৬,৮০৩ একর

৪) ফলের বাগান : ৪,৪৩৩ একর

৫) বর্তমানে চাষযোগ্য : ৪২৩,৫৬৪ একর

৬) চাষযোগ্য পতিত জমি : ৩৮৪,৬৩৭ একর

৭) চাষযোগ্য নয় : ১,০০৯,৮৯৫ একর

উপরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী বলা যায়, ৫০ শতাংশ জমি চাষ করা হয়নি, তবে পরবর্তীকালে আদিবাসীদের কায়িক পরিশ্রমের মাধ্যমে অবশিষ্ট জমিগুলিকে চাষযোগ্য করে তুলতে অনুপ্রেরণা দেওয়া হয়েছিল। সেই জন্য সরকারি উদ্যোগ অনুযায়ী তারা সরকার থেকে মাসিক সহজ কিস্তিতে লোন নিতেও আগ্রহী হয়, কিন্তু যথোপযুক্ত সেচ ও সারের অভাবে তা বাস্তবায়িত হয়নি। পাহাড়ের গায়ে ধাপচাষের মাধ্যমেও তারা ভূমিক্ষয় রোধ করতে পারেনি, শুধুমাত্র সাঁওতাল পরগণার নীচু ও সমতল এলাকাতেই বৃষ্টির জলকে ধরে রাখার সুবিধা ছিল। ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা যাকে সাধারণ ভাবে 'কানাডা ড্যাম' বলা হয়, তা যথেষ্টভাবে জলের জোগান ও ভূমি সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অজয় বাঁধ নির্মাণও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ম্যাসাঞ্জোর বাঁধ নির্মাণে বিশাল জলরাশিকে চাষের কাজে ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে লাগানো হয়, যার ফলস্বরূপ প্রচুর পরিমাণ পতিত জমিগুলিকে চাষের কাজের আওতায় আনা হয়। এর সুফল অবশ্য সাঁওতাল পরগণার সাঁওতালদের কাজে লাগেনি, কেননা অধিকাংশ জমি চলে গিয়েছিল বহিরাগতদের হাতে। দুমকার পর্যবেক্ষণ অফিস থেকে উল্লেখ পাওয়া যায় যে, উৎখাত করা আদিবাসীদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয় এবং যথাযথ ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়। যার সমস্ত খরচ বহন করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। ১৯০০০ একর এলাকা এই জলাধার নির্মাণের জন্য নেওয়া হয়। যদিও ৫০০০ পরিবার এই প্রকল্পের দ্বারা বাস্তুচ্যুত হয়েছিল, যার মধ্যে ৮০% ছিল বিভিন্ন আদিবাসী পরিবার। আগে যেটা বিশেষ ভাবে সাঁওতাল অধ্যুষিত ছিল, এখন সেই সাঁওতাল পরগণা বহিরাগতদের আধিপত্যের এলাকা হয়ে দাঁড়িয়েছে।[২৬]

যদিও জলাধার নির্মাণ বিশেষভাবে জলসেচ ব্যবস্থাকে ঘিরেই নির্মিত, তবু জলাধার নির্মাণ হল এক বহুমুখী পরিকল্পনা, যার মাধ্যমে একদিকে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন ও অন্যদিকে অনেকটা পরিমাণে বন্যাকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। কিন্তু অতিবৃষ্টির কারণে জলাধারের বিপুল পরিমাণ জলরাশির দ্বারা পার্শ্ববর্তী এলাকা বন্যার কবলে চলে যেত। স্বল্প জলসেচ পরিকল্পনায় এক তৃতীয়াংশ জমি সুরক্ষিত এবং এক তৃতীয়াংশ জমি অসুরক্ষিত ও বন্যা কবলিত ছিল। ১৯৫৭-৫৮ সালে ধান উৎপন্ন হয়েছিল ১১,৪৩,৩৬৮ একর এলাকা জুড়ে এবং উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ ছিল ৬৩,৩৪০ টন। যাই হোক, প্রত্যাশিত ভাবে কৃষিজ ফসলের উৎপাদন না হওয়ায় চাষীরা আর্থিক দুরবস্থার মধ্যে পড়ে এবং কৃষিকাজে প্রধান অসুবিধা সৃষ্টি করেছিল জলসেচ ব্যবস্থা। চাষের জমিতে সারের জোগানের পুরোটাই নির্ভর করত স্থানীয় ও গ্রামীণ শ্রমিকদের ওপর। সরকারি দপ্তরগুলি চাষবাসের উন্নতি ও তার সম্প্রসারণে খুবই কম আগ্রহ প্রকাশ করত। সাঁওতালদের দ্বারা কৃষিকাজ উন্নয়নের কোনো রকম পদক্ষেপকে সরকার অনুমোদন দিত না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সার হিসাবে ইউরিয়া, অ্যামোনিয়াম, সালফেট প্রভৃতি ব্যবহৃত হত এবং যার জন্য প্রচুর জলের জোগান দরকার হত, যা যথা সময়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যেত না। রাজমহল ও সাহেবগঞ্জ অঞ্চলে মৎস্য চাষের বেশ শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছিল, যদিও এই ব্যবসার আমদানি, রপ্তানি, বাজারে চাহিদা বাড়ানো প্রভৃতি বিষয়গুলি মালিকানাধীন ছিল। রাজমহল ও সাহেবগঞ্জে বরফ না থাকায় ভাগলপুর থেকে বরফ আমদানি করতে হত, ফলত বিক্রির সময় মাছের দাম বেড়ে যেত। কলকাতায় মাছের চাহিদা ও বাজার বেশ ভালোই ছিল। সরকারি চাষযোগ্য জলাভূমির (নদী ব্যতীত) পরিমাণ ছিল প্রায় ২৪,১৬৮ একর, যা সাঁওতাল পরগণায় ব্যাপকভাবে মৎস্য চাষে উন্নতি ঘটাতে সাহায্য করেছিল। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে জমির পরিবর্তে অন্যান্য বিকল্প অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সাঁওতালদের টিকে থাকতে সাহায্য করেছিল, তবে তাদের সামাজিক জীবনে এর প্রভাব ছিল সুদূর প্রসারিত।[২৭]

বন্যা, এই ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ সাঁওতাল পরগণায় নিয়মিত ছিল তা নয়, কিন্তু ১৮৯৯ সালের বন্যার প্রভাব ছিল দুর্বিষহ। সর্বোপরি দুর্ভিক্ষের প্রভাবে সাঁওতাল পরগণার মানুষ চরম আর্থিক দুর্ভোগে পড়ে। ১৮৫৫ সালে নতুন জেলার উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে সাঁওতাল পরগণায় চার বার দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, যার বিশেষ কারণ হিসেবে বলা

যায় এই সব অঞ্চলে শীতকালীন শস্য নষ্ট হয়ে যাওয়া। ধান চাষের ক্ষতি অর্থাৎ সেখানকার মানুষের প্রধান খাদ্য শস্যের অভাব দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতিকে আরো ভয়াবহ করে তুলেছিল। সেখানকার মৃত্তিকা প্রধানত ল্যাটেরাইট প্রকৃতির আর সেই জন্যই বৃষ্টির অভাবে মাটির নমনীয়তা কমে যায় ও ধান চাষে বিপুল ক্ষতি হয়। মিলেট জাতীয় শস্য উৎপন্ন হলেও তা দুর্ভিক্ষকে এড়াতে পারেনি। অন্যদিকে সেখানকার মানুষের জীবিকার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল মহুয়া গাছ। কিন্তু মহুয়া গাছের মালিকানা ও আধিপত্য থাকত স্থানীয় জমিদারদের হাতে। ফলত অনেক সাঁওতাল শ্রমিক হিসেবে অন্যত্র কর্ম সন্ধানে চলে যায়। ১৮৬০ সালের দুর্ভিক্ষের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল বৃষ্টির অভাব। ১৮৭৪ সালের দুর্ভিক্ষে মিলেট জাতীয় ফসল এক তৃতীয়াংশ উৎপন্ন হয়েছিল এবং ধান প্রত্যাশিত উৎপাদনের অর্ধেকের কম উৎপন্ন হয়েছিল। ১৮৯৭ ও ১৯১৯ সালের দুর্ভিক্ষের কারণ প্রায় একই রকম। যদিও সেই সময় সরকারি উদ্যোগে ত্রাণ ব্যবস্থার আয়োজন করা হয় কিন্তু তা অসম ও অপর্যাপ্ত ছিল বলে জানা যায়। ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের কবলে পুরো বাংলা পড়ে এবং এক্ষেত্রেও সাঁওতাল পরগণা ব্যতিক্রম ছিল না। ১৯৫১ সাল পর্যন্ত দুর্ভিক্ষের প্রভাব থাকে কিন্তু অভাবের পরিস্থিতি ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত ছিল, তা স্পষ্টভাবেই লক্ষ করা যায়।[২৮]

সাঁওতাল পরগণার সাঁওতালদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আর একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক উল্লেখ করতেই হবে যে, কৃষিকাজ নির্ভর জীবিকার থেকে অন্যান্য বিভিন্ন প্রকার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের অনুশীলনে তাদের জীবনযাত্রার উন্নতি হয়েছিল, আর সেটা সম্ভব হয়েছিল খ্রিস্টান মিশনারিদের উদ্যোগে সাঁওতালদের মধ্যে শিক্ষার আলোর প্রসার ঘটানোর জন্যই। সাঁওতাল পরগণা অঞ্চলে সাঁওতালদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উন্নয়নে তাঁত শিল্পের অবদানও লক্ষ করা যায়। বেনাগড়িয়া মিশনে সাঁওতালদের তাঁত শিল্পে বিভিন্ন ভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। পাথর শিল্পেও পাকুর ও রাজমহল অঞ্চলে দারুণ উন্নয়ন লক্ষ করা যায়। পাথর শিল্পের শ্রমিক হিসেবে নিযুক্তির জন্য প্রচুর সংখ্যক সাঁওতাল কর্মক্ষেত্রে সুযোগ পায়, কারণ সেই সব জেলাগুলির বাইরে শিল্পজাত দ্রব্যের প্রচুর চাহিদা ছিল। টিটাগড় কাগজ কারখানায় এই অঞ্চল থেকে সাবাই ঘাস রপ্তানির ব্যবসাও মানুষের দারিদ্র দূরীকরণে অনেকখানি ভূমিকা পালন করেছিল। কিন্তু মাঝে মাঝে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমে যাওয়ায় ব্যাঘাত ঘটত। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে

বনদপ্তর অবশ্যই অবস্থার উন্নতিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। দেওঘর ও জামতাড়া এলাকার কয়লাখনি অঞ্চলে এবং দুমকা ও পাকুড় মহকুমার কয়লা খাদানে কয়লা উত্তোলনের কাজ চলে, যার জন্য স্বাভাবিক ভাবে প্রচুর পরিমাণ সাঁওতাল শ্রমিক হিসেবে কাজের সুযোগ পায়। যদিও কয়লাখনি অঞ্চলে বিশেষ করে অগভীর খনি অঞ্চলগুলিতে শ্রমিকের কাজ কিছু সময়ের জন্যই ছিল। এছাড়াও কাঠের আসবাসপত্র তৈরি, বিড়ি বানানো, দড়ি, ঝুড়ি, টালি, ইট তৈরি এবং পোল্ট্রি চাষ, শূকর চাষ প্রভৃতি কুটির শিল্প ও ছোট ছোট ব্যবসায়িক উদ্যোগগুলি সাঁওতালদের জীবনে কিছুটা হলেও স্বচ্ছলতা এনেছিল। এই সব শিল্পে মনোনিবেশ বা কখনো শ্রমিক হিসেবে অর্থ উপার্জনের মাধ্যমে তাদের জীবনযাত্রার মান অনেকটা উন্নত হয়েছিল। ঘটনাচক্রে এটাও উল্লেখ করতে হয় যে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরের অঞ্চলগুলিতে এই রকম ব্যবসায়িক ও শিল্পের উন্নয়ন ঘটেনি। যার ফলে সেখানকার মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ তেমন ভাবে গড়ে ওঠেনি। স্বাভাবিকভাবেই তাই তারা সাঁওতাল পরগণার সাঁওতালদের থেকে অনেকখানি পিছিয়ে ছিল।[২৯]

স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে আদিবাসীরা সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে এক নতুন ক্ষেত্রে প্রবেশ করে। ভারতীয় সংবিধান আদিবাসীদের নতুন এক পরিচিতির মাধ্যমে (Scheduled Tribe) নানান আইন মারফৎ সুরক্ষার ব্যবস্থা করলেও কার্যক্ষেত্রে তা খুব একটা ফলপ্রসূ হয়ে ওঠেনি। সংবিধানের নিয়ম-নীতি সম্পর্কে অপরিচিত আদিবাসীরা অর্থাৎ এক বৃহৎ সংখ্যক অশিক্ষিত আদিবাসীদের আইন বিষয়ক জ্ঞান বা দক্ষতা না থাকায় এবং সেই সঙ্গে প্রমাণ হিসাবে দলিল-দস্তাবেজ, রেকর্ড প্রভৃতি লিখিত তথ্যের অপ্রতুলতার সুযোগ নিয়ে ভারতীয় শিক্ষিত ও উচ্চশ্রেণিবর্গ (তাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে বা কিছু সুবিধাভোগী মানুষের তৈরি করা মতাদর্শে তারা তাদের উচ্চবর্গ বলে ভাবেন) সেই আইনের নানান ফাঁক-ফোকরে আদিবাসীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুযোগ নিয়েছে। যার দরুন আদিবাসীদের স্বতন্ত্র পরিচিতি বা Identity-কে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে আদিবাসীদের অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট আলোচনার ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলির পর্যালোচনা করা কতটা প্রাসঙ্গিক? অবশ্যই এর প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে, কারণ হিসেবে স্বাধীনতা পরবর্তী নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, ভোটাধিকার, রাজনৈতিক বাতাবরণ প্রভৃতির দ্বারা আদিবাসীদের সামাজিক-

সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে বেঁধে ফেলা হয়। সাঁওতাল পরগণার সাঁওতালদের অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট জানার জন্য ভারতীয় নীতি-নির্ধারক সভা বা গণপরিষদে ওঠা বিভিন্ন বিতর্কগুলির সম্পর্কে অবকাশ হওয়া প্রয়োজন। কারণ এই বিতর্কে ওঠা প্রশ্নগুলির পর্যালোচনার মাধ্যমেই আদিবাসীদের উন্নয়নে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মতো নানান পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল।

উত্তর ঔপনিবেশিক সময়ে জনজাতিদের রাজনৈতিক আধিপত্য নজর করার মতো ছিল, যা সেই সময়ে চরম মাত্রায় প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। জনজাতি বলতে শুধুমাত্র সাঁওতাল পরগণার সাঁওতালদের প্রতিনিধিরা তা নয়। সর্বজনীন ভোটাধিকার প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে নির্বাচনী রাজনীতি তাদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনার পরিধিকে সম্প্রসারিত করে ধনাত্মক ভূমিকা পালন করে। যদিও তা কিছু শিক্ষিত সাঁওতাল ও সাধারণ মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও ভোটদানের অধিকার ও নির্বাচনী রাজনীতি তাদেরকে রাজনৈতিক ভাবে সচেতন করতে সক্ষম হয়েছিল। সাঁওতাল পরগণায় খ্রিস্টান মিশনারিদের উদ্যোগে কিছু সংখ্যক সাঁওতালকে শিক্ষিত করে তোলা হয়েছিল। যদিও দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার আলো তেমনভাবে পৌঁছায়নি অথচ সেখানে সাঁওতাল গোষ্ঠীর মানুষের বসবাস বেশি ছিল। সেই জন্যই সাঁওতাল পরগণার সাঁওতাল জনজাতি তাদের জমির অধিকারের ব্যাপারে বেশি তৎপর ছিল। ১৯৫২ সালে লোকসভায় জনজাতিদের লক্ষ্য রেখে কি রকম নীতি নির্ধারণ করা যায়, তা নিয়ে বিতর্ক দেখা দেয়। বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকের দিকে জনজাতিদের উন্নয়নের ব্যাপারে বিভিন্ন মতামত উঠে আসে। এই সমস্ত মতামতের দুটো দিক ছিল–১) পৃথকীকরণ (Isolation) ২) সংযুক্তিকরণ (Integration)। প্রথম মতাদর্শের প্রবক্তা ভেরিয়ার এলুইন বলেন–'Integration is not possible without political spiritual equality'.[৩০] অন্যদিকে বিপরীত মতামত প্রকাশ করেন আমৃতলাল বিঠল দাস, যিনি বিশেষ ভাবে 'ঠক্কর বাপ্পা' নামে পরিচিত ছিলেন। গোপালকৃষ্ণ গোখলের মতাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি জনজাতি গোষ্ঠীর মানুষদের ঐক্যবদ্ধভাবে জাতীয় স্তরের উন্নয়নের কাজে লাগানোর পন্থা অনুসরণ করেন। জনজাতিদের বনভূমি সম্পর্কিত সত্যাগ্রহ (কংগ্রেস সমর্থিত) এই প্রচেষ্টার এক উজ্জ্বল উদাহারণ। গান্ধী এলুইনকে 'ঠক্কর বাপ্পা' সঙ্গে কাজ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। যদিও তিনি গোণ্ড জনজাতিদের নিয়ে কাজ করেন এবং

তাদের বিচ্ছিন্ন করে রাখেন। এখন প্রশ্ন হল 'মূলস্রোত' (Mainstream) কথাটির সঠিক ব্যাখ্যা কি হতে পারে? মূলস্রোত রাজনীতি হল অভিজাত শ্রেণিদের নিয়ে রাজনীতি, উচ্চমানের রাজনৈতিক কাজকর্ম যেখানে নিম্নবর্গের প্রতিনিধিদের সংখ্যা ছিল আনুপাতিকহারে খুবই কম। আসলে এই প্রকার রাজনীতির পুরোটাই সমাজের উচ্চশ্রেণির মানুষেরাই নিয়ন্ত্রণ করত। ১৯৫১-৬৪ সাল পর্যন্ত 'প্রান্তিক জনগোষ্ঠী'-দের (marjinial community) সংখ্যা খুবই কম ছিল। এই বিতর্কের অন্যতম দিক হল গণপরিষদের সদস্য জয়পাল সিং মুণ্ডা তাঁর বক্তব্যে বলেন—'You can't teach democracy to Tribals. You need to learn democratic values from them…We do not have any right to impose our beliefs and beliefs on them'.[৩১] ভারতের গণপরিষদে এই বিষয়ে চরম মতবিরোধ সৃষ্টি হয়। ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু এই বিষয় সম্পর্কিত দুটি মতামতকেই চরমভাবে বিরোধিতা করেন এবং তা খারিজ করে দেন। তিনি বলেন জনজাতিদের সমাজের মূলস্রোতে আনার নাম করে তাদের ওপর অর্থাৎ তাদের সামাজিক জীবনযাত্রার উপর ভিন্ন মতাদর্শ আরোপ করা এবং প্রথাগত বসতি স্থাপনের উপর চাপ সৃষ্টি করা যাবে না।[৩২] জয়পাল সিং মুণ্ডা যখন বহু বছর ধরে চলা জনজাতিদের উপর অকথ্য অত্যাচার ও সামাজিক অবিচারের কাহিনিকে তুলে ধরেন তখন জওহরলাল নেহেরু তাকে বুঝিয়ে বলেন যে, তাদের উপর বিচার, অধিকারবোধ ও সাম্য সমানভাবে বর্তমান যেভাবে গণপরিষদের অন্যান্য সদস্যদের উপর বিচার ব্যবস্থা ও দৃষ্টিভঙ্গি বিরাজ করছে। তবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার ব্যাখ্যা একটি মাত্র শব্দে প্রকাশিত। যখন তাকে জিজ্ঞেস করা হয় জনজাতিদের প্রতি কেমন বিচারের দৃষ্টিভঙ্গি রাখা যায় তখন তিনি মানবতার (Huminity) কথা বলেন। অপরদিকে তিনি বৃহত্তর ভারতীয় জনসমাজের মানবতায় বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন—"I am alarmed when I see not only in this country but in other great countries too, how anxious people are to shape others according to their own image or likeness and to impose on them their particular way of living. … I am not at all sure which is a better way of living. In some respects I am quite certain theirs is better. Theirfore, it is grossly presumptuous on our part to approach them with an air of superiority or to tell them what to do or not to do. There is no point in trying to make them a second-rate copy of ourselves".[৩৩] ভেরিয়ার এলুইনের

পঞ্চশীল ধারণাকে অনুমোদনের সঙ্গে সঙ্গে জওহরলাল নেহেরু সেটাকে এক দার্শনিক পরিকাঠমোতে প্রসার করেন। ডঃ আম্বেদকরের খসড়ার প্রধান ও সর্বোত্তম উপকরণ হিসেবে এলুইনের পঞ্চশীলের ধারণাটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।[৩৪] কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে, আম্বেদকর সেই সমস্ত গ্রামীণ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ছিলেন, যার অনর্ভুক্ত ছিল সাঁওতাল গ্রাম সমাজ। তিনি বলেন–'I hold that this village republics have been the ruination of India. What is the village but a sink of localism, a den of ignorance, narrow mindeness and communalism? I am glad that draft constitution has discarded the village and adopted the individual as the unit'.[৩৫] তবে সংবিধানে একথা সাঁওতালদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল না। সাঁওতাল বিদ্রোহ ও ছোট ছোট জনসোচ্চারের পর সাঁওতাল পরগণার অনেক ক্ষেত্রে পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। একজন সাঁওতাল শুধুমাত্র নিজের জন্য বাঁচে না, বরং সে তার নিজের গোষ্ঠীর কাছে এক অপরিহার্য অংশ হিসেবে জীবনযাপন করে। জনজাতিদের গোষ্ঠী কাঠামোর মধ্যে একজন ব্যক্তির চাহিদা আগ্রহ সমানভাবে সেই গোষ্ঠীর সমস্ত মানুষের কাছে প্রাধান্য পায়। এই থেকে বলা যায় তাদের পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্বভাব, অসহায়তায় সাহায্য দান এবং সামাজিক সচেতনতার প্রভাব যথেষ্ট প্রকট। এই কারণের জন্যই ব্রিটিশরা পৃথকীকরণ নীতিকে গ্রহণ করেছিল এবং ভারতের মূলস্রোত বা সমাজের থেকে তাদের আলাদা রাখার চেষ্টা করেছিল। ১৮৭৪ সালের Scheduled Act অনুসারে এই সব অঞ্চলগুলোকে প্রশাসনিকভাবে পৃথক রেখেছিল এবং ১৯১৯ ও ১৯৩৫ সালের Government of India Act অনুযায়ী একই পরিস্থিতি চালিয়ে রাখা হয়েছিল। যদিও, স্বাধীনতার পরবর্তীকালে এই সমস্ত রীতিনীতিকে প্রত্যাহার করা হয় এবং একই সাথে জনজাতিদের উন্নয়ন ও একত্রীকরণে প্রাথমিকভাবে পদক্ষেপ নেওয়া হয়। কিন্তু নতুন নীতি অনুযায়ী জনজাতিদের একত্রীকরণের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়, যেখানে জনজাতিদের সাথে তথাকথিত সমাজের মূল ধারার সংযোগ ও একত্রিত করার পরিপন্থী ছিল।

সেই সময়কালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী, সাঁওতালদের সাংস্কৃতিক পরিমর্যাদা ও উত্তরাধিকার বজায় রাখার সঙ্গে সঙ্গে জীবনে সঠিক গতি ধারায় উজ্জীবিত রাখার উদ্দেশ্যে বিভিন্নভাবে প্রতিবাদ করেন। কিন্তু এটা অবশ্যই স্বীকার্য যে, তিনি শুধুমাত্র যে

পদক্ষেপ নিয়েছিলেন তা তাদের বিভিন্ন সমাধানের ক্ষেত্রে খুবই শৌখিনতা মূলক বা রোমান্টিক ছিল। ১৯৫০-এর শেষের দিকে জনজাতি সম্পর্কিত আইন কানুন ও নিয়মাবলী অনেকটা এই রকমই ছিল। একই সময়ে তাঁর প্রধান চিন্তার বিষয়টি জড়িয়ে ছিল উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বসবাসকারী জনজাতিদের নিয়ে।[৩৬] এই শতকের শেষের দিকে জনজাতিদের উন্নয়নকে লক্ষ্য রেখে একটা রূপরেখা গড়ে ওঠে। যা নিম্নরূপ[৩৭]—

১) বাইরে থেকে আদিবাসীদের ওপর কোন কিছু চাপিয়ে দেওয়া অনুচিত। প্রত্যেকটি আদিবাসী জনজাতিকে নিজেদের ভাবধারা ও ঐতিহ্য অনুসারে গড়ে উঠবার সুযোগ দিতে হবে। এক্ষেত্রে সরকারকে সাধ্যমতো উৎসাহ প্রদান করতে হবে।

২) ভূমি ও বনাঞ্চলের উপর আদিবাসীদের অধিকার সর্বতোভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

৩) সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে, সেই উদ্দ্যেশে তাদের শিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রথম অবস্থায় আদিবাসী এলাকায় বাইরে থেকে বিশেষজ্ঞ আনা হতে পারে। তবে স্থানীয় লোকেরা শিক্ষণপ্রাপ্ত হলে বাইরে থেকে বিশেষজ্ঞ আনার নীতি পরিত্যাগ করতে হবে।

৪) প্রশাসনিক জটিলতা সর্বতোভাবে পরিহার করতে হবে। আদিবাসীদের প্রাত্যহিক জীবনধারা যাতে উন্নয়নমূলক প্রচেষ্টা দ্বারা ব্যাহত বা বিপর্যস্ত না হয় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।

৫) উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কার্যকারিতা পরিসংখ্যান বা অর্থব্যয়ের পরিমান দ্বারা বিচার্য হবে না।

তবে তিনি তার এই দৃষ্টিভঙ্গিগুলিকে তাত্ত্বিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ রাখেন। দ্বিতীয় (১৯৫৬-৬১) ও তৃতীয় (১৯৬১-৬৬) পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ভারী শিল্প, কলকারখানা ও বিশাল জলাধার নির্মাণের ওপর জোর দেন। ফলস্বরূপ এই বৃহৎ উন্নয়নমূলক প্রকল্পে সাঁওতাল পরগণার সাঁওতালদের কাজের দক্ষতা না থাকায় তারা যুক্ত হতে পারেনি। তাছাড়া এই প্রকল্পের বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সাঁওতালদের এক বৃহৎ পরিমাণ জমি দখল করা হয় এবং তারা বাধ্য হয়ে পরিযায়ী শ্রমিকে পরিণত হয়। তবে এই

পরিকল্পনাগুলির সঠিক ভাবে বাস্তবায়নের জন্য ১৯৬১ সালে Scheduled area এবং Scheduled Tribe কমিশন গঠন করা হয়। ভেরিয়ার এলুইন যার দায়িত্বে ছিলেন। এই কমিশন তার এক রিপোর্টে উল্লেখ করে যে—'We believe that in the programme of the special Tribal Blocks if it is planned wisely and implemented sincerely, India has an effective instrument to save her Tribal people from poverty and fear and develop them along the lines of their own genius'.[৩৮] কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় এই রূপরেখার কোন প্রতিফলন ঘটেনি। গ্রামীণ সাঁওতালদের ছোট ছোট কুটির শিল্পের পরিবর্তে বৃহৎ ভারী শিল্পের প্রকল্পের বাস্তবায়ন করতে গিয়ে তাদের এই কর্মযোগ্যে সামিল করতে পারেনি। ফলস্বরূপ সাঁওতালদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কোনো পরিবর্তন আসেনি। এই আক্ষেপের সুর বিভিন্ন আদিবাসী মানুষের সেরেঞ বা গানে প্রতিফলিত হয় যে,

> "সিঙগি সিঞা সিঙগি লৌড়হৌই চালাওএনা
>
> ভারতে দিসম ফুরগৌলেনা।
>
> আকিলান জৌতকিন দ দিসমকিন হামেটান হিন্দুস্থান, পাকিস্তান,
>
> আদ বুনয়ৌদ হড় হপন ফলে হালে ডালে"।[৩৯]

অর্থাৎ, কি রাত কি দিন, স্বাধীনতার লড়াই চলল দেশ স্বাধীনও হলো, অগ্রণী জাত দুটো দেশ লুটে নিল—হিন্দুস্থান আর পাকিস্তান আর আমরা আদিবাসীরা যে তিমিরে ছিলাম সেই তিমিরেই রয়ে গেলাম।

পূর্বালোচিত বিষয় থেকে আমরা এটা পরিষ্কার ভাবে বলতে পারি যে, সাঁওতাল পরগণার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যকলাপের পিছনে আর্থিক বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা শুধুমাত্র সাঁওতাল পরগণার আদিবাসীদের মধ্যেই নয়, সারা ভারতবর্ষ জুড়ে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিল। ফলস্বরূপ মানুষের জমি হারানোটা ছিল অবশ্যম্ভাবী। বিভিন্ন খনি অঞ্চলগুলি ব্যক্তিগত মালিকানায় পরিণত হয়েছিল। দামোদর ভ্যালির বিশাল প্রান্তর ভুয়ো ও বে-আইনি চুক্তির মাধ্যমে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন হয়ে যায় এবং বেপরোয়া খাদান কাজ চালানোর ফলে সেই সব জায়গা পরিত্যক্ত জমিতে

পরিণত হয়। জওহরলাল নেহেরুর প্রিয় ও প্রধান পরিকল্পনার মধ্যে দামোদর ভ্যালি প্রকল্প ছিল অন্যতম। এই প্রকল্পের বাস্তবায়নের দ্বারা সাঁওতাল পরগণার জনজাতিদের জমি হারানোর হিসেব নীচে তালিকার মাধ্যমে বর্ণনা করা হল।[৪০]

প্রকল্প	জমি অধিগ্রহণের পরিমাণ (লাখে)	বাস্তুচ্যুত মানুষের সংখ্যা
ডি.ভি.সি	১.২৫	১.৫ লক্ষ
কংসাবতী	০.৪০	৬০,০০০
সুবর্ণরেখা এবং কারকায়	০.৮৫	৯০,০০০
দিমনা	০.২৫	২,০০০
সীতারামপুর	০.১৫	২০,০০০
তিলিয়া-পাঞ্চেত	জানা নেই	১.০ লক্ষ
হাতিয়া-রাঁচী	২৬	১৩,০০০
পাত্রাতু	১৯	১২,০০০
বোকারো	৪৫	৩৭,০০০
হিরাকুন্দ	০.৬৫	৭৫,০০০

এই সব প্রকল্পের সঠিক ভাবে বাস্তবায়ন না করার ফলে বৃহৎ সংখ্যক জনজাতি এমনকী সাঁওতালরাও নিজেদের অধিকার থেকেও বঞ্চিত হয়ে অসহায় হয়ে পড়েছিল। নেহেরুর পঞ্চশীল পরিকল্পনার বাস্তবিক রূপায়ন পুরোপুরিভাবে ব্যর্থতায় নিমজ্জিত হয়। কারণ সেটি জনজাতিদের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে পূরণ করতে বা তাদের কাঙ্ক্ষিত দাবি-দাওয়ার সাথে সামঞ্জস্য রাখতে পারেনি। জমি ভিত্তিক গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন যেখানে জনজাতিদের মূলস্রোতে বিরাজিত সেখানে তাদের জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। সাঁওতাল পরগণার সাঁওতাল জনজাতির জীবনযাত্রাও এই স্রোতের সাথে বিপর্যস্ত হয়ে গেছিল এবং তার ওপর সেখানে নতুন প্রশাসনিক কর্তৃত্ব নতুন ভাবে বিরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টি করে।

এই সবের প্রত্যক্ষ ফলাফল হিসেবে পরবর্তীকালে প্রচুর সংখ্যায় জনজাতিরা কয়লাখনি অঞ্চলে ও চা-বাগানে জীবিকার উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। পুরাতন আদিবাসী সমাজ নতুন কোনো এক জায়গায় আঁটোসাটো অবস্থায় জীবন যাপন করতে থাকে। ফলত, আদিবাসী সমাজে পরস্পরের প্রতি গোষ্ঠীগত একাত্মতা কমতে শুরু করে। স্বাধীনতা উত্তর সময়কালে সাঁওতাল পরগণার সাঁওতালদের অন্যত্র পরিযাত্রা বিশেষ

করে কয়লাখনি অঞ্চলে বিশেষভাবে বেড়েছিল। অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে রাণীগঞ্জ, ঝরিয়া, গিরিডি প্রভৃতি খনি অঞ্চলে কয়লা উত্তোলনের কাজ শুরু হয়েছিল। ১৯৭৪ সালে যখন Heatly রাণিগঞ্জে প্রথম খনি চালু করেন তখন তিনি ইংল্যান্ড থেকে কিছু পারদর্শী শ্রমিকদের নিয়ে আসেন। রবার উইলিয়াম জোনস বাংলায় কয়লা উত্তোলনের ব্যবসায় উন্নতম ইউরোপীয় উদ্যোক্তা ছিলেন। তিনি প্রথমবার স্থানীয় জনজাতিদের শ্রমিকের কাজে লাগান এবং স্বল্প পারিশ্রমিকে নিয়োগ করেন। ১৮৩৬-৩৯ সময়কালে আমরা প্রধানত দুটি কয়লা খনির উল্লেখ পায় সাক্রিগলি এবং হুরা, যেখানে শ্রমিক হিসেবে অধিকাংশ আসত সাঁওতাল পরগণা ও ছোটনাগপুর অঞ্চল থেকে।[৪১] কয়লাখনি অঞ্চলে কয়লা উত্তোলনের সঙ্গে সঙ্গে আদিবাসীদের কাছে জীবিকার এক গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ চলে আসে। এই কয়লা খনি অঞ্চলগুলিতে পুরুষদের পাশাপাশি আদিবাসী মহিলারাও শ্রমিক হিসাবে কাজে যুক্ত হয়। প্রথাগতভাবে সাঁওতালরা নিজেদের পরিবার থেকে মহিলাদের বাইরে ও অন্যত্র কাজ করতে অনুমতি দিতে রাজি ছিল না। কিন্তু পরবর্তীকালে যখন পরিবারের মধ্যে আর্থিক সংকট দেখা দেয়, তখন পরিবারের কর্তারা মহিলাদের খনি অঞ্চলে শ্রমিকের কাজে যুক্ত হওয়ার অনুমতি দেয়। ১৯৩৯ সালে মহিলা শ্রমিকের মাটির নিচে অর্থাৎ খনির ভেতরে কাজ করাকে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা হয়।[৪২] ভারতের পূর্বাঞ্চল খনি অঞ্চলে মহিলা শ্রমিকের অনুপাত নীচে তালিকার মাধ্যমে বর্ণনা করা হল[৪৩]—

বছর	মহিলা	পুরুষ	মোট সংখ্যার ভিত্তিতে মহিলাদের শতাংশ
১৯০১	২৬,৫২০	৫৫,৬৮২	৪৭.৬
১৯২১	৭০,৮৩১	১১৫,৯৮২	৬১.১
১৯৩৫	৬৭,৮৯৯	১২২,৪৫৪	৫৫.৫
১৯৫১	৪৫,৬৬৮	১২৮,৯৩৬	৩৫.৪
১৯৬১	৪১,৪৫৭	১৩৪,৯২৮	৩০.৭
১৯৭৩	৩১,১৮১	১৩৮,৫৮৭	২২.৫
১৯৮০	১৬,০৯৪	১৬৯,১৩৬	৯.৭
১৯৯০	১২,৮৭৫	১৬৫,৮২৯	৭.২
১৯৯৬	৯,৮৮৯	১৫১,৮৫৫	৬.১

এই পরিসংখ্যানের ৮৯.৯ শতাংশ ছিল সাঁওতাল পরগণার সাঁওতাল মহিলা। এই খাদান ও শিল্পাঞ্চলে একদিকে যেমন প্রচুর শ্রমিকের কাজের সুযোগ আসে তেমনি অন্যদিকে এক বৃহৎ সংখ্যক আদিবাসী মানুষ বাস্তুচ্যুত হয় এবং তাদের পুনর্বাসনের সঠিক ব্যবস্থাও করা হয়নি। কয়লা খনি অঞ্চলে বিভিন্ন কোম্পানির দ্বারা জমি অধিগ্রহণের ফলে বিভিন্ন পরিবারের বাস্তুচ্যুত হওয়া ও পুনর্বাসন না পাওয়ার হিসেব নীচে তালিকার আকারে দেওয়া হল[৪৪]—

কোম্পানির নাম	বাস্তুচ্যুত পরিবারের সংখ্যা	পুনর্বাসন না পাওয়া পরিবারের সংখ্যা
ইস্টার্ন কোল্ডফিল্ড লিমিটেড	১৪,৭৫০	৪,৯১৫
সেন্ট্রাল কোল্ডফিল্ড লিমিটেড	৭,৯২৮	৩,৯৮৪
ওয়েস্টার্ন কোল্ডফিল্ড লিমিটেড	৬,২৩২	২,২৫০
ভারত কুকিং কোল লিমিটেড	৩,৮৪১	৭৫২
মোট	৩২,৭৫১	১১,৯০১

আদিবাসী ও তফসিলি-অধ্যুষিত সাঁওতাল পরগণা এলাকাটি খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। ভারতের বৃহৎ শিল্পপতিদের অধিষ্ঠান এই অঞ্চলটি। নির্মল সেনগুপ্ত তাঁর *Fourth World Dynamics: Jharkhand* নামক গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, আদিবাসীদের অঞ্চলে নানান শিল্প ও প্রকল্প তৈরি হয়েছে, কিন্তু সেই সবে তাদের কোনো অগ্রগতি আসেনি। এই সব অঞ্চল মূলত আদিবাসীদের, অথচ বাস্তবে দেখা যায় যে এঁরাই এখানকার কলকারখানার শ্রমিক, আর উচ্চপদে অধিষ্ঠিত সব বহিরাগত।[৪৫] 'অফিসার উত্তর বিহারের, কিন্তু আর্দালি স্থানীয় আদিবাসী—এ চিত্র খুব দেখা যায়। বড় ব্যবসায়ী, দোকানী, ঠিকাদার সব বহিরাগত। খনি রাষ্ট্রায়ত্ত হওয়ার পর আদিবাসীদের অবস্থান

আরো সংকুচিত হয়েছে। যেটুকু জায়গা এরা পেয়েছে তা বহু সংগ্রামের বিনিময়ে’।[৪৬] আদিবাসীদের জীবন নিয়ে যে বৃহৎ শিল্প গড়ে উঠেছে তার বিনিময়ে তাদের কোনো উপকার হয়নি। রাঁচিতে হেভি ইঞ্জিনিয়ারিং প্ল্যান্টের জন্য শত শত আদিবাসী পরিবারকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। দামোদর বাঁধ প্রকল্পে বহু আদিবাসী গ্রাম জলের তলায় চলে যায়। প্রথম তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এবং পাবলিক সেক্টর শিল্প প্রকল্পের জন্য ৫০,০০০ আদিবাসী পরিবারকে ভূমিহীন করা হয়েছে। ব্যক্তিমালিকানায় শিল্পোদ্যোগের জন্য কত পরিবার যে বাস্তুচ্যুত হয়েছে তার কোনো হিসাব নেই। প্রতিটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আদিবাসী জমি গ্রাসের ঘটনা দ্রুততার সঙ্গে বৃদ্ধি পেয়েছে। স্বাধীনতার পর দেশে বৃহৎ যেসব উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়িত করা হয়েছে তাতে আদিবাসীরা সবচেয়ে বেশী বাস্তুচ্যুত হয়েছে।[৪৭]

জনসংখ্যা মানুষের অর্থনৈতিক জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৯৫১ সালের সেনসাস্ রিপোর্টে এইরূপ উল্লিখিত যে, কোনো অঞ্চলের জনসংখ্যার ঘনত্ব বিভিন্ন বিষয়ের উপর নির্ভর করে। যেমন—মাটির উর্বরতা, কর্মসংস্থানের সুবিধা, ব্যবসা বাণিজ্য, স্বাস্থ্য ইত্যাদি। সাঁওতাল পরগণাতেও এইসব বিষয়গুলি জনসংখ্যার ঘনত্ব নির্ধারণে প্রত্যক্ষ কারণ হিসেবে ধরা হয়। ১৯৫১ সাল পর্যন্ত সেখানে তেমন কোনো উৎকৃষ্ট ও উন্নয়নশীল ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার হয়নি। ১৯৪০-৫০ সালের এক প্রতিবেদন অনুযায়ী বলা হয় গত দশকে স্বাস্থ্যের দিকটা বেশ ভালোই ছিল। যদিও কলেরার মতো অতিমারি রোগটি সেই জেলা থেকে সম্পূর্ণভাবে দমন করা যায়নি। ১৯৪৩, ১৯৪৭ ও ১৯৪৯-৫০ সাল ব্যতীত বাকি বছরগুলিতে চাষবাস বা কৃষিকাজ সন্তোষজনক ছিল বলেই জানা যায়।[৪৮] ১৯৫১ সালের জনসংখ্যার ঘাটতি পড়ার অন্যতম কারণ হল সেখানকার মানুষের স্থানান্তর হওয়া। প্রত্যেক বছর বহুসংখ্যক মানুষ নিজ অঞ্চল ছেড়ে অন্য অঞ্চলে কৃষিকাজের উদ্দেশে রওনা দিত। ১৯৬১ সালের সেনসাস রিপোর্ট অনুযায়ী নীচে তালিকার মাধ্যমে জনসংখ্যার পরিসংখ্যান বর্ণনা করা হল[৪৯]—

উপবিভাগের নাম	মোট পরিবারের সংখ্যা	মোট জনসংখ্যা	পুরুষ	মহিলা
দুমকা	১,১৭,৪৯২	৬,০৯,৮১২	৩,০৭,০২০	৩,০২,৭৯২
গোড্ডা	৮৮,৩০০	৪,৮২,৭০৪	২,৪৬,২৯৪	২,৩৬,৪১০
রাজমহল	৮১,৬৪০	৪,১৪,২৭৭	২,০৯,০০১	২,০৪,৪৮৬
পাকুড়	৬৮,৭০২	৩,৪৭,০১২	১,৭৪,৬৭০	১,৭২,৩৩৬

উপরিক্ত পরিসংখ্যানের বিবরণে সবথেকে আকর্ষণীয় তথ্যটি হল যে, সেখানে পুরুষ-মহিলার জনসংখ্যা প্রায় একই রকম। জনসংখ্যার সামগ্রিক বৃদ্ধি শতাংশের হিসেবে, দুমকা ১৩.৮৬%, গোড্ডা ১৯.৯৩%, রাজমহল ১৯.৫৯%, পাকুড় ২৪.২১%। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে কি এমন বিষয় সেই সব এলাকার জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে কার্যকরী ভূমিকা নিয়েছিল। মূলত সেখানকার পাথরশিল্প, কারখানা বহু মানুষকে আকর্ষিত করেছিল। রাজমহল স্থলপথে ব্যবসা-বাণিজ্যের আকর্ষণীয় কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তাছাড়া জলপথে সেখানকার আধিপত্য কম ছিল না। গোড্ডা অঞ্চলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সবথেকে কম ছিল। 'দামিন-ই-কোহ' এলাকায় প্রথম থেকেই স্থানীয় জনজাতি মানুষে অধ্যুষিত ছিল। যারা সেখানকার পাহাড়ি ও বনাঞ্চলেই বসতি স্থাপন করে থাকতো। এটা মনে রাখতে হবে যে বর্তমান সময়ে বসবাসকারী সাঁওতালরাই এখানকার অধিবাসী ছিল তা নয়। বহু হিন্দু জাতির মধ্যে অন্যান্য জাতির মানুষ যেমন—গোয়ালা, ভূমিহর, ব্রাহ্মণ, রাজপুত, মহারাস, কুর্মী, তেলি প্রভৃতি মানুষরা বসবাস করত। ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে বহু মারোয়াড়ী সম্প্রদায়ের মানুষ সাঁওতাল পরগণায় বসবাস করত। তাই সাঁওতাল পরগণাকে শুধুমাত্র সাঁওতাল গোষ্ঠী মানুষের অধিবাস বলা যাবে না। ১৯৫১-২০০০ সাল পর্যন্ত সাঁওতাল পরগণার জনসংখ্যার রিপোর্টে দেখা যায় যে সেখানে সাঁওতালদের জনসংখ্যা দেড় শতাংশ কমে গেছে আর দিকুদের জনসংখ্যা সারে চার শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।[৫০] যার ফলে সাঁওতালদের সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থার ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রভাব পড়ে। তাই দেখা যায় যে পরবর্তীকালে সৃষ্ট হওয়া 'ঝাড়খণ্ড আন্দোলন' শুধুমাত্র সাঁওতালদের দাবিদাওয়া বা সাঁওতালদের জন্যই ঝাড়খণ্ড রাজ্য, এই দাবির মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার (J.M.M) প্রধান শিবু সরেন এই

আন্দোলনকে আঞ্চলিক আন্দোলনের রূপ দিয়েছিলেন। যেখানে এই অঞ্চলে বসবাসকারী সমস্ত মানুষের (দিকুদেরও) দাবি-দাওয়া গুলোকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। তাছাড়া শুধুমাত্র সাঁওতালদের নিয়ে গড়ে ওঠা এই আন্দোলনকে বৃহত্তর রূপ দেওয়া সম্ভব হয়ে ওঠেনি। ফলে ঔপনিবেশিক সরকার সাঁওতালদের সুবিধার কথা ভেবে সাঁওতালদের পরিচিতি দিয়ে সাঁওতাল পরগণা নামে যে অঞ্চলের গঠন করেছিল, তা ধীরে ধীরে বহিরাগতদের (দিকু) জায়গা হয়ে ওঠে, যার ফলে সাঁওতালদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রভাব পড়ে।[৫১]

আদিবাসী অর্থনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল অরণ্য-প্রকৃতির সঙ্গে তাদের অর্থনৈতিক জীবনের নিবিড় সম্পর্ক। অর্থনৈতিক ও বাস্তুকেন্দ্রিক ভাবে আদিবাদী জনগোষ্ঠী অরণ্য থেকে অবিচ্ছেদ্য। তাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় অরণ্য সম্পদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। আদিবাসীদের অরণ্য নির্ভরতার কথা বলতে গিয়ে প্রকাশ চন্দ্র মেহেতা উল্লেখ করেছেন যে—‘The linkage between the Tribal and Forests is traditional. Tribals are economically and ecologically inseparable from forests. Be it food, fooder or fuel needs. The Tribal inescapably and assuredly depended on his surrounding forests for substance even during troubled time of droughts’.[৫২] অরণ্য আদিবাসীদের পরিচয়ের ভিত্তি। অরণ্যের সঙ্গে তাদের এই আত্মিক বন্ধনের চিত্র বিভিন্ন বিন্তিতে প্রতিফলিত হয়। এই রকমই একটি হল—

‘বির্ বাড়গে নোওয়া ওড়াক’কক আলাঙ
রাজারাণি ননডে আলাঙ কক্ আলাঙ
রেঙগেচ্ জালা দলাঙ এড়ের গিডিয়া
সেরমা রেয়াক সুকলাঙ ভূঞজৌউ সুকজঙ আ’।[৫৩]

অর্থাৎ, এই বনভূমিতে আমরা ঘরবাড়ি তৈরি করব, রাজারাণী হয়ে আমরা থাকব, জগতের দুঃখ কষ্ট আমরা ভুলে যাব, স্বর্গীয় আনন্দ আমরা উপভোগ করব।

সাঁওতাল পরগণার সাঁওতালদের অরণ্য নির্ভর অর্থনৈতিক ব্যবস্থা জানার আগে উপনিবেশ ও উপনিবেশ পরবর্তী সময়ে অরণ্য আইনগুলি সম্পর্কে জানা প্রয়োজন, কারণ এই আইনগুলির মাধ্যমেই তাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার গতিময়তার পরিচয়

পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের ১০.৪ মিলিয়ন মানুষ জনজাতি গোষ্ঠীর, যা দেশের মোট জনসংখ্যার ৯.৬ শতাংশ জায়গা দখল করে আছে।[৫৪] বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে সামনে রেখে সরকার অরণ্য সংক্রান্ত নানান নিয়ম-নীতি চালু করেন। যার দরুন জনজাতিদের অরণ্যের উপর আধিপত্য খর্ব হয়। ঔপনিবেশিক সময় থেকে চালু হওয়া অরণ্য নীতির দ্বারা জনজাতিদের অরণ্যের অধিকার ও তাদের দাবিগুলিকে অগ্রাহ্য করা হয়। ঔপনিবেশিক সরকারের অরণ্য আইনের ফলে জনজাতিদের অরণ্যভূমির উপর অধিকার হস্তান্তরিত হয়ে সরকারের হাতে চলে যায়। উপনিবেশ পরবর্তী আইনে জনজাতিদের অরণ্যের অধিকারের কথা বললেও, তা ছিল কাগজে-কলমে। সেই সমস্ত আইনগুলি তাদের মানবিক অধিকার ও জীবনের মূল সমস্যার সমাধান করতে পারেনি। ঔপনিবেশিক শাসনের পূর্বে অরণ্যের উপর আদিবাসীদের যথেষ্ট কর্তৃত্ব ছিল। অরণ্য সম্পদকে ব্যবহার করে তারা তাদের জীবন-জীবিকাকে অনেকাংশে পরিচালিত করতে পারত। সেই সময়ের শাসকবর্গের অরণ্য সম্পর্কিত তেমন কোনো বিধিনিষেধ বিদ্যমান ছিল না। এ প্রসঙ্গে রামচন্দ্র গুহ উল্লেখ করেন যে— 'The waste and forest land … never attracted the attention of former (pre-British) Governments'.[৫৫] কিন্তু ঔপনিবেশিক পর্বে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রথম থেকেই অরণ্য ভূমিকে চাষাবাদ ও বাণিজ্যিক উদ্দ্যেশ্যে কাজে লাগাতে বিশেষ উদ্যোগী ছিল। উনিশ শতকের শেষার্ধে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি অনুধাবন করে যে, ভারতীয় অরণ্য অঞ্চল বিশালাকার, যা শেষ হওয়ার নয়। সেখান থেকে এক বিশাল পরিমাণ রাজস্ব লাভ করা যেতে পারে। তাই তারা অরণ্য অঞ্চলের উপর নিজেদের অধিকার ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় আগ্রাসী হয়।

ভারতের অরণ্য ইতিহাস অঞ্চলভেদে বিভিন্নভাবে প্রতিভাত হয়েছে। কৃষিকাজ সম্প্রসারণের জন্য যখন অরণ্য নিধন করা হয়েছিল তখন অরণ্য সংরক্ষণের বিষয়টিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়নি। উপনিবেশ পর্বে অথবা ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির সময় রাষ্ট্রের অরণ্যনীতি ক্রমাগত পরিবর্তিত হয়েছে এবং সেটি ধারাবাহিকতা ও পরিবর্তনের ধারা অনুসরণ করে চলে, অবশ্য ঔপনিবেশিক অরণ্যনীতির মধ্যে কোনো সমতা ছিল না। ব্রিটিশ অরণ্য আধিকারী যথা E.P. Stebbing and B. Ribentrop এই মত প্রকাশ করেন যে, অরণ্যের যথাযথ সংরক্ষণ প্রয়োজন। বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে যথেচ্ছ অরণ্য

নিধনের পরিবর্তে প্রয়োজন এক বিশেষ ধরনের সংরক্ষণ।[৫৬] অন্যদিকে বন্দনা শিবা, রামচন্দ্র গুহ, মাধব গ্যাডগিল প্রমুখরা বলেন যে, ঔপনিবেশিক অরণ্য নীতি অরণ্যকে ক্রমাগত বিনাশ করে গেছে এবং সেই সঙ্গে, 'Every day beliefs of Tribal and peasant society' ঔপনিবেশিক সরকার দ্বারা বিধ্বস্ত হয়েছে।[৫৭] এ প্রসঙ্গে রামচন্দ্র গুহ বলেন ঔপনিবেশিক সরকার 'Manipulated the Customary use of forests…to enable sustained timber production fulfilling their commercial and strategic interests'.[৫৮] এর ফলে একদিকে দেখা যায় পরিবেশের অবনমন ও অন্যদিকে কৃষকের প্রতিবাদ। এদের মত হচ্ছে, প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী অরণ্যের উপর থেকে আদিবাসীদের অধিকারকে বঞ্চিত করা হয়। আবার রিচার্ড গ্রোভ দেখিয়েছেন যে, জমির ব্যবহার সময় অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়েছে এবং শুষ্ক ও আধা শুষ্ক জমিতে কোনো অরণ্য নিধন হয়নি। তিনি বলেন—'Challenged the ideas that have dominated tropical environmentalism since the 19th century and have demolished the notion of human action destroyed forests. He argues that conservation had reminded dominant and was guided by the incentives of agrarian prosperity and social stability'.[৫৯] সুমিত গুহ পরিবেশ ও আদিবাসীদের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করে অরণ্য অঞ্চল রক্ষার জন্য মানবিক কার্যাবলীকে আরো বেশি গবেষণা লব্ধ করতে হবে বলে মত প্রকাশ করেন।[৬০]

১৮৫৪ সালে ভারতে রেললাইন বসানো শুরু হলে রেললাইন বসানোর জন্য প্রচুর কাঠের স্লিপারের প্রয়োজন পড়ে। তাছাড়া কোম্পানির নৌবাহিনীতে জাহাজ তৈরির জন্যইও কাঠের প্রয়োজন পড়ে। এই সমস্ত কারণে লর্ড ডালহৌসি ভারতীয় অরণ্য সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে 'অরণ্য সনদ' জারি করেন। যার দরুন ভারতীয় অরণ্যের উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। 'অরণ্য সনদ' ঘোষণার পরের বছরই অর্থাৎ ১৮৫৬ সালে জার্মান অরণ্য বিশারদ ডেইট্রিক ব্যান্ডিসকে ভারতীয় অরণ্য পরিদর্শক নিযুক্ত করা হয়। ১৮৬৪ সালে ব্যান্ডিসের প্রচেষ্টার ফলে 'ভারতীয় বনবিভাগ' গঠিত হয় এবং ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে ঔপনিবেশিক সরকার ভারতীয় অরণ্য আইন পাস করে অরণ্যকে সরকারি সংরক্ষণের আওতায় নিয়ে আসে। আবার ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে অরণ্য আইনের সংশোধনীতে ভারতীয় অরণ্যকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়। যথা—

১) সংরক্ষিত অরণ্য বা Reserved Forest.

2) সুরক্ষিত বা Protected Forest.

3) গ্রাম্য বনাঞ্চল বা Village Forest.

গ্রাম্য বনাঞ্চলে জনজাতিদের কিছুটা অধিকার থাকলেও সংরক্ষিত ও সুরক্ষিত অরণ্য পুরোপুরি ভাবে সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকে। কিন্তু উপনিবেশ পরবর্তী অরণ্য আইনে অর্থাৎ ১৯৫২ সালে জাতীয় অরণ্য আইনের দ্বারা জনজাতিদের সামান্য অধিকারটাও চলে যায়।[৬১]

ঝাড়খণ্ড রাজ্য গঠন হওয়ার আগে বিহার রাজ্যের অরণ্যভূমির ভৌগোলিক বর্ণনা পাওয়া যায়, যার মধ্যে সাঁওতাল পরগণাও ছিল। সেই সময়ে অরণ্যভূমি বৃদ্ধি পেয়েছিল ২৩,৩০৫ বর্গকিমি, যা পুরো ভৌগোলিক এলাকায় প্রায় ২১.৭১ শতাংশ। স্যাটেলাইট রিপোর্ট অনুযায়ী সেই অঞ্চলের ১০ শতাংশ ছিল ছায়া প্রদানকারী বিশাল বৃক্ষরাশি। নীচে তালিকার আকারে বিভিন্ন অরণ্য অঞ্চলের পরিসংখ্যান দেওয়া হল[৬২]—

১) সংরক্ষিত অরণ্য : ৪,৩৮৭ কি.মি (১৮.৬%)

২) সুরক্ষিত অরণ্য : ১৯,১৮৫ কি.মি (৮১.৩%)

৩) অশ্রেণীভুক্ত অরণ্য : ৩৩ কি.মি (০.১%)

মোট ২৩,৬০৫ কি.মি যা দেশের অরণ্যভূমির প্রায় ৩.৩ শতাংশ জুড়ে বিস্তৃত ছিল। এই অরণ্যভূমির উপর নির্ভর করে সাঁওতাল পরগণার সাওতালদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রায় ২৫-৩০ শতাংশ অরণ্য সম্পদের উপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছিল। স্থানীয় অরণ্যভূমিতে জনজাতিরা কাঠসংগ্রহ, পশুপালন, অরণ্যভূমিতে পাওয়া যায় এমন ফল প্রভৃতির দিক থেকে সুবিধা উপভোগ করত। কিন্তু অরণ্য অঞ্চল কেটে ফেলায় ও অরণ্যভূমিতে ইউক্যালিপটাস লাগানোর জন্য জনজাতিদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে বিপুল পরিবর্তন আসে।[৬৩] অরণ্যের অধিকার চলে যাওয়ায় তাদের অর্থনৈতিক দুরবস্থার কথা তাদের বিভিন্ন লোকগাথায় উল্লেখ পাওয়া যায়।

“দাঃ ক্মাঞ চোঁদাকেৎ সাহান গে বাঙ,
তালেবির তালে সাহান দাড়ে গে বাঙ।”[৬৪]

অর্থাৎ ভাতের জল চাপিয়েছি, কাঠ নেই, তালের বনে অথচ কত কাঠ।

সাঁওতালদের অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্নে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল অরণ্য অঞ্চলের ওপর আধিপত্যের সুব্যবস্থা। সাঁওতাল সমাজ-সংস্কৃতি রক্ষার ক্ষেত্রেও বরাবর অরণ্যভূমি একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। তাই আমরা বলতে পারি, অরণ্য সাঁওতালদের জীবনে বিশেষ স্থান দখল করে আছে। গাছ-গাছালির সঙ্গে বন্যপ্রাণীদের সম্পর্ক ও তাদের আন্তরিকতা স্পষ্টভাবে তাদের জীবনযাত্রায় লক্ষ্য করা যায়। 'সারনা ধর্ম' অরণ্যের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। জনজাতি নিয়ে চর্চা করা সমস্ত ঐতিহাসিক একটি বিষয়ে অবগত যে, 'জাহের' বিষয়টি সাঁওতালদের সমাজ সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কতটা গুরুত্বপূর্ণ। জঙ্গলে শিকার করার আনন্দ উপভোগ, বনৌষধি, দিহরি বাবার প্রতি আনুগত্য প্রভৃতি সংস্কৃতি অরণ্য থেকে পেয়ে থাকে। তাই অরণ্য ভূমির উপর অধিকার খর্ব হওয়ায় অর্থনৈতিক জীবনের পাশাপাশি তাদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনও সংকটাপন্ন হয়ে পড়ে।

হোমো স্যাপিয়েন্স বা মানুষের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে অভিপ্রয়াণের সূচনা। পূর্ব আফ্রিকা থেকে সমগ্র ইউরোপ এবং পূর্ব এশিয়ায় স্থানান্তরিত হয়েছিল। এরই ফলে সমস্ত পৃথিবীর পূর্ব পুরুষ হিসেবে পূর্ব আফ্রিকা থেকে আগত মানুষদেরই বংশধর হিসেবে গণ্য করা হয়। যুগের পরিবর্তন এই অভিপ্রয়াণের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করেছে। আমাদের গবেষণায় উপনিবেশ ও উপনিবেশ পরবর্তী সময়কালে সাঁওতাল পরগণার সাঁওতালদের অভিপ্রায়ণের বিষয়টি সাঁওতালদের সমাজ ও সংস্কৃতিকে কতটা প্রভাবিত করেছিল তা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। জনজাতিদের অভিপ্রয়াণ সম্পর্কে প্রথমেই যে বিতর্কটি উঠে আসে 'voluntary' বা 'Forced' বা বাধ্যতামূলক অভিপ্রয়াণ। W.W. Hunter তাঁর *Annals of Rural Bengal* গ্রন্থে সাঁওতাল পরগণার সাঁওতালদের অভিপ্রয়াণকে স্বতঃপ্রণোদিত হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এর কারণ হিসেবে দেখিয়েছেন এই অভিপ্রয়াণের ফলেই খনি শ্রমিক ও বাগিচা শ্রমিক হিসেবে সাঁওতালরা নগদ অর্থ উপার্জন করতে পেরেছিল এবং নিজেদের বাসস্থানে ফিরে এসে সেই অর্থে জমি ক্রয় করে লাভবান হয়েছিল।[৬৫] অন্যদিকে এর বিপরীত পর্যবেক্ষণ পাওয়া যায় সাঁওতাল বিদ্রোহের পরে ছটরায় দেশমাঝির বক্তব্য থেকে। খ্রিস্টান মিশনারিরা এই বক্তব্য আহরণ করেছিল বিদ্রোহের প্রত্যক্ষদর্শী ছটরায়ের কাছ থেকে।

সেখানে বলা হচ্ছে পাপা ও কোরাপ সাহেব সাঁওতালদের নানান প্রলোভন দেখিয়ে আসামের দিকে অভিপ্রয়াণে বাধ্য করেন এবং এই যাত্রা ছিল ভয়ঙ্কর ও বিপদ সঙ্কুল। এই যাত্রার বর্ণনা প্রসঙ্গে ছটরায় দেশমাঝি বলেছেন–'There is no food at home, people have to go in search of a job. Due to accessive impoverishment people are to migrated'.[৬৬] অন্যদিকে Crispin Bates এবং Marina Carter তাঁদের *Tribal Migration in India and Beyond* গ্রন্থে এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। যে বিষয়টিকে আলোকপাত করা হয়েছে তা হল, ধনতান্ত্রিক বিনিয়োগ এবং স্বাধীনতা পরবর্তী বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের জন্য শ্রমিকের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। অভিপ্রয়াণের একদিকে যেমন অভ্যন্তরীণ কারণকে চিহ্নিত করা যায় তেমনি অন্যদিকে বৈদেশিক 'Plantation Economy'-কেও দায়ী করা যায়।[৬৭]

সাঁওতাল পরগণার সাঁওতালদের জীবনচক্রে অভিপ্রয়াণ হল একটি অবিরত প্রয়াস। তাদের এই অভিপ্রয়াণের বিষয়ে কয়েকটি বিশেষ কারণকে চিহ্নিত করা যায়। ১৮৫৫ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহে পরাজয়ের পর সাঁওতালদের স্থানান্তরে গমন একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় পরিণত হয়। জমির হস্তান্তর এর একটি প্রধান কারণ। বাণিজ্যিক শস্য উৎপাদনের জন্য জমির বৃহৎ অংশ মহাজন ও জমিদারদের পাশাপাশি ইউরোপীয় প্ল্যান্টারদের হাতে চলে যায়, তবে এর ফলে সরকারি আয়ও বৃদ্ধি পায়। এল.এস.এস.ও'ম্যালে তাঁর সাঁওতাল পরগণা ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে উল্লেখ করেন যে, ১৯০১ থেকে ১৯০৮ সালের মধ্যে সাঁওতাল জনসংখ্যা ছিল ১০,৫০,৬৮২ জন। যার মধ্যে অধিকাংশ সাঁওতাল এখন শ্রমিকে পরিণত হয়েছে এবং তাদের নিজস্ব কোনো জমি নেই। কয়লা খনির ম্যানেজার এবং বাগিচা শিল্পের মালিকরা এই শ্রমিকদের জোরপূর্বক স্বল্প মজুরিতে কাজে লাগায়। নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে এই অভিপ্রয়াণে বাধ্য করা হয়েছিল। একথা ঠিক যে বিভিন্ন আইন (Aboriginal Lands Alienation Act, The Money Lender Act, Agricultural Act) থাকা সত্ত্বেও সাঁওতালদের জমি পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। এছাড়াও সাঁওতালদের অভিপ্রয়াণের অন্য একটি কারণ হিসেবে তাদের ঋণগ্রস্থতাকে দায়ী করা যায়। জেলার পোস্ট অফিসগুলির রিপোর্ট থেকে জানা যায়, যে সমস্ত সাঁওতাল খনি ও বাগিচা অঞ্চলে কাজ করতে গিয়েছিল তারা সেখান থেকেই 'মানি অর্ডার' এর মাধ্যমে মহাজনদের ঋণ পরিশোধ করত। সেই সঙ্গে দুর্ভিক্ষ অভিপ্রয়াণ প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করেছিল। ১৮৬৬

সালের দুর্ভিক্ষে চালের দাম বৃদ্ধি পায় এক টাকায় সাড়ে সাত সের এবং অগাস্টে সেটি কমে দাঁড়ায় সাড়ে ছয় সের-এ।[৬৮] যে কোনো আর্থিক সংকট ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয় নারীরা। সাঁওতালদের সমতাবাদী সমাজ কাঠামোয় পুরুষদের যেমন 'হড়' নামে চিহ্নিত করা হয় তেমনি সাঁওতাল নারীরাও 'হড়ু' হিসেবে পরিচিত ছিল। ভারতবর্ষের মোট জনসংখ্যার ৮ শতাংশ জনজাতি হলেও তাদের স্থানান্তকরণের সংখ্যা শতকরা ৪০ ভাগ। আর এই ৪০ শতাংশ হচ্ছে পরিযায়ী শ্রমিক। পুরুষ শ্রমিকদের অভিপ্রয়াণের পাশাপাশি সাঁওতাল নারী শ্রমিকদের অভিপ্রয়াণের বিষয়টিও সাঁওতাল সমাজে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। নারীদের অধিকারে যে জমিটুকু থাকত বিভিন্ন উন্নয়ন এর নামে দখল করা হলেও তার ক্ষতিপূরণ তারা পেত না। উপরন্তু অরণ্য সম্পদ আহরণে তাদের অধিকার সীমিত হয়ে পড়েছিল। আর শ্রমিক হিসেবে সাঁওতাল নারীরা সমানভাবে যোগ্য হলেও কম মজুরি পেত।[৬৯]

সাঁওতাল পরগণার সাঁওতালদের অভিপ্রয়াণের প্রাথমিক পরিকল্পনা ছিল ব্রিটিশ মিশনারিদের। সাঁওতালদের স্বতন্ত্র সমাজ ও সংস্কৃতিতে এই স্থানান্তকরণ একটা সংকটময় পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল। বিদ্রোহ পরবর্তী সময়ে এখানকার সাঁওতালরা আশ্রয় নেয় মালদা ও বীরভূমে। বিশেষ করে আসাম এবং কয়লাখনি অঞ্চল রাণীগঞ্জ ও ঝরিয়াতে। ফলত এককালের জমির মালিক হয়ে পড়ে দিন মজুর বা খনি অঞ্চল অথবা চা-বাগানের শ্রমিক। মালদা, বীরভূম ও বাঁকুড়া অঞ্চলে তাদের পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে প্রমাণ করার বহু তথ্য আজও বর্তমান। সাঁওতাল পরগণা থেকে এক বৃহৎ সংখ্যক সাঁওতাল মালদা ও উত্তরবঙ্গে স্থানান্তরিত হয়, নিজেদের জীবন রক্ষা ও জীবিকা পালনের জন্য। একদিকে যেমন ব্রিটিশ সরকারের শ্রমিকের জন্য চাহিদা ছিল অপরদিকে সাঁওতালরাও পরিস্থিতির চাপে বাধ্য হয়ে জমির সন্ধানে ও সামান্য মজুরির বিনিময়ে নিজেদের শ্রমিক হিসেবে যুক্ত করতে আগ্রহী হয়ে পড়ে। এ প্রসঙ্গে Duyker এর মন্তব্য যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ – '১৮৫০ সালে সিকিমকে তরাইয়ের অন্তর্ভুক্ত করার পর, ব্রিটিশরা তরাইয়ের বিশাল বনভূমি ধাপচাষ ও জলসেচের মাধ্যমে চাষযোগ্য করে তোলে এবং সেখানে চা, সিঙ্কোনা, আলু, দারচিনি, কমলালেবুর বিপুল উৎপাদন শুরু করে। এইসব চাষবাসের কাজে ব্রিটিশরা বৃহৎ সংখ্যক সাঁওতাল শ্রমিকদের কাজের চুক্তিতে আবদ্ধ করে। তবে কিছু সাঁওতালদের জোরপূর্বক উত্তরবঙ্গে নিয়ে যাওয়া

হয়েছিল। আসামের চা বাগান ব্রিটিশদের অধিকারে ছিল এবং সেখানে প্রচুর চা শ্রমিকের প্রয়োজন পড়ে।'[৭০] সর্বপ্রথম ১৮৭১ সালে ইংরেজ মিশনারি কোরাপ ও পাপা সাহেব সাঁওতাল পরগণা থেকে ৩০০ টি সাঁওতালদের একটি দল নিয়ে আসামে যায়। আসাম নিয়ে যাওয়ার এই প্রক্রিয়াটি বিভিন্ন পর্যায়ে সম্পন্ন হয়। ব্রিটিশ মিশনারি কোরাপ ও পাপা সাহেবের আসাম নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনার কথা ছটরায় তাঁর 'ছটরায় দেশমৈজ্ঞ্হি রেয়াঃক কাথা' গল্পে সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। সেখানে বলা হয়েছে, পাপা ও কোরাপ সাহেব খ্রিস্টান ধর্মাবলবম্বী সাঁওতালদের গির্জায় না আসার কারণ হিসেবে জানতে পারেন তাদের আর্থিক দুর্দশার কথা। তখন সাহেবরা আশ্বস্ত করেন যে খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী সাঁওতালদের খেয়ে পরে বাঁচবার জন্য একটা নতুন দেশ খুঁজে দেওয়া হবে। সেই দেশ যে আসাম, তার বর্ণনায় রয়েছে—'আসাম দেশে প্রচুর জমি আছে, যে কেউ যতখুশি চাষ করতে পারো, কেউ তোমাদের দাবিয়ে রাখবে না, আর যা খরচ হবে সমস্ত সরকার থেকে পাওয়া যাবে।'[৭১] এই অভিপ্রয়াণ যে অনেকটা পরিকল্পনামাফিক ও জোরপূর্বক ছিল, তা ডবলু.ডবলু. হান্টারের মন্তব্যে বোঝা যায়, 'এটা যথেষ্ট নজর রাখতে হবে যেন কোনো শ্রমিক অভিনয় করেই হোক বা পরিস্থিতির চাপে পড়ে, এই বাগান ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য না হয়।'[৭২] খাদান ও চা-বাগানের ঠিকাদাররা কমিশনের আশায় নানান প্রলোভন দেখিয়ে ও জোরপূর্বক সাঁওতালদের বাইরে কাজ করতে নিয়ে যেত। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের রচিত ছোট গল্প 'বীতংস'-এ যথেষ্ট বর্ণনা মেলে, যা সেই দিক দিয়ে সাহিত্যিক পরিসরে উল্লেখযোগ্য প্রমাণ বলা যেতে পারে। সেখানে একটি অংশে উল্লেখ রয়েছে যে—'আসামের চা-বাগানে কুলি যোগানো কি যে অসম্ভব ব্যাপার, সেটা সাহেব জানে। কালাজ্বরে দলে দলে লোক মরছে, আশপাশ থেকে একটি কুলি আনবারও জো নেই। বুধনীকে বাদ দিয়ে—আড়কাঠি সুন্দর লাল হিসাব করতে লাগলঃ বুধনীকে বাদ দিলে, বেয়াল্লিশ জন কুলিতে বাদ দিলে কমিশন পাওয়া হয় কত! সাঁওতাল পরগণার বিমুক্ত প্রকৃতিকে পরিপ্লাবিত করে দিয়েছে বসন্তের অকৃপণ আনন্দধারা।'[৭৩] ১৯৬৫ সালের সাঁওতাল পরগণার ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার থেকে জানা যায় যে, ১৯২১ সালে চা বাগানে কর্মরত সাঁওতালদের জনসংখ্যা ছিল ৮৪০০০ এর থেকেও বেশি এবং এরা সকলেই সাঁওতাল পরগণার বংশোদ্ভুত।

যখন ব্রিটিশরা দেখল যে সাঁওতালদের আসাম যাওয়ার প্রবণতা বেশি, তখন তারা পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে দুমকায় একটি কর্মসংস্থান কেন্দ্র স্থাপন করে। এই কেন্দ্রটি মুফাসিল থানার বিপরীতে শিব পাহাড় চকে অবস্থিত ছিল। এর নাম ছিল 'আসাম ডিপো'। এই নিয়োজন কেন্দ্র থেকে যে সংখ্যক সাঁওতালকে আসামে পাঠানো হয়েছিল তার বিবরণ তালিকার আকারে নীচে দেওয়া হল[৭৪] —

বছর	সংখ্যা
১৯২৪-২৫	১,৭৮৮
১৯২৫-২৬	১,৫৮০
১৯২৬-২৭	৬,৮৬১
১৯২৭-২৮	১২,১৭৯
১৯২৮-২৯	১,০০০
১৯২৯-৩০	৪,৩৬৭
১৯৩০-৩১	৪৩,৭২৬
১৯৩১-৩২	৩৫৫
১৯৩২-৩৩	১,১৯৪
১৯৩৩-৩৪	৮৮৩
১৯৩৪-৩৫	৬৬২
১৯৩৫-৩৬	২৩৬
১৯৪৫-৪৬	৭২৫

এই অভিপ্রয়াণ সব সময় যে জোরপূর্বক হয়েছিল তা নয়। সাঁওতাল পরগণার অর্থনৈতিক অবস্থার দরুন সাঁওতালরা অভিপ্রয়াণে বাধ্য হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে নির্মল কুমার মাহাতো বলেছেন যে, 'বিদ্রোহের পরবর্তীকালে মানুষের ঘরে ঘরে খাবারের অভাব পড়ে যায়, তাদের কাজের খোঁজে বাড়ির বাইরে হন্যে হয়ে বেড়াতে হয়। অতিরিক্ত প্রযুক্তিকরণ ও আধুনিকতার দরুন মানুষদের পরিযাত্রায় যেতে বাধ্য হতে হয়।'[৭৫] অন্যদিকে বিভিন্ন লোকসংগীতের মাধ্যমেও সাঁওতালদের পরিযাত্রার অনিচ্ছাকে

স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। আর্চারের সংগৃহীত কিছু লোকসংগীতেও এই কাহিনি বর্ণনা করে, তার কিছু অংশ নীচে আলোকপাত করা হল[৭৬] –

'চল মিনি আসাম যাবো
দেশে বড় দুখ রে,
আসাম দেশে নে মিনি চা বাগান হরিয়াল'।
বাবু বলে কাম কাম
সর্দার বলে ধরে আন,
সাহেব বলে লিবো পিঠের চাম রে,
ও যদুরাম, ফাঁকি দিয়া আনিনি আসাম'।

অন্য আর একটি হল–

'Take me home,
Oh, my love
Or, I shall fell hungry and
My free shall wither'.

সাঁওতাল পরগণার সাঁওতালরা সব থেকে বেশি আকৃষ্ট হয়েছিল বাংলা এবং আসামে। যেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষ স্বেচ্ছায় অভিবাসী হতে চেয়েছিল। ১৯০১ সালে ১০,০০০ সাঁওতাল জলপাইগুড়িতে বসতি স্থাপন করেছিল এবং রাজশাহী, বগুড়া, পূর্ব দিনাজপুরে সাঁওতালদের সংখ্যা ছিল ৫৬,০০০। এই অভিপ্রয়াণ একদিকে যেমন দুঃসাধ্য ও কন্টকময় ছিল তেমনি এর পেছনে ছিল ঐতিহাসিক কারণ। এ প্রসঙ্গে ছটরায় মন্তব্য করেছেন–'দেকোক্ ঠেণ্ নালহাক চালাঃ কানা...অনা ইনতে জম বাঙতে অনতে নতে রেঙ্গে রেগেজ্ঞ জালাতে নকোক চির চতুরঃ কানা।'[৭৭] অর্থাৎ, খাবারের অভাবে পেটের জ্বালায় এদিকে ওদিকে দিকুদের কাছে কাজ করতে যাচ্ছে, তার জন্য তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে।

বিদেশে সাঁওতাল শ্রমিকদের চোরাচালানের মাধ্যমেও শ্রমিকের কাজে পাঠানো হত। ১৯৬৫ সালে সাঁওতাল পরগণার ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে উল্লেখ রয়েছে যে, ১৯১৬-১৭ সালে মেসোপটেমিয়া (ইরাক) এবং ফ্রান্সে শ্রমিকের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় সাঁওতাল

পরগণা থেকে ১১,০০০ শ্রমিক নিয়োগ করা হয় আবার ১৯১৭-১৮ সালে ১৪৯৩ জনকে বার্মার টেলিগ্রাফ ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে শ্রমিকের কাজে পাঠানো হয়।'[৭৮] মেসোপটেমিয়ায় (ইরাক) যে সাঁওতাল পরগণার সাঁওতালদের শ্রমিকের কাজে নিয়োগ করা হয়েছিল, তার উল্লেখ পাওয়া যায় সেই সময়ের একটি সাঁওতালি গানে। যা নিম্নরূপ—

'নুমিন লল্ দাদা নুমিং সেতং
ওকা্ তেদ্ দাদান চালা কানা
ট্রাইগ্রিস গাডা বিটি মেসোপটেমিয়া
বাসেরো বাগদাদ সড়ক বেনাও'।[৭৯]

অর্থাৎ, বোন ভাই কে জিজ্ঞেস করছে—এত রোদে, এত গরমে কোথায় যাচ্ছো দাদা?

দাদার উত্তর—

বোন, মেসোপটেমিয়ার টাইগ্রিস নদীতে,
বসেরা, বাগদাদ শহরে রাস্তা বানাতে যাচ্ছি।

নেপালে সাঁওতালদের জনসংখ্যা প্রায় এক লাখ। যার সর্বাধিক বসবাস করে মোরং জেলায়। এরা সবাই সাঁওতাল পরগণার আদি বাসিন্দা, যারা ভালো মজুরির আশায় পরিযায়ী হয়েছিল। আবার বর্তমানে বাংলাদেশের মোট জনজাতির সংখ্যা তিন লাখের কাছাকাছি, যার ৯০ শতাংশই সাঁওতাল পরগণার বংশোদ্ভুত। এ প্রসঙ্গে ভেরিয়ার এলুইন বলেন, ১৯২১ সালে ২/৩ শতাংশ সাঁওতাল পরগণার মানুষকে নানান চুক্তির মাধ্যমে চালান দেওয়া হয়েছিল; নীলচাষ করতে আসামে এবং উত্তরবঙ্গের চা-বাগানে, মরিসাসে, ক্রেওলে কিংবা আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে।[৮১]

উপনিবেশ পরবর্তী সময়েও সাঁওতাল পরগণার সাঁওতালদের অভিপ্রয়াণের ধারা বজায় ছিল। স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর নেওয়া দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে এই অঞ্চলে ভারীশিল্প, কলকারখানা, বাঁধ নির্মাণের মতো উন্নয়নমূলক প্রকল্পের ব্যবস্থা করা হয়। যার দরুন বৃহৎ সংখ্যক সাঁওতালকে তার বাস্তুভিটে থেকে উচ্ছেদ করা হয় এবং সঠিকভাবে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করায় হাজার হাজার সাঁওতালকে সাঁওতাল পরগণা ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে হয়।

বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে উচ্ছেদ হওয়া ও পুনর্বাসন না পাওয়ার পরিসংখ্যান নিম্নে তালিকার আকারে দেওয়া হল[৮২] —

পরিকল্পনা	উৎখাত	পুনর্বাসন	অবশিষ্টাংশ (লাখে) যাদের কিছুই দেওয়া হয়নি
ড্যাম	৫৩.০০	১৩.১৫	৩৯.৮৬
খনি	১২.০০	৩.০০	৯.০০
কারখানা	২.৬০	০.৬৫	১.৯৫
প্রাণী সংরক্ষণ	৫.০০	১.২৫	৩.৭৫
অন্যান্য	১.৫০	০.৪০	১.৭০
মোট	৭৪.০০	১৮.৪৫	৫৬.২৬

অন্যদিকে আধুনিক কলকারখানায় শ্রমিকের কাজে দক্ষতার অজুহাত দেখিয়ে বাইরে থেকে প্রচুর শ্রমিক নিয়োগ করা হয়। যার দরুন সাঁওতাল পরগণার সাঁওতালদের শ্রমিকের কাজ চলে যায়। ফলত তাদের আর্থিক সংকট ও দারিদ্রতা চরমে পৌঁছায় এবং তারা বাধ্য হয়ে গুজরাট, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ প্রভৃতি অঞ্চলে পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে দিন মজুরের কাজে নিযুক্ত হয়। ঝাড়খণ্ড সরকারের গণপরিবহন দপ্তরের এক রিপোর্টে উল্লেখ রয়েছে যে—'বছরে বিশেষ কিছু সময়ে হাজার হাজার সাঁওতাল দিন মজুরের কাজে বাসে করে সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলিতে পাড়ি দেয়।'[৮৩] পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলায় ধান চাষের কাজে সাঁওতাল পরগণা থেকে এক বৃহৎ সংখ্যক সাঁওতাল আসতে থাকে। এই অঞ্চলের সাঁওতালদের পরিযায়ী শ্রমিক হওয়ার ঘটনা শিবেন্দু শেখর হাঁসদা তাঁর *The Adibasi will not dance* গল্প সংকলনে বিবরণ দিয়েছেন, যাকে সাহিত্য পরিসরে এক প্রামাণ্য দলিল বলা যেতে পারে। এই গল্পে তিনি দেখিয়েছেন, দক্ষতার অজুহাতে সেখানকার কলকারখানায় দিকুদের নিয়োগ করা হয়েছে। বৃহৎ কয়লা অঞ্চল হওয়া সত্ত্বেও সাঁওতালরা জ্বালানির অভাবে ভাতের হাড়িটাও উনুনে চাপাতে পারেনি। অথচ তাদের রাস্তার উপর দিয়ে টন টন কয়লা গাড়ি করে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ফলত সাঁওতালরা নিজের এলাকা ছেড়ে অন্য রাজ্যে কাজের সন্ধানে যেতে বাধ্য হয়েছে।[৮৪]

সাঁওতাল পরগণার সাঁওতালরা স্বতন্ত্র এক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামো গড়ে তুলেছিল। কিন্তু অভিপ্রয়াণের ফলে এই স্বতন্ত্র সমাজ ও সংস্কৃতি সংকটাপন্ন হয়ে পড়ে। সাঁওতাল সমাজ যৌথ গোষ্ঠী কাঠামোর উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। কিন্তু সাঁওতালদের অভিপ্রয়াণের দরুন এই যৌথ সমাজ কাঠামোয় আঘাত আসে। এক বৃহৎ সংখ্যক সাঁওতাল অভিপ্রয়াণের ফলে নিজের এলাকায় অনুপস্থিত থাকায় তাদের দলপতি নির্বাচন, শিকার উৎসব, বিভিন্ন ঋতুতে হওয়া উৎসব অনুষ্ঠান থেকে বিরত থাকে, সন্ধ্যায় কাজ থেকে বাড়ি ফিরে যে নাচ গানের আসর বসত ধীরে ধীরে তার অবক্ষয় হতে থাকে। অন্যদিকে পরিযায়ী সাঁওতালরা পরিস্থিতির চাপে বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষা-সংস্কৃতিকে গ্রহণ করতে বাধ্য হয় এবং তারা যখন মাঝে মাঝে নিজের এলাকায় ফিরে আসত, তখন তাদের বহন করা অন্য সংস্কৃতির ধারা সেই এলাকার স্থায়ী সাঁওতালদের প্রভাবিত করত। তাই সাঁওতাল সমাজ ও সংস্কৃতির বিবর্তনে অভিপ্রয়াণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

সাঁওতাল পরগণার সাঁওতালদের অর্থনীতি হল প্রান্তিক অর্থনীতি। রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গি এবং সেখানকার ভূপ্রাকৃতিক পরিবেশের ওপর ভিত্তি করে তা গড়ে ওঠে। তাদের অর্থনীতি মূলত অস্তিত্ব নির্ভর যা, অ-আদিবাসীদের কাঠামো থেকে লক্ষণীয় ভাবে পৃথক। তাদের এই স্বতন্ত্র অর্থনীতির ওপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে সমাজ ও সংস্কৃতি। কিন্তু উপনিবেশ ও উপনিবেশ পরবর্তীকালে তাদের এই অস্তিত্ব নির্ভর অর্থনীতি সংকটাপন্ন হয়ে পড়ে, যার ফলে তাদের সমাজ ও সংস্কৃতি গভীরভাবে প্রভাবিত হয়। এ প্রসঙ্গে শুচিব্রত সেন তাঁর, *পূর্ব ভারতের আদিবাসী অস্তিত্বের সংকট* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, ‘যখনই হড়দিশম বা আদিবাসী ভূমি অধিকৃত হয়েছে বহিরাগতদের হাতে, তখনই এক গভীর হতাশা নেমে এসেছে তাদের জীবন বোধের কাছে। ভূমি হস্তচ্যুতি হওয়া শুধু আর্থিক সংকট নয়, ভূমিকে কেন্দ্র করে যে আদিবাসী মানস প্রতিষ্ঠিত, তার মূলে ঘটেছে কুঠারাঘাত।’[৮৫] একক ব্যক্তিগত অধিকারের পরিবর্তে গোষ্ঠীগত যৌথ কাঠামকে ভিত্তি করে সাঁওতাল পরগণার সাঁওতালদের অর্থনৈতিক জীবন গড়ে ওঠে। এই গোষ্ঠী ভাবনার বড় নির্দশন ছিল তাদের ‘মণ্ডলী ব্যবস্থা’। সাঁওতাল সমাজে মন্ডল বা মাঝির অবস্থান, ভূমির সঙ্গে তার সম্পর্ক এবং ভূমি চ্যুতির সঙ্গে মণ্ডলী প্রথার অবসানে প্রতিক্রিয়া—এই সবগুলিই এদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক

সংকটকে বুঝতে সাহায্য করবে। এই স্বয়ং সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক পরিবৃত্তে মন্ডল বা মাঝি ক্ষমতার কেন্দ্র বিন্দুতে অধিষ্ঠিত থাকলেও কোনো আমলা তান্ত্রিক বা স্বৈরাচারী আধিপত্য গড়ে ওঠেনি। সাঁওতাল প্রথা অনুসারে ‘সনম হড় হপন মিত্ লেকা টানে কানা’ অর্থাৎ সমস্ত সাঁওতালই এক ও আসল মানুষ। সাঁওতাল সমাজে এই সমতাবাদী নীতি মণ্ডলী প্রথার এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। পরিবারের সমস্ত কর্তাদের সমান ভূমিকা, এমনকি মাঝি বা গ্রামের প্রধানও সবার মধ্যে শুধু নামেই প্রথম স্থানাধিকারী থাকত।

যেকোনো স্থানে সাঁওতালদের নতুন বসতি স্থাপন তাদের ঐতিহ্যকে অনুসরণ করে চলত। একক ভাবে কোনো সাঁওতাল অকর্ষিত ভূমিতে বসতি স্থাপন করত না। মাঝির নেতৃত্বে দলবদ্ধভাবে যখন তারা জঙ্গল হাসিল করত তখন যৌথ ভাবেই সেই মালিকানার স্বত্ব পেত। সাঁওতালদের গ্রাম পত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই গড়ে উঠত কৃষি সংক্রান্ত নিজস্ব নিয়মকানুন; যথা গোচারণ, জঙ্গল ও সেচ সংক্রান্ত নিয়ম। এই সমস্ত বিষয়গুলি পরিচালনা করার জন্য থাকত নিজস্ব পঞ্চায়েতি ব্যবস্থা। এক্ষেত্রে ‘দিশম মাঝি’, ‘ল-বির-বাইশে’-এর মতো প্রতিষ্ঠানগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখত। অন্যদিকে সাঁওতালদের এই সামাজিক জীবনের ওপর নির্ভর করে গড়ে উঠত সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল, এই প্রসঙ্গে শুচিব্রত সেন বলেন—‘Culture is an approach to life and hence a by – product of social reality. As social reality differs so differs the culture’.[৮৬] জল, জঙ্গল ও জমি ছিল তাদের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের উৎস। জমি ও জঙ্গলকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত উৎসব গড়ে উঠত, সেগুলির বর্ণনা দেওয়া হল—

১) এড়ঃ সীম : ধান চাষের আগে বৃষ্টি ও চারাগাছ যেন ভালো হয়, সেই উদ্দেশ্যে আয়োজিত উৎসব।

২) হৌরিয়ৌড় সিম উৎসব : মাঠের ফসলে যাতে পোকা-মাকড় না হয় তার জন্য উৎসব।

৩) লাঁগড়ে উৎসব : ভালো বৃষ্টির আশায় উৎসব।

৪) সাকরাত উৎসব : ফসল বাড়ি তোলার পরে উৎসব।

৫) মাঘাসীম : জঙ্গল থেকে যাতে কোনো রকম বিপদ ছাড়া জীবন ধারণের সামগ্রী সংগ্রহ করা যায়, সেই উদ্দেশ্যে উৎসব।

এছাড়াও বাহা, শিকার উৎসব প্রভৃতি উৎসবগুলি কৃষিকাজ ও জঙ্গলের ওপর নির্ভর করে গড়ে উঠত। সেই সঙ্গে প্রত্যেকটি উৎসবকে কেন্দ্র করে নানান গান ও নাচ তৈরি হত।

তবে উপনিবেশ ও উপনিবেশ পরবর্তী সময় সাঁওতাল পরগণার সাঁওতালদের জমি ও জঙ্গলের অধিকার চলে যাওয়ায় তাদের অর্থনৈতিক জীবনের পাশাপাশি সমাজ ও সংস্কৃতিতে নেমে আসে এক গভীর সংকট। সাঁওতাল পরগণায় সাঁওতালরা যখন প্রথম বসতি স্থাপন করে তখন জমির অধিকার তাদের নিজের হাতেই ছিল এবং প্রথম দিকে কোনো রাজস্ব দিতে হত না। যখন সাঁওতালদের দ্বারা চাষবাসের শ্রীবৃদ্ধি হল তখন ঔপনিবেশিক সরকার রাজস্ব ধার্য করল, যা উত্তরোত্তর বাড়তেই থাকে। ১৮৫৫ সালে সাঁওতাল বিদ্রোহ এবং তার পরবর্তী সময়ে নানান নিয়ম নীতি চালু করে সাঁওতালদের জমির অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। এমনকি মাঝির বা দলপতির মাঝিহাস বা নিষ্কর জমির অধিকারটুকুও কেড়ে নেওয়া হয়। জমির অধিকার চলে যাওয়ায় তারা মহাজন বা জমিদারের ঋণের কবলে পড়ে ক্রীতদাসে পরিণত হয়। সমতাবাদী সাঁওতাল সমাজে কোনোদিনই এই রকম ব্যবস্থা ছিল না। এই ব্যবস্থা সাঁওতাল সমাজের আত্মমর্যাদায় চরম আঘাত হানে। সেই সঙ্গে সাঁওতালদের নিজস্ব পঞ্চায়েতি ব্যবস্থার পরিবর্তে মুনসিফ আদালত ও পুলিশি ব্যবস্থা চালু করা। যেমন— Santal Police Rule 1856, Santal Pargana Settlement Regulation 1872, Santal Pargana Justice Regulation 1893, Santal Pargana Rural Police Regulation 1910 প্রভৃতি। ফলত সাঁওতাল পরগণার সাঁওতাল সমাজ এক অপরিচয়ের গণ্ডির মধ্যে প্রবেশ করে।

উপনিবেশ পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ স্বাধীন ভারতে সাঁওতালদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে কোনো সুরাহা হয়নি, বরং তা আরো বেশি দুর্বিষহ হয়ে পড়ে। স্বাধীন ভারত সরকার সাঁওতাল পরগণার সাঁওতালদের জন্য চালু করা ব্রিটিশ সরকারের নিয়ম-নীতিকে পুনর্মুদনের মাধ্যমে বহাল রাখে। ১৯৫৫ সালের সাঁওতাল পরগণা অ্যাক্ট এর বেশীরভাগ নিয়ম ছিল ঔপনিবেশিক সরকারের। অন্যদিকে প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নেওয়া প্রকল্পগুলি বাস্তবায়ন করতে গিয়ে এই এলাকার বৃহৎ সংখ্যক সাঁওতাল বাস্তুচ্যুত হয়।

পুনবার্সনের সঠিক ব্যবস্থা না থাকায় তারা বাস্তুভিটে ও কাজ হারিয়ে পরিযাত্রায় যেতে বাধ্য হয়। পার্শ্ববর্তী এলাকার খনি অঞ্চলে, আসামের চা বাগানে দিন মজুর বা শ্রমিকের কাজকে বেছে নিতে বাধ্য হয়। ফলে এক সময়ের জমির মালিক হয়ে পড়ে দিন মজুর বা চা বাগানের শ্রমিক। সেই সঙ্গে তাদের অস্তিত্ব নির্ভর অর্থনীতি (যেখানে তাদের সমাজ ও সংস্কৃতি জড়িত ছিল) দিন যাপনের অর্থনীতিতে পরিণত হয়। ফলত উপনিবেশ ও উপনিবেশ পরবর্তী সময়ে জমি ও অরণ্যের উপর ঐতিহ্যগত অধিকার হারিয়ে ক্রমশই কৃষক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। মণ্ডলের অধিকার অবসানের সঙ্গে সঙ্গে সাঁওতালি সমাজে জমির ওপর ব্যক্তি মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হল। আবার ব্যক্তি মালিকরাও মহাজনের অত্যাধিক খাজনার শর্তে চাষ করতে বাধ্য হল নচেৎ ভূমিহীন চাষীতে পরিণত হয়ে কর্মের সন্ধানে কয়লা খনি অথবা চা বাগানের কুলিতে পরিণত হল।

সমাজ থেকে গোষ্ঠী থেকে সাঁওতালরা দূরে চলে যাওয়ায় শুধু যে তাদের অর্থনীতি বিপর্যস্ত হল তাই নয়, জমি হারিয়ে তারা এক বিপন্নতাবোধে আক্রান্ত হল। ভূমি ও অরণ্য হীনতার অর্থ আদিবাসীদের আদিবাসী সত্তার বিসর্জন। জমি ও জঙ্গলের ওপর সাঁওতালদের অধিকার শুধু অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক নয়, অনেক পরিমানে আত্মিক। এ প্রসঙ্গে আর্চার সাহেব উল্লেখ করেন—'A Santal's land not only provides economic security but is a powerful link with his ancestors ; and this applies to newly entered areas no less than the old for he will not take possession till the spirits approve. The land is of his sprititual as well as economic heritage'.[৮৭] পরিবর্ত ভূমি ও অরণ্য ব্যবস্থার ফলে বিনষ্ট হল সাঁওতাল গ্রাম সমাজের পূর্বতন সুসঙ্গতি। সাঁওতাল ভূমি বন্দোবস্তে মাঝির প্রভাব ধ্বংস হওয়ায় এই গোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিকাঠামো সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে। তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তাদের মূল সত্তা থেকে। উপরোক্ত বিষয়গুলির আলোচনার মাধ্যমে বোঝা যাচ্ছে সাঁওতালদের অর্থনৈতিক কাঠামোর সঙ্গে সমাজ ও সংস্কৃতি কতটা জড়িত। সুতরাং সাঁওতাল পরগণার সাঁওতালদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ক্ষেত্রে এই অধ্যায়ের আলোচনা বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক।

তথ্যসূত্র :

১. Hunter, W.W., *The Annals of Rural Bengal*, Smith Elder and Co., London, 1868, p.382.

২. Banerjee, Prathama, ‘Writing the Adivasi : Some Historiographical notes’, *The Indian Economic and Social History Review*, 53(1), 2016, p.131-153.

৩. Cohn, Bernard, *An Anthroplogist Among The Historians and Other Essays*, Oxford University Press, New York, 1998, p.53.

৪. Quoted in O’Malley, L.S.S., Bengal *District Gazeteers: Santal Parganas*, The Bengal Secretariat Book Department, First Published in 1910, Reprint 1984, Calcutta, p.109.

৫. *Quoted in Man In India*, 1943, Vol – XXIII, No -1, p.1.

৬. *Quoted in Man In India*, Vol – XXV, 1945, No – 4, p.219.

৭ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ‘দুই বিঘা জমি’, *চিত্রা*, বিশ্বভারতী, প্রথম প্রকাশ, ১৮৯৫, পৃ. ৭৬।

৮. Buchanan, Francis, *An Account Of The District Of Bhagalpur in 1810*, Vol – II, Published on behalf of the Bihar and Orissa Research Society, Patna, 1939, p.264.

৯. Mcpherson, H., *Final Report on the Survey and Settlement Operations in the District of Santal Parganas*, 1898 – 1907, Bengal Secretariat Book Department, Calcutta, 1909, p.35.

১০. Hunter, W.W., *Statical Account of Bengal*, Vol – III, Trubner and Co., London, 1876, Reprint by DK Publishing House, Delhi, 1973, p.19.

১১. *Bhagalpur Commissioner's Records : Damin-I-Koh Correspondances*, Vol – 108, 1827-1852, Collected in Bihar State Archive, Patna.

১২. Sherwill, Captain, Revenue Surveyer, 'Notes Upon a Tour Through The Rajmahal Hills', *Journal Of The Asiatic Society of Bengal,* 20, 1-7, 1851, p.544.

১৩. Ibid, p.547.

১৪. *Pontet's Journal,* 20th May, 1847, Dumka Record Office.

১৫. Man, E.G., *Sonthalia and The Sonthals*, Geo. Whyman And Co., Calcutta, 1867, p.117.

১৬. *Letter Copy Book, Dumka, Letter From A.Eden, Deputy Commissioner Of Bhagalpur to Stainforth*, Commissioner of Santal Parganas, Dated. 6 January 1856.

১৭. McAlpin, M.C., *Report On the Condition Of The Santhals Of Birbhum, Bankura, Midnapore and North Balasore*, First Published in 1909, Bengal Secretariat Press, Reprint by Firma K.L.M Private Limited, Calcutta, 1981, p.52.

১৮. Roy Choudhury, P.C., *Bihar District Gezeteers : Santal Parganas*, Superintendent Secretariat Press, Bihar, Patna, 1965, p.85.

১৯. Dhanagare, D.N., *Peasant Movements in India 1920-1950,* Oxford University Press, New York, 1983, p.157.

২০. *Letter Copy Book*, Dumka Record Office, 1888, No-72.

২১. Hugh Tinkar, *South Asia a Short History*, University of Hawaii Press, Honolulu, 1990, p.14.

২২. Roy Choudhury, P.C., *Bihar District Gezeteers : Santal Parganas*, Superintendent Secretariat Press, Bihar, Patna, 1965, p.160.

২৩. Ibid, p.388.

২৪. Ibid, p.387.

২৫. Ibid, p.213.

২৬. Prasad, Ranchor, *District Census Handbook : Santal Parganas* 1951, Printed by the Superintended Government of Bihar, Patna, 1956, p.160.

২৭. Roy Choudhury, P.C., *Bihar District Gezeteers : Santal Parganas*, Superintendent Secretariat Press, Bihar, Patna, 1965, p.226.

২৮. Ibid, p.332.

২৯. Mathur, Ashok, *An OverView of The Jharkhand Economy and Perspective For Human Development* (Ranchi, Background paper read at the National Seminar on Growth and Human Development Jharkhand : Perspectives and Policies, 4-5 july, 2008)

৩০. Elwin, Verrier., *A Philosophy for NEFA*, Oxford, Delhi, 1957, Second Edition 2008, p.126.

৩১. *Constituent Assembly debates, Constituent Assembly of India : Vol – VII*, Part – IX (4 November, 1948)

৩২. Ibid.

৩৩. Nehru, Jawharlal, *The Tribal Folk (Speech Delivered at the Opening Session of the Scheduled Tribes and Scheduled Areas Conference, New Delhi, June, 1952) The Adibasis,* The Publications Divisions Ministry of Information and Broad Casting, Government of India, 1960, p.16.

৩৪. *Constituent Assembly debates, Constituent Assembly of India : Vol – VII*, Part – IX (4 November, 1948)

৩৫. Ambedkar, B.R., ‘Communal Deadlock and a Way to Solve It’, In Vasant Moon (ed.), *Dr. Babasaheb Ambedkar Writings and Speeches*, Vol – I, Frist Edition by Education Department, Government of Maharastra, 1979, Reprint 2014, p.355-89.

৩৬. Natarajan, Meenakshi, ‘Tribal Heritage and People’s Rights’, in Abhay Flavian Xaxa and G.N. Devy (eds.), *Being Adivasi : Existence, Entitlements, Exclusion*, Penguin Random House India, Haryana, 2021, p.39.

৩৭. Elwin, Verrier., *A Philosophy for NEFA*, Oxford, Delhi, 1957, Second Edition 2008, p.1-5.

৩৮. *Report of the Scheduled Areas and Scheduled Tribes Commission, 1960-61*, Vol – I-II(ed), Verrier Elwin in A New Deal For Tribal India, Ministry of Home Affairs, New Delhi, 1961, p.135-36.

৩৯. *সাক্ষাৎকার, রূপলাল মুর্মু, সিমলাডাঙ্গাল, জামতাড়া, ঝাড়খণ্ড,* তারিখ – ১০.০১. ২০২১

৪০. *Memorandum for The Formation of Jharkhand State*, Jharkhand Mukti Morcha, Ranchi, 1989.

৪১. De Haan, Arjan, ‘Migration in Eastern India : A Segmented Labour Market’, *The Indian Economic and Social History Review*, 32, 1(1995) p.58.

৪২. *Report of The Enquiry Commission of Labour In The Coal Mine Industry*, Despande Report, Delhi, 1946, p.21.

৪৩. *Compiled From Seth (1940), DGMS and ECL Reports*, in Nayana Banerjee, Unpublished Ph.D Thesis, Visva-Bharati, 1995, p.43.

৪৪. *Report of The Committee on Rehabilitation of Displaced Tribals Due to Development projects*, Ministry of Home Affairs, New Delhi, 1985.

৪৫. Sengupta, Nirmal, *Fourth World Dynamics : Jharkhand*, Authors Guild Publication, Delhi, 1982, p.255.

৪৬. বাগচি, যতীন, *বিংশ শতাব্দীর প্রতিবাদী ভাবনা*, ভারতীয় দলিত সাহিত্য একাডেমি, কলকাতা, পৃ. ২৩।

৪৭. মণ্ডল, অমলকুমার, *ভারতীয় আদিবাসী : সমাজ-সংস্কৃতি-সমস্যা-সংগ্রাম-সংকল্প*, দেশ প্রকাশন, কলকাতা, ২০১৭, পৃ. ২৭।

৪৮. *Census of India, 1951, Vol – V*, Bihar Part – 1, pp.41-42.

৪৯. Roy Choudhury, P.C., *Bihar District Gezeteers : Santal Parganas*, Superintendent Secretariat Press, Bihar, Patna, 1965, p.144.

৫০. Prasad, Ranchor, *District Census Handbook : Santal Parganas* 1951, Printed by The Superintended Government of Bihar, Patna, 1956, p.98

৫১. Roy Choudhury, P.C., *Bihar District Gezeteers : Santal Parganas*, Superintendent Secretariat Press, Bihar, Patna, 1965, p.150.

৫২. Mehta, Prakash Chandra, *Ethnographic Atlas of Indian Tribes*, Discovery Publishing House, New Dehli, 2004, p.18.

৫৩. হেমব্রম, রতন, *সাঁওতালি লোকগীতি মে সাহিত্য আর সংস্কৃতি*, ঝাড়খন্ড হড়কা, রাঁচি, পৃ. ১৬।

৫৪. Tripathi, Prakash, *Tribes and Forest : A Critical Appraisal of The Tribal Forest Right In India*, www.thininternationaljournal.org > RJSSM, Vol – VI, No – 06, Oct, 2016.

৫৫. Guha, Ramachandra, *Environmentalism : A Global History*, Penguin Random House India, New Delhi, 2016, p.167.

৫৬. Stebbing, E.P., *The Forests of India, Vol – I*, John Lane the Bodley Head Limited, London, 1921, P.532, See Also, B. Ribbentrop,

Forestary in British India, The Superintendent of Government Printing, Calcutta, 1900, p.126.

৫৭. Vandana Shiva, *Staying Alive : Women, Ecology and Development,* Zed Books, New Delhi, 1989, pp.54-59.

৫৮. Guha, Ramachandra, *The Unquiet Woods : Ecological change and peasant Resistance in The Western Himalaya*, University of California Press, London, 1989, p.55.

৫৯. Richard, Grove, *Green Imperialism : Colonial Expansion, Tropical Islands Edens and The origins of Environmentalism, 1600-1860,* Cambridge University Press, New York, 1995, p.17.

৬০. Guha, Sumit, *Environment and Ethnicity In India, 1200-1991*, Cambridge University Press, New York, 1991, p.25.

৬১. Choudhury, B., 'Forest and Tribals : A History Review of Forest Policy', In Chittaranjan Kumar Paty, (ed.), *Forest Government and Tribe*, Concept Publishing Company, New Delhi, 2007, pp.1-17.

৬২. Sharma, Ruchi, *Forest and The Tribals in Jharkhand : Post Independent Seenario*, Progs : Indian History Congrss, Vol – 66, 2005, pp.468-77.

৬৩. Marine Carrin, 'Santal Autonomyas a Social Ecology', in Marine Carrin and Harald Tambs-Lyche(eds.*), People of Jungle : Reformuilating Indentities and Adaptations in Crissis*, Monohar, Delhi, 2008, p.154.

৬৪. হেমব্রম, মন্ডল, *আদিবাসী জগৎ প্রবন্ধ সমগ্র,* আদিবাসী সাহিত্য প্রকাশনী, হাওড়া, ২০১৭, পৃ. ১৮১।

৬৫. Hunter, W.W., *The Annals of Rural Bengal*, Smith, Elder, and Co., London, 1868, p.65.

৬৬. বাস্কে, ধীরেন্দ্রনাথ, *সাঁওতাল গণসংগ্রামের ইতিহাস*, বাস্কে পাবলিকেশন, প্রথম প্রকাশ ১৯৭৬, অষ্টম প্রকাশ ২০১৩, পৃ. ১৯৬।

৬৭. Crispin Bates and Marina Carter, 'Tribal Migration in India and Beyond', in Gyan prakash(ed.), *The World of The Rural Labourer in Colonial India*, Oxford University Press, Dehli, 1992, pp.210-12.

৬৮. Roy Choudhury, P.C., *Bihar District Gezeteers : Santal Parganas*, Superintendent Secretariat Press Bihar, Patna, 1965, p.227.

৬৯. Ibid, p.240.

৭০. Duyker, Edward, Tribal Guerillas: Santals of West Bengal and the Naxalite Movement, Oxford University Press, Delhi, 1987, p.73.

৭১. বাস্কে, ধীরেন্দ্রনাথ, *সাঁওতাল গণসংগ্রামের ইতিহাস*, বাস্কে পাবলিকেশন, প্রথম প্রকাশ ১৯৭৬, অষ্টম প্রকাশ, ২০১৩, পৃ. ৮৬।

৭২. Hunter, W.W., *The Annals of Rural Bengal*, Smith, Elder, and Co., London, 1868, p.482.

৭৩. গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ, 'বীতংস', *নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প*, জগদীশ ভট্টাচার্য(সম্পাদিত), প্রকাশ ভবন, কলকাতা, পৃ. ২৯।

৭৪. Roy Choudhury, P.C., *Bihar District Gezeteers : Santal Parganas*, Superintendent Secretariat Press Bihar, Patna, 1965, pp.150-55.

৭৫. Mahato, Nirmal Kumar, *Sorrow songs of woods : Adivasi-Nature Relationaship in the Anthropoccne in Manbhum*, Primus Books, Delhi, 2020, p.154.

৭৬. Archer, W.G., *The Hill of Flutes : Life, Love, Poetry in Tribal India*, George Allen and Unwin, London, 1974, p.212.

৭৭. Desmanjhi, Chotrae, *Desmanjhi Reak Katha* : A Settlement of Chotrae Desmajhi about the Santal Rebellion of 1855 and the Migration of the Santals to Assam as collies in the Tea Gardens, Published by the Santal Mission of the Northern Churches, Benagoria, Santal Parganas,1856, (বাংলা আনুবাদ), ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে,

সাঁওতাল গণসংগ্রামের ইতিহাস, বাস্কে পাবলিকেশন, প্রথম প্রকাশ ১৯৭৬, অষ্টম প্রকাশ ২০১৩, পৃ. ১৮৬।

৭৮. Roy Choudhury, P.C., *Bihar District Gezeteers : Santal Parganas*, Superintendent Secretariat Press Bihar, Patna, 1965 , pp.170-75.

৭৯. Gamaliel, Gopal, *Hor Soren (Santal song), Part – 1 & 2,* The Santal Mission Press, Benagoria, 1943, p.243.

৮০. Roy Choudhury, P.C., *Bihar District Gezeteers : Santal Parganas*, Superintendent Secretariat Press Bihar, Patna, 1965 , p.151.

৮১. Elwin, Verrier, 'Tribals in India', In Ramachandra Guha(ed.), *Savaging the Civilished*, Peenguin Random House India, New Delhi, p.127.

৮২. Prakash, Louis, '*Marginalisation of Tribals'*, Economic Political Weekly, No – 18-21-200, Vol-XXV, No-47.

৮৩. *Public Transport Report Of Bihar District*, 1951, Collated in Jharkhand State Archives, Ranchi.

৮৪. Hansda, Sowvendra Sekhar, *The Adibasi will Not dance : Stories*, Speaking Tiger Books, New Delhi, 2017. pp.174-175.

৮৫. Sen, Suchibrata, 'Popular Culture : Its Meaning and Reflection', Rural and Urban, in Dr. Prabal Kumar Sinha(ed.), *Thoughts On Liberal Art and Popular Culture,* Ashadeep Publication, Kolkata, 2016, p.9.

৮৬. সেন, শুচিব্রত, *পূর্ব ভারতের আদিবাসী অস্তিত্বের সংকট,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০২, পৃ. ১৫।

৮৭. Archer, W.G., *Tribal Law Justice : A Report On The Santal*, Concept Publishing Company Pvt. Ltd, Reprint 2014, New Delhi, p.283.

চতুর্থ অধ্যায়

স্বাধীনতা পরবর্তী উন্নয়ন ও সাংবিধানিক রীতিনীতি: ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের প্রেক্ষাপট

চতুর্থ অধ্যায়

স্বাধীনতা পরবর্তী উন্নয়ন ও সাংবিধানিক রীতিনীতি : ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের প্রেক্ষাপট

স্বাধীনোত্তর ভারতে আদিবাসী সমস্যা এক অন্যতম জটিল সমস্যায় রূপায়িত হয়। মূল বিষয়টি ছিল আদিবাসীদের স্বাতন্ত্র্য ও সংস্কৃতি অক্ষুণ্ণ রেখে তাদের মূল ধারার সঙ্গে সংযুক্ত করা। ঔপনিবেশিক পর্বে আদিবাসীদের বিচ্ছিন্ন রাখার যে প্রচেষ্টা ছিল সেটি প্রধানত রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত। স্বাধীন ভারতের সংবিধান ও বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে আদিবাসীদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সুরাহার কথা ভাবা হয়েছিল। সাঁওতাল পরগণার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনজাতি ছিল সাঁওতালরা, ফলত এই প্রচেষ্টার ফলাফল কী হয়েছিল সেটি গভীরভাবে আলোচনা ও বিশ্লেষণের বিষয়। আবার এই প্রেক্ষাপটে দেখতে হবে ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধির ঐতিহাসিকতাকে। এই তিনটি বিষয় অর্থাৎ সংবিধান, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও ঝাড়খণ্ড আন্দোলন পরস্পর সম্পৃক্ত। স্বাধীন ভারতের আদিবাসীদের স্থান কোথায়, তা নির্ণয়ে তৎকালীন বিতর্কগুলিও যথেষ্ট অনুধাবন যোগ্য। এই অধ্যায়ে সার্বিক পর্যালোচনার মাধ্যমে এই বিষয়গুলি উপস্থাপিত করা হয়েছে।

সাঁওতাল পরগণার আদিবাসীরা নতুন সাংবিধানিক সংস্করণ ও উন্নয়নমূলক প্রকল্পের ফলাফল হিসাবে যা অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল তা কোনো ভিন্ন বা বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিল না। এটাকে অবশ্যই আদিবাসী আইন প্রণালীর সঙ্গে জড়িত মতবিরোধ ও তার সম্ভাব্য পরিণতির সঙ্গে যুক্ত করা উচিত। বস্তুত আদিবাসী সম্পর্কিত মতবিরোধের সূত্রপাত ঘটে ঔপনিবেশিক সময়কাল থেকেই। একদিকে ঔপনিবেশিক সরকার ভারতীয় আদিবাসীদের 'ট্রাইব' নাম দিয়ে যেমন অন্যান্য সম্প্রদায় থেকে পৃথক করার চেষ্টা করে তেমনি অন্যদিকে ব্রিটিশ আইন-নীতি আদিবাসীদের রক্ষাকবচ হিসাবে কাজ করেছিল, যার উদ্দেশ্য ছিল কংগ্রেসী রীতিনীতির মূলস্রোত থেকে আদিবাসীদের বিরত রাখা। আর এই জন্য ব্রিটিশ সরকার আদিবাসীদের জন্য ১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইনের মাধ্যমে বহির্ভূত অঞ্চল (Excluded Area) সৃষ্টি করে। তবে এর চার বছর

আগে অর্থাৎ ১৯৩১ সালে জে.এইচ. হাটন (J.H. Hutton) ছিলেন এই স্বতন্ত্রকরণ নীতির প্রবর্তক। তিনি এক সুরক্ষিত ও বিশেষ অঞ্চল চেয়েছিলেন, যেখানে আদিবাসীদের বিশেষ করে তাদের আদর্শ ও সংস্কৃতিকে সংরক্ষণ করা যায়। ১৯৩১ সালের সেনসাস রিপোর্টে তিনি এই বিষয়ে উল্লেখ করেন যে, 'The solution of problem would appear to be to create Self-Governing tribal areas with free power of self-determination in regard to surrounding or adjacent provincial units.'[১] অন্যদিকে ভেরিয়ার এলুইন যিনি একজন বিখ্যাত জনজাতি পর্যবেক্ষক ও নৃতত্ত্ববিদ তিনিও একই মত প্রকাশ করেন। মধ্যপ্রদেশে দীর্ঘ সময় ধরে তিনি জনজাতিদের জন্য বহু জনহিতকর কাজ করেছিলেন এবং গোণ্ড জনজাতির এক মহিলাকে বিয়েও করেন। শুধু তাই নয়, দীর্ঘ দশ বছর তিনি গোণ্ড সমাজে বসবাস করে তাদের জীবনচর্চা ও সমাজধারাকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তবে শুধু গোণ্ড সমাজ নয়, সামগ্রিকভাবে ভারতীয় আদিবাসী সমাজকে নিয়েই গবেষণা করেছিলেন। ভারতের আদিবাসীদের সম্পর্কে তিনি কতকগুলি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রচনা করেন : *The Tribal world of Verrier Elwin, A Philosophy for NEFA, The Aboriginals, Issues in Tribal Policy Making, For The Tribal way, The Tribal Pople of India, A New Deal for Tribal India, The Baiga* প্রভৃতি, আর এই গ্রন্থগুলি ভারতীয় আদিবাসী বিষয়ক অনবদ্য রচনা। ড. এলুইন তাঁর রচিত গ্রন্থগুলির মাধ্যমে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে, সভ্যতার সংস্পর্শ (Culture-Contact) আদিবাসী জীবনধারাকে বিনষ্ট করেছে। এ সম্পর্কে তিনি তাঁর *The Aboriginals* গ্রন্থের উনিশ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, যেসব আদিবাসীরা সভ্যতার দূষিত সংস্পর্শে আসেনি তারা নিরীহ ও সুখী মানুষ এবং তারা স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দ জীবন-যাপনের মাধ্যমে সারা বছর উৎসবে ও নৃত্যে মাতোয়ারা। সেই সঙ্গে আদিবাসী ছেলে-মেয়েরা অলংকারে সুসজ্জিত হয়ে চুলে ফুল গুঁজে দল বেঁধে নাচে আর প্রবীণেরা দেবতার তুষ্টি বিধান করে। অন্যদিকে যেসব আদিবাসীরা সভ্যতার সংস্পর্শে লালিত তাদের জীবন সম্বন্ধে এসেছে একটা উদাসীনতা, দেখা দিয়েছে আত্মমর্যাদাবোধের অভাব। অন্য সংস্কৃতির মধ্যে বেড়ে ওঠা আদিবাসীদের এই মনোবলকে তিনি 'স্নায়বিক হানি' (Loss of Nerve) বলে অভিহিত করেছেন। উন্নত বিজাতীয় সংস্কৃতির সংঘাতে পড়ে গোষ্ঠীগত সংস্কৃতি ক্ষুণ্ণ হওয়ায় তাদের জীবন যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং তার ফলেই

মনের এই শোচনীয় রূপান্তর ঘটেছে, যার প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে তাদের স্বতন্ত্র সমাজ-সংস্কৃতিতে। আদিবাসীদের নিয়ে তাঁর নৃতাত্ত্বিক গবেষণাকে তিনি 'Philanthropology' বলে উল্লেখ করেছেন।[২] আদিবাসী বিষয়ক তাঁর এই গবেষণা পরবর্তীতে নেহেরুর আদিবাসী ভাবনাকে প্রভাবিত করেছিল। উত্তর-পূর্ব ভারতে আদিবাসীদের উন্নয়ন প্রশ্নে ড. এলুইন প্রধানমন্ত্রী নেহেরুর Consultant for Tribal Affairs হিসাবে কাজ করেছিলেন এবং Adviser for Tribal Affairs হয়েছিলেন। পরবর্তীতে আবার নেহেরু সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক নিযুক্ত কমিটির চেয়ারপার্সনও হয়েছিলেন। রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত The Report of The Scheduled Areas and Scheduled Tribes Commission (1960-61) এর মুখ্য রূপকার ছিলেন ড. এলুইন। আদিবাসীদের উন্নয়নের ক্ষেত্রে ভেরিয়ার এলুইন স্বতন্ত্রকরণের নীতিতে প্রত্যয়শীল ছিলেন। আর এজন্য আদিবাসীদের স্বাভাবিক চিরাচরিত জীবনযাত্রাকে অব্যাহত রেখে স্বাভাবিক অগ্রগতি আনার জন্য স্বতন্ত্র উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার কথা বলেছিলেন। সেই উপনিবেশে আদিবাসীরা তাদের সাবেকি জীবনধারাগত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গেই জীবন-যাপন করবে বলে মনে করেন। কারণ সেখানে আবগারি আইন, জঙ্গল আইন, ভূমি আইন বলে কিছু থাকবে না এবং বাইরের কোনো সংস্কৃতি প্রবেশাধিকার পাবে না। অন্য গোষ্ঠীর মানুষের সংস্পর্শ থেকে আদিবাসীদের যতটা দূরে রাখা যায় ততই মঙ্গল বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। তাঁর এই চিন্তা ধারা 'ন্যাশনাল পার্ক থিওরি' নামে পরিচিত। ১৯৩৯ সালে ভারত সরকারের কাছে এই পার্ক বা আদিবাসী উপনিবেশ স্থাপনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। আদিবাসী জীবনধারার উপর যাতে বাইরের কোন আঘাত না আসে, তারা যাতে নিজস্ব অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বন্ধনে নিজেদের জীবনকে উপলব্ধি করতে পারে তার জন্য তিনি ১৯৪৬ সালে স্বতন্ত্রকরণ নীতিকে সমর্থনও জানিয়ে ছিলেন।[৩]

বাস্তবিকভাবে সমগ্র বিশ্বজুড়ে জনজাতি সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রার ধরণ সম্পর্কে অনেক মতবিরোধ আছে। স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতীয় সমাজে জনজাতিদের কোন স্থান দেওয়া হবে তা নিয়ে প্রধান দুটি দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করে। একটি দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী, জনজাতিদের স্বাধীনভাবে বাঁচার অধিকার দিতে হবে এবং তাদের নিজের এলাকার উপর আলাদাভাবে কর্তৃত্ব বা সার্বভৌমত্ব বজায় রাখতে হবে এবং সেখানে কোনো

বহিরাগত তাদের জীবনযাত্রার ধারায় হস্তক্ষেপ করার অধিকার থাকবে না। অন্য দৃষ্টিভঙ্গিটি হল, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভারতীয় সমাজের পারিপার্শ্বিকতায় জনজাতিদের পুরোপুরি অঙ্গীভূত করতে হবে। আর তা করতে গিয়ে যদি জনজাতীয় জীবনধারা বিলুপ্ত হয়ে যায় তবে দুঃখের কিছু নেই; বরং তাকে স্বাগত জানাতে হবে, কেননা সেটাও তাদের 'উন্নতির' লক্ষণ।[৪] ১৯৫২ সালের গণপরিষদে আদিবাসী বিষয়ক আলোচনায় এই বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। কারণ এই বিষয়গুলির পর্যালোচনার মাধ্যমেই পরবর্তীতে আদিবাসী বিষয়ক নীতি নির্ধারণ করা হয়। ভেরিয়ার এলুইন প্রথম ধারায় বিশ্বাসী ছিলেন এবং এ প্রসঙ্গে তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, 'Integration was not possible without political and spiritual equality'.[৫] অন্যদিকে বিপরীত মতামত প্রকাশ করেন অমৃত লাল বিঠল দাস, যিনি বিশেষ ভাবে 'ঠক্কর বাপ্পা' (Thakkar Bappa) নামে পরিচিত ছিলেন। গোপালকৃষ্ণ গোখলের মতাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি পঁয়ত্রিশ বছর ধরে আদিবাসীদের জন্য কাজ করেন এবং তাদের ঐক্যবদ্ধভাবে জাতীয় স্তরের উন্নয়নে কাজে লাগানোর পন্থা অনুসরণ করেন। জনজাতিদের বনভূমি সম্পর্কিত সত্যাগ্রহ (কংগ্রেস সমর্থিত) তাঁর প্রচেষ্টার এক উজ্জ্বল উদাহরণ। গান্ধী এলুইনকে 'ঠক্কর বাপ্পা'-এর সঙ্গে কাজ করার পরামর্শ দিলে তিনি তা গ্রহণ করেননি, বরং কংগ্রেস থেকে সবরকম যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে গোণ্ড গ্রামে গিয়ে নিজের ইচ্ছায় সমাজসেবা শুরু করেন। তবে স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু দুটি মতামতকেই খারিজ করেন এবং তিনি বলেন, প্রথম দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী জনজাতীয় মানুষেরা যেন সংগ্রহশালায় সাজিয়ে রাখা নমুনা, যাকে পর্যবেক্ষণ করা যাবে, যাকে নিয়ে লেখালেখি করা যাবে। জনজাতিদের পক্ষে এটা অপমানসূচক, সুতরাং জনজাতীয় মানুষদের বহির্জগৎ থেকে আলাদা করে নিজেদের মতো থাকতে দেওয়া যায় না। আজকের দিনে তো এইভাবে আলাদা ভাবে সরিয়ে রাখা একেবারেই অসম্ভব, কেননা বহির্জগৎ ইতিমধ্যেই গভীরে তলিয়ে গেছে। কাজেই তাদের আলাদা করে সরিয়ে রাখা সম্ভবও নয়, কাম্যও নয়। আর দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী, ভারতের মানুষের বিশাল মহাসমুদ্রে তাদের বিলীন করে দেওয়া, অর্থাৎ কিনা বহির্জগতের স্বাভাবিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার অভিঘাতে তাদের সামিল করা। নেহেরুর মতে এটিও ভুল দৃষ্টিভঙ্গি। এর ফলে জনজাতিদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয় নষ্ট হয়ে যাবে।

আসলে তিনি মনে করতেন যে, স্বাভাবিক প্রক্রিয়াগুলোকে যদি এখানে চলতে দেওয়া হয় তাহলে বহির্জগতের মানুষেরা এসে জনজাতীয় জল, জঙ্গল ও জমি অধিকার করে তাদের জীবনকে ব্যাহত করবে। এর ফলে তাদের সমগ্র জীবনধারা ও সংস্কৃতি, যার মধ্যে তাদের নিজস্ব যে স্বাতন্ত্রতা রয়েছে তা বিলীন হয়ে যাবে।[৬] সুতরাং আদিবাসী সমাজের ঐতিহ্যবাহী মূল্যবোধকে অক্ষত রেখেই তিনি তাদের সমাজকে আধুনিক ও সংহত করতে চেয়েছিলেন। তিনি মূলত বহুত্ববাদী ভারতীয় সমাজের সঙ্গে আদিবাসী গোষ্ঠী সত্তার সমন্বয় ঘটাতে চেয়েছিলেন।

অনগ্রসর অবস্থা থেকে আদিবাসীদের তুলে আনার ক্ষেত্রে নেহেরু তাদের বিশেষ পদ্ধতিতে এবং তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য অনুসারে গণতান্ত্রিকভাবে উন্নতি সুনিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন। আদিবাসীদের কল্যাণ বিষয়ে শোষণবিহীন অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং নিরাপত্তার প্রশ্নে তিনি ছিলেন উদারমনস্ক। “But while Nehru was anxious to pull the tribal people up from their state of backwardness, he wanted to ensure that they should develop in ‘their own special way’ and ‘democratically accordingly to their own culture and tradition’. Nehru was so deeply interested in the welfare of the tribal people that he did not wish in any way to impose upon them the same type of growth which may be adopted by the rest of India”.[৭] ১৯৫২ সালে নতুন দিল্লিতে অনুষ্ঠিত ‘Scheduled Tribes and Scheduled Areas’ কনফারেন্সের প্রারম্ভিক অধিবেশনে ‘The Tribal Folk’ শীর্ষক বিষয়ে বক্তৃতায় আদিবাসীদের অত্যন্ত সুশৃঙ্খল মানুষ এবং ভারতের অন্যান্য সম্প্রদায়ের তুলনায় অনেক বেশি গণতান্ত্রিক বলে মত প্রকাশ করেন। সেই সঙ্গে ভারতীয় আদিবাসী বিষয়ক উপলব্ধি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, দারিদ্র্য ও বঞ্চনার মধ্যেও তাদের মধ্যে রয়েছে প্রাণময়তা, রয়েছে মূল্যবোধ ও ব্যক্তিত্ববোধের স্বতন্ত্রধারা, যা ভারতীয় সভ্যতার নিষ্কলুষ ঐতিহ্য।[৮] তাই তিনি আদিবাসীদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও ভাষার সংরক্ষণকে উৎসাহিত করা উচিত বলে মনে করেছিলেন। কিন্তু গণপরিষদে জনজাতিদের একমাত্র প্রতিনিধি জয়পাল সিং মুন্ডা যখন বহু বছর ধরে চলা জনজাতিদের উপর অকথ্য অত্যাচার ও সামাজিক অবিচারের কাহিনিকে তুলে ধরেন তখন নেহেরু তাঁকে বলেন যে, তাদের ওপর বিচার, অধিকারবোধ ও সাম্য সমানভাবে বর্তমান যেভাবে গণপরিষদে অন্যান্য সদস্যদের ওপর

বিচারব্যবস্থা ও দৃষ্টিভঙ্গি বিরাজ করে। তবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার ব্যাখ্যা একটি মাত্র শব্দে প্রকাশিত। যখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয় জনজাতিদের প্রতি কেমন বিচারের দৃষ্টিভঙ্গি রাখা যায়, তখন তিনি মানবতার (Humanity) কথা বলেন।[৯] আবার অন্যদিকে বৃহত্তর ভারতীয় জনসমাজের সঙ্গে আদিবাসী সমাজ সংস্কৃতির একাত্মতায় বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন যে, 'আমি শঙ্কিত হই যখন আমি শুধু এই দেশেই নয়, অন্যান্য মহান দেশেও দেখি মানুষ কতটা উদ্বিগ্ন অন্যদেরকে তাদের নিজস্ব প্রতিমূর্তি বা উপমা অনুযায়ী গঠন করতে এবং তাদের ওপর নিজেদের বিশেষ জীবনযাপনের পদ্ধতি চাপিয়ে দিতে'।[১০] এমন মননশীলতার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি আদিবাসী কল্যাণে পাঁচটি মৌলিক নীতি নির্ধারণ করেন ১৯৫৮ সালের ৯ই অক্টোবর, যা 'পঞ্চশীল' নামে পরিচিত। কিছুটা পরিমার্জিত করে হলেও নেহেরু শেষ পর্যন্ত এলুইনের মতাদর্শকেই গ্রহণ করেছিলেন। আদিবাসী ও তাদের উন্নয়ন বিষয়ে সুনির্দিষ্ট ধারণা তৈরি করতে নেহেরু যে এলুইনের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন তা তিনি নিজেই স্বীকার করে বলেন, "My ideas were not clear at all, but I felt that we should avoid two extreme courses: one was to treat them as anthropological specimens for study and the other was to allow them to be engulfed by the masses of Indian humanity. These reactions were instinctive and not based on any knowledge or experience. Later, in considering various aspects of these problems and in discussing them with those who knew much more than I did, and more specially with Verrier Elwin, more definite ideas took shape in my mind".[১১] পঞ্চশীলের ভাবনাগুলি পরবর্তীতে জনজাতিদের অবস্থান নির্ণয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে, তাই পঞ্চশীলের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি পর্যালোচনা করা প্রয়োজন, যাতে ভারতের জনজাতিদের ওপর ভবিষ্যতের প্রভাবগুলিকে সহজেই বিশ্লেষণ করা যায়। নেহেরুর পঞ্চশীল পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত আদিবাসী উন্নয়নের পাঁচটি বিষয় হল[১২]—

১) জনজাতিরা তাদের নিজস্ব গুণ ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিকাশ লাভ করতে পারে সেই দিকে নজর দিতে হবে। উপর থেকে কোনো কিছু জোর করে তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া যাবে না। প্রত্যেকটি আদিবাসী গোষ্ঠীকে নিজেদের ভাবধারা ও ঐতিহ্য অনুসারে গড়ে উঠবার সুযোগ দিতে হবে। এক্ষেত্রে সরকারকে সাধ্যমত উৎসাহ প্রদান করতে হবে।

২) আদিবাসীদের জঙ্গল ও ভূমির ওপর অবাধ স্বাধীনতা দিতে হবে। বহিরাগত কোনো গোষ্ঠী জমির স্বত্ব নিতে পারবে না। জনজাতি এলাকায় বাজারি অর্থনীতির অনুপ্রবেশ দৃঢ়ভাবে নিয়ন্ত্রণ ও নিয়মাধীন করতে হবে।

৩) জনজাতিদের উন্নতির ক্ষেত্রে তাদের মধ্য থেকেই যোগ্য ব্যক্তি নির্বাচিত করে তাদের যথাযথ শিক্ষা দিয়ে উন্নয়নের কাজে নিযুক্ত করতে হবে। প্রথম অবস্থায় আদিবাসী এলাকায় বাইরে থেকে বিশেষজ্ঞ আনা হতে পারে। তবে স্থানীয় লোকেরা শিক্ষাপ্রাপ্ত হলে বাইরে থেকে বিশেষজ্ঞ আনার নীতি পরিত্যাগ করতে হবে।

৪) জনজাতিদের ওপর প্রশাসনিক জটিলতা সর্বতোভাবে পরিহার করতে হবে। আদিবাসী অঞ্চলের ওপর অতিরিক্ত শাসন ক্ষমতা প্রয়োগ না করে তাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে কাজ করতে হবে।

৫) উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কার্যকারিতা পরিসংখ্যান বা অর্থব্যয়ের পরিমাণ দ্বারা বিচার্য হবে না। আদিবাসীদের জীবনযাত্রার গুণগত উৎকর্ষ হয়েছে কিনা এবং হয়ে থাকলে তা কতটুকু এটাই হবে বিচার্য বিষয়।

বস্তুত নেহেরু পঞ্চশীল নীতির মাধ্যমে আদিবাসীদের সরাসরি আত্তীকরণ না করে তাদের সহজাত সৃজনী ক্ষমতা অনুসারে বেড়ে ওঠার পক্ষে মত দেন। আবার নেহেরুর এই দৃষ্টিভঙ্গির মূল বিদ্যমান ছিল বিশের দশকের পরবর্তী জনজাতি সংক্রান্ত জাতীয়তাবাদী নীতির মধ্যে; মূলত বিশের দশকে গান্ধীজি জনজাতি এলাকাগুলিতে আশ্রম গড়ে গঠনশীল কাজে উৎসাহ দিতেন। আবার স্বাধীনতার পরে ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ ও অন্যান্য বড় বড় রাজনৈতিক নেতা এই নীতিকেই সমর্থন করেন। কিন্তু এই নীতির বাস্তবিক রূপায়ণের ক্ষেত্রে নানান ত্রুটি ধরা পড়ে। অর্থাৎ নীতির পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের মধ্যে একটা বিস্তর ফারাক থেকে যায়, যার অন্যতম কারণ হচ্ছে আমলাতান্ত্রিক ত্রুটি। আদিবাসী অঞ্চলে নিযুক্ত আমলা বা প্রশাসকরা তাদের উন্নয়নের পরিবর্তে বুর্জোয়াদের স্বার্থ চরিতার্থ করেছিল। সেই সঙ্গে আদিবাসী অঞ্চলে সবথেকে বেশি সুবিধা লাভ করে ঠিকাদার, জমিদার ও মহাজনেরা। অন্যদিকে জনজাতিদের দুর্দশার একটি প্রধান কারণ হল সুবিচারের অভাব। অনেক সময়েই

আইন আর আইনি ব্যবস্থার সঙ্গে পরিচিত না থাকায় জনজাতীয় জমি বহিরাগতদের হাতে চলে যাওয়ার বিরুদ্ধে যে আইন আছে তা ক্রমাগত লঙ্ঘিত হয়েছে, ফলে জমি হস্তান্তর ও জনজাতিদের উচ্ছেদ চলেছে সমানে। সেই সঙ্গে বহু এলাকায় খনি আর শিল্পের দ্রুত প্রসার তাদের অবস্থাকে আরও সঙ্গিন করে তুলেছে। দুর্নীতগ্রস্ত কর্মকর্তা, রাজনৈতিক নেতা আর বন-ঠিকাদারদের অশুভ চক্রের প্রকোপে ক্রমাগত জঙ্গল হাসিল হয়েছে। আর সেই অনুপাতেই বন ও বনজ সম্পদের ওপর জনজাতিদের চিরাচরিত অধিকার খর্ব হয়েছে। জমি হারানো, জঙ্গল হাসিল আর অরণ্যের অধিকারে বাধানিষেধের পরিণামে জনজাতিদের মধ্যে আর্থিক সংকট চরম রূপ ধারণ করে। অন্যদিকে জনজাতি সমাজে শ্রেণি বৈষম্য ও শ্রেণি কাঠামো গড়ে উঠেছে। সেই কাঠামোর উপরের স্তরের লোকেরা বহিরাগতদের সঙ্গে প্রায়ই হাত মেলায়। তাছাড়া শিক্ষা, প্রশাসনিক সুবিধা, অর্থনীতি আর রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতার ক্ষেত্রে জনজাতিদের মধ্যে যেটুকু বিকাশ তার বেশিরভাগ সুবিধা ভোগ করে জনজাতি সমাজের এলিটদের ক্ষুদ্র অংশটি। ফলে সাধারণ নিম্নশ্রেণির আদিবাসীরা এই সমস্ত সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত থেকে যায়। আবার এই এলিটশ্রেণির হাত ঘুরেই নিম্নশ্রেণির আদিবাসীদের জমি বহিরাগতদের দখলীকৃত হয়। ভারতের মতো সামন্ততান্ত্রিক সমাজে এবং ঔপনিবেশিক রাজনৈতিক ভিত্তির ওপর ব্রিটিশ পার্লামেন্টারি ডেমোক্র্যাসি প্রতিষ্ঠা করা যে কত দুঃসাধ্য তা সহজেই অনুমেয়। ফলত, জওহরলাল নেহেরু পরিকল্পিত ‘সমাজতন্ত্র’ যে ভারতের মতো দেশে ‘সোস্যালিজম’ হয়ে ওঠেনি তা দৃঢ়ভাবে বলা যায়। কাজেই এই সব নীতির বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ভেরিয়ার এলুইনের করা দৃষ্টিভঙ্গি সময়ের সঙ্গে বেশি কার্যকর ও ফলপ্রসূ বলে দেখা দিল, কারণ এলুইনের করা দৃষ্টিভঙ্গি স্বাধীনোত্তরকালে জনজাতিদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার নিরিখে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। তাঁর করা সেই দৃষ্টিভঙ্গি ১৯৪৩ সালে *The Aboriginals* গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। সেই দৃষ্টিভঙ্গিতে বলা হয় যে, শুধু ভারতবর্ষ কেন সারা পৃথিবীজুড়ে যেভাবে প্রাচীনত্বের বদলে আধুনিক ছোঁয়া ও আধুনিক সভ্যতার কবল থেকে জনজাতিদের সহজাত অভ্যাস, আদব-কায়দা, সংস্কৃতি প্রভৃতির অক্ষুণ্ণতা বাঁচিয়ে রাখা দুষ্কর। কাজেই জনজাতিদের এই সব প্রাচীনত্বকে টিকিয়ে রাখার একমাত্র বিকল্প হল অবক্ষয়। কুড়ি, পঞ্চাশ অথবা শতবছরে কোনো এক মানবগোষ্ঠীর অভ্যুত্থান ঘটবে যারা

যথেষ্ট শিক্ষিত হয়ে তাদের অর্থাৎ জনজাতিদের কোনো ক্ষতিসাধন না করে নিজেদের সঙ্গে একাত্ম করে নেবে, তবে এই ধরনের মানুষ বা জনগোষ্ঠী বর্তমানে অমিল। তাই জনজাতিরা আপাতত নিজেদের বিচ্ছিন্ন রেখে নিজস্ব নিয়ম-নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গিতে সংস্কার আনুক। সেই সঙ্গে তিনি এটাও দাবি করেন জনজাতিদের না বদলে বদলাতে হবে উকিল, ডাক্তার, স্কুলশিক্ষক, প্রশাসক, ব্যাবসায়ীদের। যাদের সঙ্গে জনজাতিদের লেনদেন করতে হবে, মেলামেশা করতে হবে। তাই জনজাতিদের স্বতন্ত্র রাখাটাই শ্রেয়। যদিও পরবর্তীকালে এলুইন ও নেহেরু এই ধরনের নীতি থেকে সরে এসে সমন্বয়করণ নীতিকেই আদিবাসীদের উন্নয়নের সরকারি নীতি হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন।[১৩] তবে এলুইনের করা এই মতাদর্শকে ঘিরে কলকাতা ভিত্তিক বিভিন্ন নৃতত্ত্ববিদ যেমন নির্মল কুমার বসু, ধীরেন্দ্র কুমার মজুমদার প্রমুখের মধ্যে তীব্র মতানৈক্য গড়ে ওঠে। নির্মল কুমার বসু আলোচ্য মতাদর্শকে ‘Curio-hunting’ এবং ‘Unbalanced Romantic concern for Tribals’ বলে উল্লেখ করেন।[১৪] যদিও এলুইনকে ‘রোম্যান্টিক’ বলে আখ্যা দেওয়া হয় তবুও তাঁর করা পর্যবেক্ষণের মধ্যে অবশ্যই কিছু সত্যতা ছিল। ভারত স্বাধীন হওয়ার পরবর্তীকালেও ব্রিটিশ পরম্পরা ও আভিজাত্যকে প্রায় সম্পূর্ণরূপে অনুসরণ করা হয়। ব্রিটিশরাজের তিনটি স্তম্ভ যথা—বুর্জোয়া, সেনাবাহিনী ও পুলিশ তিনটিকেই যথারীতি বজায় রাখা হয়। তাছাড়া বিভিন্ন বৈদেশিক সংস্থার পরিচর্যা ও তার সঙ্গে গান্ধীবাদী আদর্শের সংরক্ষণের অনীহা স্বদেশীয় সংস্কৃতি ও সামাজিক ভাবধারাকে বিভিন্ন ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করেছিল।[১৫] কারণ স্থানীয় ও আঞ্চলিক নিয়মাবলীতে বৈদেশিক চিন্তাধারা ও আগ্রাসী মনোভাবের আনুগত্য বজায় রাখা হয়। তবে সংবিধান রচনার প্রাক্কালে একমাত্র কংগ্রেস নেতা ও উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী (১৯৫৪-১৯৬০) সম্পূর্ণানন্দ (Sampurnanand) এই মতাদর্শের সমালোচনা করে বলেন, ‘Our constitution is a miserable failure. The spirit of Indian Culture has not breathed in it … It is just a piee of legislation, like say, the Motor Vehicle Act’.[১৬]

অন্যদিকে স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতের নীতি নির্ধারকগণ দলিত ও আদিবাসীদের একসূত্রে বেঁধে নানান পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। কিন্তু এটাও বলা প্রয়োজন যে আদিবাসী ও দলিতরা কখনই এক নয়, অনেকাংশে আলাদা। ভারতের সংসদীয়

রাজনীতিতে প্রতিনিধিত্বের দরুন দলিতরা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে নিজেদের কিছুটা প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেও আদিবাসীরা সেই দিক থেকে বঞ্চিত হয়, কারণ ভারতীয় মূলস্রোত রাজনীতির পুরোটাই উচ্চবর্গের দ্বারা পরিচালিত হয়। প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে ১৯৫১-৬৪ সাল পর্যন্ত প্রান্তিক জনগোষ্ঠী বা আদিবাসীদের সংখ্যা খুবই কম থাকায় এবং সমাজের উচ্চশ্রেণির মানুষেরাই প্রধান নিয়ন্ত্রক হওয়ায় তাদের নিজস্ব চিন্তা ভাবনাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। কিন্তু জনজাতিদের মধ্যে স্বায়ত্তশাসন ছিল জোরালো। উড়িষ্যার গণপরিষদের সদস্য যুধিষ্ঠির মিশ্র (Yudhisthir Mishra) জনজাতিদের কাছ থেকে এক স্বারকলিপি পান, যার ভিত্তিতে গণপরিষদে প্রশ্ন উত্থাপন পর্বে তিনি তার উল্লেখ করে বলেন, জনজাতিরা বিশ্বাস করে না গণপরিষদ তাদের প্রতিনিধিত্ব করে এবং তাদের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখার দায়িত্ব নেয়।[১৭] পরবর্তীতে প্রথমা ব্যানার্জী তাঁর 'Writing the Adivasi : Some historiographical notes' প্রবন্ধে একই মতামত পোষণ করে বলেন যে, "আমাদের সংবিধান তপশিলি জাতি এবং তপশিলি জনজাতিকে একই রকম ভাবে চিহ্নিত করেছে, অন্ততপক্ষে জাতীয় রাষ্ট্র হিসাবে তার দায়িত্বের দিক থেকে। উদাহরণ স্বরূপ বহুজন সমাজ দল রাজনৈতিক ভাষ্যে দলিত এবং আদিবাসীদের একই বন্ধনীভুক্ত করেছে। অনুরূপভাবে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ সোস্যাল সায়েন্স তাদের বর্তমান পর্যালোচনায় 'দলিত ও আদিবাসী' শীর্ষক আলোচনায় একই অধ্যায় ব্যয় করেছে। কিন্তু বস্তুতপক্ষে দলিত ও আদিবাসীদের তুলনামূলক আলোচনায় দেখা যাবে যে, গণতন্ত্রের চরিত্র সম্পর্কে ধারণায় এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রভূত পার্থক্য বিদ্যমান। সহজভাবে বলতে গেলে দলিতরা যেখানে প্রতিনিধিত্ব করার ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের পক্ষপাতি, আদিবাসীরা সেখানে স্বায়ত্তশাসনের দাবিদার।"[১৮] যা আমাদের ১৯৫২ সালে গণপরিষদে করা জয়পাল সিং মুন্ডার মন্তব্যকে স্মরণ করিয়ে দেয়। তিনি সেখানে বলেন, 'You can't teach democracy to Tribals. You need to learn democratic values from them…we do not have any right to impose our beliefs and beliefs on them'.[১৯]

স্বাধীনতা উত্তরকালে আদিবাসীদের সমস্যা সমাধানকল্পে ব্যবহারিক প্রক্রিয়া সমূহ যেমন, সম্পত্তি আইন কার্যকর করা, কৃষি উন্নয়ন, অরণ্য সংরক্ষণ আইনের

পরিবর্তন, চিকিৎসার সুযোগ, আদিবাসী অঞ্চলে শিল্পায়ন, যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রভৃতি বিষয়গুলির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ভারত সরকার সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গঠন এবং সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য আদিবাসীসহ দেশের জনগণের সার্বিক উন্নয়নে ১৯৫০ সালের মার্চে গঠিত হয় 'ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিশন'। দেশে জনসাধারণের স্বার্থে উন্নয়নমূলক কর্মসূচি প্রণয়ন ও রূপায়ণই ছিল যার একমাত্র উদ্দেশ্য। এই কমিশন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও তাদের জীবন অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ করে তোলার দিকে সচেষ্ট হয়। কমিশন সফলতা অর্জনের প্রতি আস্থা রেখেই ১৯৫১ সালে জুলাই মাসে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার (১৯৫১-৫৬) খসড়া পেশ করে। সমগ্র দেশের সার্বিক উন্নয়নের কথা ভেবে এই পরিকল্পনার বিষয়গুলি নির্ধারণ করা হয়। তবে আদিবাসীদের ক্ষেত্রে পঞ্চশীলের নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বাস্তবায়নের কথা বলা হয়। আমাদের গবেষণার সময়পর্বে (১৮৫৫-১৯৬৪) তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বিষয়গুলি আলোচনার মূল বিষয়। সাঁওতাল পরগণায় আদিবাসী তথা সাঁওতালদের ক্ষেত্রে এই তিনটি পরিকল্পনার প্রভাব আলোচনার পূর্বে পরিকল্পনায় ঘোষিত সার্বিক বিষয়গুলি সম্পর্কে অবগত হওয়া প্রয়োজন; কারণ তবেই ভারতের মূলস্রোত জনসমাজের সঙ্গে আদিবাসীদের মধ্যে এই পরিকল্পনাগুলির প্রভাব সম্পর্কে তুলনামূলক আলোচনা করা সম্ভব হবে। তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বিষয়গুলি নিম্নরূপ—

১) <u>প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৫১খ্রীঃ-১৯৫৬খ্রীঃ) :</u>

স্বাধীনতা লাভের পর ভারতবর্ষ যে বহুমুখী অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল তা দূর করার উদ্দেশ্যে ১৯৫১ সালে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ঘোষণা করা হয়। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ রয় হ্যারল্ড ও ইভিসি ডোমারের রচিত মডেলকে অনুসরণ করে এই পরিকল্পনার খসড়া প্রস্তুত করা হয়। যেখানে বিনিয়োগে অগ্রাধিকার পায় কৃষি ও কমিউনিটি উন্নয়ন প্রকল্পে শতকরা ১৫ ভাগ, বৃহৎ ও মধ্য সেচ পরিকল্পনায় শতকরা ১৬ ভাগ এবং শক্তি প্রকল্পে শতকরা ১৩ ভাগ বিনিয়োগ করা হয়। যানবাহন ও সমাজসেবামূলক প্রকল্পে বিনিয়োগ যথাক্রমে শতকরা ২৭ ও ২৩ ভাগ। শিল্প ও খনি উন্নয়নে শতকরা ৪ ভাগ এবং আয় বৃদ্ধির লক্ষ্য মাত্রা স্থির করা হয় শতকরা ১২ ভাগ,

কিন্তু তা বেড়ে দাঁড়ায় শতকরা ১৮ ভাগে। কৃষি উৎপাদনের বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল প্রায় ১৭ ভাগ। অন্যদিকে পাবলিক সেক্টরে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বরাদ্দ করা হয় ২৩৫৬ কোটি টাকা। তবে এক্ষেত্রে বেকারের সংখ্যা হ্রাস করা যায়নি, বরং তা বৃদ্ধি পায়। পরিকল্পনার প্রারম্ভে বেকারের সংখ্যা ছিল ৫০ লক্ষ ও নতুন কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৯০ লক্ষ। কিন্তু পরিকল্পনায় মাত্র ৪৫ লক্ষ বেকারের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়। ফলত দেশের সর্বসাধারণের জন্য শিক্ষা-স্বাস্থ্য এবং নিম্নবর্গ ও আদিবাসীদের দারিদ্র দূরীকরণের বিষয়গুলির সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব হয়নি।[২০]

২) দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৫৬খ্রীঃ-১৯৬১খ্রীঃ) :

প্রথম পরিকল্পনার উদ্দেশ্য অব্যাহত রেখেই দ্বিতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য মাত্রা স্থির করা হয়। অধ্যাপক পি.সি. মহলানবীশ মডেল অনুসরণে এই পরিকল্পনা রচিত হয়। তবে এই পরিকল্পনায় প্রথম পরিকল্পনার বিপরীত চিত্র লক্ষ করা যায়। প্রথম পরিকল্পনায় 'কৃষি ও সেচ' প্রাধান্য লাভ করলেও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় গুরুত্ব দেওয়া হয় 'শিল্প ও পরিবহন' বিষয়কে। এই পরিকল্পনায় শিল্পখনিতে বিনিয়োগের পরিমাণ ধার্য করা হয় মোট বিনিয়োগের ২০ শতাংশ। পরিবহন-সংযোগ ও সমাজসেবা প্রকল্পের জন্য ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ যথাক্রমে ২৮ শতাংশ ও ১৮ শতাংশ। অন্যদিকে পাবলিক সেক্টরে ব্যয়ের পরিমাণ ৪৬০০ কোটি টাকা, তবে বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ৪৮০০ কোটি টাকা। অন্যদিকে প্রাইভেট সেক্টরে ব্যয়ের পরিমাণ ২১৫০ কোটি টাকা আর বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ২৪০০ কোটি টাকা। এই পরিকল্পনায় লৌহ আকরিক ও এ্যালুমিনিয়মের উৎপাদন বৃদ্ধির পরিমাণ স্থির করা হয় ৫০ শতাংশ, ইস্পাতের উৎপাদন বৃদ্ধির পরিমাণ ১০০ শতাংশ, ক্ষুদ্র যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে ৫০ শতাংশ ও শক্তি সরবরাহের ক্ষেত্রে ৬৮ শতাংশ। দুর্গাপুর, ভিলাই ও রৌরকেল্লায় একটি করে নতুন ইস্পাত কারখানা স্থাপিত হয়। কৃষির ক্ষেত্রে ১৬ শতাংশ বৃদ্ধি ঘটে আর জাতীয় ক্ষেত্রে আয় বৃদ্ধির লক্ষ্য ৫ শতাংশ স্থির করা হলেও তা ৪ শতাংশে দাঁড়ায়। কিন্তু এই পরিকল্পনার সমাপ্তি লগ্নে বেকারের সংখ্যা দাঁড়ায় ৯০ লক্ষ এবং দ্রব্য মূল্য ১৫ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। ফলে সমাজে সাধারণ-নিম্নবর্গ ও আদিবাসী মানুষের অর্থনৈতিক সংকট অধিকতর ঘনীভূত হয়।[২১]

৩) তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৬১খ্রীঃ-১৯৬৬খ্রীঃ) :

এই পরিকল্পনায় কৃষি ও শিল্পের মধ্যে যাতে ভারসাম্য বজায় থাকে সেদিকে দৃষ্টি রাখা হয়। সেই সঙ্গে শিল্পক্ষেত্রে ভারী শিল্পের প্রসার সাধনে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হয়। এই পরিকল্পনার সম্পদ বন্টনের চিত্রটি নিম্নরূপ[২২]—

ক) কৃষি, সেচ ও শক্তি প্রকল্পে ৩৬ শতাংশ।

খ) গ্রাম ও ক্ষুদ্র শিল্পে ৪ শতাংশ।

গ) খনি ও বৃহৎ শিল্পে ২০ শতাংশ।

ঘ) পরিবহন ও সংযোগ প্রকল্পে ২০ শতাংশ।

সেই সঙ্গে জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার ধরা হয়েছিল বার্ষিক ৫ শতাংশ, কিন্তু সে লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয়নি। বৃদ্ধির হার ৩.৪ শতাংশে দাঁড়ায়। খাদ্যশস্য উৎপাদনের লক্ষ্য ছিল ১০০ মিলিয়ন মেট্রিক টন, কিন্তু ১৯৬৪-৬৫ এবং ১৯৬৫-৬৬ তে খাদ্যশস্য উৎপাদন যথাক্রমে ৮৯ মিলিয়ন মেট্রিক টন ও ৭২.৩ মিলিয়ন মেট্রিক টনে এসে দাঁড়ায়। তবে এই প্রকল্পের ব্যর্থতাও পরিলক্ষিত হয়, বিশেষ করে শিল্পের ক্ষেত্রে। ইস্পাত শিল্পের উৎপাদনের লক্ষ্য মাত্রা ছিল ৯.২ মেট্রিক টন, কিন্তু উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ৬.৫ মেট্রিক টনে। সেই সঙ্গে মূল্যবৃদ্ধি অব্যাহত থাকে।[২৩]

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আদিবাসী এলাকায় কমিউনিটি উন্নয়ন, কৃষি ও স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হলেও দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনায় ভারী শিল্প নির্মাণে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। আর এই ভারী শিল্প ও কলকারখানা স্থাপনে অধিকৃত হয় এক বৃহৎ পরিমাণ আদিবাসী জমি। ফলত, বহু সংখ্যক আদিবাসী পরিবারকে বাস্তুচ্যুত হতে হয়। অন্যদিকে এই বৃহৎ কলকারখানা পরিচালনায় আদিবাসীদের দক্ষতা না থাকায় তারা নিজেদেরকে বিশেষভাবে যুক্ত করতে পারেনি। ফলত, আদিবাসী এলাকায় খনিজ সম্পদ ও ভারী শিল্প থাকা সত্ত্বেও তাদের জীবন-জীবিকার মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রভাব পড়েনি বরং তার উল্টোটাই ঘটে। শুধু তাই নয়, এই শিল্পের কাজে এক বৃহৎ সংখ্যক বহিরাগত দিকুদের প্রবেশ ঘটে

আদিবাসী এলাকায়। যার দরুন আদিবাসী সমাজ-সংস্কৃতি, জনবিন্যাস ও অর্থনৈতিক কাঠামো গভীরভাবে প্রভাবিত হয়। তাদের এলাকায় খনিজ সম্পদ উত্তোলন ও শিল্প স্থাপনের দরুন রাষ্ট্র যে পরিমাণ অর্থ লাভ করে তার সামান্য পরিমাণই আদিবাসীদের মান উন্নয়নে বরাদ্দ করা হয়। যার পরিসংখ্যান নিম্নরূপ[২৪]—

পরিকল্পনার সময়	মোট বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ	আদিবাসীদের উন্নয়ণকল্পে বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ	শতাংশের হিসাবে
প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৫১-৫৬)	২০৬৯.০০	১৩.৯৩	০.০৬
দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৫৬-৬১)	৪৮০০.০০	৪৯.৯২	১.০৮
তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৬১-৬৬)	৭৫০০.০০	৫০.৫৩	০.৬০

আদিবাসী গ্রামীণ সংগঠন মূলত জল, জঙ্গল, জমি (Subsistence Economy) নির্ভর অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। ফলত, সেখানে হঠাৎ করে পুঁজিভিত্তিক অর্থনৈতিক কাঠামো ও শিল্পায়ন তাদের ঐতিহ্যমণ্ডিত অর্থনৈতিক কাঠামোর বুনিয়াদকে ভেঙে ফেলে। আবার তাদের অর্থনৈতিক কাঠামোর সঙ্গে সমাজ-সংস্কৃতি গভীরভাবে সম্পৃক্ত থাকায় অর্থনৈতিক কাঠামোর ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে স্বতন্ত্র সমাজ-সংস্কৃতি গভীর সংকটের মুখে এসে দাঁড়ায়, যা তৃতীয় অধ্যায়ে বিস্তৃত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। সুতরাং পুঁজিভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সার্বিক ক্ষেত্রে উন্নতি ঘটালেও আদিবাসীদের ক্ষেত্রে তার বিপরীত চিত্র লক্ষ করা যায়। কাজেই সার্বিক ক্ষেত্রে উন্নয়ন (Development) বলতে উন্নতির মাপ কাঠি বোঝালেও জনজাতিদের ক্ষেত্রে উন্নয়ন বা Development এর অর্থ, চার D= Displacement, Dispossession, Destitution, Dehumanization অর্থাৎ উন্নয়ন মানে বাস্তুচ্যুতি, জমি হরণ, নিঃস্ব হয়ে ভ্রাম্যমান মজুর, আত্মপরিচয় হারানো।[২৫] সুতরাং শোষণ মূলক অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারা আদিবাসী সমাজ জীবনে যে পরিবর্তন এনেছে, তার ফলে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে আদিবাসী জীবন, বিপর্যস্ত হয়েছে আত্মমর্যাদাবোধ, মূল্যহানী হয়েছে আত্মপরিচয়ের। সেই সঙ্গে তাদের চেতনায় যে পরিবর্তন ঘটেছে তাতে প্রতিবাদ করা তো দুরস্ত বরং নির্বাক হয়ে

পড়েছে। পশুপতি প্রসাদ মাহাতো যাকে ‘Culture of Silence’ বলে উল্লেখ করেছেন।[২৬] কাজেই স্বাধীনতা পরবর্তী উন্নয়ন আদিবাসীদের শুধু অর্থনৈতিক কাঠামোই নয়, সমাজ-সংস্কৃতির পাশাপাশি তাদের চিন্তা চেতনাকেও গভীরভাবে প্রভাবিত করে।

পরিকল্পনায় ঘোষিত বিষয়গুলি সাঁওতাল পরগণার সাঁওতালদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কতটা প্রভাব ফেলেছিল তা বোঝার জন্য ‘ফাইভ ইয়ার প্ল্যান ইন বিহার’ (প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়)-এর রিপোর্টগুলি পর্যালোচনা করলেই বোঝা যায়। ১৯৫৬ সালের আগস্ট মাসে নতুন দিল্লির এক পরিকল্পনা কমিশনের প্রতিবেদনে সাঁওতাল পরগণার সার্বিক উন্নতির কিছু ঝলক সামনে আসে। প্রথম পরিকল্পনার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে জমি, জলসেচ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়গুলি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার রূপায়ণে জমি সংক্রান্ত বিষয়গুলির ক্ষেত্রে ১৯৪৯ সালের সাঁওতাল পরগণা টেনেন্সি অ্যাক্টকে বিশেষভাবে মান্যতা দেওয়া হয়। সাঁওতাল পরগণার জমিগুলিতে ইজারা প্রথার অনুমোদন না থাকায় মালিকদের ইচ্ছানুযায়ী ভাড়াটিয়াদের উচ্ছেদের সম্মুখীন হতে হত। অবশ্য এই পরিস্থিতিতে কোনো ইজারা আইন বর্হিভূত হয়ে থাকলে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি গোচরে আনা হত অথবা ভাড়াটিয়ারা ইচ্ছানুসারে জমিদারদের জমিগুলি দখল করে নিত। আর এর অন্যতম কারণ ছিল সাঁওতাল জমির মালিকরা; যারা আর্থিক দুরবস্থার অধীন তারা কোনো জায়গা থেকে ঋণ পাওয়ার সুযোগ পেত না, তাই উভয়পক্ষই নীরব থাকত। ১৯৫০ সালে জমি সংস্কার আইনের মাধ্যমে মধ্যস্থতাকারী বা মধ্যবর্তী সুবিধাভোগীদের হস্তক্ষেপের অবসান ঘটে। তবে ভেস্ট জমির দখলদারীর কাজে অবশ্য এই আইন যথেষ্ট দেরি করে ফেলে। পূর্বের অধ্যায়গুলোতে একথা উল্লেখ করা হয়েছিল যে, কীভাবে ১৮৫৫ সালে সাঁওতাল বিদ্রোহে সাঁওতালরা তাদের জমির অধিকার ও মালিকানার প্রশ্নে বিভিন্ন চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। বাংলার জমিদারি ব্যবস্থার অবসানের মতোই সাঁওতাল ব্যতীত জমির মালিকদের কাছে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়, কিন্তু সাঁওতালদের ক্ষেত্রে কোনো ব্যবস্থাই নেওয়া হয়নি যাতে তারা তাদের অধিকার বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকে। ১৯৪৯ সালের সাঁওতাল পরগণা টেনেন্সি অ্যাক্টে সাঁওতাল জমির লেনদেন বা হস্তান্তর নিষিদ্ধ করা হলেও ‘Batai System’ সেখানে আগে থেকে বহু প্রচলিত ছিল, যা মোট উৎপাদনের ৬৫ শতাংশ প্রদান করা হলেও চাষীরা কোনো ভাবেই তাদের অধিকার সম্পর্কে

নিশ্চয়তা পেত না। ১৯৬৪ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর এক অর্ডারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, ভাগচাষীদের অধিকার লিখিত রাখতে হবে, যদিও পূর্বতন কৃষিজীবী আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে কোনো রেকর্ড করা সম্ভব হয়নি। ফলত ভাগচাষীদের অধিকার লিপিবদ্ধ করে রাখার ক্ষেত্রে উপরোক্ত আইনই কার্যকর করা হয়েছিল।[২৭]

সাঁওতাল পরগণা অঞ্চলটি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ছয়টি এলাকার সমন্বয়ে গঠিত। আর সেই ছয়টি এলাকা হল সাহেবগঞ্জ, পাকুড়, দেওঘর, জামতাড়া, গোড্ডা ও দুমকা; আর এর প্রধান কার্যালয় ছিল দুমকায়। ১৮৫৫ সালের বিদ্রোহ থেকেই ব্রিটিশরা এই এলাকার জমি সংক্রান্ত ব্যাপারে নানান ভূমি আইন আরোপ করে। তবে ১৯৪৯ সালের সাঁওতাল পরগণা টেনেন্সি অ্যাক্টে সাঁওতাল রীতিনীতির সঙ্গে আরো অনেক বহির্ভূত আইন কানুন সমন্বয় করা হয়। যেমন ঘর জামাই থাকার অধিকার, জল-জঙ্গল-জমি প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর জনগোষ্ঠীর অধিকার অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলা হয়। এই আইনে চারটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য দেশের অন্যান্য টেনেন্সি অ্যাক্টগুলি থেকে একেবারে স্বতন্ত্র ছিল। প্রথমত, ২০নং সেকশনে্ উল্লেখ করা হয় যে, সাঁওতালদের জমি বিক্রয়, বন্ধক, ইজারা দেওয়া যাবে না, শুধুমাত্র বংশপরম্পরায় তাতে পরবর্তী মানুষদের স্বত্ব বজায় থাকবে। দ্বিতীয়ত, ৪২নং সেকশনে্ মহকুমা শাসকের ক্ষমতা বাড়ানোর কথা উল্লেখ করা হয়, যার মাধ্যমে সেই অঞ্চলে যে কোনো বে-আইনি জমি সরকার নিজের দখলে বা আওতায় আনতে পারে। তৃতীয়ত, ৬৪নং সেকশনে্ বলা হয় আদিবাসীদের অধিকৃত জমি পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে দাবি জানানোর জন্য কোনো বিশেষ সময়সীমা নির্ধারিত থাকবে না। চতুর্থত, ৬৩নং সেকশনে্ সাঁওতাল জমিসংক্রান্ত বিষয়ে দেওয়ানি আদালতের ওপর কিছু নিষেধ আরোপ করা হয়। আর সেগুলি হল, পূর্বের ন্যায় মহাজনের পক্ষে একতরফা রায় বা আদেশ জারি করা যাবে না। তবে এই সব আইনের বৈশিষ্ট্য বা নিয়মগুলি লাগু হওয়ার পরেও কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে সমস্যা থাকায় জমি সংক্রান্ত বিবাদগুলি মেটানোর ক্ষেত্রে কিছু বাধ্যবাধকতা দেখা দেয়। কারণ, বাস্তবে সম্পত্তির পরিমাণের তুলনায় সরকারি রেকর্ডে তার হিসাবের স্বচ্ছতা ছিল না। বংশপরম্পরা ছাড়া সাঁওতাল পরগণায় কোনোভাবেই সম্পত্তি হস্তান্তরের আইন ছিল না। তাই বেশিরভাগ মানুষ জমি হস্তান্তরের পক্ষপাতী ছিল না।[২৮]

জমির পাশাপাশি বনভূমি আদিবাসীদের জীবন জীবিকার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে, আর সেটা শুধুমাত্র বনজ কাঠ উৎপাদন করাই নয়, বনভূমির আরো অনেক সম্পদের আহরণ ও তার ব্যবহার করাকেও নির্দেশ করে। সেই সঙ্গে বনভূমি জমির মাটির সংরক্ষণের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিহার অবশ্য বনজ সম্পদের সংরক্ষণে তেমন উজ্জ্বল উদাহরণ গড়ে তুলতে পারেনি। বনভূমির প্রধান ও বেশিরভাগ অঞ্চল পূর্ব থেকেই ব্যক্তিগত মালিকানার অধীনে ছিল। ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত মাত্র ৩৬৭ বর্গমাইল জমি সরকারি তত্ত্বাবধানে আনা হয়েছিল এবং তা শুধুমাত্র ব্যক্তিগত মালিকদের সঙ্গে সমঝোতার মাধ্যমে সম্ভব হয়েছিল। বনজ সম্পদ ও জমি সংরক্ষণের জন্য 'বিহার প্রাইভেট ফরেস্ট অ্যাক্ট' প্রণয়ন করা হয়। যার দরুন সরকারি বনভূমির পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় ১৩৫ বর্গমাইল। বনদপ্তরের পক্ষ থেকে বনভূমি উন্নয়নের স্বার্থে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ১২৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়। নিম্নে সেই বরাদ্দ অর্থের বন্টন সম্পর্কে তথ্য দেওয়া হল[২৯]—

১) ব্যক্তিগত বনভূমির তত্ত্বাবধায়ন—১০,৮১৮ লক্ষ টাকা।

২) শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ—১,৪৮০ লক্ষ টাকা।

৩) বনভূমি গবেষণা—২০২ লক্ষ টাকা।

তবে বনভূমি সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সাঁওতাল পরগণায় কোনো সংরক্ষণ বিভাগ গড়ে তোলা হয়নি। শুধুমাত্র পালামৌ জেলায় নতুন এক ভূমিক্ষয় সংরক্ষণ বিভাগ গড়ে ওঠে। বনসৃজনের জন্য কিছু বিশেষ বিশেষ এলাকাগুলিকে চিহ্নিত করে সার্কেল গঠন করা হয়। পালামৌ, হাজারিবাগ, গিরিডি, রাঁচি, মানভূম, সাঁওতাল পরগণা প্রভৃতি অঞ্চলকে কেন্দ্র করে বিহার ফরেস্ট সার্কেল ও দামোদর ডেভেলপমেন্ট সার্কেল গড়ে তোলা হয়।[৩০]

কৃষিকাজের উন্নতির জন্য জলসেচ ব্যবস্থা ছিল আবশ্যিক, তাই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হয়। তবে সাঁওতাল পরগণা পূর্ব থেকেই এক্ষেত্রে এক সুবিধাজনক স্থানে অবস্থান করত, কারণ সেখানে ম্যাসাঞ্জোর বা কানাডা বাঁধের জল সরবরাহের বিপুল সুবিধা ছিল। বিহারের দুমকাতে অবস্থিত এই

ম্যাসাঞ্জোর বাঁধ জলবিদ্যুৎ উৎপাদনেও সক্ষম ছিল। ১৯৫৫ সালে ময়ূরাক্ষী নদীর ওপর এই বাঁধ নির্মাণ করা হয়। কানাডা সরকারের অর্থ সাহায্যে তৈরি হওয়ার জন্য এটাকে কানাডা বাঁধও বলা হয়। এই বাঁধ সংলগ্ন এলাকার আয়তন ১৮৬৯ বর্গমাইল।[৩১] বিভিন্ন ক্যানেলের মাধ্যমে বাঁধের জলকে ধরে রেখে কৃষিকাজে ব্যবহার করা হয়। অন্যদিকে ময়ূরাক্ষী বাঁধের আগে থেকেই দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন (DVC)-এর কাজ শুরু হয়েছিল। দামোদর নদী উপত্যকা হল বন্যা প্রবণ এবং ১৯৪৩ সালের বন্যা প্রবাহের ভয়াবহতার বিচারে বাংলায় 'দামোদর বন্যা তদন্ত' কমিটি গঠিত হয়েছিল, যা ইউনাইটেড স্টেটসের Tennessee Valley কর্তৃপক্ষের সদৃশ এক সংগঠন তৈরি করার সিদ্ধান্ত হয়। পরবর্তীকালে TVA-এর একজন অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার W.L. Voorduin-কে সেই সমস্যা পর্যবেক্ষণ ও তদন্ত কাজে নিয়োগ করা হয়। তিনি ১৯৪৪ সালে উপত্যকাটির সার্বিক উন্নয়নের জন্য ৮টি বাঁধ নির্মাণের নির্দেশ দেন এবং সেগুলি বিভিন্ন কাজে ব্যবহারের একটি রূপরেখা তুলে ধরেন। স্বাধীন ভারতের প্রথম বহুমুখী নদী উপত্যকা প্রকল্প হিসাবে ১৯৪৮ সালে ডিভিসি গড়ে ওঠে। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও কেন্দ্র সরকারের যৌথ উদ্যোগে এটি তৈরি করা হয়। এই প্রকল্পটির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বন্যা নিয়ন্ত্রণ, জলসেচের উন্নতি, জলবিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ করা। তবে W.L. Voorduin প্রকল্পটিতে ৮টি বাঁধ নির্মাণের কথা বললেও ৪টি তৈরি করা হয়। দামোদর বেসিন জুড়ে ২৪,২৩৫ কিলোমিটার বিস্তৃত এই প্রকল্পের পরিসর যেখানে বিহারের ১১টি অঞ্চল (ধানবাদ, বোকারো, হাজারিবাগ, কোডারমা, ছত্র, রামগড়, পালামৌ, রাঁচি, লোহারদাগা, গিরিডি, দুমকা) ও পশ্চিমবঙ্গের ছয়টি অঞ্চল (পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম বর্ধমান, হুগলী, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, হাওড়া) অন্তর্ভুক্ত ছিল। বর্তমানে ডিভিসি এর অধীনে ৪৯টি সাবস্টেশন ও ৯৩৯০ এরও বেশী এলাকা জুড়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়ে থাকে।[৩২] এর পাশাপাশি ক্ষুদ্র জলসেচের ক্ষেত্রেও নানান উদ্যোগ নেওয়া হয়। সমগ্র সাঁওতাল পরগণা জুড়ে জলসেচের ক্ষেত্রে বাঁধ ও কুয়ো প্রকল্পগুলির অধীনে ১৬টি ছোট ছোট জলসেচ কর্মসূচিতে সাঁওতাল পরগণা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। সাঁওতাল পরগণার ২০৪০ একর জমির মধ্যে ২০০০ একর জমি এই সব ক্ষুদ্র জলসেচ প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছিল। দুমকা অঞ্চলে বিদ্যুৎ ও সড়ক পথের যথেষ্ট সুবিধা ছিল। ম্যাসেঞ্জার জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের পর ২০০ মাইল হাইটেনসন ও ১০ মাইল লোয়ার

টেনসন সার্কিট যুক্ত করা হয়, যাতে খরচ হয়েছিল প্রায় ৬.৬৫ লক্ষ টাকা। সেই সঙ্গে নতুন সড়ক পথ নির্মাণের ক্ষেত্রেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। যে সমস্ত সড়ক নির্মাণ করা হয়েছিল সেগুলি হল[৩৩]—

১) দুমকা-লিটিপাড়া-সাহেবগঞ্জ— ৯৬ মাইল।

২) দুমকা-রামপুরহাট— ৩৫ মাইল।

৩) লিটিপাড়া-পাকুড়— ১৮ মাইল।

৪) মুরারই-আম্রপাড়া— ১৮ মাইল।

৫) গোড্ডা-হাঁসডিয়া— ২০ মাইল।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রূপায়ণের সঙ্গে সঙ্গে সাঁওতাল পরগণায় সরকারিভাবে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠা হয়; যাতে করে সহজেই উন্নয়নের ধারাকে গ্রামীণ এলাকায় বহন করা যায়। সাঁওতাল পরগণায় ৫৫৮ টি গ্রাম পঞ্চায়েত স্থাপিত হয়। এই পঞ্চায়েত নির্মাণের উদ্দেশ্য ছিল সাঁওতালদের মূলস্রোত কাঠামোর সঙ্গে অঙ্গীভূত করা। অন্যদিকে মহাজনরা সাঁওতাল কৃষকদের কাছ থেকে যে অতিরিক্ত সুদ নিত সেটা বন্ধ করার জন্য পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে মাত্র ২৫% সুদে কৃষকদের বীজ ধান দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। অন্যদিকে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের প্রতিও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। জেলা শিক্ষা দপ্তরের তহবিল থেকে ২৭টি ও পৌর তহবিল থেকে ৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ করা হয়। তবে পরিকল্পনার প্রাক্কালেই ৩০৭টি বালক ও ৬৩টি বালিকা প্রাথমিক বিদ্যালয় সক্রিয়ভাবে কাজ করতে থাকে, সেই সঙ্গে ৩টি প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ও বিদ্যমান ছিল। আবার ১৯৯১ সালের মধ্যেই সাঁওতাল পরগণায় ৯১টি বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে ওঠে। শিক্ষায় অগ্রগতি আনার জন্য ১৬টি আদিবাসী হোস্টেল স্থাপন করা হয়।[৩৪] শিক্ষার পাশাপাশি স্বাস্থ্য পরিকাঠামো গড়ে তোলার ক্ষেত্রে নানান উদ্যোগ নেওয়া হয়। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষলগ্নে সাঁওতাল পরগণায় ৪৮টি চিকিৎসা কেন্দ্র গড়ে ওঠে এবং স্বাস্থ্য পরিষেবা ও শৌচালয়ের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সুবিধা প্রদান করা হয়। স্বাস্থ্য পরিষেবায় যে সুবিধা লাভ করেছিল তা সাঁওতাল পরগণার তৎকালীন জন্ম-মৃত্যুহারের

পরিসংখ্যান থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। বিভিন্ন রোগজনিত কারণে জন্ম-মৃত্যুহারের পরিসংখ্যান নিম্নরূপ[৩৫]—

এক হাজারে	পূর্বে	পরে
জন্মহার	১০.৩৬	৯.৬১
মৃত্যুহার	৮.৮৯	৫.৭৫
কলেরায় মৃত্যু হার	০.৩৩	০.৩
গুটি বসন্তে মৃত্যুহার	০.৩৫	০.০১
জ্বরে মৃত্যুহার	৭.৭৩	৫.৯
অন্যান্য কারণ	০.৪৮	০.২৫
শিশু মৃত্যুহার	৭৫.৮৬	৫৮.৭৩

সুতরাং এই পরিসংখ্যানের মাধ্যমে আমরা বলতে পারি প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে স্বাস্থ্যসচেতনতা মূলক কর্মসূচি সাঁওতাল পরগণায় যথেষ্ট প্রভাব ফেলে।

জনজাতিদের উন্নয়নের তাগিদে এবং সেই উন্নয়নের ধারাকে সঠিকভাবে রূপায়নের জন্য সাঁওতাল পরগণায় দুই ধরণের প্রশাসনিক পদ তৈরি করা হয়—১) জেলা আধিকারিক ২) থানা উন্নয়ন আধিকারিক। তপশিলি জাতি ও তপশিলি জনজাতি মিলিয়ে বিহারে বহুসংখ্যক অনগ্রসরশ্রেণির মানুষের বসবাস ছিল। যার মধ্যে জনজাতি মানুষের সংখ্যা ছিল ৪০.৪৯ লক্ষ, যা সেখানকার মোট জনসংখ্যার প্রায় ১০.৬ শতাংশ। তাই সেখানে জনজাতি মানুষের বিশেষ চাহিদা পূরণ ও সমস্যা সমাধানের জন্য রাজ্য সরকার ১৪১.4 লক্ষ টাকা বরাদ্দের মাধ্যমে ১৮টি কর্মসূচি গ্রহণ করে। তবে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন ভর্তুকির বাইরেও কেন্দ্র সরকার সংবিধানের ২৭৫ নং আর্টিকেল অনুযায়ী বিভিন্ন অনুমোদন মঞ্জুর ও ভর্তুকি প্রদান করে। জেলা আধিকারিকগণ তাদের নিজস্ব জেলার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজকর্মের প্রতি দায়বদ্ধ থাকত আর তাদের সাহায্য করতেন জেলা আধিকারিক ও থানা উন্নয়ন আধিকারিক। ১৯৫১ সালের পূর্বে ১৬৭টি থানা উন্নয়ন আধিকারিক ছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ২৪৭ জনে। সেই সঙ্গে সাঁওতাল পরগণায় পাহাড়িয়া পদে তিনজন ও রাঁচিতে 'Rohtas Adhura' যোজনায় বিশেষ বিশেষ কর্মকর্তা নিযুক্ত করা হয়। অন্যদিকে ১৯৪৮ সাল থেকেই 'ঠক্কর বাপ্পা' সাঁওতাল পরগণা ও ছোটনাগপুর অঞ্চলে নানান উন্নয়নমূলক কর্মসূচি চালু

করেন। রাঁচিতে 'আদিম জাতি সেবা মণ্ডল' এবং দেওঘরে 'পাহাড়িয়া সেবক মণ্ডল' সংগঠনের মাধ্যমে তিনি অনেক উন্নয়ন মূলক কর্মসূচি রূপায়ন করেন। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সাঁওতাল পরগণা ও ছোটনাগপুর অঞ্চলে শস্যাগার নির্মাণ স্বার্থে ৬.৫০ লক্ষ টাকা ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন খাতে ০.২৫ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়। সেই সঙ্গে ১৯৫৩-৫৪ সালে রাঁচিতে জনজাতি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপিত হয়। তবে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে সাঁওতাল পরগণার সাঁওতালদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষিক্ষেত্রে কিছুটা উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব হলেও কোনো স্থানীয় সংগঠনকে এই উন্নয়নমূলক কর্মসূচির রূপায়ণের ক্ষেত্রে যুক্ত করা হয়নি। ফলে সাঁওতালদের স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্ন তো ওঠেই না বরং পরবর্তীকালে সাঁওতালরা নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও সত্তা বজায় রাখার ক্ষেত্রে সংকটাপন্ন হয়ে পড়ে।[৩৬]

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষি, সেচ ও ভূমি সংরক্ষণের ক্ষেত্রে উন্নতি লক্ষণীয়। ১৯৫৭-৫৮ বর্ষে সামগ্রিক ভাবে বিহারের জন্য বরাদ্দ ছিল ৩১.১১ কোটি টাকা, যার মধ্যে ডিভিসি ও কোশী সেচ পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯৫৬-৫৭ সালে কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে ১০০.৩১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়, তবে ১৯৫৭-৫৮-তে বৃদ্ধি পেয়ে হয় ১৯৪.৩৪ লক্ষ টাকা। সেই সঙ্গে ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পেও বরাদ্দ বৃদ্ধি পায়। সাঁওতাল পরগণা ও ছোটনাগপুরে ভূমিক্ষয় রোধে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয় এবং এই উদ্দেশ্যে আদিবাসী বা সাঁওতালদের বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। আবার ভূমিক্ষয় রোধের জন্য বনসৃজনের উদ্দেশ্যে সাঁওতাল পরগণা ও ছোটনাগপুর অঞ্চলের জন্য ৪২৫০ একর জমি নির্ধারণ করা হয়, যদিও অর্থাভাবে তা পূরণ করা সম্ভব হয়নি। আবার ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নতিকল্পে দুমকা, রাঁচি প্রভৃতি অঞ্চলে কাঠের ও লোহার কাজের জন্য একাধিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়। এ বিষয়ে 'সেকন্ড ফাইভ ইয়ার প্ল্যান ইন বিহার'-এর রিপোর্টে উল্লেখ করা হয় যে, 'The institute of industrial Designs continue to make good progress during the year. It has three sections, Viz., textile, handicrafts and small scale industries'.[৩৭] আবার তপশীলি জাতি ও জনজাতিদের জন্য তৈরি হয় নলকূপ, শস্যগোলা, কুটিরশিল্প ও পাহাড়ি অঞ্চলের জন্য রাস্তাঘাট। জনজাতিদের মধ্যে আর্থিক অনুদান দেওয়া হয় ২৮৮৯ কোটি টাকা, যার মধ্যে বিহার গ্রাম পঞ্চায়েতের জন্য বরাদ্দ ছিল ১৭.৮৩ লক্ষ টাকা।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার উদ্দেশ্যেই বলা হয় যে, ‘strengthening the agriculture, economy, developing Industry, power and transport and hastening the process of Industrial and technological change … Considerable Emphasis to the development of Education and other social services’.[৩৮] অর্থাৎ পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য হল অর্থনৈতিক উন্নয়ন। “The third plan of the state (Bihar) has, therefore, been drawn up as a programme of action much larger in size compared to the First or the Second”.[৩৯] সুতরাং এর ভূমিকাতেই বলা হচ্ছে যে সংবিধান অনুসারে এই গণতান্ত্রিক দেশে ‘Socialistic Pattern of Society’ গড়ে তোলা হবে। বিহারের ক্ষেত্রে চিরাচরিত কৃষি অর্থনীতি প্রচলিত ছিল, কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য কৃষির ওপর চাপ বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রয়োজন দেখা দেয় শিল্পোদ্যোগের। ১৯২১ সাল পর্যন্ত বিহারের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল ৯ লক্ষ, কিন্তু ১৯২১-৫১ সালের মধ্যেই এই বৃদ্ধির পরিমাণ দাঁড়ায় ১১ লক্ষে। অবশ্য তখনও কোনো পরিবার পরিকল্পনার বিষয় ছিল না। অন্যদিকে কৃষিযোগ্য জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছিল মাত্র ৪.৮% আর জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার ছিল ৩৮%, ফলত কৃষির উৎপাদন ব্যাহত হয়েছিল। আবার সেচের সঠিক বন্দোবস্ত না থাকায় কৃষিকাজও ব্যাহত হয়। যার জন্য দেখা যায় ১৯২১ সালে মোট কর্ষিত জমির পরিমাণ ৭৩ একর, যেটি ১৯৫১ সালে দাঁড়ায় মাত্র ৫৫ একরে। ‘There was a decline in the Net area cultivated. Net area irigated’.[৪০] অবশ্য সাঁওতাল পরগণার দক্ষিণে কোয়েল, শঙ্খ নদী ও ডিভিসি-র ফলে উৎপাদন কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছিল। অন্যদিকে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় তৈরি হয় সিন্ধ্রি সার কারখানা, হাতিয়া হেভি মেশিনারী কারখানা, বারৌনি তেল শোধনাগার। আর এই সব কারখানায় প্রয়োজন ছিল দক্ষ শ্রমিকের যদিও এখানে সাঁওতালদের স্থান ছিল অদক্ষ শ্রমিক হিসাবে এবং যার সংখ্যাটি ছিল সামান্য। শিক্ষার ক্ষেত্রে বিহার অঞ্চলে ৬টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় এবং একটি কৃষি কলেজও স্থাপন করা হয়। আদিবাসীদের জন্য ১৫০০০ ছাত্রকে কারিগরি শিক্ষার জন্য বৃত্তি প্রদান করা হয় এবং সেই সঙ্গে প্রাথমিক ও উচ্চপ্রাথমিকে ৫১০০০ আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীকে বিনা খরচে শিক্ষা লাভের সুযোগ দেওয়া হয়। এছাড়াও এই পরিকল্পনার মাধ্যমে ৫৩,৪০০ একর জমিকে বনসৃজনের আওতাভুক্ত করা হয়।[৪১] প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বিহারের জন্য বরাদ্দ অর্থের বন্টন নিম্নরূপ[৪২]—

	দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (বিহার)	তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (বিহার)
কৃষি	১৩,৪২,৬৬	১৪,৩৫,৬১
ভূমিক্ষয়	১,৬১,৫৬	২,৫০,০৪
অরণ্য	১,৭৬,৩০	২,৯৫,০০
শিল্প	২,১২,৭৮	২,৮০,০০

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রসার সীমিত হলেও সাঁওতাল পরগণায় তার কিছুটা প্রভাব পড়ে। তবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সাঁওতাল পরগণায় বৃহৎ শিল্প ও কলকারখানা স্থাপনে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। আর এই বৃহৎ শিল্প ও কলকারখানা স্থাপন করতে গিয়ে বহু আদিবাসী পরিবারকে উদ্বাস্তু হতে হয়েছে। প্রথম তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এবং পাবলিক সেক্টর শিল্প প্রকল্পের জন্য ৫০,০০০ আদিবাসী পরিবারকে ভূমিহীন করা হয়েছে। অন্যদিকে এই শিল্প ও প্রকল্পের দ্বারা সাঁওতালদের কোনো অগ্রগতি আসেনি। এসব অঞ্চল আদিবাসীদের হলেও বৃহৎ কলকারখানায় আদিবাসীরা শ্রমিক হিসাবে যুক্ত হয় আর উচ্চপদে অবস্থান করে বহিরাগত বা দিকুরা। কোনো পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাই আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সার্বিক উন্নয়ন ঘটাতে পারেনি বরং নব উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় আরো ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে আদিবাসী সমাজ, আরো বেড়েছে বাস্তুচ্যুতি ও অভিবাসন। ১৯৫০-৫১ সালের মধ্যেই ছোটনাগপুর এলাকায় ১.৪৫ কোটি মানুষ স্বভূমি থেকে উৎখাত হয়েছে আর পুনর্বাসন পেয়েছে মাত্র ৩৬.৫ লক্ষ মানুষ। বিভিন্ন প্রকল্পের দ্বারা বাস্তুচ্যুত হওয়া মানুষের পরিসংখ্যান নিম্নরূপ[৪৩]—

প্রকল্পের নাম	স্থানচ্যুত	পুনর্বাসিত
কয়লা এবং খনিশিল্প	১৭,০০,০০০	৪,৫০,০০০
বাঁধ এবং খাল	১,১০,০০,০০০	২৭,৫০,০০০
কারখানা অভয়ারণ্য	৬,০০,০০০	১,৫০,০০০
পার্ক ইত্যাদি		
অন্যান্য	১২,০০,০০০	৩,০০,০০০
মোট	১.৪৫ কোটি	৩৬.৫ লক্ষ

অন্যদিকে দিকে শিল্পায়নের নামে এক বৃহৎ সংখ্যক দিকুদের অনুপ্রবেশ ঘটে সাঁওতাল পরগণায়। সুতরাং পঞ্চশীলের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করা হয় কার্যক্ষেত্রে তার উল্টোটাই ঘটে। ফলে আদিবাসীদের জন্য নির্ধারিত জনকল্যাণমূলক কর্মসূচির বেশির ভাগ সুফল ভোগ করে দিকুরা। ১৯৪৭-এর পর যোজনা কমিশনের ট্রাইবাল-সাব-প্ল্যানের আওতাভুক্ত এলাকায় জনসংখ্যা ৫০ শতাংশের বেশি হওয়া উচিত; অথচ বিহারের এই অঞ্চলে জনসংখ্যার ৫১.৮ শতাংশ ছিল দিকুরা।[৪৪] ফলে আদিবাসী সমাজ উন্নয়নের ধারা থেকে বঞ্চিত হয়। অন্যদিকে বিভিন্ন শিল্পস্থাপনের ফলে শহরগুলির সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। শুধুমাত্র ছোটনাগপুর ও সাঁওতাল পরগণা অঞ্চলে ১৯০১ থেকে ১৯৭১ সালের মধ্যেই শহরের সংখ্যা দাঁড়ায় ৯৬টি। আর এই শহর স্থাপনেও বহু আদিবাসী পরিবারকে উচ্ছেদ করা হয়। তাছাড়া এইসব কলকারখানাগুলিতে নিয়মিত শ্রমিকদের মধ্যে আদিবাসীদের শতকরা হার ৪-৬ ভাগ। অথচ সব চেয়ে বেশি পরিশ্রম করে, সবচেয়ে কম মজুরির কাজে অর্থাৎ অস্থায়ী শ্রমিকদের মধ্যে তাদের শতকরা হার ছিল ৪০-৫০ ভাগ, কিন্তু এইসব প্রকল্পের কোনো সুবিধা স্থানীয় মানুষরা পায়নি, অন্যদিকে এক বৃহৎ সংখ্যক বহিরাগত মানুষদের প্রবেশ ঘটে। ১৯৫১-৬১ সালের মধ্যেই সাঁওতাল পরগণায় দিকুদের সংখ্যা ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। সেই সঙ্গে বহুসংখ্যক আদিবাসীকে অন্যত্র পরিযাত্রা করতে হয়েছে। এত উন্নয়ন, ব্যবসা-বাণিজ্য, কলকারখানা নিজেদের এলাকায় হওয়া সত্ত্বেও বাইরে যেতে হয় দিন মজুরের কাজে। ১৯৩১-১৯৮১ সালের মধ্যেই সাঁওতাল পরগণা অঞ্চলে আদিবাসীদের সংখ্যা ৪৩ শতাংশ থেকে কমে ৩৭ শতাংশ দাঁড়িয়েছে।[৪৫] নিজেদের এলাকায় বৃহৎ বিদ্যুৎ প্রকল্প ও কয়লার ভাণ্ডার থাকা সত্ত্বেও আদিবাসী পরিবারগুলোকে অন্ধকারের মধ্যেই দিন যাপন করতে হয় এবং বিদ্যুতের সুবিধা থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করা হয়। তার একটি পরিসংখ্যান নিম্নরূপ[৪৬]

অঞ্চল	মাথা পিছু বিদ্যুৎ, কিলোওয়াট/ঘন্টা	শতকরা গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণ
সাঁওতাল পরগণা	২০৪	৫
অবশিষ্ট বিহার	২০	২০
ভারত	৯৬	২৭

এই পরিসংখ্যান থেকে স্পষ্ট যে সাঁওতাল পরগণায় উৎপাদিত বিদ্যুতের পরিমাণ অন্যান্য এলাকা বা সমগ্র দেশের তুলনায় বেশি হওয়া সত্ত্বেও সাঁওতাল পরগণার সাধারণ মানুষ তথা আদিবাসীরা বিশেষ সুবিধা পায়নি। বরং তাদের এলাকার উৎপাদিত বিদ্যুৎ অন্যত্র সরবরাহ করা হয়েছে।

এই নব উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে সঠিকভাবে রূপায়ণ ও আদিবাসীদের স্বার্থ রক্ষার্থে সংবিধানে নানান রক্ষা কবচের ব্যবস্থা করা হয়। আর এর জন্য প্রথমেই ভারতীয় সংবিধানে জনজাতিদের সিডিউল্ড ট্রাইব বা তপশিলি জনজাতি হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করে, ট্রাইবাল সাব প্ল্যান (TSP) গঠন করা হয়। যদিও আদিবাসী মহাসভার সভাপতি জয়পাল সিং মুন্ডা সংবিধানে আদিবাসী শব্দটি রাখার প্রস্তাব করেছিলেন। কারণ জনজাতিরা নিজেদের আদিবাসী বলতেই বেশি পছন্দ করে, সেই সঙ্গে আদিবাসীদের বৈশিষ্ট্যগুলিকে সঠিকভাবে চিহ্নিতকরণের জন্য সংবিধানের ৩৩৬(২৫)নং ধারায় উল্লেখ করা হয়, তপশিলি জাতি হল সেই গোষ্ঠী যা রাষ্ট্রপতি ৩৪২(১)নং ধারা বলে পাবলিক নোটিফিকেশন দিয়ে নির্দিষ্ট করেন। যেখানে আদিবাসীদের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত করা হয় যথা, ১) একটি নির্দিষ্ট ভৌগলিক অঞ্চলে বসবাসকারী, নির্দিষ্ট প্রথা অনুসারে জীবন-যাপনকারী গোষ্ঠী ২) সুনির্দিষ্ট সংস্কৃতিসম্পন্ন গোষ্ঠী ৩) পৃথক ভাষা, প্রথা, ধর্মীয় বিশ্বাস, শিল্প, সংগীত সম্পন্ন গোষ্ঠী ৪) শিক্ষা ও প্রযুক্তির অভাব।[৪৭] আর এই বৈশিষ্ট্যগুলির নিরিখে আদিবাসীদের পর্যায়ভুক্তকরণের পাশাপাশি বৈশিষ্ট্যগুলির রক্ষার্থে সংবিধানে নানান আইনি ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ করা হয়। সরকারি নীতির বাস্তব রূপ দেওয়ার প্রথম ধাপটি খোদ সংবিধানেই লিপিবদ্ধ করা হয়। ৪৬ নং ধারায় আদিবাসীদের সবরকম অন্যায় ও শোষণ থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য সরকারকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে জনজাতীয় রাজ্যগুলির রাজ্যপালের হাতে জনজাতীয় স্বার্থ রক্ষার্থে বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয়, বিশেষ করে জনজাতি এলাকায় কেন্দ্র-রাজ্য আইনের প্রযোজ্যতা প্রয়োজন অনুসারে বদলে নেওয়া, জমিতে জনজাতীয় অধিকার রক্ষা করা এবং মহাজনদের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য নিয়মনীতি প্রণয়ন করার ক্ষমতাও দেওয়া হয়। আবার সংবিধান জনজাতীয় জনগণকে পূর্ণ রাজনৈতিক অধিকারও প্রদান করে। এর জন্য ৩৩৪নং ধারা অনুযায়ী লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভায় নির্দিষ্ট আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। শুধু তাই নয়, জনজাতীয়

জনবসতি যুক্ত প্রত্যেক রাজ্যে জনজাতি মঙ্গল সংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শ দেওয়ার জন্য একটি করে 'জনজাতি উপদেষ্টা পর্ষদ' গঠন করার ব্যবস্থা করা হয়। আবার ৩৩৫নং ধারায় সরকারি চাকরিতে অগ্রাধিকার দান ও নির্দিষ্ট সংখ্যক আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে। ১৬৪নং ধারানুযায়ী বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও উড়িষ্যার জনজাতিদের জন্য স্বতন্ত্র মন্ত্রকের উল্লেখ রয়েছে। এছাড়াও ২৭৫নং ধারানুযায়ী জাতীয় সমবায় উন্নয়ন নিগমের মাধ্যমে আদিবাসীদের ৮০,০০০-১,০০,০০০ টাকা ঋণ ও অনুদান দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। অন্যদিকে ২৭৫(১)নং ধারায় আদিবাসী এলাকায় চিকিৎসা ব্যবস্থা, সমবায় সমিতির জন্য আর্থিক সাহায্য, আদিবাসী মহিলাদের স্বনির্ভর করার প্রকল্প, আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপন করার কথা বলা হয়। সেই সঙ্গে আদিবাসী সংস্কৃতি, ভাষা, সংগঠন রক্ষার্থে নানা ব্যবস্থা সন্নিবেশিত হয়েছে। সংবিধান প্রদত্ত উপরোক্ত সব সুযোগ-সুবিধাগুলি আদিবাসীদের স্বার্থে যথাযত ভাবে কার্যকরী হচ্ছে কি না, তা দেখভাল করার জন্য ৩৩৪নং ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি একজন কমিশনার নিয়োগ করেন, যার কাজ হল সংবিধানে আদিবাসীদের জন্য যে সমস্ত রক্ষা কবচের ব্যবস্থা আছে সেগুলি সঠিকভাবে প্রয়োগ হচ্ছে কিনা, তা অনুসন্ধান করা।[৪৮]

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে আদিবাসীদের সমাজ-সংস্কৃতি, কৃষ্টি রক্ষার্থে সংবিধানে নানান ব্যবস্থা করা হলেও বাস্তবিক ক্ষেত্রে এই সব নীতির প্রয়োগের দিক দিয়ে একদিকে যেমন কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বৈরিতা লক্ষ করা যায়, তেমনি অন্যদিকে নিরক্ষর সাধারণ আদিবাসী সমাজ এই সব আইনি ব্যবস্থা সম্পর্কে অপরিচিত হওয়ায় বা পরিচিত থাকলেও সেই সমস্ত আইনগুলিকে উকিল-আদালতের মাধ্যমে কার্যকরি করার সামর্থ না থাকায় তার সামান্যই সুফল লাভ করে। তাছাড়া সাংবিধানিক বিধানে এমন কিছু বিধান আছে যা আদিবাসীদের বৃহত্তর সমাজে সমন্বয়করণকেই সমর্থন করে। ফলে আদিবাসীদের ঐতিহ্যপূর্ণ সমাজ কাঠামো সাংবিধানিক রীতিনীতিতে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। ঐতিহাসিক ভাবে দেখতে গেলে নিম্নবর্গের চর্চা যেমন উচ্চবর্গের মস্তিষ্ক প্রসূত তেমনি সাংবিধানিক রীতিনীতি গঠনে আদিবাসীদের প্রতিনিধিত্বের সংখ্যা কম থাকায় (১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইনের দ্বারা সংবিধান সভায় যারা নির্বাচিত হয়েছিলেন তারাই ভারতের সংবিধান রচয়িতা। এরা ছিলেন দেশীয় রাজা, সামন্ত প্রভু এবং মুৎসদ্দি-বুর্জোয়া অথবা তাদের প্রতিনিধি। পূর্বভারতের আদিবাসীদের প্রতিনিধি হিসাবে

একমাত্র প্রতিনিধি ছিলেন জয়পাল সিং মুন্ডা, যদিও তিনি এলিট ঘরনার।) আদিবাসীদের মূল সমস্যাগুলি বিশেষভাবে মান্যতা পায়নি। আবার সংবিধান পরিচালনার দায়িত্বে থাকে উচ্চবর্গের দিকুরা; ফলে সাংবিধানিক রীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে পদাধিকারীরা সেই ফাঁক-ফোঁকরগুলির সুযোগ গ্রহণ করে। অন্যদিকে সাংবিধানিক রীতিনীতির গঠন ও সংশোধনের ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠতা মাপকাঠি হওয়ায় এলিট সরকার অনেক সময় নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করতে আদিবাসীদের স্বার্থের কথা না ভেবেই সাংবিধান সংশোধন করেছে।

সংবিধান প্রদত্ত বিভিন্ন নিয়ম-নীতি জনজাতিদের জীবনে কতটা প্রভাব ফেলেছিল তা আলোচনা করার পূর্বে সাঁওতাল পরগণার ১৯৪৯ সালের টেনেন্সি অ্যাক্ট, ১৮৭২ সালে ৩নং রেগুলেশন ও ১৮৭৬ সালের সাঁওতাল পরগণা টেনেন্সি অ্যাক্ট সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। কারণ সাংবিধানিক রীতিনীতি রূপায়ণের ক্ষেত্রে এই সমস্ত আইনগুলি সাঁওতাল পরগণার ক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্ব রাখে। ১৮৭২ সালের আইনের ২৭নং সেকশনে উল্লেখ করা হয় যে—

১) কোন জমির ক্রয়-বিক্রয়, বন্ধক, হস্তান্তর, চুক্তি প্রভৃতি আইনত গ্রাহ্য করা হবে না যতক্ষণ না সেটি সরকারি আইন মেনে রেকর্ড করা হয়েছে। S.D.O. এর নির্দেশে এই রকম কোনো জমি অর্থাৎ রায়তওয়ারী জমি লিজ বা হস্তান্তর এক বছর পর্যন্ত বৈধ থাকবে।

২) জমির কোনো রকম হস্তান্তর কোনো আদালতেই মান্যতা দেওয়া হবে না; সেটা সিভিল, ক্রিমিন্যাল বা রেভেনিউ যেকোনো বিভাগেই হোক না কেন তার কোনো সরকারি অনুমোদন থাকবে না।[৪৯] এই আইনের কার্যকারিতা প্রসঙ্গে অন্যতম উদাহরণ হল আদিবাসী ঠাকুর হাঁসদা বনাম বাস্তাকোলের কোলিয়ারির কেস। ১৯৬১ সালে ঠাকুর হাঁসদা নামে এক আদিবাসী কোলিয়ারি বাস্তাকোলের বিরুদ্ধে জমি হরণ করে নেওয়ার অভিযোগ দায়ের করলে পাটনা হাইকোর্ট ১৮৭২ সালের ২৭নং সেকশনকে মর্যাদা দিয়ে ঠাকুরের সপক্ষে দাঁড়ায়। এছাড়াও ১৮৬১ সালের রেগুলেশন অনুযায়ী আদিবাসী জমি দখল করা মামলা আদিবাসীদের পক্ষে যায়।[৫০] আবার ১৯৪৭ সালের ২৫নং বিহার অ্যাক্টের ৪৬নং সেকশনের সংস্করণ করা হলে আদিবাসী সম্পর্কিত আরো কিছু আইন অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৮৭২ সালের আইন মোতাবেক সাঁওতাল পরগণায় কিছু নির্দেশিকা

বলবৎ করা হয় যেগুলি প্রচলিত নিয়ম-কানুন থেকে অনেকাংশেই আলাদা ছিল। তবে মূল আইনের ক্ষেত্রটি ঠিক মতো বজায় থাকে। জমি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে ডেপুটি কমিশনারের অনুমতি ছাড়া কোনো জমি হস্তান্তর করতে পারবে না বলে নির্দেশ দেওয়া হয়।[৫১] এটি বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে ঔপনিবেশিক সময়ের পূর্ববর্তী ও পরবর্তীকালে সাঁওতাল সমাজ থেকে যে সমস্ত সমস্যাগুলি উঠে আসে তার মধ্যে অন্যতম ছিল জমি সংক্রান্ত সমস্যা। ১৮৫৫ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহ থেকে ঝাড়খণ্ড আন্দোলন পর্যন্ত সময়পর্বে জমি বন্দোবস্তকে কেন্দ্র করে নানান সমস্যা দেখা দেয়। তাই নতুন সংবিধান মারফৎ এই সমস্যার সমাধানের জন্য সরকার নানান আইন পাস করে। সাঁওতাল পরগণাতে ১৯৪৯ সালের টেনেন্সি অ্যাক্ট ছিল প্রথম কোন নথিভুক্ত আইন। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে এই সমস্ত আইনগুলির সঙ্গে আরো কিছু নতুন বিষয় যুক্ত করে নির্দেশিকা জারি করা হয়।

২৪৪নং আর্টিকেল অনুসারে সংবিধানে তপশিলি জাতি ও তপশিলি জনজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে সরকারি অনেক আইন কানুন জারি করা হয়েছিল। তবে আসাম, মেঘালয়, ত্রিপুরা ও নাগাল্যান্ডকে এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। ৬নং তালিকা অনুযায়ী সাঁওতাল পরগণাকে যেভাবে আইনের চোখে দেখা হয়েছে সেরকমভাবে সাঁওতালদের নিজস্ব সামাজিক কাঠামোকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। অনুচ্ছেদ বি-তে বলা হয়েছে প্রত্যেক রাজ্যে জনজাতিদের জন্য আলাদা অঞ্চল চিহ্নিত করা হবে এবং জনগোষ্ঠী থেকে Tribe Advisory Council-এর মাধ্যমে তৃতীয়-চতুর্থাংশ জনগোষ্ঠী থেকে সদস্য পদ থাকবে যারা রাজ্যের বিধান সভায় প্রতিনিধিত্ব করবে। সংবিধানের ‘Directive Principles’ অনুযায়ী সমাজে পিছিয়ে পড়া ও অনুন্নত শ্রেণির আর্থ-সামাজিক ও শিক্ষামূলক অগ্রগতিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। সংবিধান রাজ্যগুলিকে এটাও ক্ষমতা প্রদান করে যে, জনজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিকে ৫নং ও ৬নং তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে সেখানকার মানুষের সামাজিক, আর্থিক, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক দিকগুলিকে সরকারিভাবে সাহায্য করে উন্নতি ঘটাতে হবে। ফলত, সংবিধান জনজাতিদের ওপর সংস্কার আনতে আগ্রহী ছিল এবং তাদের চলমান জীবনধারার নিয়মনীতিকে উপেক্ষা করে নতুন সংস্কার সাধনের চেষ্টায় সংবিধানের নির্দেশগুলি কার্যকরী করা হয়। এ প্রসঙ্গে ভার্জিনিয়াস জাক্সা (Virginus Xaxa) মন্তব্য করেন যে—‘If one were to examine these provisions more carefully, one would find that the constitution clearly

adopts a policy of integration rather than of isolation and assimilation, albeit without using the term and concept of integration even once'.[৫২] সেই সঙ্গে আদিবাসী এলাকায় নতুন পুলিশি ব্যবস্থা ও পঞ্চায়েত স্থাপনের মধ্য দিয়ে তাদের প্রাচীন ও চিরাচরিত প্রথাগুলির অবলুপ্তি ঘটানো হয়। দামিন-ই-কোহ যা দুমকা, গোড্ডা, পাকুড় ও রাজমহল এলাকা জুড়ে বিস্তৃত, যা প্রধানত ১৯৫০ সালের আগে পর্যন্ত সাঁওতাল ও পাহাড়িয়াদের বসবাসের প্রধান এলাকা, যেটা পুরোপুরিভাবে পুলিশ বিহীন এলাকা ছিল। সাধারণত পরগণার অধিপতিদের হাতেই এই পুলিশি ক্ষমতা থাকত এবং তারাই সেখানকার চৌকিদার ও মাঝিদের কাজকর্মগুলির পরিচালনা ও তদারকির ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। কিন্তু দেশভাগের সময় থেকে যখন গোটা দেশ জুড়ে সাম্প্রদায়িক অসংহতি ছড়িয়ে পড়ে তখন এই জেলার সাঁওতাল মহাসভার কিছু দাপুটে আদিবাসী নেতারা উত্তেজনা সৃষ্টি করে। সাঁওতালদের মধ্যে এই সব নেতারা জনমত তৈরি করে যে ছোটনাগপুর অঞ্চলের কিছু এলাকাকে নিয়ে আলাদা ঝাড়খণ্ড রাজ্য তৈরি করতে চায় এবং তারা নতুন কংগ্রেস নেতাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে। এমত অবস্থায় সরকার সশস্ত্র সেনাবাহিনী ও জেলাশাসকদের বিভিন্ন সংবেদনশীল এলাকায় নিযুক্ত করে যাতে শাসন ব্যবস্থায় স্থিরতা আসে এবং তার সঙ্গে বহিরাগত মানুষদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলা যায়। কারণ তারা মনে করেছিল ক্ষুব্ধ সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর এই আন্দোলনে প্রথম শিকার হয়তো দিকুরাই হবে। এর থেকে বোঝা যায় বছরের পর বছর ধরে দিকু-আদিবাসী সম্পর্ক ক্রমাগতভাবে অবক্ষয়ের দিকেই এগোচ্ছিল। জমি মামলায় বেশিরভাগই জড়িয়ে ছিল দিকুরা, কারণ তারা বিভিন্নভাবে সাঁওতালদের জমি অধিকার করে নিয়েছিল। তাই সাঁওতাল পরগণা নন-রেগুলেটেড এলাকা হওয়া সত্ত্বেও এই সব কারণেই থানা স্থাপন করা হয়।[৫৩]

আদিবাসী এলাকায় পঞ্চায়েত ছিল সব থেকে প্রাচীন শাসন ব্যবস্থা যেটি তাদের নিজস্ব নিয়ম নীতির দ্বারা পরিচালিত হত। তাই পঞ্চায়েতের অধিকার গ্রহণ করার পূর্বে আদিবাসী প্রধানকে শপথ নিয়ে বলতে হত—

'সিরমারে সিংবোঙ্গা

অতরে পঞ্চ।'[৫৪]

অর্থাৎ, উপরে সূর্য দেবতা, নীচে পঞ্চায়েত।

এই পঞ্চায়েতের নির্বাচন হত মাঘাসীম উৎসবের সময়। গ্রামের বয়স্ক ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি নির্বাচনের মাধ্যমে গ্রাম প্রধান নির্বাচন করত এবং সেই গ্রাম প্রধান গ্রামের অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে অন্যান্য আধিকারিকদের নিযুক্ত করতেন। কিন্তু সংবিধানের মাধ্যমে এই পঞ্চায়েতি ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে সরকারের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। এর মাধ্যমে এটা স্পষ্টভাবে লক্ষ করা যায় সেটি হল আদিবাসীদের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার খর্ব করা, তাদের প্রত্যক্ষ বিভিন্ন আধিপত্যগুলিকে প্রাধান্য না দেওয়ার মাধ্যমে সরকারের কাছে অনেকখানি নির্ভরশীল করে তোলা হয়। তবে ১৯৯৬ সালে PESA ACT-এর মাধ্যমে পঞ্চায়েত শাসন ব্যবস্থায় রাজ্যের স্থানীয় মানুষদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় দিকগুলির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। তবে আইন ও তার বাস্তবিক রূপায়ণের মধ্যে একটা বিস্তর ফারাক থেকে যায়। এক্ষেত্রে ভার্জিনিয়াস জাক্সা (Virginus Xaxa) উল্লেখ করেন যে, The most important provision made in this Act is that State legislation on the Panchayat would be in consonance with customary law, social and religious practice, and traditional management of the community resources'.[৫৫] সেই সময় জনজাতিরা মনে করেছিল এই সব গ্রামীণ শাসন সংগঠনগুলি তাদের নিরাপত্তা, স্বাধীনতা ও প্রত্যয় এনে দেবে কিন্তু সেগুলির কিছুটা বাস্তবায়িত হলেও তা আসলে তাদের চিরাচরিত ঐতিহ্য ও স্বায়ত্তশাসনকে অবলুপ্তির পথে নিয়ে যায়। ফলে সাঁওতাল ও অন্যান্য জনজাতিদের নিজস্ব সিদ্ধান্ত নির্ধারণের ক্ষমতা আর রইল না। সংবিধানে পঞ্চম তালিকা অনুসারে আদিবাসী কল্যাণ পরিকল্পনার কাঠামো তৈরি করা এবং আদিবাসী উন্নয়ন বিষয়ে রাজ্য সরকারকে প্রয়োজনীয় উপদেশ দেওয়া হয়। পাশাপাশি এই সমস্ত ব্যাপার যথাযথ রূপায়ণের জন্য এবং কেন্দ্র রাজ্যের সমন্বয় রচনার জন্য একদল উপ-অধিকর্তা নিযুক্ত করার কথাও বলা হয়। কিন্তু কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও, জনজাতিগুলির অগ্রগতির কল্যাণের হার খুবই শ্লথ, এমনকি ভয়াবহ। একমাত্র উত্তর-পূর্বাঞ্চল ছাড়া আর সব জায়গাতেই জনজাতিরা এখনও গরিব, ঋণগ্রস্ত, ভূমিহীন এবং প্রায়শই কর্মহীন। বহুক্ষেত্রেই সমস্যাটা হল উদ্দেশ্য প্রণোদিত বিধিব্যবস্থার দুর্বল প্রয়োগ। অনেক সময়েই কেন্দ্রের পলিসির সঙ্গে রাজ্যের পলিসির বেশ ফারাক দেখা যায়। রাজ্য সরকারের পলিসির সঙ্গে জনজাতি-স্বার্থের তাল ঠিকমতো মেলে না। বিশেষ করে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রণীত, এমনকী রাজ্য সরকারের নিজেরই প্রণীত সদর্থক

পলিসি আর আইনগুলির প্রয়োগে রাজ্য সরকারগুলি অপেক্ষাকৃত অপটু বলে প্রমাণিত হয়েছে। তফশিলি জাতি ও জনজাতি বিষয়ক কমিশনার এবং পরিকল্পনা কমিশনের প্রতিবেদনগুলিতে বারংবার এ-কথা বলা হয়েছে। বহু ক্ষেত্রেই জনজাতি কল্যাণের জন্য বরাদ্দ অর্থ খরচ করা হয় না, এমনকী আত্মসাৎ করা হয়, আবার খরচ করা হলেও তা থেকে ফল পাওয়া যায় না। জনজাতি স্বার্থরক্ষার অন্যতম প্রহরী 'জনজাতি উপদেষ্টা পর্ষদ' ঠিকমতো কাজও করে না।[৫৬]

স্বাধীনতা পরবর্তী উন্নয়ন মূলত আদিবাসী সমাজ ব্যবস্থাকে বিধ্বস্ত করে তোলে, যা সাংবিধানিক রীতি-নীতির মাধ্যমেও তাদের সেই ঐতিহ্যপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। স্বাভাবিকভাবেই এই এলিট সরকারের কাছে আদিবাসী জীবনের মূল সত্তার প্রশ্নটি বোধগম্য না হওয়ায় তাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সত্তাগুলি হল অবহেলিত এবং তাদের আত্মপ্রতিষ্ঠার ইচ্ছাগুলোকে ব্যাখ্যা করা হল ভুল ভাবে। অবশ্য আদিবাসী জগতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের সূচনা হয়েছিল। সর্বজনীন ভোটাধিকারের প্রবর্তনে যে নির্বাচনী রাজনীতির জন্ম হল তা পরোক্ষ ফল হিসাবেও শিক্ষিত সাঁওতাল এমনকি সাধারণ আদিবাসীদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা গড়ে ওঠে। তবে শিক্ষিত সাঁওতাল গোষ্ঠী বিভিন্ন কারণে প্রত্যক্ষ ভাবে কোনো রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত না থাকলেও তৎকালীন বিভিন্ন অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিজেদেরকে যুক্ত রেখেছিল। অন্যদিকে ব্রিটিশ রাজত্বের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে জোতদাররা অবশ্য শেষ হয়ে যায়নি, বরং অত্যন্ত সুকৌশলে নিজেদের তারা অঙ্গীভূত করে ফেলে নতুন ক্ষমতার কাঠামোয়। এরা শুধু নিজেদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি নিয়েই খুশি থাকল না, সাথে সাথে চাইল দরিদ্র এবং ভূমিহীন সাঁওতাল কৃষকদের ওপর রাজনৈতিক আধিপত্য। এর বিরুদ্ধাচরণের অর্থই ছিল তার রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতৃত্বের বিরুদ্ধে একটি চ্যালেঞ্জ। যার প্রতিক্রিয়ায় দীর্ঘদিনের পৃথক ঝাড়খণ্ড রাজ্যের দাবির মধ্য দিয়ে আদিবাসীরা তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় অপরাগ হয়ে ওঠে। কাজেই স্বাধীনতার পরবর্তী ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের নতুন ভাবে বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে আদিবাসীদের নতুন নতুন দাবি যেমন-সংরক্ষণ, ভাষা, সংস্কৃতি রক্ষা ও গোষ্ঠী সত্তার নানা প্রশ্ন যুক্ত হয়। অর্থাৎ এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আদিবাসীদের মধ্যে গড়ে ওঠে নতুন আত্মপরিচয়বোধ।

ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের সূত্রপাত ঔপনিবেশিক সময় পর্বে হলেও স্বাধীনতা পরবর্তী সরকারি নীতির কার্যকারিতা ও সাংবিধানিক ব্যবস্থাপনা এই আন্দোলনকে নতুন দাবির সঙ্গে পুনরায় উজ্জীবিত করে তোলে। ঝাড়খণ্ড আন্দোলন ছিল মূলত পূর্বভারতের আদিবাসীদের জাতিসত্তার পরিচয়ের, স্বভূমি রক্ষার্থে, স্বাধীনভাবে বাঁচার আন্দোলন। ১৯১৫ সালে 'আদিবাসী উন্নতি সমাজ' গঠন করে এই আন্দোলনের সূত্রপাত করে খ্রিষ্টান আদিবাসীরা, ১৯২৮ সালে সাইমন কমিশনের কাছে তারা একটি স্মারকপত্র জমা দিয়ে স্বতন্ত্র ঝাড়খণ্ড রাজ্য দাবী করে। এরপর ১৯৩৯ সালে অখ্রিস্টান আদিবাসীদেরও অন্তর্ভুক্ত করে উন্নতি সমাজকে পুনর্গঠিত করা হয়, যার নাম হয় 'আদিবাসী মহাসভা'। কিন্তু ১৯৪৯ সালে এই আন্দোলন একটি নির্দিষ্ট রূপ ধারণ করে যখন 'আদিবাসী মহাসভা' নাম পরিবর্তিত হয়ে 'ঝাড়খণ্ড পার্টি' রূপে আত্মপ্রকাশ করে এবং যার সভাপতি হন একজন শিক্ষিত মুন্ডা নেতা জয়পাল সিং এবং সম্পাদক হিসাবে নির্বাচিত হন ইবসেন দেবা। ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু ছিল ছোটনাগপুর এবং এখানে পূর্ব অধ্যুষিত বাসিন্দা হিসাবে মুন্ডা ও ওঁরাও জনজাতিরা বিদ্যমান ছিল। তবে, এই আন্দোলনের প্রভাব ও বিস্তার বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সাঁওতাল পরগণা ও পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিকে সংযুক্ত করা হয়েছিল, যেখানে সাঁওতালরাই ছিল প্রধান অধিবাসী। আন্দোলনের প্রথমার্ধে আদিবাসীরা 'পৃথক প্রান্ত'-এর দাবি করেছিল, আর এই দাবির পেছনে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠাকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়।[৫৭] কারণ স্বাধীনতা পরবর্তী উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় আদিবাসীদের জীবন-জীবিকা সংকটাপন্ন হয়ে পড়েছিল, তা আন্দোলনের দাবিগুলির মধ্যে স্পষ্টত দৃশ্যমান ছিল। যে দাবিগুলি 'ঝাড়খণ্ড সমন্বয় সমিতি' প্রকাশ করেছিল, সেগুলি হল—১) আলাদা ঝাড়খণ্ড রাজ্যের স্বীকৃতি, ২) জনবিরোধী শিল্পায়ন, নগরোন্নয়ন এবং বড় বড় বাঁধ নির্মাণ যা আদিবাসীদের জমি এবং ভিটে থেকে উৎখাত করেছে, জঙ্গলের অধিকার কেড়ে নিয়েছে, তার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম, ৩) সরকারি ও বেসরকারি কলকারখানা এবং ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে আদিবাসীদের পূর্ণ নিয়োগ করা। ৪) আদিবাসী ও অনুন্নত মানুষদের জন্য চাকরির সংরক্ষণ, ৫) জমি, অরণ্য, সামাজিক ও ধর্মীয় প্রশ্নে প্রাচীন গ্রাম পঞ্চায়েত এবং মাঝি-পরগণা প্রথা কার্যকর করতে হবে ইত্যাদি।[৫৮]

এই আন্দোলনের মাধ্যমে ১৬টি পাশাপাশি জেলা নিয়ে একটি পৃথক রাজ্য (পরে জেলা ভাগ হওয়ার কারণে সংখ্যাটি দাঁড়ায় ২১টি) গঠন করার দাবি ওঠে। আর এই জেলাগুলি চারটি রাজ্যের অন্তর্গত হল বিহার, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা ও পশ্চিমবঙ্গ। তবে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন (১৯৫৬) এই দাবি বাতিল করে দেয় এই যুক্তিতে যে, ছোটনাগপুর এবং সাঁওতাল পরগণা অঞ্চলে ঝাড়খণ্ড পার্টির সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই। প্রস্তাবিত অঞ্চলের সমগ্র জনসংখ্যায় আদিবাসীদের স্থান তৃতীয় এবং তারা বিভিন্ন ভাষিক গোষ্ঠীতে বিভক্ত। গোষ্ঠী এবং ভাষাগত প্রশ্নে আন্দোলনের এই সহজাত ব্যাপারটা থেকেই যায়, সেই সঙ্গে এই আন্দোলনের নেতৃত্ব ছিল সম্পূর্ণভাবে দিকু রাজনৈতিক প্রভাবিত। যার ফলাফল হিসাবে বিহারের জয়পাল সিং মুন্ডার নেতৃত্বে ঝাড়খণ্ড পার্টি কিছুটা সাফল্য অর্জন করলেও ১৯৬২ সালে নির্বাচনে হেরে যায়। আর সেই অবশ্যম্ভাবী ঘটনাটি ঘটল যখন আদিবাসীদের সর্বাঙ্গীন উন্নয়নের কথা চিন্তা না করে, ১৯৬৩ সালে জয়পাল সিং মুন্ডা কংগ্রেস পার্টিতে যোগদান করে। অন্যদিকে জয়পাল সিং সরে যাওয়ার পর ঝাড়খণ্ড পার্টির কেন্দ্র বিন্দু রাঁচি থকে সরে আসে সাঁওতাল পরগণায় এবং প্রতিষ্ঠিত হয় মুন্ডাদের জায়গায় সাঁওতালদের আধিপত্য।[৫৯] তবে শিবু সরেনের নেতৃত্বে সত্তরের দশকের প্রথমদিকে 'ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা' বা 'জে.এম.এম' দল গঠিত হলে এই আন্দোলন নিঃসন্দেহে এক ভিন্ন মাত্রা লাভ করে। শুধু আদিবাসীরাই নয় মার্ক্সসিস্ট কো-অর্ডিনেশন কমিটির এ.কে.রায়ও মোর্চাকে সমর্থন করে। অন্যদিকে নকশালরাও এই আন্দোলনকে নীতিগত সমর্থন জানায়। 'জে.এম.এম'-এর প্রাথমিক সার্থকতা অন-আদিবাসীদের জন্য নয়, মূলত এই আন্দোলন আদিবাসীদের ঐতিহ্যময় রাজনীতির পুনঃপ্রবর্তন দাবি করেছিল। এই প্রসঙ্গে অরুণাভ ঘোষ উল্লেখ করেন যে– "... The agrarian Madicalism of J.M.M was combined with the interest in cultural revivalism. Its attempt to revise the ancient practice of 'Tribal self government' virtually mobilised the adivasi world of the region".[৬০] কিন্তু এখানেও দেখা দিল এক বৈপরীত্য। বি.বি.মাহাতো এবং কিষণ চ্যাটার্জির মতো নেতারা যোগ দেওয়ায় এই আন্দোলনের মাধ্যমে আদিবাসী চরিত্রের মধ্যে একটি সর্বভারতীয় সংযোগ রক্ষা করতে চেয়েছিল, কিন্তু 'আদিবাসী স্বায়ত্তশাসন' কতখানি সর্বভারতীয় মতাদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে পারবে এই বিষয়ে একটা সংশয় দেখা দেয়। এই বহিরাগত নেতাদের আধুনিক

দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে আদিবাসী সংস্কৃতি সম্পর্কে তাদের নিজেদের ধারণার মিল পাওয়ার মধ্যে একটা সমস্যা তো নিশ্চয় ছিল। আদিবাসী জগতের বাইরে বুদ্ধিজীবীদের সাহায্য এবং সমর্থনে ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের পরিধি অনেকটা প্রসারিত হয়েছিল, কিন্তু একই সাথে এই বুদ্ধিজীবীরা দিকু রাজনীতির ত্রুটিগুলি বহন করে এনেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও শিবু সরেনের নেতৃত্ব ছিল অবিসংবাদিত, শুধু রাজনীতিই নয় সমাজ সংস্কারেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। আদিবাসীদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার ও মদ্যপানের বিরোধিতায় তার সক্রিয়তা ছিল উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এলিট রাজনীতির প্রভাবে ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের মধ্যে উপদল সৃষ্টি হয়। একদিকে সরেন ও মারান্ডি পরিচালিত জে.এম.এম, অন্যদিকে হোরো ও নরেন হাঁসদার দল। উপরন্তু ছিল আজসু ও জোহার। আর ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের এই গোষ্ঠীগত বিভাজনের দরুন মূল দাবিগুলি অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। আদিবাসী স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার থেকে সময়ের সঙ্গে এই আন্দোলনে আঞ্চলিকতার প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, যেখানে দিকুরা পুনরায় কর্তৃত্বের দাবিদার হয়ে ওঠে। তবে বিভিন্ন টানাপোড়েনের মধ্যেই শেষ পর্যন্ত ২০০০ সালে পৃথক রাজ্য হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে ঝাড়খণ্ড, তবে শুধু বিহারের ১৮টি জেলা নিয়ে এই রাজ্য গঠিত হয়।[৬১]

স্বাধীনোত্তরকালে ভারতীয় সংবিধান ও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ফলাফলের দিকে তাকালে দেখা যাবে যে, সাঁওতাল পরগণার ক্ষেত্রে বা সাধারণভাবে আদিবাসীদের ওপর এক মিশ্র পরিণতি ঘটেছিল। মনে রাখা দরকার যে দুটি বিষয়ই অর্থাৎ সংবিধান বা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা নির্ধারিত হয়েছিল ওপর থেকে। সেখানে তথাকথিত নিম্নস্তরের আদিবাসীদের আশা আকাঙ্ক্ষা কোনো গুরুত্ব পায়নি। নীতি নির্ধারণে আদিবাসীদের কোনো ভূমিকা ছিল না বললেই চলে, কারণ সংসদে আদিবাসীদের প্রতিনিধিত্ব করার কেউ ছিল না। ভার্জিনিয়াস জাক্সা (Virji xaxa) পর্যবেক্ষণ অনুসারে বলা যায় যে সংবিধানের মূল উদ্দেশ্যই ছিল সংযুক্তি (Integration), মিলন বা Assimilation নয়। উপরন্তু সেখানে পৃথক জাতিসত্তার স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নটি কোনো মান্যতা পায়নি। সংবিধানের পঞ্চম সিডিউলের ২৪৪(১) অনুচ্ছেদ অনুসারে আদিবাসী উন্নয়নের বিষয়টি বর্তায় রাজ্যের উপরে। নিম্নতম শাসনতান্ত্রিক একক হিসাবে গ্রাম পঞ্চায়েতও স্বীকৃতি লাভ করে। কিন্তু আদিবাসী অধ্যুষিত সাঁওতাল পরগণার গ্রাম গঠন ও কার্যাবলীতে সাঁওতালি ঐতিহ্যের অবসান ঘটিয়ে সরকারি আধিকারিকদের প্রাধান্য

প্রতিষ্ঠিত হয়, আর এই আমলাতন্ত্রের সবটাই ছিল উচ্চবর্গের হাতে। স্বভাবতই নীতি নির্ধারণ ও তা রূপায়ণে তাদের ভূমিকাই ছিল প্রধান। সাঁওতাল মণ্ডলী প্রথা (Headmanship) শুধু সীমিত থাকল উৎসব প্রতিপালন বা ছোটখাটো বিবাদ বিসংবাদ মেটানো বা সালিশির মধ্যে। উন্নয়নে অগ্রাধিকার কি হবে সে বিষয়ে তাদের কোনো বক্তব্য বিবেচনার অবকাশ পায়নি। এই কারণেই বিভিন্ন জলাধার প্রকল্প যেমন ডিভিসি ইত্যাদি এবং কলকারখানা স্থাপনে সাঁওতাল জমি অধিগ্রহণ ও উচ্ছেদ ঘটে যায়। যে Tribe Advisory Council গঠিত হয়েছিল তার সদস্য সংখ্যা ২০-র অনধিক হত না, এবং এর মধ্যে চার ভাগের তিন ভাগ হত রাজ্য বিধানসভায় নির্বাচিত জনজাতি প্রতিনিধি। অন্যদিকে ট্রাইব বা আদিবাসীদের চিহ্নিত করার প্রচেষ্টায় নৃতত্ত্ববিদদের এক বিশেষ অবদান আছে। এই কথা তর্কাতীত যে আদিবাসী কোনো সমপ্রকৃতি সম্পন্ন (Homogenous) গোষ্ঠী নয়। সভ্যতার বিভিন্ন স্তরে তার উপস্থিতি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় শবর, খেরিয়াদের সঙ্গে সাঁওতাল, হো বা মুন্ডারা এক গোত্রীয় হিসাবে বিবেচিত হতে পারে না। আবার উত্তর-পূর্ব ভারতের নাগা, মিজো বা খাসিয়ারা পরিবেশগত কারণেই সাঁওতাল, হো বা মুন্ডাদের জীবনযাত্রা এক নয়। কাজেই একই সংবিধান বা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বিভিন্ন জনজাতি গোষ্ঠীর উপর ভিন্ন ভিন্ন প্রভাব সূচিত করে।

১৯০১ সালের ম্যাকআলপিন রিপোর্টে উল্লেখ আছে যে, সাঁওতালরা দেনার দায়ে অধিকৃত তাদের জমি পুনরুদ্ধারের দাবি করে, কিন্তু ম্যাকালপিন এই বিষয়ে কোনো নিশ্চয়তা দিতে পারেননি।[৬২] স্বাধীনতার পরে সংবিধান ও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ফলে সেই লুপ্ত আশা পুনরায় জাগরিত হয়। আর এই আশা পূরণ না হওয়ায় ঝাড়খণ্ড আন্দোলনে পুনরায় দাবি ওঠে জমির প্রশ্নটিকে নিয়ে। ১৯৪৯-এ এই ঝাড়খণ্ড আন্দোলন দাবি তুলেছিল ‘আলাগ প্রান্ত’ বা আলাদা রাজ্যের। সত্তর দশকে এসে যখন এই আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু রাঁচি থেকে দুমকা অর্থাৎ সাঁওতাল পরগনায় স্থানান্তরিত হয় তখন জমি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয় সাংস্কৃতিক পুনরুত্থানের বিষয়টি। যেখানে মূল শত্রু হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিল ‘দিকু’ বা বহিরাগত অ-আদিবাসীরা। কিন্তু উন্নয়নের অনিবার্যতায় দিকু অনুপ্রবেশ ছিল অবশ্যম্ভাবী, কেননা পরিকল্পনা অনুসারে বৃহৎ বাঁধ বা বৃহৎ কারখানায় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত বহিরাগতরাই ছিল মূল চালিকা শক্তি। সুতরাং সাঁওতাল সমাজকে এই বাধ্যবাধকতার মধ্যেই আন্দোলন করতে হয়েছিল। বস্তুত পক্ষে ঝাড়খণ্ড

আন্দোলন ছিল নতুন করে এক আত্ম-পরিচয়ের সন্ধান। আর এই সন্ধানের মধ্যেও ইতিহাসের অনিবার্য গতিপথে কিছু দ্বন্দ্ব লক্ষণীয়। ‘দিকু’ আধিপত্যের বিরুদ্ধেই ছিল আদিবাসীদের সংগ্রাম, কিন্তু ‘দিকু’ প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া অত সহজ ছিল না। এ.কে রায় এবং কিষাণ চ্যাটার্জির মতো নেতারা ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের সমর্থনে এগিয়ে এলেন, আবার নকশালপন্থীদের একটা অংশও এর সমর্থক ছিল। ফলত দিকু-আদিবাসী সম্পর্কের চিরন্তন দ্বন্দ্বের মাঝে এগুলির সাহায্যে তৈরি হয়েছিল এক সমঝোতার বাতাবরণ। উপরন্তু নির্বাচনী রাজনীতিকে সম্পূর্ণরূপে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। এরই সামগ্রিক ফলস্বরূপ পৃথক রাজ্য হিসাবে ঝাড়খণ্ড রাজ্যের আত্মপ্রকাশ ঘটে। কিন্তু সেখানেও আদিবাসীদের স্বতন্ত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠার দীর্ঘদিনের দাবিগুলির মধ্যে একটা প্রশ্ন চিহ্ন থেকে যায়।

তথ্যসূত্র :

১. *Census of India Report, 1931*.

২. Elwin, Verrier., *The Aboriginals*, Oxford University Press, London, First Published 1943, p.19.

৩. মণ্ডল, অমলকুমার, *ভারতীয় আদিবাসী : সমাজ-সংস্কৃতি-সমস্যা-সংগ্রাম-সংকল্প*, দেশ প্রকাশন, কলকাতা, ২০১৭, পৃ. ২৯৪।

৪. Natarajan, Meenakshi, 'Tribal Haritage and People's Rights', in Abhay Flavian Xaxa and G.N Devy (eds.), *Being Adivasi : Existence, Entitlement, Exclusion*, Penguin Random House, New Delhi, 2021, p.37.

৫. Elwin, Verrier., *A Philosophy for NEFA*, Oxford, Delhi, 1959, Second Edition, 2008, p.126.

৬. Chandra, Bipan, Mridula Mukherjee, Aditya Mukherjee, *India After Independence 1947-2000*, Penguin Books India, Delhi, 1999, (অনুবাদ), আশীষ লাহিড়ী, *ভারতবর্ষ স্বাধীনতার পরে ১৯৪৭-২০০০*, আনন্দ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ২০০৬, দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০১১, পৃ. ১২৯।

৭. Tripathi,C.D., And B.Dutta-Ray, *Jawaharlal Nehru and the Disadvantaged*, Department of Parliamentary Affairs, Government of Megalaya and North East India council for Social Science Research, 1992, p.73.

৮. *The Scheduled Tribes and The Scheduled Areas Conference*, Held in Delhi on the 7th, 8th, 9th June, 1952, p.16.

৯. *Constituent Assembly Debates*, Constituent Assembly of India, Vol-Viii, 4th November, 1949.

১০. *The Scheduled Tribes and The Scheduled Areas Conference*, Held in Delhi on the 7th, 8th, 9th June, 1952, p.16.

১১. Tripathi,C.D., And B.Dutta-Ray, Jawaharlal Nehru and the Disadvantaged, Department of Parliamentary Affairs, Government of Megalaya and North East India council for social Science Research, 1992, pp.62-63.

১২. Jawaharlal Nehru's Endorsement of Verrier Elwin's Concept of Panchasil, in Relation to Tribals of India, in his Forward to *A Philosophy of NEFA*, Oxford, Delhi,1959, Second Revised Edition 2008, p.56.

১৩. Quoted from Ramachandra Guha, *Savaging the Civilized : Verrier Elwin, His Tribals, and India,* Penguin Random House India, Delhi, First Published 1999, Second Edition 2014, p.250.

১৪. *Ibid*., p.273.

১৫. Hugh Tinker, 'South Asia at Independence : India, Pakistan and Sri Lanka', in A. Jayarantam and Dennis Dalton (eds.), *The States of South Asia : Problems of National Integration*, Vikash Publishing House, New Delhi, 1982, p.14.

১৬. *Ibid*., p.10.

১৭. *Constitution Assembly Debates*, 19th December, 1946.

১৮. Banerjee, Prathama, 'Writing the Adivasi : Some Historiographical notes', *The Indian Economic and Social History Review*, 53(1), 2016, pp.135-136.

১৯. *Constituent Assembly debates, Constituent Assembly of India : Vol – VII*, Part – IX(4 November, 1948).

২০. *The First Five Year Plan : A Draft Outline*, Government of India, July-1951, (See Also), https://en.m.wikipedia.org/wiki/Five-Year_Plans_of_India. Date – 05/02/2023, Time – 1.30 P.M.

২১. *The Second Five Year Plan : A Draft Outline*, Government of India, February-1956, (See Also), https://en.m.wikipedia.org/wiki/Five-Year_Plans_of_India. Date – 10/02/2023, Time – 12.30 P.M.

২২. *The Third Five Year Plan : A Draft Outline*, Government of India, April-1961, (See Also), https://en.m.wikipedia.org/wiki/Five-Year_Plans_of_India. Date – 11/02/2023, Time – 10.30 A.M.

২৩. Ibid.

২৪. *Document of Planning Commission from 1st to 3rd Plan,* Government of India.

২৫. মাহাতো, পশুপতি প্রসাদ ও সজল বসু, *ঝাড়খণ্ড : সমাজ ও বিদ্রোহ-আন্দোলন,* বুকপোস্ট পাবলিকেশন, কলকাতা, ২০২০, পৃ. ১০৪।

২৬. Mahato, Pashupati Prasad, *Sanskritization vs Nirbakization : A Study of cultural resistance of the people of Junglemahal,* Purbalok Publication, Kolkata, First Published 2000, Second Edition 2012, p.18.

২৭. *Santhal Panganas Tenancy Laws*, Bihar Act XIV of 1949.

২৮. *Land Disputes in 'Santhal Parganas' : Issues and Solutions by Karan Satyarthi,* https://www.ideasforindia.in/topics/governance/land-disputes-in-santhal-parganas-issues-and-solutions.html Date – 15/03/2023, Time – 6.30 P.M.

২৯. *First Five-Year Plan in Bihar 1951-56,* A Review, Printed By the Superiententdent Secretariat Press Bihar, Patna, 1956, p.55.

৩০. *Ibid.,* p.57.

৩১. Mayurakshi Reservoir Project https://www.wbiwd.gov.in/index.php/applications/mayuraksh Date – 20/03/2023, Time – 4.30 P.M.

৩২. Damodar River,

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Damodar_Valley_Corporatio, Date – 25/03/2023, Time – 2.30 P.M.

৩৩. *First Five-Year Plan in Bihar 1951-56,* A Review, Printed By the Superientenddent Secretariat Press Bihar, Patna, 1956, p.125.

৩৪. Ibid., p.137.

৩৫. Ibid., p.174.

৩৬. Ibid., p.192.

৩৭. *Second Five-Year Plan in Bihar 1957-58,* A Review Progress in the Second Year, Printed By the Superientendent Secretariat Press Bihar, Patna, 1958, p.22.

৩৮. *Third Five-Year Plan in Bihar,* Volume-I, Printed By the Superientendent Secretariat Press Bihar, Patna, 1961, p.31.

৩৯. *Introductory Speech Delivered by Binodanand Jha (Chief Minister of Bihar) in Third Five-Year Plan in Bihar,* Volume-I, Printed By the Superientendent Secretariat Press Bihar, Patna, 1961.

৪০. *Third Five-Year Plan in Bihar,* Volume-I, Printed By the Superientendent Secretariat Press Bihar, Patna, 1961, p.4.

৪১. Ibid., p.57.

৪২. Ibid., p.62.

৪৩. মাহাতো, পশুপতি প্রসাদ ও সজল বসু, *ঝাড়খণ্ড : সমাজ ও বিদ্রোহ-আন্দোলন,* বুকপোস্ট পাবলিকেশন, কলকাতা, ২০২০, পৃ. ১০৪।

৪৪. তদেব, পৃ. ১০৬।

৪৫. তদেব, পৃ. ১৪৫-১৪৭।

৪৬. তদেব, পৃ. ১৪৮।

৪৭. উদ্ধৃত : সেন, শুচিব্রত, *ভারতের আদিবাসী : সমাজ, পরিবেশ ও সংগ্রাম,* বুকপোস্ট পাবলিকেশন, কলকাতা, ২০২১, পৃ. ১৬৩।

৪৮. Basu, Durga Das, *Indroduction to the Constitution of India,* Lexis Nexis, Nagpur, First Published 1960, Reprint 2012, p.430. (See Also), Chakraborty, shambhu prasad, *Tribal Right in India,* Partridge, Singapore, 2018, p.153.

৪৯. *Santal Parganas Settlement Regulation 1872*, collected copy in Jharkhand State Archive.

৫০. *Patna High Court, Shaikh Bande vs Juthas Pahan and Others.* On 17th September, 1974, equivalent citations : AIR 1975. Part 113, Bench N.Untwalia, K. Singh, S.Jha, judgement report. https://indiankanoon.org/search/?formInput=AIR%201974%20+doctypes:patna, Date - 26/03/2023, Time – 1.30 P.M.

৫১. Ibid.

৫২. Xaxa, Virginus, *State, Society and Tribes : Issues in Post-Colonial India,* Pearson, New Delhi, 2008, p.6.

৫৩. Roy Choudhury, P.C., Bihar District Gazetteer : Santal Parganas, The Superintendent Secretariat Press, Bihar, Patna, 1965, p.525.

৫৪. রায়, শরৎচন্দ্র, *ভারতবর্ষের মানব ও মানব সমাজ,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৩৮, পৃ. ৪৫।

৫৫. Xaxa, Virginus, *State, Society and Tribes : Issues in Post-Colonial India,* Pearson, New Delhi, 2008, p.71.

৫৬. Chandra, Bipan, Mridula Mukherjee, Aditya Mukherjee, *India After Independence 1947-2000,* Penguin Books India, Delhi, 1999, (অনুবাদ), আশীষ লাহিড়ী, *ভারতবর্ষ স্বাধীনতার পরে ১৯৪৭-২০০০,* আনন্দ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ২০০৬, দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০১১, পৃ. ১৩১।

৫৭. Panchbhai, S.C., 'The Jharkhand movement Among The Santals', in K.S. Singh (ed.), *Tribal Movements in India*, Vol-ii, Monohar, Delhi, 2015, p.43.

৫৮. উদ্ধৃত : মাহাতো, পশুপতি প্রসাদ ও সজল বসু, *ঝাড়খণ্ড : সমাজ ও বিদ্রোহ – আন্দোলন*, বুকপোস্ট পাবলিকেশন, কলকাতা, ২০২০, পৃ. ১৭১।

৫৯. Sengupta, Nirmal, 'Background of The Jharkhand Question', in Nirmal Sengupta (ed.), *Fourth World Dynamics : Jharkhand*, Guild Publication, Delhi, 1982, pp.5-6.

৬০. Ghosh, Arunabha, 'Probing the Jharkhand Question', *Economic and political Weekly*, Vol.26, No.18 (May 4, 1991), pp.1173-1181.

৬১. উদ্ধৃত : সেন, শুচিব্রত, *ভারতের আদিবাসী : সমাজ, পরিবেশ ও সংগ্রাম*, বুকপোস্ট পাবলিকেশন, কলকাতা, ২০২১, পৃ. ১৬৫।

৬২. McAlpin, M.C., *Report on The Condition of The Sonthals of Birbhum, Bankura, Midnapore and North Balasore*, First Published in 1909, Bengal Secretariat Press, Reprint, Firma K.L.M, Calcutta, 1981, p.57.

পঞ্চম অধ্যায়

সাঁওতাল পরগণার সাঁওতাল সমাজ-সংস্কৃতিতে পরিবেশের প্রভাব

পঞ্চম অধ্যায়

সাঁওতাল পরগণার সাঁওতাল সমাজ-সংস্কৃতিতে পরিবেশের প্রভাব

পরিবেশ বলতে কী বোঝায়, তার ব্যাখ্যায় অনেক সংজ্ঞা উঠে আসে। কিন্তু এক কথায় বললে বলা যায় যে, এটি হল প্রাণ ও অপ্রাণের পারস্পারিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার সম্পর্ক, বিজ্ঞানসম্মতভাবে যাকে বলা হয় Biotic ও Abiotic-এর সম্পর্ক। মানব জীবনের ওপর পরিবেশের প্রভাব বিভিন্ন ভাবেই অনুভূত হয়। বস্তুতপক্ষে, এই পরিবেশ কেন্দ্রিক ঐতিহাসিক আলোচনা সময়ের প্রয়োজনে এখন সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। সেই দিক দিয়ে দেখলে আদিবাসীদের সমাজ সংস্কৃতিতে পরিবেশের আলোচনা বিশেষ গুরুত্ব রাখে। আদিবাসী চেতনায় Homo Centric বা মানুষ এবং একই সাথে Helio Centric অর্থাৎ সূর্যের বিরাট ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। সাঁওতালরা তাদের আত্ম-পরিচয়ে বলে 'আবো দো হড় জাতি', যার অর্থ তারা প্রকৃত মানুষ। আবার জড় উপাসক হিসাবে তাদের কাছে সূর্যের প্রাধান্য বেশি, যার প্রমাণ তাদের অন্যতম প্রধান দেবতা হল 'সিংবোঙ্গা'। অন্যদিকে চাঁদের রূপকল্প সর্বশক্তিমান বোঙ্গা-র প্রতিনিধি হিসাবে অনেক দিন ধরে চালু ছিল এবং পরে তাকে সরিয়ে দেয় ঠাকুরজীউ। কিন্তু সাঁওতালদের স্মৃতিতে বর্তমানে এরা সকলেই মারাংবুরু, চান্দোবোঙ্গা এবং সিংবোঙ্গা হিসাবে বিদ্যমান। তারা মনে করে পৃথিবী জীবন্ত অস্তিত্ব এবং প্রতিটি জীব ও জড়েরই আত্মা আছে এবং জীবন দর্শনের কেন্দ্রে তারা যে মূল্যবোধকে অনুসরণ করে তা প্রকৃতি প্রদত্ত, এমনকি অভিবাদন জানানোর বার্তা 'জোহার'-এর প্রচলন এই মূল্যবোধের উদাহরণ। এছাড়াও তাদের যৌথ নৃত্য এবং গানের সময় তারা প্রকৃতি থেকে শেখা ছন্দই অনুসরণ করে। তাদের এই প্রকৃতি চেতনার সঙ্গেই জড়িয়ে ছিল সাংস্কৃতিক চেতনা, তাই Biotic এবং Abiotic সূত্রে বলতে গেলে তাদের কাছে অরণ্য, নদী, পর্বত সবাই দেবতা এবং এদের রক্ষা করা তাদের কর্তব্য। পশ্চিমের Conservation বা সংরক্ষণ তত্ত্বের বহু পূর্বেই সাঁওতালদের মধ্যে এই ধারণা সম্যক বিদ্যমান ছিল। ভেরিয়ার এলুইন তাই যথার্থই বলেছেন, "For centuries environment has been the real ruler of the Tribals"।[১] তবে আদিবাসী পরিবেশ চেতনা ও আধুনিক পরিবেশের ইতিহাসের মধ্যে এক পার্থক্য বিদ্যমান। প্রজন্মের পর প্রজন্মব্যাপী নিরন্তর

প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের জ্ঞান আদিবাসীদের পরিবেশ চেতনার সৃষ্টি করেছিল। উপরন্তু জল, জঙ্গল ও জমি ছিল তাদের কাছে অস্তিত্বের পরিচায়ক। অন্যদিকে আধুনিক পরিবেশ ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিকতা ও ধনতন্ত্র ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আর একে কেন্দ্র করে উভয়ের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব, তা আদিবাসী পরিবেশ চেতনায় পরিবর্তন নিয়ে আসে।

আদিতে জঙ্গলমহল বা সাঁওতাল পরগণায় বৃক্ষচ্ছেদন করেই কৃষিজমির বিস্তার ঘটেছিল এবং একে পরিবেশ হনন বললে ভুল হবে কেননা, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে ১৮৩০-এর দশক পর্যন্ত জঙ্গল পরিষ্কার করে কৃষিজমির রূপান্তর ছিল এক ঐতিহাসিক অনিবার্যতা। ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির ভূমি রাজস্ব নীতি ও সাঁওতাল স্ব-বাস ভূমি প্রতিষ্ঠা উভয়ই ছিল এর জন্য দায়ী। তথাপি একথা বহু আলোচিত যে জঙ্গল থেকেই সাঁওতালরা আহরণ করত ফলমূল, রন্ধনের জন্য কাঠ, মধু এবং পশু-পাখির মাংস। ডবলু.ডবলু.হান্টার যথার্থই বলেন যে, “The Jungle, is their unfaileng friend”।[২] তাই জঙ্গল নিধনের সময়ও এই আদিবাসীরা নির্বিচারে জঙ্গল কাটার পক্ষপাতী ছিল না। সম্ভবত দীর্ঘকাল অরণ্যের মধ্যে বসবাসের ফলে তাদের মধ্যে খুব স্বাভাবিক ভাবেই জন্ম নিয়েছিল অরণ্যের প্রতি এক মমত্ববোধ। ক্যাপ্টেন শেরউইলের বর্ণনায় এর আভাস পাওয়া যায়, “A Santhal although he does clear away the forest in a most masterly style, he has the good taste to spare all the useful and ornamental trees when of any decent size, this always impart a decent parklike appearance to the Santhal Clearance”।[৩] আবার Velayutham Saravanan তাঁর *Environmental History and Tribes in Modern India* (2018) গ্রন্থে পরিবেশ নিয়ে যে বিতর্কের উল্লেখ করেছেন তা হল, উপনিবেশ পূর্বকালে প্রকৃতি ও সমাজের মধ্যে একটা সমতা বিরাজ করত, কিন্তু পরবর্তীকালে বাণিজ্যায়ন, ধনতান্ত্রিক বিনিয়োগ এবং প্রকৃতির সংরক্ষণ সমাজের ক্ষেত্রে একটা বিভাজনের সৃষ্টি করে।[৪] এর সঙ্গে অবশ্যই যুক্ত করতে হবে ঔপনিবেশিক উত্তর ভারতের উন্নয়ন প্রক্রিয়ার ফলাফল।

মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক মানুষের পৃথিবীতে আবির্ভাবের সময়কাল থেকেই। যেকোনো সভ্যতার ক্রমবিকাশের প্রয়োজনীয় যাবতীয় উপাদান পরিবেশের

মধ্যেই অন্তর্নিহিত রয়েছে। তবে আদিবাসীদের ক্ষেত্রে পরিবেশগত সম্পদগুলি কেবলমাত্র পরিচয়ই নয়, তাদের অস্তিত্বের নিদর্শন। প্রকৃতি তাদের জীবন-যাপনকে যে রূপ দিয়েছিল তা অন্যান্য সম্প্রদায়ের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। তারা তাদের বাস্তবতাকে সবসময় প্রকৃতির পরিপ্রেক্ষিতেই বুঝত, এটি তাদের এক ‘Way of Life’। প্রথম থেকেই আদিবাসীরা জল, জঙ্গল ও জমি কেন্দ্রিক, তাই এগুলির সংরক্ষণ তাদের কাছে এতই স্বাভাবিক যে, এই বিষয়ে কোনো বক্তব্য উপস্থাপনে তারা বিস্মিতই হয়। প্রাত্যহিক পর্যবেক্ষণ এবং দীর্ঘ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তারা প্রকৃতিকে চিনতে ও বুঝতে পেরেছে। আর এই সব জ্ঞানই বংশপরম্পরায় শ্রুতির মাধ্যমে স্মৃতিতে পরিবাহিত হয়েছিল তাদের উত্তর পুরুষে। তাদের জীবন যেহেতু অতিবাহিত হত শুধু বেঁচে থাকার অর্থনৈতিক (Subsistence Economy) তাগিদে, সেহেতু খাদ্য সংগ্রহ থেকে আনন্দের উৎস আহরণ সবই প্রকৃতি কেন্দ্রিক। তবে অন্যান্য সম্প্রদায়ের মতো কেবলমাত্র বেঁচে থাকার জন্যই নয়, প্রকৃতির সঙ্গে আদিবাসীরা জড়িয়ে আছে সংস্কার ও সংস্কৃতিগতভাবে। ভারতবর্ষের অন্যতম ও বৃহত্তম জনজাতি সাঁওতালরা সবসময় প্রকৃতির সাহচর্যে থেকেছে। তাই তাদের সামাজিক ধ্যান-ধারণা, সংস্কৃতির বিন্যাস, মানসিক গঠন সমস্ত কিছুই পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্কিত। পরিবেশের এই সামগ্রিক বাস্তবতাকে সাঁওতালরা ‘দিশম’ শব্দটি দ্বারা প্রকাশ করে, যার অর্থ দেশ এবং যেখানে জীব ও জড়কে একত্রিত করেই ভাবা হয়। বিনীতা দামোদরন একেই ‘Landscape’ বলে উল্লেখ করেছেন।[৫] আর এই ‘দিশমের’ উপর ভিত্তি করেই তাদের সৃষ্টিতত্ত্ব, ভাষা, লিপি, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চেতনার উদ্ভব। আবার পরিবেশগত অবস্থানের ভিন্নতাই একই গোষ্ঠীর মধ্যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চেতনার পার্থক্য গড়ে তোলে। প্রকৃতি ও মানুষের এই পারস্পারিক সাম্যকে আধুনিক পরিভাষায় বলা হয় ‘Ecological Balance’, যা আদিবাসী জীবনের মনস্তত্ত্বের এক বিশাল ও অবহেলিত দিক। যে অঞ্চলে এদের মূল বাসস্থান তার প্রাকৃতিক পরিচয়ে উদ্ঘাটিত হয় জীবনের মূল সুর, আর এতেই আছে তাদের নাড়ির স্পন্দন। প্রকৃতিকে জয় করার বাসনা এদের কোনো দিনই ছিল না, ছিল প্রকৃতির সঙ্গে সমঝোতার চেষ্টা। উপনিবেশ পূর্ব যুগে শাসকশ্রেণি পরিবেশের উপর খুব একটা হস্তক্ষেপ করত না, কিন্তু ব্রিটিশদের আগমনের পর থেকেই রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য জঙ্গল ধ্বংসের প্রয়োজন দেখা দেয়। কৃষিকাজের জন্য

পরিকল্পিতভাবে বনাঞ্চল ধ্বংস করা হয় এবং এই সবই ছিল রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য। এরপর রেলপথ নির্মাণেও বনাঞ্চলের পরিসর কমে আসে, অর্থাৎ প্রকৃতি নির্ভর এই বাস্তুসংস্থান এক ধাক্কায় বদলে যায় কোম্পানির আমলে। নেহাতই বাণিজ্যিক প্রয়োজনে জঙ্গলের পর জঙ্গল ধ্বংস করা হয়। কোম্পানি শাসনাধীন এলাকায় পুরনো জঙ্গলের জমি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে জমিদারদের হাতে চলে আসে, কোথাও সমগ্র জঙ্গলই জমিদারি সম্পত্তি হয়ে যায়। ফলত এতদিন যা ছিল সামাজিক বা সাধারণ সম্পত্তি, সর্বসাধারণের ভূখণ্ড, তা বদলে যায় ব্যক্তি সম্পত্তিতে। অথচ গোষ্ঠীভিত্তিক সমতাবাদী আদিবাসী জীবনে জল, জঙ্গল ও পাহাড়ই ছিল দেবতা। এই সময় থেকেই শুরু হয় আদিবাসীদের বাস্তুচ্যুতির ইতিহাস। এমনকি স্বাধীনতার পড়েও যখন উন্নয়নের নামে জঙ্গল কেটে রাস্তা তৈরি অথবা নদী-বাঁধ নির্মাণ কিংবা কলকারখানা তৈরির জন্য আদিবাসী জমি অধিগ্রহণ, সবই পরিবেশ ধ্বংস করে এটিই আদিবাসীদের ধারণা। কাজেই আদিবাসীদের পরিবেশ চেতনা ইতিহাসের আলোচনার এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

সাঁওতাল পরগণার সাঁওতালদের প্রকৃতির তথা পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্ক নির্ণয়ে আমাদের সেখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। ইতিহাসের এই আলোচনায় আমাদের একটু চোখ ফেরাতে হবে ভূগোলের দিকে। কারণ আদিবাসী পরিবেশ ইতিহাস নির্মাণে ভৌগোলিক পটভূমির পরিচয় একটি আবশ্যিক শর্ত, কেননা এই প্রেক্ষাপট ব্যতীত তাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিকগুলির উপস্থাপনা অসম্ভব। সাঁওতাল পরগণা অঞ্চলটি পূর্বতন বঙ্গপ্রদেশের অন্তর্গত ছিল, তবে বর্তমানে ভারতবর্ষের ঝাড়খণ্ড রাজ্যে অবস্থিত। এই অঞ্চলটি মূলত জঙ্গলময় পার্বত্য এলাকা, যা খনিজ সম্পদ, ভেষজ উদ্ভিদ ও প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ। প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ এই অঞ্চলে বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ যেমন শাল, মহুয়া, পলাশ, নিম বিভিন্ন প্রজাতির বাঁশ পাওয়া যায়। আর খনিজ সম্পদের মধ্যে রয়েছে কয়লা, চুনাপাথর, চিনামাটি, লোহা, তামা, রূপা ও সিসা। আবার এই অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে গঙ্গা, গোমানী, অজয়, ব্রাহ্মণী, ময়ূরাক্ষী, বাঁশলই, মুর প্রভৃতি নদী। পার্বত্য অঞ্চল হওয়ায় এখানে ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারী পর্যন্ত সবচেয়ে বেশী ঠাণ্ডা থাকে। আর মে-জুন মাসে উষ্ণতা থাকে সব থেকে বেশি। সাঁওতাল পরগণায় বছরে গড়ে ৫৯ দিন ২.৫ মিলিমিটার করে বৃষ্টিপাত হয়। জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে এখানে সর্বাধিক

বৃষ্টিপাত হয়।[৬] আর এই ধরণের ভৌগোলিক পরিমণ্ডল এখানকার সাঁওতালদের সমাজ সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক অনন্যতা প্রদান করে। এ প্রসঙ্গে জার্মান নৃতত্ত্ববিদ Frantz Boas বলেন, Environment, culture as well as physical, has a determining effect on the way one views the World।[৭] এই ভূপ্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য অন্যান্য এলাকার সাঁওতালদের সঙ্গে এই এলাকার সাঁওতালদের কিছু কিছু ক্ষেত্রে পার্থক্য গড়ে তোলে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সাঁওতালরা কার্তিক মাসে সহরায় উৎসব পালন করলেও সাঁওতাল পরগণার সাঁওতালরা করে পৌষ-মাঘ মাসে।[৮] আবার অভিপ্রয়াণের মাধ্যমে এই এলাকার সাঁওতালরা সবথেকে বেশি স্থানান্তরিত হয়, অন্যদিকে দিকুদের সংখ্যা দ্রুত তাদের এলাকায় বৃদ্ধি পায়। আবার রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সঙ্গে সাঁওতাল পরগণার সীমানার ও নামের (জঙ্গল তরাই–দামিন-ই-কো-সাঁওতাল পরগণা–ঝাড়খণ্ড) পরিবর্তন ঘটে বার বার, যা এই এলাকার সাঁওতালদের জনজীবনে যথেষ্ট প্রভাব ফেলে।

প্রকৃতির সঙ্গে সাঁওতাল তথা জনজাতিদের এই সম্পর্কটা নতুন কিছু নয়। জনজাতিরা নিজেদের ‘হড় হপন’ হিসাবে পরিচয় দেয়, যেখানে সাঁওতাল, হো, মুণ্ডা প্রভৃতি আরোপিত নাম। আর এই ‘হড় হপন’ চেতনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িয়ে আছে ‘হড় দিশম’-এর ধারণা। এইভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে সাঁওতালদের জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ এবং ধর্মের প্রতিটি ক্ষেত্রে ছড়িয়ে রয়েছে প্রকৃতির ছাপ। ওঙ্কার প্রসাদ দেখিয়েছেন যে তাদের সংগীতের তাল বাদ্যের শব্দ পর্যন্ত প্রকৃতি থেকে আহরিত।[৯] তবে আদিবাসীদের নিজস্ব লিখিত উপাদান না থাকায় ইতিহাসগতভাবে এই আলোচনায় যে সকল তত্ত্ব প্রয়োগ করা হয়েছে, তা আমাদের বিভ্রান্ত করে। কারণ এগুলোর অধিকাংশ বিদ্যায়তনিক বা প্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোচিত। আবার প্রামাণ্য তথ্য ব্যতীত ইতিহাস হয় না, আর এই তথ্যের খোঁজে ঐতিহাসিক ছোটেন মহাফেজখানায়, চান লিখিত দলিল; আর আদিবাসী ইতিহাস রচনার সীমাবদ্ধতা এখানেই। জ্ঞানের এক বিরাট সঞ্চয় আদিবাসীদের থাকলেও নিজেদের কোনো বর্ণমালা না থাকায় যেমন তাকে দীর্ঘকাল প্রকাশ করতে পারেনি তেমনি তারা শাসকের থেকে কোনো বর্ণমালাকে গ্রহণও করেনি বা গ্রহণ করলেও তাতে তাদের মনের ভাবনাকে সঠিকভাবে প্রকাশ করতে পারেনি। যার ফলে প্রকৃতির সঙ্গে তাদের সম্পর্কের চেতনা স্মৃতিতেই গচ্ছিত

ছিল। আবার আদিবাসীদের জীবন এবং বিশ্বের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে বুঝতে গেলে তাদের কল্পনার জগতের সঙ্গে আরো অন্তর্ভুক্ত হতে হবে, যে কারণে তাদের ভাষা এবং সাহিত্যের গুরুত্বকে এড়িয়ে যাওয়া যায় না।[১০] সুতরাং ইতিহাস যে চলমান জীবনের ছবি তার সবটুকু হদিশ লিখিত তথ্যে নাও মিলতে পারে। তাই ঐতিহাসিককে খুঁজে নিতে হয় নৃতত্ত্ব, সাহিত্যের উপাদান ও মৌখিক তথ্যকে। ১৯৭০ দশকের পর থেকে ইতিহাসের আলোচনায় এই বিষয়গুলিকে বিশেষ ভাবে প্রাধান্য দেওয়া হয়। Marc Bloch তাঁর *The Historian's Craft* (1954) গ্রন্থে একই মতামত পোষণ করেন। যার ফলে আদিবাসী ইতিহাস রচনায় এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন ঘটে, যেটি অনেক ক্ষেত্রেই Beyond Archives।

এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে সাঁওতালদের বিন্তিগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় সাঁওতালদের সৃষ্টি তত্ত্বের কাহিনীর মধ্যেই রয়েছে পরিবেশ চেতনা। সাঁওতালি জন্ম কথা শুরু হয় এই বলে,

"বেড়ায় রাকাব আ অকাস্যে রে, জানাম লেনাবন।
মানওয়া অনেতেরে, দৃরয়া লাতার হাসা, ইনৈয়াতে তাঁহে কানা ধ্যর্তি।"[১১]

অর্থাৎ সূর্য যেদিকে ওঠে, ঠিক সেই দিকেই আমাদের জন্ম হয়েছিল, তখন চারিদিকে শুধু জল আর জল, আর ছিল জলের নীচে মাটি। কারাম বিন্তি অনুযায়ী ঠাকুরজীউ, পিলচু হাড়াম ও পিলচু বুড়িকে কেন্দ্র করে সাঁওতাল সৃষ্টিতত্ত্বের যে আখ্যান রয়েছে, তাতে প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদান যেমন—পাহাড়, পর্বত, জল, মাটি, বিভিন্ন জলজ প্রাণী (কুমির, চিংড়ি, কাঁকড়া, কেঁচো) প্রভৃতিকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে। সেখানে বলা হয় সৃষ্টিকর্তা অর্থাৎ ঠাকুরজীউ প্রথমে সামুদ্রিক প্রাণীদের সৃষ্টি করেন এবং পরে মানুষকে সৃষ্টি করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। প্রথমে তিনি মাটি দিয়ে দুটি মানুষের মূর্তি করেন, কিন্তু সূর্যের ঘোড়া (সিঞ সাদন) এসে মাটির মূর্তি দুটি ভেঙ্গে দেয়। এবার ঠাকুরজীউ নিজের বুকের অস্থি দিয়ে 'হাঁস-হাঁসিল' নামের দুটি পাখি তৈরি করেন এবং তিনি পাখি দুটিকে নিজের প্রাণবায়ু দিয়ে জীবন্ত করে তোলেন। কয়েকদিন পর হাঁসিল 'হিহিড়ি-পিপিড়ি' নামক স্থানে দুটি ডিম পাড়ে, সেই দুটি ডিম থেকে একটি মানব শিশু পুত্র ও শিশু কন্যার জন্ম হয়। আর এদের নাম হল—'পিলচু হাড়াম' (প্রথম বৃদ্ধ) এবং 'পিলচু বুড়হি' (প্রথম বৃদ্ধা), আর এরাই হল সাঁওতালদের আদি পিতা-মাতা।[১২] সুতরাং

সাঁওতালদের সৃষ্টিতত্ত্বের আখ্যানের মধ্যেই রয়েছে প্রকৃতি চেতনার নিদর্শন। আবার কর্মের ভিত্তিতে সাঁওতালরা **১২**টি গোত্রে বিভক্ত এবং প্রত্যেকটি গোত্রের বৈশিষ্ট্য চিহ্নিতকরণের জন্য প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানকে প্রতীক রূপে ব্যবহার করা হয়। যা নিম্নরূপ[১৩]—

গোত্রের নাম	গোত্রের প্রতীক	গোত্রের ধর্মীয় প্রতীক
হাঁসদা	হাঁস	কেয়া ফুল, সাদা রঙ, বনের ছত্রাক, বেণা ঘাস।
মুরমু	নীলগাই	চাঁপা ফুল, খুড়চি ফুল, পলাশ ফুল, সাদা রঙ।
সরেন	সপ্তর্ষি	আমলকি গাছ, সাদা রঙ, তসর, সিঁদুর।
টুডু	জানা নেই	হাঁড়িয়া, সোনা।
মার্ডি	মেরদা	পিয়াল গাছ, ধ-গাছ, ঘোড়া, সোনা, মিরুবাহা মুগুর।
বেসরা	বাজপাখি	কাক, শকুন, নিমকাঠি, হাঁড়িয়া।
চঁড়ে	গিরগিটি	শকুন, সাদা রঙ।
বাস্কে	পান্তাভাত	কাঠবিড়াল, সোনা, শকুন।
কিস্কু	শঙ্খচিল	কেয়া ফুল, সাদা রং, শকুন, ঘোড়া, রুপা, কাঠবিড়াল।
পাঁউরিয়া	পায়রা	কাঠবিড়াল, সাদা রঙ।
বেদেয়া	জানা নেই	জানা নেই।
হেমব্রম	সুপারি	আমলকি গাছ, তসর, সাদা রঙ, শকুন, শাঁখা।

এই সব টোটেম গড়ে উঠেছে পূর্বপুরুষদের অভিজ্ঞতা থেকে, এখানে কোনো অলৌকিকতা, যুক্তিহীনতা নেই। গাছ-গাছালি, পশুপাখির রঙ—এমন নান্দনিক বিষয়কে পূর্বজনেরা বিচার করেছিল উপকারী ও ক্ষতিকর-এর দৃষ্টিভঙ্গিতে, যেখানে ছিল তাদের নিজস্ব পরিবেশ চেতনা। আবার সাঁওতালদের গ্রামসমাজের পত্তনের মধ্যেও জড়িয়ে আছে প্রকৃতির বন্ধন। সাধারণত, সাঁওতাল গ্রাম সাধারণ বর্গের কৃষকদের থেকে বিচ্ছিন্ন ভাবে অবস্থান করে। এই ধরনের গ্রাম ভৌগোলিক বা ইতিহাসগত দিক থেকে অবস্থিত কোনো গ্রাম নয়, বরং কিছু রীতি-নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত, যা মূলত প্রকৃতিকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে। এই ধরনের গ্রামীণ সমাজ কাঠামো কিছু প্রাকৃতিক শর্তের ওপর প্রতিষ্ঠিত যথা—

১) কৃষিকাজের উপযুক্ত জমি

২) মহুয়া ও শালবনের উপস্থিতি

৩) জলের উৎস

এ বিষয়ে ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে বলেন, ‘বন, জঙ্গল ও নদীর কাছাকাছি উঁচু জায়গা বেছে নিয়ে সেখানেই সাঁওতালরা গ্রাম প্রতিষ্ঠা করে।’[১৪] অন্যদিকে সাঁওতাল গ্রাম পরিচালনার জন্য যে সব প্রতিষ্ঠান রয়েছে, তা মূলত প্রকৃতির মূল্যবোধকেই কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। যেমন— ‘ল-বির-বাইসি’ (সাঁওতালদের উচ্চতর বিচারসভা)-র মতো প্রতিষ্ঠানের গঠন প্রণালী ও নির্বাচন পদ্ধতি মূলত তারই প্রতিফলন।[১৫]

সেই সঙ্গে সাঁওতালরা বাসস্থান নির্মাণের ক্ষেত্রেও পরিবেশের ওপর নির্ভরশীল। সাঁওতাল বাড়িগুলো মূলত কাদামাটি, খড়, বাঁশ, গাছের পাতা এবং টালি দিয়ে তৈরি করা হয়। তারা বাড়ির ছাঁচ তৈরির জন্য বাঁশ ও কাঠ ব্যবহার করে আর ছাউনির জন্য ব্যবহার করে খড়, তালপাতা, লম্বা ঘাস প্রভৃতি। এছাড়াও তারা কাদামাটির দেওয়াল তৈরি করে রোদে শুকিয়ে পুনরায় কাদামাটি ও গোবর দিয়ে তা প্লাস্টার করে।[১৬] আবার সাঁওতালদের বাড়িগুলির দেওয়ালে নানা রকম ফুল-পাতা-জীবজন্তুর ছবি আঁকা থাকে, যাকে ‘ফ্রেসকো’ বলা হয়। এই ফ্রেসকো বা দেওয়াল চিত্রে প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত করে তাদের সমাজ ও সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যগুলোকে সাঙ্কেতিক আকারে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হয়। যেমন, বাড়ির দেওয়ালে লতা-পাতা, ফুল আঁকা থাকলে এবং পাশাপাশি লতানো গাছ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে—এমন বোঝানো হলে, এর অর্থ দাঁড়ায় বাড়িটি একান্নবর্তী পরিবারের এবং লোকজন সুখে-শান্তিতে আছে। আবার যদি দেখা যায়, মাদল, ধামসা, বাঁশির চিত্র এবং পাশাপাশি নাচগানের দৃশ্য আঁকা আছে তবে এর অর্থ হয়, বাড়ির লোকজন সংগীত প্রেমী। তীর, ধনুক, কুকুরের দেওয়াল চিত্র জানায় যে লোকজন খুব শিকার প্রিয়।[১৭] এক্ষেত্রে তারা চিহ্ন হিসাবে দৈনন্দিন ব্যবহার্য জিনিসকে যেমন আশ্রয় করে, তেমনি প্রকৃতি থেকেও চিহ্নের উপকরণ নিয়ে থাকে। গবেষক সাঁওতাল পরগণার একাধিক গ্রাম (সিমলাডাঙ্গাল, তেলিয়াবাঁধি, জোডডিহা, দুমা, ভীমপাহাড়ি) পর্যবেক্ষণ করে এই দেওয়াল চিত্রের বিষয়গুলি লক্ষ্য করেছেন এবং গ্রামের মানুষের সঙ্গে আলাপচারিতার মাধ্যমে উঠে আসে দেওয়াল চিত্রের সঙ্গে প্রকৃতির মেলবন্ধনের বিষয়টি।[১৮] সিমলাডাঙ্গাল গ্রামের জহর মুরমু এই প্রসঙ্গে বলেন, “আমাদের বাড়ির দেওয়ালে যেসব ছবি আঁকা হয় তাতে প্রকৃতির নানা বিষয়কে প্রতীক করে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিকের নানা বিষয়কে উপস্থাপন করা হয়। কারণ প্রকৃতিকে বাদ দিয়ে যদি কিছু বিষয় বলা হয় বা উপস্থাপন করা হয় তাহলে আমাদের সমাজের

মানুষ তা বুঝে উঠতে পারে না। কারণ জন্মের থেকেই আমরা প্রকৃতির সঙ্গে বেড়ে উঠি আর প্রকৃতিকেই আমরা আমাদের পরিবার ভাবি।”[১৯] শুধু তাই নয়, এই ছবিগুলি আঁকার ক্ষেত্রে যে রঙের ব্যবহার করা হয় সেক্ষেত্রেও প্রকৃতির উপাদানকে উপকরণ হিসাবে বাছা হয়। রঙ তৈরির ক্ষেত্রে গাছের ছাল সেদ্ধ করে, অনেক সময় খড় পুড়িয়ে কালো রঙ তৈরি করা হয়। আবার গাছের ফুল, লালমাটি, খড়িমাটি, পাতা শুকিয়ে গুড়ো করে রঙ প্রস্তুত করা হয়।[২০] শুধুমাত্র দেওয়াল চিত্রেই নয় উলকির বিষয়বস্তু হিসাবে প্রাকৃতিক উপাদন গুলিকেই প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করা হয়। সাধারণত সাঁওতাল মেয়েদের হাতের কনুই থেকে আঙুলের গোড়া পর্যন্ত যে কোনো জায়গায়, বুকে, গলার নীচে উলকি নেওয়ার প্রচলন রয়েছে। ফুল, লতা-পাতা, কাঁকড়া বিছে, চন্দ্র-সূর্য, তারা, মুরগীর পায়ের ছাপ ইত্যাদিকে উলকির প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও বার্তা বহনের ক্ষেত্রেও তারা প্রকৃতিকেই আশ্রয় করে থাকে। এই সমাজের মানুষেরা কোনো খবর বা নির্দেশ পাঠানোর জন্য গাছের পাতা সহ ডালকে প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করে। সাধারণত মহুয়া গাছের ডাল, আম গাছের ডাল, শাল গাছের ডাল ব্যবহার করা হয়। আর ডাল ও পাতা দেখলেই এই সমাজের মানুষেরা বার্তার অভিপ্রায় বুঝতে পারে। যেমন, পাতা সহ মহুয়া ডাল দেখলেই বুঝে যায় সমাজ বিষয়ক কোনো বড় সভার আয়োজন করা হয়েছে, তেমনি আম ডাল পাঠানোর অর্থ উৎসব পালন সংক্রান্ত সামাজিক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে। আবার পাতা সহ শাল গাছের ডাল পাঠানোর অর্থ হয় কোনো ধর্মীয় আহ্বান বিষয়ক বার্তা।[২১] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ১৮৫৫ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহে সিধু-কানহু সাঁওতালদের এক জোট করার জন্য গ্রামে গ্রামে শাল গাছের ডাল পাঠিয়ে ছিলেন, যাকে ‘গিরা’ বলা হয়।

সাঁওতাল সমাজ জীবনে জঙ্গলের অবদান ছিল অপরিসীম। জঙ্গলের সঙ্গে আদিবাসীদের সম্পর্কের গভীরতা তাদের জীবন-জীবিকা অনুধাবন করলেই বোঝা যায়। তাদের এই সম্পর্কের কথা বলতে গিয়ে Rucha S. Ghate উল্লেখ করেন– “To a vast number of Tribal people, the forest is a home, a lifelihood, the very existence. Its gives them food-fruits of all kind, edible leaves, honey, nourishing roots, Wild game and fish. It provides them materials to build their houses and things for practicing their arts.”[২২] উপনিবেশ-পূর্ব ভারতে পরিবেশই ছিল তাদের জীবনযাপনের তথা অস্তিত্ব রক্ষার একমাত্র সহায়। আবার

জঙ্গলের মধ্যেই ছিল তাদের পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্যের নিদর্শন। তাই আদিবাসীরা নিজেদের ভাষায় বলেন—আতা মত বির কো তালারে অর্থাৎ ঘন জঙ্গলের নীচে আমাদের বাপ–ঠাকুরদার দিন কেটে ছিল।[২৩] আবার সাড়োয়া-র সাঁওতালরা একবার রেভারেন্ড জন ব্যাপটিস্ট হপম্যানকে বলে ছিলেন 'বীর বানোঃ দিশম আলে হোড়োকো কালে সুকুআ।'[২৪] অর্থাৎ যেখানে অরণ্য নেই, আমরা সাঁওতালরা সেই দেশে বাস করে কোনো দিনই সুখী হব না। সেই সঙ্গে সাঁওতাল যৌথস্মৃতিতে রয়েছে মান বির, সিন বির আর হাসা বির (বির মানে জঙ্গল)-এর কথা, যেখানে প্রথম ১২ জন বালক-বালিকা (সাঁওতালদের পূর্বপুরুষ) বাস করত, মারাং বুরু (মহান পর্বত বা সর্বশক্তিমান সত্তা) তাদের অরণ্যের গান গাইতে, বাঁশি বাজাতে, ধামসা বাঁজাতে আর নাচতে শিখিয়ে ছিলেন। প্রকৃত পক্ষে আদিবাসীদের অসংখ্য গান ও নাচের ভঙ্গিতে প্রকৃতির বন্দনাই প্রধান বিষয়। অন্যদিকে জঙ্গলের প্রভাব রয়েছে বিভিন্ন স্থান-নামেও। অনেকক্ষেত্রে আদিবাসীদের গ্রামের নামগুলিও গাছ ও ফুলের নামে নেওয়া। গ্রাম পত্তনের সময় জঙ্গলকে কেন্দ্র করে সাঁওতালদের জাহের বা জায়ের (পবিত্র থান) থান স্থাপন করা হয়।[২৫] এক নারী পুরোহিতের আত্মার নামে এই নামকরণ করা হয়, যিনি ধরিত্রী মার রূপকল্প। এই 'থান'-এর পবিত্র জীববৈচিত্র্য আবহমানকালের জন্য যত্ন ও ভক্তিতে বজায় রাখা হয়, কারণ সেটিকে বিদেহী আত্মার বাসভূমি বলে মনে করা হয়। পবিত্র থান বা জাহের থান সেই কারণে সাঁওতালদের বিশ্বাসের জগতের কেন্দ্রে অবস্থান করে। তবে একে কখনই হিন্দুদের মন্দিরের সঙ্গে তুলনা করা যায় না। নৃত্য পূজার জন্য সেখানে কোনো মানবাকৃতি প্রতিমা রাখা হয় না। আমরা ধর্ম বলতে সাধারণত যা বুঝি, মন্দির সম্পূর্ণ তারই সঙ্গে যুক্ত। যুগ যুগ ধরে অতিপ্রাকৃতকে বিশ্বাস করে, মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক বজায় রেখে এসেছে, এটা তারই মূর্ত প্রতীক।[২৬] আজকের বাস্তবতায় এটাকে আদিবাসীদের প্রকৃতি সংরক্ষণের উদ্যোগ হিসাবে দেখা যেতে পারে। এ বিষয়ে মাধব গ্যাডগিল তাঁর 'Sacred Groves : An Ancient Tradition of Nature conservation' প্রবন্ধে উল্লেখ করেন যে— "A legacy of prehistoric traditions of nature conservation, sacred groves are patches of forest that rural communities in the developing world protect and revere as sacrosanct. Deeply held spiritual beliefs ensure that not a tree is felled nor a creature harmed within its boundaries."[২৭]

সাঁওতালরা জঙ্গল থেকে সংগ্রহ করত ফুল, মধু, গাছের পাতা, শিকড়। আর তার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন বন্য জন্তুদের শিকার করত। আবার এই শিকারকেই কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে শিকার উৎসব। যার উপর ভিত্তি করে তাদের সমাজ কাঠামোর নানান প্রথা ও প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। যেমন, দিহরি (শিকারের যাবতীয় দায়িত্বে যিনি থাকেন), গিপিতিটৌন্ডি (শিকারে মিলিত হওয়ার স্থান), দুপুডুপটৌন্ডি (শিকারের আগে মিলিত হওয়ার স্থান)।[২৮] এই বিষয়গুলি তাদের সমাজ- সংস্কৃতিকে অনন্যতা প্রদান করে। আবার জঙ্গলের নানান গাছ-গাছালির ওপর নির্ভর করেই গড়ে ওঠে রোগ প্রতিকারের ধারণা। দীর্ঘদিন প্রকৃতির সংস্পর্শে থেকে ভেষজ উদ্ভিদ সম্পর্কে যে জ্ঞানলাভ করেছিল, সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই তাদের মধ্যে এক স্বতন্ত্র চিকিৎসা ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। তারা মনে করে যে প্রকৃতির মধ্যে সব ধরণের রোগ নিরাময়ের প্রয়োজনীয় বনৌষধি আছে, যা মানুষকে খুঁজে বের করতে হবে এবং প্রয়োজনে ব্যবহার করতে হবে। তবে তারা শুধু গাছ-গাছালি দিয়ে চিকিৎসা করত তাই নয়, বিভিন্ন প্রাকৃতিক বস্তুকেও রোগ নিরাময়ের কাজে ব্যবহার করত। কর্নেল ওয়ার্ডেন এই বিষয়ে উল্লেখ করেন যে, সাঁওতালরা উষ্ণপ্রস্রবনের জল ব্যবহার করত চুলকানি, ক্ষত ও অন্যান্য চামড়ার রোগ নিরাময়ের কাজে।[২৯]

সাঁওতাল জনজাতির উপর পরিবেশের প্রভাব আলোচনা ক্ষেত্রে তাদের ধর্মের বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। কারণ পরিবেশের উপর ভিত্তি করেই তাদের মধ্যে ধর্ম চেতনা গড়ে ওঠে। সাঁওতালদের পূজ্য দেবতা হল ‘বোঙ্গাবুরু’। যার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ করলে বোঝায়, বোঙ্গা অর্থাৎ দেবতা আর বুরু অর্থে পাহাড় বা পর্বত।[৩০] আর তাদের প্রধান দেবতার নাম ‘মারাংবুরু’ অর্থাৎ সব থেকে উঁচু পর্বত।[৩১] এইভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে সূর্য, চাঁদ, পৃথিবী, গাছপালা, পাহাড় প্রভৃতি প্রাকৃতিক উপাদনকে তারা তাদের দেবতা বলে মনে করে। সাঁওতালরা সূর্যকে বলে সিংবোঙ্গা বা সিঞবোঙ্গা; যিনি বৃষ্টি আনেন, কল্যাণ করেন, অন্ধকার দূর করে চারিদিক আলোকিত করে তোলেন।[৩২] আবার তাদের বিন্তি অনুযায়ী, ধর্মের মার্গ প্রাপ্তির যে অ্যাখ্যান রয়েছে, তা মূলত প্রকৃতিকে কেন্দ্র করেই। সাঁওতালরা ‘সারি ধরম’-কে তাদের ধর্ম বলে মনে করে। আর এই ধর্মের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক বিদ্যমান। সাঁওতালি ভাষায় শাল গাছ ‘সারি সারজম’ নামে পরিচিত। আর এই গাছের কাছে তারা তাদের ধর্মের বাণী লাভ করে বলে তাদের

ধর্মের নাম ‘সারি ধরম’। সাঁওতাল বিন্তিতে বলা হয় যে সাঁওতালদের জনসংখ্যা বেড়ে গেলে দুঃখ-দুর্দশা নেমে আসে এবং সেখান থেকে মুক্তির জন্য ‘লাগাচার পাঁজা’ বা ‘ধরম পাঁজার’ উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। আর এই যাত্রাপথে তারা একাধিক বৃক্ষের কাছে পরামর্শ গ্রহণ করে। প্রথমে তারা ‘হেচাং বাং চং’ (সংশয় রূপ বৃক্ষ) বৃক্ষের কাছে দশ বছর ধরে পরামর্শ গ্রহণ করে। কিন্তু সেইখানে সংশয়পূর্ণ বিচার পাওয়ায় তারা ‘বাড়িচ বাদরি’ বৃক্ষের কাছে গেলেন। কিন্তু সেখানেও বিচার খারাপ হওয়ায় তারা ‘এঁড়ে আতনাঃ’ বা ‘লাবাড় আতনাঃ’ দারে বুটাতে বিচার সভা বসালেন। এখানে দশ বছর বিচার করার পরেও মিথ্যা পরামর্শ পেলেন। চতুর্থ বারে তারা ‘লেপেচ তেরেল’ দারের (কেন্দু বৃক্ষ) নিকট বিচার বসালেন কিন্তু সেখানেও বিচার ভেস্তে গেল। এখান থেকে প্রস্থান করে তারা গেলেন ‘খোদে মাতকুম’ বুটাতে (মহুয়া বৃক্ষ) কিন্তু সেখানেও সঠিক পরামর্শ এল না। এরপর তারা ‘পেটের বাড়ে’ (বট বৃক্ষ) কাছে গেলেন কিন্তু সেখানেও বিচার জটিল হয়ে উঠল, কোনো সরল বিচার এল না। অবশেষে তারা ‘সারি সারজম’ বৃক্ষের কাছ থেকে সঠিক বিচার পেলেন এবং তারা উপলব্ধি করলেন সদাচারই ধর্মের মূল। আর শাল গাছের নিকট তাদের এই সঠিক ধর্মের বাণী লাভ হয় বলে শাল গাছের তলায় ‘জাহের থান’ প্রতিষ্ঠিত করে।[৩৩] গাছকে কেন্দ্র করে এই বিন্তিটির তাৎপর্য কী? আসলে এক একটা বৃক্ষ এক একটা আচারের মানসিক বৃত্তির প্রতীক। রূপকের আশ্রয়ে আচারের বা কর্মের দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হয়েছে। প্রথমত, হেচাং বা চং অর্থাৎ সংশয়; সংশয়াত্মিক বৃত্তিতে সত্য পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়ত, বাড়িচ বাদরি বৃক্ষের কথা, বাড়িচ মানে নিষিদ্ধ কর্ম বা আচার। তৃতীয়ত, এঁড়ে আতনা বা লাবাড় আতনাঃ, এই বৃক্ষদুটির সাহায্যে মিথ্যাচার এবং প্রমাদ বৃত্তির কথা বলা হয়েছে। মিথ্যাচার ও প্রমাদে ধর্ম লাভ হয় না। চতুর্থত, লেপেচ তেরেল দারের মাধ্যমে বাক সর্বস্বতা ও তার অন্তঃসার শূন্যতা বোঝানো হয়েছে। শুধু মুখের কথায় ধর্ম হয় না, তাতে সত্যরূপ থাকা প্রয়োজন। পঞ্চমত, খোদে মাতকম বৃক্ষের দ্বারা ভালো মন্দের পার্থক্য বোঝানো হয়েছে। বুদ্ধির দৌড় আছে কিন্তু তা হৃদয় সঞ্জাত নয়, এইরূপ মানসিক বৃত্তি ধর্মের প্রতিকূল। আর শেষ বৃক্ষটি সারি সারজম অর্থাৎ সারি (সৎ সত্য) বোঝানো হয়েছে। এখানে সৎ আচারই যে ধর্ম তা বলা হয়।[৩৪] শুধু তাই নয় প্রকৃতিকেই তারা সংকটের পরিত্রাতা বলে মনে করে। আদিবাসীদের মধ্যে অপদেবতার কু-নজর থেকে বাঁচবার

জন্য বৃক্ষের সঙ্গে বিবাহ দেওয়ার প্রথাও প্রচলিত আছে। অবশ্য আধুনিক সমাজ বিজ্ঞানীরা এর মধ্যে একটি অন্য অভিপ্রায় লক্ষ্য করেছেন। তাদের মতে উর্বরা শক্তি অথবা প্রজনন ক্ষমতা বৃদ্ধির বিষয়টি এর সঙ্গে জড়িত আছে। বনদেবতার আশীর্বাদে গাছপালার মতোই বংশ বিস্তারের আকাঙ্ক্ষায় এই ধরনের অনুষ্ঠানের উৎপত্তি। সাঁওতাল পরগণার সাঁওতালদের মধ্যে আজও 'আমবিহা' নামে একটি অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে।[৩৫]

সাঁওতালদের জীবনে পরিবেশের গুরুত্ব প্রতিফলিত হয় তাদের বর্ষপঞ্জিতেও। প্রকৃতির রূপ তাদের সময়ের জ্ঞানকে নির্দেশ করে, তাই বসন্তের শুরুতে শাল গাছের ফুলফোটার মাধ্যমে তাদের নতুন বছর সূচিত হয়। আবার চাঁদের হিসাবে মাসের গগণা করে বলে তারা মাসকে বলে 'চাঁদো'।[৩৬] আর এই সময়ের সূচনার সঙ্গে সঙ্গে সারা বছর নানান উৎসব পালিত হয়। প্রকৃতি কেন্দ্রিক জীবনবোধ থেকে তারা প্রকৃতিকে বরণ করে নেয় বিভিন্ন উৎসবের মাধ্যমে, যার অন্যতম দৃষ্টান্ত হচ্ছে 'বাহা' পরব, যা মূলত প্রকৃতিরই উৎসব। সাঁওতালি ভাষায় 'বাহা' অর্থে ফুল অর্থাৎ ফুলের উৎসব। বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র সহযোগে নাচ ও গানের মধ্য দিয়ে সাঁওতালদের ঘরে ঘরে নতুন ফুল দিয়ে প্রকৃতি প্রেমের সূচনা হয়। গ্রামে গ্রামে নিজস্ব নিয়মনীতি অনুযায়ী পূজার্চনার মাধ্যমে সাঁওতালরা ভাগ করে নেয় বাহা পরবের আনন্দ। শাল গাছ হল সাঁওতাল ধর্ম অনুযায়ী পবিত্র গাছ। এই সময়ে মহুয়া পলাশের মতোই শাল গাছেও ফুল ফোটে এবং সবুজ কচি পাতায় ভরে ওঠে। গ্রামসভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নির্দিষ্ট দিনে কচিপাতা সহ শাল ফুলে ভরা ডাল জঙ্গল থেকে সংগ্রহ করে আনা হয়। এরপর গ্রামের সবাই একত্রিত হয়ে তাদের নিজস্ব দেবস্থানে শাল ফুলে পুজার্চনা করা হয়। 'বাহা' পরব শেষ না হওয়া পর্যন্ত কেউই নতুন ফুল বা ফল ব্যবহার করতে পারে না।[৩৭] আসলে, বাহা উৎসব হল প্রকৃতি মাতার সঙ্গে প্রকৃতির সন্তানদের আত্মিক বন্ধন। প্রকৃতির প্রতি প্রকাশ পায় তাদের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। আবার সাঁওতালরা কৃষিজীবী হওয়ায় কৃষিকাজকে কেন্দ্র করে নানান উৎসব পালিত হয়, যা মূলত প্রকৃতিরই বন্দনা। 'এড়ঃ সিম', যা হলকর্ষণ বা বীজ বপনের আগে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এরপর ধান রোপন হলে এবং শস্য শ্যামল হয়ে উঠলে পালিত হয় 'হাড়িয়াড় সিম' উৎসব। আবার ধান পাকার সময় 'জান থাড়' উৎসব পালন করা হয়, যাতে গাছ বড় হয়ে ওঠে এবং বীজের দানা বাঁধে।[৩৮]

উৎসবের পাশাপাশি পরিবেশের সঙ্গে সাঁওতালদের একাত্মতার অন্যতম নিদর্শন হচ্ছে তাদের ভাষা, লিপি ও বিভিন্ন মৌখিক সাহিত্যের আখ্যানগুলি। যেকোনো মানব জাতি বা গোষ্ঠীর আত্মপরিচয় নির্ধারণে ভাষা, লিপি ও সাহিত্য হল এক অন্যতম মাধ্যম। নৃতত্ত্ববিদদের মতে সাঁওতাল জনজাতি দীর্ঘকালব্যাপী বংশপরম্পরায় স্মৃতিতে ধরে রেখেছিল তাদের ভাষা। আর এই ভাষার উচ্চারণশৈলী, গঠন সবকিছুর উৎসই হচ্ছে তাদের পরিবেশ। উনিশ শতক পর্যন্ত অ-আদিবাসীরা তাদের ভাষাকে 'ঠার' বলে ব্যঙ্গ করত।[৩৯] আর এই 'ঠার' বলতে বোঝায় পশুপাখি বা জীব-জন্তুদের ভাষা, যা মূলত প্রকৃতি বা পরিবেশের রূপকেই চিহ্নিত করে। আবার তাদের লিপির গঠনের ক্ষেত্রেও তাদের পারিপার্শ্বিক পরিবেশের বিষয়গুলি বেছে নেওয়া হয়। সাঁওতালদের নিজস্ব ভাষা থাকলেও দীর্ঘদিন সেই ভাষার কোনো লিখিতরূপ ছিল না। তাই লিপি আবিষ্কারের পূর্বে সাঁওতাল সমাজ তাদের মনের ভাবনাকে বাইরের জগতের মানুষের কাছে বিশেষভাবে প্রকাশ করতে পারত না। আবার সাঁওতালি ভাষা লেখার মাধ্যম হিসাবে বিভিন্ন প্রাদেশিক লিপিকে গ্রহণ করলেও কোনোটাতেই নিখুঁত ভাবে সাঁওতালি ভাষাকে প্রকাশ করা যায়নি। তাছাড়া অঞ্চলভেদে প্রাদেশিক লিপিতে সাঁওতালি ভাষা প্রকাশের ক্ষেত্রে ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক কারণে সাঁওতাল সমাজের মধ্যে জাতীয় ঐক্যচেতনার চরম সংকট দেখা দেয়। মিশনারিদের প্রচেষ্টায় তারা প্রথম লিপির স্বাদ অনুভব করলেও সাঁওতাল সমাজকে তা প্রভাবিত করতে পারেনি। কারণ সাঁওতাল সমাজকে একত্রিত করতে এমন একটি লিপির প্রয়োজন পড়ে যা তাদের পারপার্শ্বিক পরিবেশের বিষয়গুলোকে সংযুক্ত করার ক্ষমতা রাখে। আর এই অসাধ্য কাজটি ১৯২৫ সালে পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু 'অলচিকি' নামে এক খ্যাতনামা সাঁওতালি লিপির আবিষ্কারের মাধ্যমে বাস্তবায়িত করেন। 'অলচিকি'-র ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল, 'অল' এর অর্থ মনের মধ্যে কোনো বিষয়ের ছবি আঁকা আর 'চিকি' এর অর্থ সচিত্র উপস্থাপন।[৪০] ১৯২৯ সালের উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ জেলার প্রদর্শনীতে প্রথম এই লিপি প্রকাশ করা হয় এবং ১৯৪৬ সালে এই লিপি আধুনিক রূপে মুদ্রিত হয়। এই লিপিতে মোট ৩০টি বর্ণ রয়েছে, যার মধ্যে ৬টি স্বরবর্ণ ও ২৪টি ব্যঞ্জনবর্ণ।[৪১] লিপির প্রত্যেকটির বর্ণের সঙ্গে সাঁওতাল সমাজের আত্মিক যোগ খুঁজে পাওয়া যায়। রঘুনাথ মুর্মুর নিজস্ব ব্যাখ্যায় এই লিপি তাঁর জাতি দেবতারা অর্থাৎ বোঙ্গারা তাঁকে দিয়েছেন।[৪২] আবার এই লিপির

আবিষ্কার প্রসঙ্গে মেরিন কেরিন যে ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন তাতে পরিবেশের সঙ্গে লিপির সম্পর্কের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সেখানে তিনি বলেন—"একটি বিশাল পাথরের ওপর সাঁওতালদের সৃষ্টির দেবতা মারাং বুরু ভর করেন। রঘুনাথ সেইদিকে যান এবং পাথরে আলোক উদ্ভাসিত কিছু চিহ্ন দেখতে পান। সেই চিহ্নগুলি দেখার পর তিনি বাড়ি ফিরে আসেন এবং সাতদিন যাবৎ সেই চিহ্নগুলিকে একে একে লিপিবদ্ধ করেন।"[৪৩] তাই এই লিপির প্রত্যেকটি বর্ণের সঙ্গে সাঁওতালদের স্বতন্ত্র পরিবেশের বিভিন্ন বিষয়কে প্রতীক হিসাবে যুক্ত করা হয়। কারণ প্রকৃতির সঙ্গে সাঁওতালদের একটি সাঙ্কেতিক সম্পর্ক (Symbolic Relationship) রয়েছে, আর সেই সম্পর্ককেই লিপি গঠনে প্রাধান্য দেওয়া হয়। যাতে সহজেই এই সমাজের মানুষ এই লিপিকে গ্রহণ করতে পারে এবং তাদের মধ্যে একটি জাতীয় ঐক্য গড়ে ওঠে। এই লিপির গঠনের প্রধান উৎস হল পৃথিবীর পাঁচটি মৌলিক উপাদান অর্থাৎ আগুন, জল, বায়ু, আকাশ ও মৃত্তিকা। আবার সাঁওতালরা বেশিরভাগ কৃষির ওপর নির্ভরশীল, তাই কৃষিকার্যে ব্যবহার্য সরঞ্জামগুলিও লিপির আকারের উৎস বা প্রতীক। এমনকি এই লিপিতে শিকারের সময় ব্যবহৃত 'বৃক্ষশাখা সদৃশ' ইশারার ভাষাকেও স্থান দেওয়া হয়েছে।[৪৪] প্রত্যেকটি চিহ্নের একটি নির্দিষ্ট অর্থ আছে, সুস্পষ্ট উচ্চারণ আছে এবং যা একটি বিশেষ জ্ঞানের দ্যোতক। সাঁওতালদের পরিবেশের সঙ্গে লিপির গঠনের বিষয়টি উল্লেখ করা হল[৪৫]—

অলচিকি বর্ণ ও উচ্চারণ	**বর্ণের গঠন প্রণালীর উৎস**
ᱚ (অ)	জলন্ত আগুনের আকৃতি।
ᱛ (অত্)	পৃথিবীর আকৃতি।
ᱜ (অগ্)	মুখের আকৃতি।
ᱝ (অং)	প্রবাহিত বাতাসের আকৃতি।
ᱞ (অল্)	লেখার কলমের আকৃতি।
ᱟ (আ)	কোদাল দিয়ে মাঠে কাজ করার আকৃতি।
ᱠ (আক্)	পাখির আকৃতি।
ᱡ (আজ্)	ডান হাত দিয়ে তৃতীয় ব্যক্তির দিকে ইশারা করা একজন ব্যক্তির আকৃতি।

ᱢ (আম্)	বাম হাত দিয়ে দ্বিতীয় ব্যক্তির দিকে ইশারা করা একজন ব্যক্তির আকৃতি।
ᱣ (আও)	খোলা ঠোঁটের আকৃতি।
ᱤ (ই)	নমনের আকৃতি।
ᱥ (ইস্)	লাঙলের আকৃতি।
ᱦ (ইহ্)	উপর দিকে হাত তুলে রাখার আকৃতি।
ᱧ (ইঞ্)	বাম হাত দিয়ে নিজের দিকে ইশারা করা এক ব্যক্তির আকৃতি।
ᱨ (ইর্)	কাস্তের আকৃতি।
ᱩ (উ)	খাবার পরিবেশনের জন্য ব্যবহৃত চামচের আকৃতি।
ᱪ (উচ্)	শিখরের আকৃতি।
ᱫ (উদ্)	মাশরুমের আকৃতি।
ᱬ (উড়্)	উড়ন্ত মৌমাছির আকৃতি।
ᱭ (উয়্)	তীরের উপর হাত রাখার আকৃতি।
ᱮ (এ্য)	প্লাবিত নদীর আকৃতি।
ᱯ (এ্যপ্)	যখন একজন ব্যক্তি অন্যকে কিছু দেয়, সেই অবস্থার আকৃতি।
ᱰ (এ্যড়্)	আঙুল ব্যবহার করে কিছু নির্দেশ করার আকৃতি।
ᱱ (এ্যন্)	পা দিয়ে শস্য ঝাড়ানোর আকৃতি।
ᱲ (এ্যড)	একটি ফাকা রাস্তার আকৃতি।
ᱳ (ও)	শব্দ করার সময় মুখের আকৃতি।
ᱴ (ওট্)	কুঁজ বিশিষ্ট উটের আকৃতি।
ᱵ (ওব্)	কোঁকড়ানো চুলের আকৃতি।
ᱶ (ওঁ)	অনুনাসিক।
ᱷ (ওহ্)	ব্যাথার উপসর্গ।

লিপির পাশাপাশি সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর মৌখিক সাহিত্যকে বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায় প্রকৃতিময় সাহিত্য ভাবনা। তাদের প্রচলিত অজস্র কথা, উপকথা, কাহিনী, ছড়া, গান, প্রবাদ-প্রবচন, হেঁয়ালি প্রভৃতির মধ্যে একদিকে যেমন রয়েছে প্রকৃতি নির্ভর বিশ্বাস অপরদিকে তেমনি দেখা যায় প্রকৃতি নির্ভর প্রেমরস, নীতি কথা ও কর্মবহুল জীবনের পরাকাষ্ঠা। সাঁওতালদের এই মৌখিক সাহিত্যকে লিপিবদ্ধ করে পল ওলাফ বোডিং বা পি.ও. বোডিং *Santal Folk Tales* (1925) নামক তিন খণ্ডের গ্রন্থে প্রকাশ করেন। এখানে যেসব আখ্যান রয়েছে তা মূলত সাঁওতালদের পরিবেশ বা প্রকৃতিকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে। আবার সিসিল হেনরি বমপাস তাঁর *Folklore of Santal Parganas* (1909) গ্রন্থে একই ধরনের বিষয়কে তুলে ধরেছেন।

এই প্রকৃতি নির্ভর জীবনশৈলীর প্রতিটি ক্ষেত্রেই জড়িয়ে রয়েছে সাঁওতালদের বিশ্বাস, ক্রিয়াকরম, রীতিনীতি, প্রতীক, সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং উৎসবগুলি। আর এই সমস্ত বিষয়গুলির ক্ষেত্রে কেবলমাত্র প্রকৃতির উপস্থিতিই শুধু নয়, রয়েছে প্রকৃতি নির্ধারণ করে দেওয়া মূল্যবোধ। সুতরাং আদিবাসীদের মানসে এবং শারীরিক অস্তিত্বে প্রকৃতি এত গভীরভাবে যুক্ত যে, যে কোনো অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন তাদের পরিবেশের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হওয়া জরুরি ছিল, কিন্তু বাস্তবে তার উল্টোটাই ঘটে। বিশেষ করে উপনিবেশ ও উপনিবেশ পরবর্তী সময়ে রাষ্ট্রের নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপের দরুন আদিবাসীদের পরিবেশ চেতনায় পার্থক্য গড়ে ওঠে, যার প্রভাব এসে পড়ে তাদের সমাজ-সংস্কৃতিতে। ঔপনিবেশিক সরকার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে একদিকে যেমন তাদের গোষ্ঠী কাঠামোয় আঘাত হানে, তেমনি অন্যদিকে ঝুম চাষের অজুহাতে জঙ্গলের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের বিচ্ছেদ ঘটায়। গভীরভাবে অনুধাবন করলে দেখা যাবে যে, পরিবেশ সংরক্ষণের যে পদ্ধতি বিদেশি সরকার প্রয়োগ করেছিল সেটি ঔপনিবেশিক স্বার্থ প্রণোদিত। কৃষি জমির বিস্তার বা বনজ সম্পদের উপর আধিপত্য উভয়ই ছিল আদিবাসী বা সাঁওতালদের জীবনবোধের বিরোধী। অতিরিক্ত রাজস্ব আদায় এবং রেললাইন বা জাহাজ নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় কাঠ সংগ্রহ সাঁওতাল পরগণার সাঁওতালদের অর্থনৈতিক অবস্থানকে বিপন্ন করে তোলে, অন্যদিকে গোষ্ঠীগত সামাজিক মূল্যবোধকে আহত করে।

ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক শাসনপর্বে, বিশেষ করে ১৭৬৫ সালে ইংরেজ ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করলে ধীরে ধীরে ব্রিটিশ আধিপত্য সাঁওতাল পরগণা অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়ে। ফলে সাঁওতালদের কৌম জীবন নতুন কাঠামোয় আবদ্ধ হয়ে পরে। অর্থাৎ ঔপনিবেশিকতার ভিত্তিমূল যত গভীরে প্রবেশ করতে থাকে ততই আদিবাসীদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা একটা নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়। ব্রিটিশ শাসনের প্রারম্ভিক পর্বে অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ভারতের রাজস্বের উৎস হিসাবে কৃষির বিশেষ গুরুত্ব ছিল। কারণ কৃষি থেকে যে রাজস্ব আদায় হত, তা কীভাবে আরো বাড়িয়ে তোলা যায়, সেটা তৎকালীন ব্রিটিশ শাসকের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিচার্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। রাজস্ব আদায়ের এই ভাবনা থেকে ঔপনিবেশিক সরকার জঙ্গলের জমিকেও কৃষির উপযোগী করে, স্থায়ী কৃষিকাজের বন্দোবস্ত করাই ছিল তাদের প্রাথমিক লক্ষ্য। আর এই উদ্দেশ্যেই বহিরাগত হিসাবে সাঁওতলরা সাঁওতাল পরগনায় প্রবেশাধিকার পায়। এ বিষয়ে ইতিহাসবিদ রামচন্দ্র গুহ বলেন, কৃষি থেকে সংগৃহীত রাজস্ব বাড়ানোর লক্ষ্যে ব্রিটিশ শাসকেরা অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ভারতে নির্বিচারে জঙ্গল নিধন করে।[৪৬] অর্থাৎ ব্রিটিশ শাসনের শুরুর দিকে জঙ্গল সংরক্ষণের প্রশ্নটি ব্রিটিশ শাসকের কাছে কোনো বিচার্য বিষয়ই ছিল না, বরং জঙ্গল ধ্বংসই ছিল তখন তাদের নীতি। তবে উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে যখন ইংল্যান্ডে যুদ্ধ জাহাজ তৈরির জন্য কাঠের অভাব দেখা দেয়, তখন জঙ্গলের প্রশ্নে ব্রিটিশ নীতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। যুদ্ধ-জাহাজ তৈরির জন্য সেগুন কাঠ খুবই কার্যকরী বলে ১৮০৬ সালে মালাবার অঞ্চলের সেগুন গাছকে সংরক্ষিত করা হয়।[৪৭] ভারতে জঙ্গলের উপর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণের এটাই ছিল প্রথম নিদর্শন। এর আগে পর্যন্ত, ভারতে জঙ্গলের উপর আদিবাসীদের অধিকারের প্রশ্নে রাষ্ট্রকে বিশেষ হস্তক্ষেপ করতে দেখা যায়নি। তবে জঙ্গলের উপর ঔপনিবেশিক সরকারের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ শুরু হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ভারতে রেল ব্যবস্থা প্রচলনের পর। ব্রিটিশ সামরিক ও ব্যবসায়িক স্বার্থে রেলের সম্প্রসারণ শুরু হলে, রেল লাইনের কাঠের স্লিপারের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ করতে ভারতে ব্যাপক মাত্রায় গাছ কাটা শুরু হয়। এমনকি যে সব গাছ স্লিপারের কাজে আসবে না, সেসব গাছও নির্বিচারে কাটা হতে থাকে। স্লিপারের কাঠের জোগান দেওয়ার জন্য ঠিকাদাররা

সে সময় বেপরোয়াভাবে জঙ্গল ধ্বংস করতে থাকে। আবার কিছু ব্যক্তিগত কোম্পানিও বেপরোয়া ভাবে জঙ্গল ধ্বংস করে কাঠের ব্যবসা করতে থাকে। এ বিষয়ে রামচন্দ্র গুহ উল্লেখ করেন যে—"private enterprises were being worked in a neckless and wasteful manner and were likely to become exhausted if supervision was not exercised"।[৪৮] অন্যদিকে, রাণীগঞ্জের কয়লাখনি থেকে কয়লার জোগান ঠিকভাবে শুরু না হওয়া পর্যন্ত রেলইঞ্জিনের (বাষ্পচালিত) জ্বালানীর প্রয়োজনেও অবাধে গাছ কাটা হতে থাকে। কিন্তু এইভাবে গাছ কাটা বন্ধ না হলে কিছু দিনের মধ্যেই কাঠের সংকট তৈরি হবে, এ কথা বুঝে উঠতে ব্রিটিশ শাসকদের বেশি সময় লাগেনি। আর এই উদ্দেশ্যেই ১৮৬৪ সালে আলাদা করে বনবিভাগ তৈরি হয় এবং এর এক বছর পরে বন আইন জারি করা হয়। ১৮৭৮ সালে এই বন আইনকে আরো শক্তিশালী করা হয়, জঙ্গলের ওপর ব্রিটিশদের দখলদারি ও কর্তৃত্বকে নিশ্ছিদ্র করে তোলার জন্য।[৪৯]

ঔপনিবেশিক সরকার বন সংরক্ষণের পাশাপাশি বিভিন্ন আইন জারি করে বনাঞ্চলের ওপর সরকারি আধিপত্য কায়েম করতে থাকে। ফলত, আইনের সংখ্যা ও কঠোরতা যত বাড়তে থাকে সাঁওতলরা ততই নিজেদের পরিচিত জীবনপ্রণালী থেকে বিচ্যুত হতে থাকে। এতদিন আদিবাসীদের যে জঙ্গল ব্যবহারের জন্য প্রাকৃতিক বা সামাজিক বিধিনিষেধের বাইরে অন্য কোনো বিধিনিষেধের কথা ভাবতে হতো না, সেই জঙ্গল ব্যবহারের জন্য এখন তাদের রাষ্ট্রের বাধার সম্মুখীন হতে হয়। রাষ্ট্রের বিধিনিষেধ অগ্রাহ্য করে আদিবাসীরা তাদের জঙ্গল নির্ভর চিরাচরিত জীবনযাপন চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে, রাষ্ট্র তাদের অবৈধ দখলদার বা অনুপ্রবেশকারীর তকমা দিয়ে অপরাধী হিসাবে গণ্য করতে শুরু করল। যদিও এর আগে যখন বনাঞ্চলগুলো জমিদারদের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল তখনও পর্যন্ত 'দামিন-ই-কোহ'-এর সাঁওতাল কৃষকেরা বনজ সম্পদ আহরণ করার আধিকারী ছিল। অন্যদিকে সাঁওতাল পরগণার সাঁওতালরা এতদিন কৃষিজমি বৃদ্ধির জন্য জঙ্গল পরিষ্কার করছিল, আর তাতে ব্রিটিশরা একপ্রকার তাদের উৎসাহ দিয়েছিল বলা যায়। 'This led to a major crisis in their life and they began to cut-down forests in order to clear land for cultivation since they had been deprived of their very life system'।[৫০] কিন্তু ঊনবিংশ শতকের ষাটের দশকে তৎকালীন ভাগলপুরের কমিশনার A.Money সাঁওতালদের এইভাবে বন

নিধন দেখে শঙ্কিত হয়ে পড়েন এবং তৎকালীন বাংলা সরকারের সেক্রেটারিকে চিঠি লিখে বন সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তার কথা জানান।[৫১] কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের এই রকম মানসিক পরিবর্তনের পিছনে কি সত্যিই সাঁওতালদের বননিধন দায়ী? নাকি এর পিছনে ছিল ব্যবসায়িক স্বার্থপূরণের গভীর ষড়যন্ত্র? শুধু বেঁচে থাকা বা জীবিকার প্রয়োজনেই নয়, আদিবাসী বিশ্ববীক্ষাও পাহাড়, জঙ্গল রক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। এই রকম এক বিশ্ববীক্ষা নিয়ে চলা জনসমুদায়কেই, ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সরকার জঙ্গল ধ্বংসের অভিযোগে প্রথম অভিযুক্ত করে। ব্রিটিশদের অন্যতম অভিযোগের বিষয় ছিল ঝুম চাষ, যার জন্য জঙ্গল পোড়াতে হয়। অথচ পারস্পরিক রীতি অনুসরণ করে ঝুম চাষের সুযোগ থাকলে, জঙ্গল পোড়ানোর পরও তা জঙ্গল সংরক্ষণ বা জীববৈচিত্র্য রক্ষার ক্ষেত্রে কোনো সমস্যাই তৈরি করে না।[৫২] ঊনবিংশ শতাব্দীর পাঁচের দশকে তৎকালীন মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত কন্নড় জেলার কালেক্টর ডবলু.ফিশার লক্ষ্য করেছিলেন ঝুম চাষের ফলে জঙ্গল বিপন্ন হয় না, বরং নতুন করে তৈরি হয়ে যায়।[৫৩] আসলে ঝুম প্রথায় কোনো জমিতে একবার চাষ করার পর বহুদিন আর সেই জমিতে চাষ করা হয় না। ফলে সেই জমিতে নতুন করে জঙ্গল গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে কোনো বাধাও থাকে না। সুতরাং ঝুম চাষের জন্য জঙ্গল ধ্বংসের অভিযোগটি মোটেই প্রশ্নাতীত নয়। আসলে এই সময়ে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে চলছিল রেল লাইন পাতার কাজ, আর যার জন্য প্রয়োজন পড়ে প্রচুর পরিমাণে স্লিপার, যা মূলত শালকাঠ দিয়েই বানানো হত। এছাড়াও জাহাজ তৈরির কাজে প্রয়োজন হত প্রচুর কাঠ, যা এতদিন জোগাড় করা হত আয়ারল্যান্ড এবং ইউরোপ মহাদেশের উত্তরাংশের দেশগুলি থেকে। কিন্তু সেখানকার বনভূমি ধ্বংস হতে শুরু করলে ভারত থেকে সেই কাঠ জোগাড়ের চেষ্টা শুরু হয়। যার ফলে শুরু হয় বন নিয়ন্ত্রণ এবং সাঁওতালদের অধিকার হরণের পালা। প্রকৃতপক্ষে ঝুম চাষের সঙ্গে জঙ্গলের বিপন্নতার প্রশ্নটি তখন থেকেই জুড়েছে, যখন থেকে ব্রিটিশ শাসকেরা জঙ্গলের ওপর আদিবাসীদের অধিকার কেড়ে নিয়ে নিজেদের দখল প্রতিষ্ঠা করেছে।

বাংলায় ১৮৬৫ সালে প্রথম বন আইন পাস হলেও ব্রিটিশ সরকার সাঁওতাল পরগণা ও ছোটনাগপুর অঞ্চলে তখনও কোনো কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেনি, কারণ সেই সময় এই অঞ্চলে খেড়ওয়ার আন্দোলন চলছিল। তবে এই আইনে

পরিষ্কারভাবে বলা হয়—"The preservation of all growing trees, shrubs and plants, within government forest or of certain kind only – by prohibiting the marking, girdling, felling and lopping there of and all kinds of injury there to; by prohibiting the kindling of fires so as to endanger such trees, shrubs and plants; by prohibiting the collecting and removing of leaves, fruits, grass, wood-oil, resin, wax, honey, stones, lime or any natural produce of such forests".[৫৪] ফলত এই আইনের দ্বারা একদিকে যেমন সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, তেমনি তারা অন্যদিকে বনজ সম্পদ সম্পর্কে নানান ব্যবস্থা গ্রহণ করে। যেমন বনের গাছকে আঘাত করা যাবে না, কোনো বনজ সম্পদ আহরণ করা যাবে না, পশুপালন করা যাবে না। অর্থাৎ বনবাসী সাঁওতালদের বনের ওপর অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হয়। আবার ১৮৭৬ সালে ১০ জুলাই ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করে যে, পূর্বের সংরক্ষিত বনাঞ্চলের সঙ্গে সাঁওতাল পরগণার ৭৬ বর্গ কিমি বনাঞ্চলও সংরক্ষিত বনাঞ্চল হিসাবে মান্যতা পাবে।[৫৫] ১৮৭৭ সালে এই সংরক্ষিত বনাঞ্চল পরিচালনার অধিকার বন দপ্তরের কাছ থেকে ডেপুটি কমিশনারের কাছে হস্তান্তরিত করা হয় এবং ১৮৭৮ সালে মিস্টার কোসেরাট (Mr. Cosserat) এই বনাঞ্চল পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে। আর তার সুপারিশক্রমে বনের কাঠ কেনাবেচা অপরাধ বলে ঘোষণা করা হয়। এই কঠোর আইনের বিরুদ্ধে পাহাড়িয়া, সাঁওতাল এবং স্থানীয় বণিকরা তীব্র প্রতিবাদ জানায়।[৫৬] আবার ১৮৮১ সালের মধ্যেই আরো কিছু অঞ্চলকে সংরক্ষিত বনের আওতায় আনা হয় এবং মারপাল, দেউরপাল, কুমারপাল অঞ্চলের কিছু অংশকে মুক্ত বনাঞ্চল হিসাবে ঘোষণা করা হয়।[৫৭] কিন্তু ১৮৮৩ সালে তৎকালীন বন সংরক্ষক মিস্টার জে.এস. গ্যাম্বেল (Mr.J.S.Gamble) সাঁওতাল পরগণার বনাঞ্চল পর্যবেক্ষণ করে সুপারিশ করেন যে, সংরক্ষিত বনাঞ্চল বন দপ্তরের অধীনে থাকা উচিত আর সেটির পরিচালনার দায়িত্বে থাকবে ডেপুটি কমিশনারের নিয়ন্ত্রাধীন কোনো অফিসার। মিস্টার গ্যাম্বলের সুপারিশ অনুযায়ী ১৮৭৮ সালে ভারতীয় বন আইন VII পাস করা হয়, যা ১৮৬৫ সালের VII আইনের জায়গা দখল করে। তবে শেষ পর্যন্ত ১৮৮৬ সালে III রেগুলেশন জারি করে সাঁওতাল পরগনাকে ১৮৭৮ সালের ভারতীয় বন আইন VII এর আওতায় আনা হয়।[৫৮] আর এই আইন ছিল ১৮৬৫ সালের আইনের থেকে আরো বেশি কঠোর এবং এই আইনের দ্বারা বনকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়।

১) সংরক্ষিত বন (Reserved Forest) ২) রক্ষিত বন (Protected Forest) ৩) গ্রাম্য বন (Village Forest)। পাশাপাশি এই আইনে বলা হয়—"The local government may from time to time constitute any forest land or waste land which the government has proprietary rights, or to the whole or any part of the forest produce for which the government is entitled"।[৫৯] এই আইনের দ্বারা বন আধিকারীকগণ আরো ক্ষমতা লাভ করে এবং তাদের অনুমতি ছাড়া কেউ বনাঞ্চলে পশুচারণ ও বনজ সম্পদ আহরণ করতে পারত না। অথচ জঙ্গলের ভিতরে ঝুম চাষ থেকে শুরু করে স্থায়ী কৃষিকাজ বা গবাদি পশু চরানো থেকে শুরু করে বনজ সম্পদ সংগ্রহ আদিবাসী জীবন জীবিকার এই সব কিছুর মধ্যেই এক বাস্তুতান্ত্রিক ভারসাম্য রক্ষার প্রয়াস থাকে, যা 'বন্য প্রকৃতি' সংরক্ষণের বিশেষ ভূমিকা নেয়। অর্থাৎ জঙ্গল সংরক্ষণ আদিবাসী জীবনচর্যারই এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ফলে বনের ওপর সাঁওতালদের গোষ্ঠীগত যে অধিকার প্রতিষ্ঠিত ছিল তা কেড়ে নেওয়া হয়। এমনকি সরকার চেয়েছিল সাঁওতাল পরগণার গ্রাম্য বন ও পশুচারণ ভূমিগুলিকেও সরকারি সম্পত্তি হিসাবে দাবি করতে। তাই ধীরে ধীরে বনের সঙ্গে আদিবাসীদের যে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ছিল তা বিনষ্ট হতে থাকে।

১৮৯৪ সালে ব্রিটিশ সরকার প্রথম ভারতবর্ষে বননীতি ঘোষণা করে। জার্মান বন বিশেষজ্ঞ ড. ভয়েলকার ইতিপূর্বে ১৮৯৩ সালে কৃষিকাজের সঙ্গে অরণ্য জীবনের ভূমিকা নিয়ে সমীক্ষা চালান। এই সমীক্ষার রিপোর্টের ভিত্তিতেই প্রবর্তন করা হয় ১৮৯৪ সালে জাতীয় বননীতি বা আইন। এই বন আইন অনুযায়ী বনভূমিকে চারটি ভাগে ভাগ করা হয় যথা[৬০]—১) প্রথম সারির বন সংরক্ষণ, যা প্রাকৃতিক অবস্থা বজায় রাখার জন্য ২) দ্বিতীয় সারির বন, যা শুধুমাত্র বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য পূরণের জন্য কাঠ সরবরাহ করবে। ৩) ছোট বন বা ছোট গাছপালা সমন্বিত বন, ৪) পশুচারণ ভূমি। আসলে ইতিপূর্বে ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লব শুরু হওয়ায়, সেখানকার প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যেই ব্রিটিশরা এই বন আইন প্রবর্তন করেছিল। এই আইনের প্রভাব সম্পর্কে গবেষক কে.পি. কান্নান বলেন—"This forest policy was largely benefiting the landed interests and adversely affecting the adivasis for whom the concept of properly rights over land was almost unknown".[৬১] এই সময় থেকে কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত জমি ছাড়া সকল জমিকে সরকারি সম্পত্তি বলে

ঘোষণা করে ভারতীয় বন আইনের আওতায় আনা হয়, আর এই রক্ষিত বনাঞ্চলও বন দপ্তরের অধীনে চলে আসে। ১৯০৪ সালে হাজারিবাগ বনাঞ্চলের অধীন থেকে সাঁওতাল পরগনাকে আলাদা করা হয় এবং গঠিত হয় সাঁওতাল পরগণা বনবিভাগ। পরবর্তীতে অবশ্য ২৭২ বর্গমাইল এলাকাকে সাঁওতাল পরগণা বনবিভাগের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।[৬২] কিন্তু ১৯২৭ এবং ১৯৭৮ সালে ভারতীয় বন আইনের কিছুটা বদল ঘটানো হলে ব্রিটিশ সরকারের হাত আরো বেশি শক্ত হয় এবং তারা আরো বেশি করে বনকে নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করে। পূর্বের সকল আইনগত বিধিনিষেধ এই আইনে বজায় ছিল, পাশাপাশি এর সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছিল জরিমানা ও শাস্তি। এই সকল আইনের ফলে সাঁওতালদের গোষ্ঠীগত খাজনা প্রদানের পরিবর্তে ব্যক্তিগত খাজনা প্রদান করতে বাধ্য করা হয়। অথচ জঙ্গল ধ্বংসের জন্য আদিবাসীদের দায়ী করে জঙ্গলের উপর থেকে তাদের অধিকার কেড়ে নেওয়া হলেও, গাছ কাটায় কোনো বিরতি পড়ে না। আসলে ব্রিটিশরা মুখে জঙ্গল সংরক্ষণের কথা বললেও, তাদের নজর ছিল শুধুমাত্র বনজ সম্পদের বাজার মূল্যের প্রতি, তাই গাছ কাটার উপর নিয়ন্ত্রণ আনার জন্য বনবিভাগ তৈরি হলেও বনজ সম্পদের বাণিজ্যিক স্বার্থের কাছে তা গৌণ হয়ে পড়ে। বাস্তুতন্ত্র, জীববৈচিত্র্য এইসব তাদের বিচার্য বিষয়ের মধ্যে কখনোই ছিল না। আর এই ব্রিটিশ সরকারই ভারতে প্রথম বনজ সম্পদকে বাণিজ্যিক দৃষ্টিতে দেখার রেওয়াজ তৈরি করে।

জঙ্গল সংরক্ষণের নামে ব্রিটিশ শাসনকালে আদিবাসীদের জঙ্গল থেকে বিচ্ছিন্ন করার যে নীতি অনুসৃত হয়েছিল, স্বাধীন ভারতেও তার কোনো পরিবর্তন ঘটে না, বরং নতুন নতুন আইন প্রণয়ন করে আদিবাসীদের আরোও বেশি বেশি করে জঙ্গল থেকে বিচ্ছিন্ন করার প্রক্রিয়া শুরু হয়। ওয়াল্টার ফার্নান্ডেজের হিসাব অনুযায়ী, ১৯৫১ থেকে ১৯৯৫ সালের মধ্যেই ভারতে বিভিন্ন 'উন্নয়ন' প্রকল্পের জন্য ৭০ লক্ষ হেক্টর জঙ্গল অধিগৃহীত হয়েছে।[৬৩] এক্ষেত্রে ১৯৭২ সালের বন্যপ্রাণী সুরক্ষা আইনের দ্বারা 'অভয়ারণ্য' বা 'জাতীয় উদ্যান' বলে ঘোষিত জঙ্গল থেকে আদিবাসীদের উচ্ছেদের রাস্তা পাকা করা হয়। অন্যদিকে ১৯৫২ সালের জাতীয় অরণ্য নীতিতে যে ছয়টি বিষয়কে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়, রাজস্ব সংগ্রহ তার মধ্যে অন্যতম বিষয় হিসাবে স্থান পেয়েছিল। অর্থাৎ জঙ্গলকে বাণিজ্যিক দৃষ্টিতে দেখার যে নীতি ঔপনিবেশিক সরকার নিয়েছিল, স্বাধীন ভারতেও সেই নীতিতে কোনো পরিবর্তন ঘটে না। বরং কাগজ শিল্পের মতো

কিছু শিল্পের ক্রমবর্ধমান কাঁচামালের চাহিদা মেটাতে বনজ 'সম্পদ উৎপাদন'-এর ধারণাকে সামনে নিয়ে আসা হয়। যে সব গাছ বড় হতে সময় লাগে এমন 'অলাভজনক' গাছের পরিবর্তে, ইউক্যালিপটাসের মতো দ্রুত বাড়ে এমন 'লাভজনক' গাছ লাগানোর উপর জোর দেওয়া হয়। আবার আসবাব পত্রের জন্য সেগুন কাঠের চাহিদাকে মাথায় রেখে সেগুন গাছ লাগানোর উপরও বিশেষ জোর দেওয়া হয়।[৬৪] অন্যদিকে সাঁওতাল পরগণার জঙ্গলের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল 'শাল জঙ্গল'। শাল গাছ এখানকার আদিবাসীদের দৈনন্দিন জীবন-যাপনের অঙ্গ। এইসব জঙ্গলের বা জঙ্গল সংলগ্ন অঞ্চলে বসবাসকারী আদিবাসীদের দিন শুরু হয় শাল গাছের দাঁতন কাঠি দিয়ে। শাল কাঠ, শালের পাতা, শালের বীজ সবই আদিবাসীদের বেঁচে থাকার জন্য অতীব প্রয়োজনীয়। এখানকার স্থায়ী কৃষিকাজে অভ্যস্ত সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর কাছে শাল গাছের গুরুত্ব অপরিসীম। সাঁওতালদের 'জাহের থান'-এ শাল গাছ থাকা অত্যন্ত জরুরি। বসন্তের শুরুতে অনুষ্ঠিত আদিবাসী, 'বাহা পরব'-এ শাল গাছের গুরুত্ব সবথেকে বেশি। এহেন শাল গাছ, যা সাঁওতালদের সংস্কৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত, সেই শাল গাছের জঙ্গল ধ্বংস করে বাণিজ্যিক গাছ লাগানো হয়। আর এই লাভজনক গাছ উৎপাদনের নীতির ফলে বৈচিত্রপূর্ণ মিশ্রপ্রকৃতির স্বাভাবিক জঙ্গলের পরিবর্তে ভারতে ইউক্যালিপটাস, পাইন বা সেগুন এর মতো একই প্রজাতির জঙ্গলের প্রাধান্য দেখা দেয়। যার সাংঘাতিক প্রভাব পড়ে বাস্তুতন্ত্রের উপর এবং আদিবাসীদের জীবন জীবিকার উপর।[৬৫]

একদিকে যখন বাণিজ্যিকভাবে 'লাভজনক' বনজ সম্পদ উৎপাদন নীতি করে জঙ্গলের বাস্তুতন্ত্রে আঘাত আনা হচ্ছে তেমনি অন্যদিকে উপনিবেশ ও উপনিবেশ পরবর্তী সময়ে সাঁওতাল পরগণায় একাধিক ড্যাম, খাদান, শিল্প, যোগাযোগ ব্যবস্থা নির্মাণে একের পর এক জঙ্গলকে নিশ্চিহ্ন করে তোলা হয়। পাশাপাশি এই বিষয়গুলি সাঁওতাল পরগণার সাঁওতালদের প্রকৃতিকেন্দ্রিক পরিবেশকে ধ্বংস করে। সাঁওতাল পরগণায় কৃষিকাজ জলের অভাবে ব্যাহত হত, তাই সেখানে জল সরবরাহ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে ময়ূরাক্ষী বা ম্যাসাঞ্জোর বাঁধ তৈরি করা হয়, যার জন্য প্রয়োজন হয়েছিল ১৯০০ একর জমি।[৬৬] আবার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য তৈরি হয়েছিল হাইওয়ে বা বড় রাস্তা। দেওঘর-ভাগলপুর রোড, দুমকা-দেওঘর রোড, দুমকা-লিটিপাড়া

রোড, গোড্ডা-হাসডিহা রোড প্রভৃতি হল সেখানকার উল্লেখযোগ্য সড়ক পথ। আর এই সড়ক নির্মাণের জন্য প্রচুর পরিমাণে বনভূমি ও পাহাড় ধ্বংস করা হয়। দুমকা বন বিভাগের মধ্য দিয়ে প্রায় ১৭৯ মাইল সড়ক নির্মাণ করা হয় আর দেওঘর বন বিভাগের মধ্য দিয়ে প্রায় ১৬ মাইল সড়ক তৈরি হয়েছে। অর্থাৎ সাঁওতাল পরগণা বনাঞ্চলের ভিতরে প্রায় ২০৯ মাইল সড়ক নির্মাণ করা হয়।[৬৭] আবার রেলপথ স্থাপনের ক্ষেত্রেও প্রচুর পরিমাণে বনাঞ্চল ধ্বংস করা হয়। এই জেলার উল্লেখযোগ্য রেল যোগাযোগ হল[৬৮]—

১) পাকুড়-তিনপাহাড়, যা ১৮৬০ সালে তৈরি করা হয় এবং যার দৈর্ঘ্য ছিল ৪৩ কিমি।

২) তিনপাহার-মির্জাচৌকি, যা ১৮৬১ সালে তৈরি হয় এবং যার দৈর্ঘ্য ছিল ৫৩ কিমি।

৩) জামতাড়া-শিমুলতলা, যা ১৮৭১ সালে তৈরি হয় এবং যার দৈর্ঘ্য ৯৬ কিমি।

শুধুমাত্র সাঁওতাল পরগণাতে পূর্বরেলের ২২৩ কিমি রেললাইন রয়েছে।[৬৯] ১৯৭৫-৯১ সালে সাঁওতাল পরগণার ৫৬০ বর্গকিমি জঙ্গল বিভিন্ন উন্নয়নের কাজে ধ্বংস হয়েছিল।[৭০] এই রেললাইন পাতার জন্য একদিকে যেমন জঙ্গল ও পাহাড় ধ্বংস করা হয়, তেমনি অন্যদিকে বহু আদিবাসী পরিবারকে তাদের বাস্তুতান্ত্রিক পরিবেশ থেকে বাস্তুচ্যুত করা হয়। আবার সাঁওতাল পরগণা অঞ্চলটি খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ হওয়ায় এখানে গড়ে উঠেছিল বিভিন্ন ধরনের খনি ও শিল্প, যা এখানকার পরিবেশ ধ্বংসের জন্য এক অন্যতম কারণ ছিল। এখানে বেশ কিছু কয়লা খনি ছিল যেমন—ব্রাহ্মণী কোলফিল্ড, পাচওয়ারা কয়লা খনি, চাপারাভিটা কয়লাখনি, হুরা কয়লাখনি প্রভৃতি। আর পাথর খাদানগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল মহারাজপুরের মিস্টার আম্বলার খাদান এবং উধুয়ানুল্লার মিস্টার অ্যাটকিনসন খাদান।[৭১] এই সকল খনি ও শিল্পের দ্বারা এই অঞ্চলে বনাঞ্চল ধ্বংসের পাশাপাশি ভূমিক্ষয়ও ঘটেছিল এবং সেই সঙ্গে বায়ুদূষণের মাত্রাকেও বাড়িয়ে তোলে। এ বিষয়ে ইতিহাসবিদ ইরফান হাবিব, ১৯৩১ সালের রয়্যাল কমিশনের প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে দেখান যে, সাঁওতাল পরগণার কয়লা খনির দূষণে সেখানকার সাঁওতালদের শারীরিক অবক্ষয় ঘটেছিল।[৭২] এই দূষণে স্বাস্থ্যের পাশাপাশি সাঁওতালদের ঐতিহ্যশালী সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলকে অবক্ষয়ের দিকে নিয়ে যায়। যার বর্ণনায় সৌভেন্দ্র শেখর হাঁসদা The Adibasi Will Not Dance: Stories গ্রন্থে বিস্তৃত

বিবরণ তুলে ধরেন এবং সাঁওতালরা আক্ষেপের সঙ্গে বলে, It is this coal, sir, which is gobbling us up bit by bit. There is a blackness-deep, indelible-all along the Koyla Road. The trees and shrubs in our village bear black leaves. Our ochre earth has become black. The stones, the rocks, the sand, all black. The tiles on the roofs of our huts have lost their fire-burnt red. The vines and flowers and peacocks we Santhals draw on the outer walls of our houses are black. Our children-dark-skinned as they are-are forever covered with fine black dust. When they cry, and tears stream down their faces, it seems as if a river is cutting across a drought-stricken land.[৭৩] অর্থাৎ আদিবাসীদের ঐতিহ্যপূর্ণ বাস্তুতান্ত্রিক পরিবেশকে ধ্বংস করে তাদের পরিবেশকেন্দ্রিক সমাজ জীবনকে বিচ্ছিন্ন করে তোলা হয়।

উপনিবেশ এবং উপনিবেশ পরবর্তী সময়ে আদিবাসীদের ঐতিহ্যগত পরিবেশ ধ্বংস হওয়ায়, একদিকে যেমন তাদের জীবন-জীবিকার উপর প্রভাব পড়ে তেমনি অন্যদিকে তাদের পরিবেশ সংরক্ষণের ঐতিহ্য ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। জঙ্গলের বাস্তুতান্ত্রিক ভারসাম্য বজায় রেখে বনজ সম্পদ ব্যবহারে আদিবাসীদের যে ঐতিহ্য ছিল, তা ধীরে ধীরে অবক্ষয়ের দিকে চলে যায়। গবেষক সাঁওতাল পরগণার একাধিক এলাকায় সমীক্ষা চালিয়ে অবগত হন যে, প্রাকৃতিক দুর্যোগকে হাতিয়ার করে রাতের অন্ধকারে আদিবাসী ও দিকুরা মিলিতভাবে গ্রাম্য বনাঞ্চলের গাছ কেটে নিয়ে যায় এবং কাঠ ব্যবসায়ীদের বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করে। আসলে দীর্ঘকাল ধরে বন বিভাগের হাতে বনজ সম্পদকে লাভজনক পণ্য হিসাবে লুণ্ঠিত হতে দেখে, আদিবাসীদের মধ্যেও কেউ কেউ তাৎক্ষণিক লাভের আশায় জঙ্গলকে নিঃশেষ করতে দ্বিধাবোধ করে না। এদের এই ধরনের ভূমিকার পিছনে মূল চালিকা শক্তি হল ‘পণ্য সংস্কৃতি’। যার প্রভাব থেকে আদিবাসীরা এখন আর বিচ্ছিন্ন নেই। জঙ্গলের উপর থেকেই নিজেদের অধিকার চলে যাওয়ায়, জঙ্গল ধ্বংস হওয়ার ব্যাপারে তারা নির্বিকার হয়ে পড়েছে। তাদের অনেকেই জঙ্গল সংরক্ষণেই পুরোনো সামাজিক রীতি নীতিগুলিকে অস্বীকার করে। এ বিষয়ে গ্যাডগিল দক্ষিণ ভারতের পবিত্র থান বলে বিবেচিত হয় এমন জায়গার গাছও আদিবাসীদের কাটতে দেখেছেন।[৭৪] আদিবাসীদের পুরনো সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলো দুর্বল হয়ে পড়ায় এই বিচ্যুতি আরো সহজ হয়েছে; বিশেষ করে গোষ্ঠীগত মাঝি পরগণাইৎ ধ্বংস হয়ে যাওয়ায়। তাদের এই বিচ্যুতির পিছনে গ্যাডগিল খ্রিষ্টান ও অন্যান্য ধর্মের

প্রভাবের কথাও বলেছেন। গ্যাডগিলের মতে, এই ধর্মগুলির প্রভাবে আদিবাসীদের কাছে প্রকৃতিকে রক্ষা করার গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছে।[৭৫] সুতরাং প্রকৃতি নির্ভর আদিবাসীদের প্রথা প্রতিষ্ঠান ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল ধ্বংসের পাশাপাশি তাদের মানসিকতার বদল ঘটে। তবে এক্ষেত্রে বিতর্কের অন্যতম বিষয় হল উন্নয়ন বনাম আদিবাসী সমাজ। আর এই দিক দিয়ে দেখলে ইতিহাসের গতিকে পিছনে ফেরানো সম্ভব নয়। স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে উন্নয়নের প্রচেষ্টা ছিল অনিবার্য। ভারতবর্ষের মতো বিভিন্ন জাতপাত ও শ্রেণি-বিভক্ত সমাজে উন্নয়নের গতিটাও পক্ষপাতমূলক হওয়াটা ছিল একপ্রকার নিয়তি নির্দিষ্ট। প্রশ্নটা হলো উন্নয়ন সম্পর্কে শাসকশ্রেণি ও আদিবাসী কৌম সমাজের আশিরনখ পার্থক্য। একদিকে নদীবাঁধ, বৃহৎ শিল্প, খনি নির্মাণ, রাস্তাঘাটের উন্নতি সবই উন্নয়নের অনিবার্য পরিণতি। অন্যদিকে আদিবাসীদের বিশ্ববীক্ষা ছিল 'Another Component of the World View is self – management' উন্নয়নের সঙ্গী হিসাবে প্রবেশ বণিক, কাঠ ব্যবসায়ী, মদ্য ব্যবসায়ী, সুদখোর মহাজন এবং জমি হাঙররা প্রবেশ করে সাঁওতাল পরগণায়। খনি ও কারখানার দূষণে বিলুপ্ত হতে থাকে সাঁওতালদের সৌন্দ্যর্যের প্রতীক দেওয়াল চিত্রগুলি। অর্থনৈতিক বিপর্যস্ততার সঙ্গে সঙ্গে নেমে আসে সৌন্দর্যবোধের প্রতি আঘাত। শুধু জাগতিক নয়, মানসিক বিচ্ছিন্নতা যার অন্যতম পরিণতি।

তথ্যসূত্র :

১. Quoted in Ramachandra Guha, *Savaging The Civilized : Verrier Elwin, His Tribals, and India,* Penguin Random House India, Haryana, First Published 1999, New Edition 2016, p.27.

২. Hunter, W.W., *Annals of Rural Bengal,* Smith, Elder & Company First Published 1868, Reprint 1996, London, p.146.

৩. Sherwill, Captain Walter, 'Notes Upon a Tour Through The Rajmahal Hills', *Journal of The Asiatic Society of Bengal*, No- VII, 1854, p.556.

৪. Velayutham Saravanan, *Environmental History and Tribes in Modern India*, Palgrave MacMillian, Singapore, 2018, pp.3-4.

৫. Damodaran, Vinita, 'Environment, Ethnicity and History in Chotanagpur, India, 1850-1970', *Environment and History,* No.3 (October 1997), p.279.

৬. Roy Choudhury, P.C., Bihar District Gazetteer : Santal Parganas, The Superintendent Secretariat Press, Bihar, Patna, 1965, p.37.

৭. J. Monaghan and Peter Just, *Social and Cultural Anthropology*, Oxford University Press, New York, 2000, p.37.

৮. মিশ্র, শিবেন্দু শেখর, *সাঁওতাল সমাজ সংস্কৃতি ও সংগ্রাম,* লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ ,পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, ২০১৭, পৃ. ৮৬।

৯. Prasad, Onkar, 'Santhal Approach to Sounds', in Nita Mathur (ed.), *Santhal WorldView*, Indra Gandhi National Centre For The Arts, Concept Publishing Company, New Delhi, 2001, pp.56-57.

১০. জি.এন. দেবী, 'আদিবাসী চর্চা, ভাষা এবং সাহিত্য', *অনুষ্টুপ,* আদিবাসী ভারত বিশেষ সংখ্যা, বর্ষ ৫৬, সংখ্যা- ৪, ২০২২, পৃ. ৬৭-৬৮।

১১. সেন, শুচিব্রত, *পূর্ব ভারতের আদিবাসী অস্তিত্বের সংকট,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৩, পৃ. ২০।

১২. মিশ্র, শিবেন্দু শেখর, *সাঁওতাল সমাজ সংস্কৃতি ও সংগ্রাম,* লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ ,পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, ২০১৭, পৃ. ২৭-২৮।

১৩. তদেব, পৃ. ৩১-৩৪।

১৪. বাস্কে, ধীরেন্দ্রনাথ, *পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ* (প্রথম খন্ড), বাস্কে পাবলিকেশন, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃ .১৯০।

১৫. মিশ্র, শিবেন্দু শেখর, *সাঁওতাল সমাজ সংস্কৃতি ও সংগ্রাম,* লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ ,পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, ২০১৭, পৃ. ৪৮-৪৮।

১৬. O'.Malley, L.S.S., *Bengal District Gazetteers : Santal Parganas,* The Bengal Secretariat Book Depot, Calcutta, First Published 1910, Reprint Logos Press, New Delhi, 1984, p.114.

১৭. হেমব্রম, পরিমল, *ঝাড়খণ্ডের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও অন্যান্য প্রবন্ধ-নিবন্ধ,* সাহিত্যম্, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ১৪।

১৮. *ক্ষেত্র সমীক্ষা* – (সিমলাডাঙ্গাল, তেলিয়াবাঁধী, জোডডিহা, দুমা, ভিমপাহাড়ি), জামতাড়া জেলা, ফতেহপুর ব্লক, ঝাড়খণ্ড, তারিখ – ১০.০২.২০২১ - ২১.০২.২০২১। মূলত প্রতিবছর সহরায় উৎসবের আগে (পৌষ মাসে) এই দেওয়াল চিত্রগুলি অঙ্গন করা হয়। প্রথমে গোবর দিয়ে বাড়ির দেওয়াল গুলিকে পরিষ্কার করা হয় এবং দেওয়ালে সাদামাটিতে এবং বর্ডার অংশে লাল মাটিতে লেপা হয়। এরপর প্রাকৃতিক ভাবে রঙ তৈরি করে সেই বাড়ির লোক বা গ্রামের যে সবচেয়ে ভালো ছবি আঁকতে পারে, তাকে দিয়ে দেওয়াল চিত্রগুলি অঙ্গন করা হয়। অবশ্য বর্তমানে প্রাকৃতিক রঙের পাশাপাশি বাজারজাত কৃত্রিম রঙের ব্যবহার লক্ষ্য করা গেছে।

১৯. *সাক্ষাৎকার* – জহর মুর্মু, ভীমপাহাড়ি, ফতেহপুর ব্লক, জামতাড়া জেলা, ঝাড়খন্ড, ১৫.০২.২০২১।

২০. মিশ্র, শিবেন্দু শেখর, *সাঁওতাল সমাজ সংস্কৃতি ও সংগ্রাম,* লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, ২০১৭, পৃ. ৯৫।

২১. হেমব্রম, পরিমল, *ঝাড়খণ্ডের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও অন্যান্য প্রবন্ধ-নিবন্ধ,* সাহিত্যম্, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ১৪-১৫।

২২. Rucha.S. Ghate, *Forest Policy and Tribal Development : A Study of Maharashtra*, Concept publishing Company, New Delhi, 1992, p.7.

২৩. Sing, K.S., 'The Munda Land System', in Peter Ponette (ed.), *The Munda World*, Catholic Press, Ranchi, 1978, p.31.

২৪. Hoffman, J.B. and Van Arther Emelen, *Encyclopaedia Mundarica*, Government Printing Press, Patna, 1950, p.555.

২৫. উদ্ধৃত : বসু মল্লিক, সমর, 'আদিবাদীদের সুখের দর্শন : মুন্ডা পরিপ্রেক্ষিত', অনুষ্টুপ, *আদিবাসী ভারত বিশেষ সংখ্যা,* বর্ষ ৫৬, সংখ্যা– ৪, ২০২২, পৃ. ২০।

২৬. Das, Subhashis, 'A brief study of sacred Groves of Jharkhand and their non-brahmin priests', *International Journal of Humanities and Arts*, 2(1), 2020, p.24-28.

২৭. Gadgil, Madhav, *Sacred Groves : An Ancient Tradition of Nature Conservation*, Scientific American, December, 2018, https://www.scientificamerican.com/article/sacred-groves-an-ancient-tradition-of-nature-conservation

২৮. মিশ্র, শিবেন্দু শেখর, *সাঁওতাল সমাজ সংস্কৃতি ও সংগ্রাম,* লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, ২০১৭, পৃ. ৯০।

২৯. O'.Malley, L.S.S., *Bengal District Gazetteers : Santal Parganas,* The Bengal Secretariat Book Depot, Calcutta, First Published 1910, Reprint Logos Press, New Delhi, 1984, p.11.

৩০. মিশ্র, শিবেন্দু শেখর, *সাঁওতাল সমাজ সংস্কৃতি ও সংগ্রাম,* লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, ২০১৭, পৃ. ৭২।

৩১. তদেব, পৃ. ৭২।

৩২. তদেব, পৃ. ৭২।

৩৩. মুর্মু, বিনোদ বিহারী, 'সাঁওতালী ভাষা ও সারি ধরম ভাবনা', *আদিবাসী জগৎ প্রবন্ধ সমগ্র,* আদিবাসী সাহিত্য প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ ২০১৪, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০১৭, হাওড়া, পৃ. ১১৩-১১৫।

৩৪. তদেব, পৃ. ১১৫-১১৬।

৩৫. মিশ্র, শিবেন্দু শেখর, *সাঁওতাল সমাজ সংস্কৃতি ও সংগ্রাম,* লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, ২০১৭, পৃ. ৫৬-৫৭।

৩৬. Marine, Carrine, 'Santal Autonomy as a Social Ecology', in Marine carrine and Harald Tambs-Lyche(eds.), *People Of the Jungle : Reformulating Indentities and Adaptations in Crisis,* Monohar Publishers, Delhi, 2008, p.152.

৩৭. হেমব্রম, পরিমল, *ঝাড়খণ্ডের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও অন্যান্য প্রবন্ধ-নিবন্ধ,* সাহিত্যম্, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ৫৬-৫৭।

৩৮. মুর্মু, বিনোদ বিহারী, 'সাঁওতালী ভাষা ও সারি ধরম ভাবনা', *আদিবাসী জগৎ প্রবন্ধ সমগ্র,* আদিবাসী সাহিত্য প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ ২০১৪, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০১৭, হাওড়া, পৃ. ১১৭।

৩৯. হেমব্রম, পরিমল, *সাঁওতালি ভাষা-চর্চা ও বিকাশের ইতিবৃত্ত,* নির্মল বুক এজেন্সি, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ১৩৮।

৪০. Murmu, Arjun, *Guru Gomke : Pt Raghunath Murmu*, Ol Itun Asra, Odisha, 2018, p.18.

৪১. Mahapatra, Khageswar, *Tribal Language and Culture of Odisha*, Bhubaneswar Academy of Tribal Dialects and Culture, Government of Odisha, 1997, p.4.

৪২. উদ্ধৃত : মেরিন কারিন, 'সাঁওতাল লেখকবর্গ : প্রতিবাদী কন্ঠস্বর', *অনুষ্টুপ,* আদিবাসী ভারত বিশেষ সংখ্যা, বর্ষ ৫৬, সংখ্যা– ৪, ২০২২, পৃ. ৭৪।

৪৩. তদেব, পৃ.৭৪।

৪৪. তদেব, পৃ.৭৪।

৪৫. Kisku, Mr., Panchanan, *Saviour of The Oldest Cultural Heritage of India,* Kherwal Publication, Bankura, 2001, p.32-35.

৪৬. Guha, Ramachandra, 'Forestry in British and Post British India : A Historical Analysis', *Economic and Political Weekly,* Vol-18, No-44 (Oct. 29. 1983), p.1886.

৪৭. Ibid, p.1888.

৪৮. Ibid, p.1884.

৪৯. Ibid, p.1887.

৫০. Fidelis de sa, *Crisis in ChotaNagpur : With Special Reference to The Judicial Conflict Between Jesuit Missionaries and British Government Officials,* November 1889 – March 1890, Redemptorist Publication, Singapore, 1975, pp.45-47.

৫১. Sivaramakrishnan, K., *Modern Forests, State Making and Environmental Change in Colonial Eastern India,* Oxford University Press, New Delhi, 1999, p.133.

৫২. Gupta, A.K., 'Shifting Cultivation and Conservation of Biological Diversity in Tripura, Northeast India', *Human Ecology,* Vol-28, No-4, (December 2000), p.660.

৫৩. Jacques Pouchepadass, 'British Attitudes Towards Shifting Cultivation in Colonial South India : A Case Study of South Canara District 1800-1920' in David Arnold and Ramachandra Guha (eds.), *Nature, Culture, Imperialism-Essays on the Enviromental History of South Asia,* Oxford University Press, Delhi, 1995. p.72.

৫৪. *The Government Forest Act 1865*, Hundred Years of Indian Forestry, Forest Research Institute, Dehradun, 1961, pp.237-38.

৫৫. O'.Malley, L.S.S., *Bengal District Gazetteers : Santal Parganas*, The Bengal Secretariat Book Depot, Calcutta, First Published 1910, Reprint Logos Press, New Delhi, 1984, p.178.

৫৬. Ibid, p178.

৫৭. Ibid, p.179.

৫৮. Ibid, p.179.

৫৯. *The Government Forest Act, 1878*, Chapter-2, Para-3, Government of India.

৬০. 'The Old Forest Policy', Circular No. 22-F, Oct. 19, 1894, Hundreds Years Of Indian Forestary, Forest Research Institute, Dehradun, 1961, p.337.

৬১. Kannan, K.P., 'Forestry Legislation in India : Its Evaluation in The Light of The Forest Bill 1980', *Towards a New Forest Policy,* Indian Social Institute, New Delhi, 1986, p.76.

৬২. O'.Malley, L.S.S., *Bengal District Gazetteers : Santal Parganas*, The Bengal Secretariat Book Depot, Calcutta, First Published 1910, Reprint Logos Press, New Delhi, 1984, pp.179-80.

৬৩. Fernades Walter, 'Rehabilitation Policy for The Displaced', *Economic & Political Weekly,* 2004, 39 (12).

৬৪. *National Forest Policy 1952*, Hundred Years of India Forestry, Forest Research Institute, Dehradun, 1961, p.329.

৬৫. সরকার, মানবেশ, *আদিবাসী জীবন ও জীবিকা বনাম ‘বন্যপ্রকৃতি’*, অনুষ্টুপ, আদিবাসী ভারত বিশেষ সংখ্যা, বর্ষ ৫৬, সংখ্যা – ৪, ২০২২, পৃ. ২৬৩-২৬৪।

৬৬. Roy Choudhury, P.C., *Bihar District Gazetteer : Santal Parganas*, The Superintendent Secretariat Press, Bihar, Patna, 1965, p.201.

৬৭. Ibid, pp.333-334.

৬৮. Ibid, p.339.

৬৯. Ibid, p.339.

৭০. Government Of Bihar, Department of Forest, *Forest Land, Forest Cover and Vegetation*, Annual Report.

৭১. O'.Malley, L.S.S., *Bengal District Gazetteers : Santal Parganas* The Bengal Secretariat Book Depot, Calcutta, First Published 1910, Reprint Logos Press, New Delhi, 1984, p.199.

৭২. Habib, Irfan., *The Man and Environment : Ecological Hitory of India,* Tulika Books, New Delhi, 2010 (বাংলা অনুবাদ), জিনিয়া মুখার্জ্জী, *মানুষ ও পরিবেশ : ভারতবর্ষের বাস্তুতান্ত্রিক ইতিহাস*, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৫, পৃ. ১৪৩।

৭৩. Hansda, Sowvendra Shekhar., *The Adivasi Will Not Dance : Stories*, Speaking Tiger Publishers, 2017, pp.174-175.

৭৪. Gadgil, Madhav, 'Grassroot Conservation Practices : Revitalizing the Traditions', in Ashish Kothari, Neema Pathak, R.V. Anuradha, Bansuri Taneja (eds.), *Communities and Conservation : Natural Resources Management in South and Central Asia*, New Delhi , Thousand Oaks-London, Sage Publications, p.225.

৭৫. Ibid, p.225.

উপসংহার

উপসংহার

এই দেশ ভারতবর্ষ শুধু বহু ভাষা এবং সম্প্রদায় ভিত্তিক একটি দেশই নয়, একই সঙ্গে বহন করে বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য, আর এদিক দিয়ে আদিবাসীরা তাদের স্বতন্ত্র সমাজ সংস্কৃতির জন্যই বিশেষ পরিচিতি পেয়ে থাকে। বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠীর সামাজিক কাঠামো ও তৎসংলগ্ন মূল্যবোধের ক্রিয়াবাদই যে তাদের নিজ নিজ গোষ্ঠীর স্বাতন্ত্র্য বোধকে সজাগ রেখে একটি সংগত গোষ্ঠী চেতনার জন্ম দিয়েছে, এই প্রশ্নে ঐতিহাসিকরা আজও অনেক ক্ষেত্রে একমত। কিন্তু আদিবাসী ইতিহাস রচনায় মূলত প্রাধান্য পেয়েছে বিভিন্ন বিদ্রোহ ও তার প্রাসঙ্গিকতা। ফলত, বরাবরই উপেক্ষিত থেকেছে তাদের স্বতন্ত্র সমাজ সংস্কৃতির চর্চার দিকটি। পশ্চিমী ভাবধারা ও সংস্কৃতায়নের নামে সাংস্কৃতিক শোষণের বহমান ধারায় এই ইতিহাসের যেটুকু ব্যাখ্যা হয়েছে তা একেবারে একমুখী। এর অনিবার্য পরিণামে আদিবাসীদের বিশ্ববীক্ষা ও চেতনাকে অতিকৌশলে এক নির্ব্বাকায়নের দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। সাঁওতালদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পটভূমি থাকা সত্ত্বেও হুলের মতো কিছু ঘটনার নিরিখেই তাদের উপস্থাপিত করা হয়েছে। ফলত, তাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার নানা প্রসঙ্গ অনালোচিত থেকেছে। সাঁওতাল হুলের মধ্য দিয়ে সাঁওতালদের নিজস্ব গোষ্ঠীর নামে ভূখণ্ড প্রাপ্তি (সাঁওতাল পরগণা) বিশেষ পরিচিতি তৈরি করলেও সেখানে তাদের পুরোনো ঐতিহ্যকে সুরক্ষিত রাখতে পারেনি। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক ভিত্তিমূল যত গভীরে প্রবেশ করতে থাকে ততই তাদের রাজনৈতিক পদ্ধতি, সামাজিক কাঠামো, অর্থনৈতিক ও ভূমি ব্যবস্থা সম্পর্কীয় যা কিছু প্রতিষ্ঠান ছিল সবই একটা নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়। আবার স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে বৃহত্তর জটিল প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সাঁওতাল গ্রাম সমাজের মূলে কুঠারাঘাত করে এবং শেষ পর্যন্ত তাদের আত্মপরিচিতি বা Identity–কেউ প্রশ্নের মুখে ঠেলে দেয়। আর এই সামগ্রিক বিষয়কেই কেন্দ্র করে গবেষণার অনুসন্ধানে উঠে এসেছে সাঁওতাল পরগণার সাঁওতালদের বিবর্তনের ধারাবাহিক ইতিহাস চর্চা।

ভৌগোলিক বা স্থানিক অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে আদিবাসী ইতিহাস চর্চায় সাঁওতাল পরগণার গুরুত্ব এক ভিন্ন মাত্রায় উপস্থিত। কারণ ভারতবর্ষের কোনো অংশে কোনো বিশেষ জনজাতির নামে স্বতন্ত্র রাজ্য গড়ে ওঠেনি, একমাত্র ব্যতিক্রম 'সাঁওতাল পরগণা'। আর এ প্রসঙ্গেই বিশেষভাবে ১৮৫৫-৫৬ সালের বিদ্রোহটি স্মরণীয়, কেননা ১৮৫৫ সালে

এই এলাকাটি 'দামিন-ই-কোহ' থেকে 'সাঁওতাল পরগণা' নামে স্বতন্ত্র রাজ্য হিসাবে চিহ্নিত হয়। ১৮৫৫ সাল পর্যন্ত এই অঞ্চলের সাঁওতালদের মধ্যে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যে স্বাতন্ত্র্যতা লক্ষ করা যায়, তা নিঃসন্দেহে তাদের আত্মপরিচয় বা Identity-এর সমার্থক। এই সময়কাল পর্যন্ত দিকু মহাজন বা জমিদারদের আধিপত্য থাকলেও জনসংখ্যার নিরিখে সাঁওতালরাই ছিল সংখ্যা গরিষ্ঠ, এমনকি এখানে পাহাড়িয়া ব্যতীত অন্য কোনো জনজাতির অস্তিত্ব ছিল না। স্বাভাবিকভাবেই দক্ষিণ-পশ্চিম রাঢ় অঞ্চল বা পূর্বতন জঙ্গলমহলের তুলনায় সাঁওতাল পরগণার সাঁওতালদের কোনো বিশেষ প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হয়নি। তাছাড়া সাঁওতাল পরগণার ভূপ্রাকৃতিক অবস্থান, খনিজ সম্পদের প্রাচুর্য এবং পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতি সাঁওতাল সমাজ-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক স্বতন্ত্র মর্যাদা দান করেছিল। সমগ্র ভারতবর্ষে সাঁওতালদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক অবস্থান মোটামুটি ভাবে এক হলেও সাঁওতাল পরগণার সাঁওতালদের অনেক ক্ষেত্রেই ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়, আর এই পার্থক্যই আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চায় সাঁওতাল পরগণার সাঁওতালদের অবস্থানকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, অন্যান্য অঞ্চলে সাঁওতালদের 'বাহা' পরব কার্তিক মাসে অনুষ্ঠিত হলেও সাঁওতাল পরগণার সাঁওতালদের ক্ষেত্রে তা পৌষ মাসে উৎযাপিত হয়। আবার বিবাহের ক্ষেত্রে আদিবাসীদের মধ্যে গাছের সঙ্গে বিবাহ দেওয়ায় রীতি-রেওয়াজ থাকলেও একমাত্র ব্যতিক্রম সাঁওতাল পরগণার সাঁওতালদের মধ্যে আমগাছের সঙ্গে বিবাহের রীতি, যাকে 'আমবিহা' বলা হয় এবং অন্যান্য অঞ্চলে সাঁওতালদের বিবাহ দুদিন যাবৎ করা হলেও এই অঞ্চলের সাঁওতালদের ক্ষেত্রে পাঁচ দিন ধরে করা হয়। মিশনারিদের দ্বারা সব থেকে বেশি প্রভাবিত হয় এই অঞ্চলের সাঁওতালরা এবং অভিপ্রয়াণের পরিসংখ্যানে দেখা যায় এখানকার সাঁওতালরা সবথেকে বেশি স্থানান্তরিত হয়েছিল। এছাড়াও এই অঞ্চলের সাঁওতালদের অর্থনৈতিক অবস্থান, খ্যাদ্যাভাস, চিকিৎসা পদ্ধতি, বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠান এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানের কার্যপ্রণালীর মধ্যে অন্যান্য অঞ্চলের সাঁওতালদের থেকে বিশেষ পার্থক্য গড়ে তোলে।

ইতিহাসের পর্যালোচনায় দেখা যায় ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আওতা থেকে মুক্ত ছিল 'দামিন-ই-কোহ'। যা পূর্বতন জঙ্গলমহল বা সিংভূম অঞ্চলে জমিদারি অত্যাচার 'দামিন-ই-কোহ'-তে সাঁওতালদের অভিপ্রয়াণের সূচনা করে। প্রসঙ্গত মনে রাখা দরকার সাঁওতাল পরগণা সাঁওতালদের আদি বাসভূমি ছিল না, ব্যাপক অভিপ্রয়াণই এর

জন্মদাতা। একই সাথে ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির রাজস্ব লাভের বিষয়টিও এর সঙ্গে সংযুক্ত। সাঁওতাল পরগণার আদি বাসিন্দা পাহাড়িয়ারা ঝুম চাষ ব্যতীত কৃষিকাজে আগ্রহী ছিল না, উপরন্তু এরা ছিল দস্যু প্রবণ। বিপরীত দিকে সাঁওতালরা ছিল শান্ত, কর্মনিষ্ঠ ও জঙ্গল হাসিলে দক্ষ। আর এই কারণেই কোম্পানি অনুমান করেছিল একমাত্র সাঁওতালদের দ্বারাই সম্ভব হবে পাহাড় ও জঙ্গলময় সাঁওতাল পরণার ভূমিতে কৃষিকাজের সম্প্রসারণ ঘটানো। তাই 'দামিন-ই-কোহ'-তে কৃষিকাজের ও স্থায়ী বসবাসের জন্য ঔপনিবেশিক সরকার সাঁওতালদের বিশেষ সুবিধা প্রদানের কথা ঘোষণা করে। কিন্তু যখন সাঁওতালরা এই অঞ্চলে স্থায়ী বসবাস গড়ে কৃষির সম্প্রসারণ ঘটায় তখন এই এলাকাটিকেও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আওতায় নিয়ে আসা হয়; যার দরুন সাঁওতালদের স্বতন্ত্র অর্থনৈতিক কাঠামো, বিশেষ করে যৌথ মালিকানা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। আর এরই প্রতিবাদে ১৮৫৫-৫৬ সালে সংগঠিত হয় ঐতিহাসিক সাঁওতাল বিদ্রোহ। তবে এই বিদ্রোহের জন্য বেশিরভাগ ঐতিহাসিক অর্থনৈতিক কারণকেই দায়ী করেছেন। কিন্তু বর্তমান গবেষণায় বিভিন্ন তথ্যের নিরিখে দেখা যায় অর্থনৈতিক কারণের পাশাপাশি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মর্যাদাবোধের বিষয়টিও বিদ্রোহের অন্যতম কারণ ছিল। কেননা মণ্ডলী প্রথার ভাঙন, কামিয়তি ব্যবস্থা এবং সর্বোপরি সাঁওতাল মেয়েদের আত্মমর্যাদার বিষয়টিও বিদ্রোহের অন্যতম কারণ। যদিও শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহে ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে সাঁওতাল জনজীবনে নেমে আসে এক চূড়ান্ত বিপর্যয়। আর এরই ফলে এই জনজাতির সংহতিতে যে ভাঙনের সূচনা হয়, তারই পরিণতিতে এদের সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনীতি এবং পরিবেশ বাস্তবতায় দেখা দেয় বিভিন্ন পরিবর্তন।

সাঁওতাল বিদ্রোহ দমন করার পর এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে ঔপনিবেশিক সরকার বিভিন্ন প্রশাসনিক ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিল। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, বিভিন্ন আইন এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে সাঁওতাল গ্রাম সমাজের স্ব-শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু গভীর বিশ্লেষণের মাধ্যমে লক্ষ্য করা যায় যে সাঁওতাল সমাজ একটি নির্দিষ্ট পরিসরের মধ্যে বাধা পড়ে যায়। মাঝি বা গ্রাম প্রধানকে স্বীকৃতি দেওয়া হলেও তাকে যুক্ত করা হয় ব্রিটিশ প্রশাসনিক ব্যবস্থার সঙ্গে। আবার সেই প্রশাসনিক ব্যবস্থায় মাঝি বা গ্রাম প্রধানকে নামমাত্র পদে বহাল রেখে শুধু মাত্র তদারকির কাজ দেওয়া হয়, আর মূল ক্ষমতার প্রধান হিসাবে নিযুক্ত থাকে সরকারি আমলারা। শুধু তাই নয় ব্রিটিশদের পুলিশি ব্যবস্থা, কর সংগ্রহের পদ্ধতি, বিচার ব্যবস্থা সবগুলিই

আরোপিত হয় সাঁওতাল সমাজের উপর। ১৮৫৫ সালের ৩৭নং আইনের ১নং ধারা অনুযায়ী সাঁওতাল পরগণাকে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির প্রবর্তিত প্রশাসনিক ব্যবস্থা থেকে পৃথক করে নন রেগুলেটেড জেলা হিসাবে ঘোষণা করা হলেও বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির ভূমি রাজস্ব আইন ছাড়া সমস্ত আইনই এই এলাকায় পূর্বের ন্যায় বহাল রাখা হয়। তাছাড়া সমগ্র জেলাটিকে চারটি উপজেলায় বিভক্ত করে (গোড্ডা, দুমকা, দেওঘর, রাজমহল) এক জন করে অ্যাসিসট্যান্ট কমিশনারের নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়। ফলত, পূর্বের মাঝি, পরগনাইৎদের জায়গায় সরকার নিযুক্ত কর্মকর্তা ও আধিকারিকদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়। শুধু তাই নয় সাঁওতাল পরগণার সাঁওতালদের স্বার্থ রক্ষার্থে একাধিক ভূমি বন্দোবস্ত ও রাজস্ব আইন প্রবর্তন করা হলেও সাঁওতালরা বিশেষভাবে লাভবান হয়নি। এই সমস্ত আইনে সাঁওতাল গ্রামসভার পরিবর্তে পূর্বের ন্যায় জমিদার ও ব্রিটিশদের ক্ষমতা বহাল থাকে এবং দেশীয় জমিদারদের তালিকায় নতুনভাবে অন্তর্ভুক্ত হয় ইউরোপীয়রা, যারা খাজনা বৃদ্ধিতে উৎসাহ দিয়েছিল। অন্যদিকে দেওয়ানি ও ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থা ব্রিটিশ সরকার দ্বারা পরিচালিত হওয়ায় সাঁওতালদের 'ল-বির-বাইসি' (উচ্চতম সভা)-এর মতো স্বাধীন প্রতিষ্ঠানগুলি ভেঙে পড়ে। সেই সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের আবগারি নীতি, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের মতো আইন সাঁওতাল সমাজকে তার ঐতিহ্যপূর্ণ শিকার উৎসব, হাঁড়িয়া পান থেকে বিরত থাকতে বাধ্য করে। আবার স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে সাঁওতাল ঐতিহ্য অনুসরণ করে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার কথা বলা হলেও বাস্তবে দেখা যায় ব্রিটিশদের প্রবর্তিত আইনগুলিই নতুনরূপে আরো কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হয়। এর ফলে সাঁওতাল সমাজ কাঠামোর স্বাতন্ত্র্য বিঘ্নিত হয়ে Tribal Self Government (TSG) থেকে অনেক দূরে সরে যায়।

Tribal Self Government (TSG) বা সাঁওতাল স্ব-শাসন ছিল মূলত জমি ও জঙ্গল ভিত্তিক। এক্ষেত্রে রাজনীতি অর্থনীতিকে নয় বরং অর্থনীতি রাজনীতিকে প্রভাবিত করেছিল। এখানেও লক্ষ্য করা যায় আদিবাসী জমি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করা হলেও সেগুলি বাস্তবে রূপায়িত হয়নি, আর কিছু ক্ষেত্রে রূপায়িত হলেও তার সুবিধা ভোগ করে বহিরাগত দিকুরা। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে যে সমস্ত ব্যবস্থা গুরুত্ব সহকারে প্রবর্তন করা হয়েছিল সেগুলি সাঁওতাল পরগণার ক্ষেত্রে অত্যন্ত উদাসীনতার সঙ্গে করা হয়। তাছাড়া এই অঞ্চল ছিল খনিজ ও বনজ সম্পদে সমৃদ্ধ, তাই ঔপনিবেশিক সময় থেকেই এই সব অঞ্চলে বৃহৎ শিল্পপতি ও পুঁজিপতিদের অনুপ্রবেশ ঘটতে থাকে। আবার এই বৃহৎ শিল্প এবং শিল্পের পরিকাঠামো

নির্মাণে বৃহৎ পরিমাণ সাঁওতাল জমি অধিগৃহীত হয়, আর এই জমিচ্যুতি সাঁওতালদের অর্থনীতিতে যে ভয়াবহ পরিণতি ডেকে এনেছিল তারই ফলস্বরূপ শুরু হয় তাদের এক ব্যাপক অভিপ্রয়াণ। নিজ বাসভূমি থেকে শুধুমাত্র অস্তিত্ব রক্ষার্থেই তাদের চলে যেতে হয় পার্শ্ববর্তী জেলা এবং খনি অঞ্চলে। এদের অভিপ্রয়াণের পরিসংখ্যান থেকে স্পষ্টত বোঝা যায় অভিপ্রয়াণের দিকগুলি ছিল মূলত বীরভূম, পশ্চিম-দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, মালদা, আসাম, সুন্দরবন প্রভৃতি। আর এই সব অঞ্চলে সাঁওতালরা মূলত স্বল্প মজুরির শ্রমিকের কাজে যুক্ত হয়। নিজেদের আত্মনির্ভর অর্থনৈতিক কাঠামোর বুনিয়াদ থাকা সত্ত্বেও শ্রমিক হিসাবে নিজেদের যুক্ত রাখা আত্মমর্যাদায় আঘাত হানে। যদিও স্থানান্তরিত সাঁওতাল পরগণার সাঁওতালরা নিজেদের কর্মদক্ষতা ও আত্মমর্যাদার প্রশ্নে বিশেষ দৃষ্টান্ত রাখে। অনুসন্ধানে প্রমাণিত যে, একদিকে বীরভূমে তাদের অভিপ্রয়াণে যেমন কৃষিকাজের সম্প্রসারণ ঘটেছিল তেমনি সুন্দরবন অঞ্চলের জঙ্গল পরিষ্কার করে লোকালয় গড়ে তুলতে সাহায্য করে। আবার আত্মমর্যাদার প্রশ্নে মালদায় জিতু সাঁওতালদের বিদ্রোহ (১৯৩২) ও আরো পরবর্তীকালে নকশালবাড়ি (১৯৬৭) অভ্যুত্থান একদা সাঁওতাল পরগণার সাঁওতাল জনজাতির অভিবাসনে পরবর্তী প্রজন্মের অবদান। তবে এই অভিপ্রয়াণের সামগ্রিক ফলাফল হিসাবে একদিকে সাঁওতাল পরগণার সাঁওতালদের জনবিন্যাসের যেমন পরিবর্তন ঘটতে থাকে তেমনি অন্যদিকে সাঁওতালদের সমাজ-সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠানগুলি বিভিন্ন প্রভাবিত হতে থাকে।

সাঁওতাল পরগণার সাঁওতালদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক কাঠামোর পরিবর্তনে খ্রিষ্টান মিশনারি এবং হিন্দু ধর্মের প্রভাবের এক মিশ্র প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। ব্রিটিশ সরকারের পরোক্ষ নীতির বাহক ছিল মিশনারিরা। ঔপনিবেশিক সরকারের কাঠামোকে মজবুত করতে মিশনারিরা ধর্মান্তকরণের মধ্য দিয়ে আদিবাসী বা প্রান্তিক মানুষদের পশ্চিমী সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছিল। মিশনারিদের ধর্মান্তকরণের প্রচেষ্টার মূল স্বার্থটি ইতিহাসের অসচেতন অস্ত্র হিসাবে এই জনজাতির শিক্ষা বিস্তারে এবং স্বাস্থ্য সচেতনতায় এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিল, যা পরবর্তীকালে তাদের রাজনৈতিকভাবে অভিষিক্ত করে। উনিশ শতকের পূর্বে সাঁওতালি ভাষাকে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে দেখা হলেও মিশনারিদের প্রচেষ্টাতেই এই ভাষা বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে এবং মিশনারিদের দ্বারাই সাঁওতালি ভাষার লিপিবদ্ধকরণ সম্ভব হয়েছিল। যার দরুন পরবর্তীতে সাঁওতালি লিপির উদ্ভব এবং সাঁওতালি ভাষার সাংবিধানিক অধিকার লাভের পথ প্রশস্ত হয়েছিল। তবে এই ইতিবাচক

দিকগুলির পাশাপাশি যে নেতিবাচক দিকগুলি সাঁওতাল সমাজে ভাঙনের সূত্রপাত ঘটায় সেটিও মিশনারিদের দ্বারাই সংঘটিত হয়। মিশনারিরা সাঁওতাল পরগণার সাঁওতালদের গোষ্ঠীগত সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ভিত্তি থেকে উৎখাত করে নতুন একটি সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে ছেড়ে দেয়। সাঁওতালদের অর্থনৈতিক দুরাবস্থাকে হাতিয়ার করে মিশনারিরা নানান প্রলোভন দেখিয়ে সরকারের বাণিজ্যিক স্বার্থে সাঁওতালদের অভিপ্রায়ণে উৎসাহ প্রদান করে। আবার মিশনারি ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ সাঁওতালরা তাদের ঐতিহ্যের নিদর্শন যৌথ নৃত্য, গান থেকে যেমন বিরত থাকত তেমনি সাঁওতাল ঐতিহ্যমণ্ডিত দেওয়াল চিত্রের পরিবর্তে খ্রিস্টের পরিচায়ক 'ক্রস চিহ্ন' আঁকতে বাধ্য থাকত। মিশনারিদের এই সমস্ত কার্যকলাপে গোষ্ঠীবদ্ধ সাঁওতাল সমাজ বিভক্ত হয়ে পরে, যার প্রভাব এসে পড়ে তাদের সমাজ-সংস্কৃতিতে। সাঁওতাল সমাজ কাঠামোকে বিভক্ত করে যে রাজনৈতিক বাতাবরণ গড়ে ওঠে, তা পরবর্তীতে আরো জটিল রূপ ধারণ করে। এই দলাদলি রাজনৈতিক বাতাবরণ পরবর্তীতে সাঁওতালী ভাষা ও অলচিকি লিপির বিস্তারে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় এবং স্বাধীনতার পরেও সাঁওতালদের নিজস্ব ধর্মের উল্লেখ না পাওয়াও এর অন্যতম কারণ। তাছাড়া মিশনারিদের প্রভাবেই সাঁওতালদের ভেষজ চিকিৎসা পদ্ধতির স্থান নিয়েছে আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা। ফলত সাঁওতালদের স্বতন্ত্র চিকিৎসা পদ্ধতি যেমন বিবর্তিত হয়েছে তেমনি ভেষজ সংগ্রহের পদ্ধতিও তারা ভুলতে বসেছে। অন্যদিকে হিন্দু ধর্মের প্রভাবে সাঁওতাল সমাজ অনেকাংশেই পরিবর্তিত হয়েছিল। ঐতিহাসিক জি.এস.ঘোরে আদিবাসীদের নিম্নশ্রেণির হিন্দু বলে অভিভূত করলেও এই মতের বিরুদ্ধে যে যুক্তিগুলি উঠে আসে সেগুলি হল সাঁওতাল সমাজের একাংশ তাদের নিজস্ব ধর্মের প্রভাব থেকে কখনই বিচ্ছিন্ন হয়নি। জড়োপাসক সাঁওতালরা মূর্তিপুজার দিকে কিছুটা অগ্রসর হলেও তাদের প্রধান দেবতা মারাং বুরুকে অস্বীকার করেনি। তবে সাঁওতাল পরগণার সাঁওতালরা ১৮৭১ সালের 'খেরওয়াড়' আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে হিন্দু ধর্মের নানান প্রতীক ও আচরণ বিধিকে গ্রহণ করেছিল। আবার 'সাপাহড়' আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যে শুদ্ধিকরণের ভাবধারা গড়ে ওঠে তাতে ধর্মান্তরিত সাঁওতালরা নিজেদের সমাজের ঐতিহ্যের নানা বিষয়কে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে দেখতে থাকে এবং শুদ্ধিকরণের নামে স্ব-সমাজের নানা বিষয়কে উৎখাত করার চেষ্টা করে। শূকর, মুরগি পালন এবং হাঁড়িয়া পানের মতো বিষয়গুলিকে অশুচি হিসাবে প্রতিপন্ন করা হয়, অথচ এই বিষয়গুলি ছিল সাঁওতাল গ্রামসমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তি। হিন্দুত্বের এই সাংস্কৃতিক আধিপত্যে গোষ্ঠীবদ্ধ সাঁওতাল সমাজ বিভক্ত

হয়ে পরে। তাছাড়া বহিরাগত হিন্দুদের দ্বারায় যে মাঝি প্রথা ধ্বংস হয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। অর্থনৈতিক দিক থেকে যেমন 'Tribe-Caste Continuum'-এর কথা বলা যায়, তেমনি হিন্দুত্বের প্রভাবের ক্ষেত্রে 'Hindu-Tribe Dichotomy'-এর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

স্বাধীনতা উত্তরকালে আদিবাসী উন্নয়ন সংক্রান্ত ভেরিয়ার এলুইন এবং নেহরুর বিতর্কটি যেমন উল্লিখিত হয়েছে তেমনি আদিবাসীদের অবস্থান বিষয়ক আলোচনা করা হয়েছে। আদিবাসীদের অবস্থান বিষয়ক বিতর্কে মূলত পৃথকীকরণ ও সংযুক্তিকরণের মতো দুটি বিষয় উঠে আসে, কিন্তু কার্যত শেষ পর্যন্ত কোনো নীতিই সঠিকভাবে আদিবাসীদের অবস্থানের ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ হয়ে ওঠেনি। নেহরুর পঞ্চশীলে আদিবাসীদের সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের সংরক্ষণের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু মূল সমস্যাটি ছিল মূলত অর্থনৈতিক। সংস্কৃতি এবং অর্থনীতি কোনো বিচ্ছিন্ন বিষয় নয়, অর্থনৈতিক পরিবর্তনে সংস্কৃতির পরিবর্তনও অনিবার্য। বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আদিবাসী তথা সাঁওতালদের আর্থিক উন্নতির ক্ষেত্রে বাস্তবে এক বিপরীত চিত্রের প্রকাশ ঘটেছিল। জাতীয় মূল স্রোতের সঙ্গে তাদের যুক্ত করার যে ব্যর্থতা সেটি মূলত নীতি নির্ধারকদের মধ্যেই নিহিত ছিল। উন্নয়ন বিষয়ক আদিবাসীদের দৃষ্টিভঙ্গির কোনো প্রতিফলন এই নীতিগুলিতে পরিলক্ষিত হয়নি। আমলাতান্ত্রিক অনিহা উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া পরিকল্পনাগুলির বাস্তবায়ণের ক্ষেত্রে বহু প্রতিবন্ধকতা ছিল। উহাদরণস্বরূপ বলা যায়, জমি হস্তান্তর এবং অরণ্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে আইনত গ্রামসভাগুলির অনুমতির প্রয়োজন ছিল, কিন্তু কার্যত দেখা যায় বৃহৎ শিল্প কারখানা, খনি অঞ্চলে জমি অধিগ্রহণ এবং অরণ্যের উপর অধিকার হস্তচ্যুত হয়ে থাকে। সংবিধানে সংরক্ষণের যে সুবিধাগুলি ছিল সেগুলি গ্রহণ ক্ষমতার জন্য সাঁওতাল অর্থনীতি ও শিক্ষার যে বুনিয়াদ তৈরির প্রয়োজন তা সম্পূর্ণভাবে অবহেলিত হয়। সমীক্ষায় দেখা যায় ১৯৫২ পরবর্তী ৩০ বছরে ৪.৩ মিলিয়ন অরণ্য জমি, ভারীশিল্প এবং পরিকল্পিত বাঁধ নির্মাণে ব্যবহৃত হয়। সন্দেহ নেই যে সর্বজনীন ভোটাধিকার আদিবাসী বা সাঁওতালদের রাজনৈতিক সচেতনতা স্বল্প হলেও বৃদ্ধি করেছিল। কিন্তু এর সুফল প্রধানত গ্রহণ করেছিল সাঁওতাল জন সমাজের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সাঁওতালরা এবং এদের মধ্যেই গড়ে ওঠে সাঁওতাল সমাজের মধ্যে এক 'এলিট' শ্রেণির, যারা স্ব-সমাজকে অবহেলা করে হিন্দু উচ্চ শ্রেণির সঙ্গে মিলিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে। জয়পাল সিং মুণ্ডা বা শিবু সরেন এরা সবাই ছিলেন সাঁওতাল সমাজের অগ্রবর্তী শ্রেণি এবং এরাই মূলত সাঁওতাল

সমাজকে নেতৃত্ব দিয়েছিল। অন্যদিকে স্বাধীনতা পরবর্তী উন্নয়নের ব্যর্থতা থেকে পুনরায় Self Government-এর দাবি ওঠে, আর এই ভাবনা থেকে গড়ে ওঠে ঝাড়খণ্ড আন্দোলন। কিন্তু ঝাড়খণ্ড গড়ে উঠলেও সেখানে 'এলিট' আদিবাসী এবং হিন্দুদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, যেখানে সাধারণ আদিবাসীরা সব দিক থেকেই বঞ্চিত থেকে থেকে যায়।

সাঁওতালদের ক্ষেত্রে পরিবেশগত সম্পদগুলি কেবলমাত্র পরিচয়ই নই, তাদের অস্তিত্বের নিদর্শন। সাঁওতাল পরগণার সাঁওতালদের অর্থনীতির মূলভিত্তিই হল জল, জঙ্গল ও জমি। তবে অন্যান্য সম্প্রদায়ের মতো কেবলমাত্র বেঁচে থাকার জন্যই নয়, পরিবেশের সঙ্গে সাঁওতালরা জড়িয়ে আছে সংস্কার ও সংস্কৃতিভাবে। অনুসন্ধানে দেখা যায় অরণ্য, নদী পর্বত সব কিছুই সাঁওতালদের দেবতা এবং তাদের সৃষ্টি তত্ত্বের আখ্যান, গোত্রের নাম-প্রতীক সব কিছুই প্রকৃতিকেন্দ্রিক। আবার প্রকৃতির সঙ্গে তাদের একটি সাংকেতিক সম্পর্ক বিদ্যমান, যার প্রতিফলন দেখা যায় সাঁওতাল দেওয়াল চিত্রে এবং লিপির গঠনের মধ্যে। এছাড়াও তাদের চিকিৎসা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে বিভিন্ন গাছ-গাছালির ওপর নির্ভর করে। সাঁওতালদের নাচ, গান, সুরের সৃষ্টির মূলেও রয়েছে প্রকৃতি। শুধু তাই নয় সাঁওতালদের 'জাহের থান' হল প্রকৃতি বন্দনা বা সংরক্ষণের অন্যতম নিদর্শন। তবে সাঁওতালদের পরিবেশ কেন্দ্রিক জীবন বোধের বিচ্ছেদ ঘটে ঔপনিবেশিক সময় থেকে। সমগ্র ভারতবর্ষের মতোই সাঁওতাল পরগণাতে পরিবেশ ধ্বংসের সূচনা ঔপনিবেশিক আমলেই। দুর্ভাগ্যবশত, স্বাধীন ভারতের পরিবর্তিত ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে বহন করে চলেছে একই উত্তরাধিকার। উন্নয়নের অভিধায় সরকারি দৃষ্টিভঙ্গি ও আদিবাসীদের সুরক্ষিত মনোভাবের মধ্যে বিরাজিত যোজন প্রমাণ দূরত্ব। ১৮৭৬ সালে প্রথম সাঁওতাল পরগণার ৭৬ বর্গকিমি বনাঞ্চলকে সুরক্ষিত ঘোষণা করা হয় এবং ১৮৭৮ সালে বন আইনের VII নং তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আবার ১৯০৪ সালে হাজারিবাগ থেকে পৃথক করে সাঁওতাল পরগণা বনবিভাগ গঠন করা হয়। এই সব আইনের দ্বারা সাঁওতাল পরগণার সাঁওতালদের জঙ্গলের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয় এবং যার ফলাফল হিসাবে সাঁওতাল অর্থনীতির ক্ষেত্রগুলি সংকচিত হয়ে পড়ে। অন্যদিকে স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে জাতীয় অরণ্য নীতিকে রাজস্ব সংগ্রহের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। শাল গাছের পরিবর্তে বাণিজ্যিক গাছ লাগানোর জোর দেওয়ায় সাঁওতালদের অর্থনীতির পাশাপাশি সমাজ সংস্কৃতি বিপন্ন হয়ে পড়ে। সেই সঙ্গে উন্নয়নের নামে সাঁওতাল পরগণায় বৃহৎ কলকারখানা, বাঁধ, জলাধার, সড়ক ও রেলপথ নির্মাণে সাঁওতালদের বাস্তুতান্ত্রিক অবক্ষয় ঘটতে থাকে। এই সমস্ত কারখানা ও খনি

অঞ্চলের দূষণে সাঁওতাল পরগণার সাঁওতালদের স্বাস্থ্যের যেমন অবক্ষয় দেখা দেয় তেমনি সাঁওতাল সমাজ-সংস্কৃতির নানান নিদর্শন বিশেষ করে সাঁওতাল দেওয়াল চিত্রগুলি কারখানার ধুলো ও ধোঁয়ায় ঢাকা পড়ে যায়। সুতরাং পরিবেশের অবনমনের সঙ্গে সঙ্গে সাঁওতাল সমাজ- সংস্কৃতি এবং অর্থনীতির প্রতিষ্ঠানগুলির পরিবর্তন ঘটতে থাকে।

ইতিহাস এক চলমান পরিবর্তনশীল আখ্যান। নিরন্তন ভাঙা গড়ায় ঘটে চলে তার আবর্তন; যদিও আঙ্গিক এক থাকে না। মানব সভ্যতার ইতিহাসে ভাঙনের পাল্লা যখন ভারী হয়ে দেখা দেয়, তখন প্রয়োজন হয়ে পড়ে অতীতের দিকে ফিরে দেখা এবং পুনর্গঠন করা। সাঁওতাল পরগণার সাঁওতালদের সম্প্রদায়গত সংহতি এবং সংস্কৃতি যখন বিপন্ন তখন বিকল্প হিসাবে উঠে আসছে 'সারনা' ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও আত্মপরিচয়ের মাধ্যম হিসাবে সার্বিক ভাবে অলচিকি লিপির প্রবর্তনের দাবি। এগুলির যুগোপযুগিতা সন্দেহাতীত না হলেও তারা নিজেদের পরিসরকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে এক ধরণের পুনঃআদিবাসীকরণের (Re-Tribalizaton) পথে হাঁটতে চাইছে। এরই প্রকাশ বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠীগুলির মধ্যে দ্বন্দ্ব। যেমন— পশ্চিমবঙ্গে কুর্মি মাহাতো ও সাঁওতাদের দ্বন্দ্ব। আবার সাঁওতাল পরগণার মূল দ্বন্দ্ব বহিরাগত ও আদিবাসী-সাঁওতালকেন্দ্রিক, এছাড়াও রয়েছে খ্রিষ্টান সাঁওতালদের সঙ্গে মূল নিবাসী সাঁওতালদের দ্বন্দ্ব। ইতিহাসে শেষ কথা বলে কিছু হয় না, তাই আমাদের গবেষণায় ১৮৫৫-১৯৬৪ পরিসর অতিক্রম করে এই সব দ্বন্দ্বের পরিণতি ভবিষ্যতের কি বার্তা বহন করে আনবে সেটি বস্তুত পক্ষে অজ্ঞেয়।

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট- ১

সাক্ষাৎকার

(এটি মূলত সাক্ষাৎকার হলেও পূর্ব নির্ধারিত প্রশ্নের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ না করে সাধারণ বা দলগত আলাপচারিতা বা কথোপকথনের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের কাজটি করা হয়েছে। মোটামুটিভাবে প্রায় একশোটি পরিবারের সঙ্গে একবছর যাবৎ বিভিন্ন পর্যায়ে এই তথ্য সংগ্রহের কাজটি করা হয়েছে। নিম্নে তারই কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে তুলে ধরা হল।)

১) নাম – সাগেন মারান্ডি

বয়স – ৪৫

লিঙ্গ - পুরুষ

ঠিকানা – সিমলাডাঙ্গাল, জামতাড়া, ঝাড়খণ্ড

শিক্ষাগত যোগ্যতা – নিরক্ষর

সাক্ষাৎকারের তারিখ – ০৯.০৮.২০২২

গবেষক : জোহার গে গমকে আপে আতুরে আডিদিন লাহারে মিৎধাও ইঞ হেচ্ লিনা। তখন আপে আতুরে বাহা বঁগা হয়ুঃ কান তাহে। আছা গমকে বাহা বঁগা ছাড়া আর যাহা পরব পে মানাও গিয়া।

(জোহার, আপনাদের এই গ্রামে আমি অনেক দিন আগে একবার এসেছিলাম তখন আপনাদের গ্রামে বাহা পরব চলছিল। আচ্ছা, এই বাহা পরব ছাড়া আর কি কি পরব আপনাদের হয়ে থাকে।)

সাগেন : আলেয়া বাহা বঁগা ছাড়া আরো আডিলেকান পরব হুয়ুঃ তালেয়া। জত ঘন সরেস পরব দ হুয়ুঃ কানা সহরায় পরব।

(আমাদের বাহা পরবের পাশাপাশি আরো অনেক পরব আছে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে সহরায় পরব।)

গবেষক : বাহা বঁগা দ আপেয়া ফাগুন বঁগারে হয়ুঃ তাপেয়া। আর সহরায় পরব দ সহরায় বঁগারে হুয়ুঃ তাপেয়া নিয়ৌ সহরায় পরব সে এটা চাঁদ রে।

(বাহা পরবতো ফাল্গুন মাসে হয়ে থাকে আর সহরায় পুজোর পরে কার্ত্তিক মাসে। আপনাদের এখানে কি এই সময়ে হয়ে থাকে নাকি অন্যকোনো সময়ে।)

সাগেন : গমকে ঠিক গেম মেনদা মেন খান আলে নতে পৌষ বঁগা রেলে মানাও গিয়া।

(আপনি ঠিকই বলেছেন। কিন্তু সহরায় আমাদের এখানে পৌষ মাসে হয়।)

গবেষক : আচ্ছা, গমকে আলে মানে আঁজম আকাদ, সহরায় বঁগা রে সহরায় হুয়ু আ, মেন খান আপে নতে দ চেদা ভেগার গিয়া।

(অন্যান্য এলাকায় তো আমি সহরায় পরব কার্তিক মাসে হতে দেখেছি, কিন্তু আপনাদের এখানে পৌষ মাসে হয় কেন।)

সাগেন : আলে নতে দ আলে রেন মাঝি বাবা সাঁওতে আতু মঁড়ে হড় ক দারায়তে দিন ক কো গৌঠায় গিয়া। আলে দ জানাম তায়ম খন গে পুষ বঁগারে সহরায় লে মানাও গিয়া। মেন খান আলে নতে দ বাকু মানাও আ সহরায় বঁগারে। আলে রেন হাপড়াম কঠেন লে আঁজম আকাদা লে হুড়ু চাওলে টাকা পয়সা তাহেনা আর উন অকত মানাও নাপায় হুয়ুঃ আ। আর হম আঁজম আকাদা পয়সা কু তালে লেন খান বেস হুয়ু আ।

(এই পরবের দিন-ক্ষণ তো আমাদের এলাকার মোড়লরা ঠিক করে থাকে। আমরাতো জন্মের পর থেকে পৌষ মাসে সহরায় পরব পালন করে আসছি। তবে আমাদের বাপ-ঠাকুরদাদের কাছে শুনেছি যে, মাঘ মাসে ধান উঠলে হাতে টাকা পয়সা আসলে পরব পালন করা সহজ হয়। আপনিতো জানেন যে কোনো পরবে টাকা-পয়সার দরকার হয়।)

গবেষক : গমকে নওয়া ক পরব যে পে মানাও দা। নওয়া কুদ লাহাতে লেকা গে মিনাঃ আকাদা সে দিন দিন তে আরু ফেরাও আকাকা।

(আপনারা অনেক দিন ধরেই এই পরবগুলো পালন করে আসছেন; কিন্তু এখনকি আগেকার মতো রীতি-রেওয়াজ আছে নাকি কিছু পরিবর্তন ঘটেছে।)

সাগেন : সময় সাঁও সাঁওতে জতগে আরু ফেরা কানা, অন কাগে আলেয়া পরব হ আরু ফেরা কানা। খেলেক আলেয়া বাহা বঁগা রেদ দাঃ কু দুল আকুয়াঃ আর দাঃ আতে গে কু রৌস্কো জং আ। মেন খান নেতার রেন গৌদরৌ কুদ বাজার খন ঔডি লেকান রং আগু কতে ক খেল দা। আর হ সহরায় পরব করে দ ডিজে, সেরেঞ তে কু এনেজ কানা। তুমদা, টামাক দ বাকু বেওহার দা, নং কা গে অরু ফেরা কানা। আর হ ঞেলঃ কানা দাঁসায় বঁগা অক্ত আতো আতো সেন কাতে হুড়ু চাওলে ক হাতাও এদ, তাহে কানা। মেন খান নেতার দ দিকু ঠেন খন টাকা পুয়সা কু হাতাও দা, নংকা কাতে গে সাঁওতা রেনা নাগাম দ আরু ফেরাও কানা। নুয়ুঃ কুদ ঔন ঔরি রে বনুঃ আ।

(সময়ের সঙ্গে তো অনেক কিছুই বদলে যায়, তাই আমাদের পরবগুলির ক্ষেত্রেও অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। আমরা আগে যেভাবে পরবগুলো পালন করতাম এখনকার আমাদের ছেলে-মেয়েরা সেভাবে করে না। যেমন ধরুন, বাহা পরবে আমাদের নিয়ম শুধু জল দিয়ে দোল খেলা কিন্তু এখন বাজারের কেনা রঙ দিয়েও খেলা হয়। আবার আমাদের অনেক গ্রামেই পরবগুলো হয়না বললেই চলে। তাছাড়া নিজেদের ধামসা, মাদল এবং গান ও নাচের পরিবর্তে ডিজে বাজিয়ে হিন্দি, ভোজপুরি গানের মাধ্যমে পরবগুলো পালন করা হয়। আচ্ছা আপনাকে আর একটা পরবের কথা বলি, সেটি দাঁশায় পরব। এই পরবে নিজেদের গ্রামে নাচ গানের মাধ্যমে চাল-ধান সংগ্রহ করা হয়, কিন্তু এখন চাল ধানের পরিবর্তে টাকা নেওয়া হয় এবং সাঁওতাল গ্রামের বাইরেও দিকুদের কাছ থেকেও টাকা চাওয়া হয়। যেটা আমাদের সমাজের নিয়ম বিরুদ্ধ।)

গবেষক : আডি-নাপায় গমকে আমঠেন খনা আডি দামান কাথা কু আঁজম ঞাম কেদা আর আডি-নাপায় ইঞ বুঝা কেদা আর হঁ লাং ঞা-পামা হাঁ। জোহার গে মা তা হলে।

(আপনার কাছ থেকে অনেক কিছু জানতে পারলাম। আবার কোনো দিন সময় হলে আপনার কাছে গল্প করতে আসবো।)

২)   **নাম– সুলখান সরেন**

বয়স – ৫২

লিঙ্গ - পুরুষ

ঠিকানা – মিরগাপাহাড়ি, জামতাড়া, ঝাড়খণ্ড

শিক্ষাগত যোগ্যতা – প্রাথমিক

সাক্ষাৎকারের তারিখ – ১২.০৮.২০২২

গবেষক : জোহার গে চেত লেকা মেনাপেয়া, আড়ি নাপায় গে, আড়াঃ দুয়ৌর ক পে সাঁফা সাঁফি আকাদ দ যাহানাঃ ক মেনা আকাদা সে চেদ।

(জোহার, কেমন আছেন? আপনাদের বাড়ির চারপাশ বেশ পরিষ্কার মনে হচ্ছে, কোনো অনুষ্ঠান আছে কি?)

সুলখান সরেন : হ্যাঁ, আলে অড়াঃ রে সৌগুন বাপ্লা মেনা আকাদা, অনা তে অড়াঃ দুয়োর ক সাফা সাফি অকাদা।

(আমাদের বাড়িতে আর কিছু দিনের মধ্যে একটি বিয়ের অনুষ্ঠান রয়েছে। তাই বাড়িঘরগুলি এখন থেকেই পরিষ্কার করা হচ্ছে।)

গবেষক : গমকে সৌগুন বাপ্লা দ আকর আ মেনা আকাদা।

(বিয়ের অনুষ্ঠান, আচ্ছা কার বিয়ে আছে।)

সুলখান সরেন : সৌগুন বাপ্লা দ ইঞরেন হপন এ্যাঁরা আ মেনা আকাদা। আর অনা লাগিদ তেগে আড়ি জোর কামি ক করাও এদা।

(আমার ছোটো মেয়ের বিয়ে আছে। তাই এতো সব আয়োজন করা হচ্ছে।)

গবেষক : গমকে মেন খান আমরেন হপন এ্যাঁরা মা আডি হুডিন এ্য ঞেলঃ কান। বাপ্লা উমের হুয় এনতায়া।

(আপনার ছোটো মেয়ের বয়সতো দেখে মনে হচ্ছে খুবই কম। বিয়ে দেওয়ার মতো কি বয়স হয়েছে।)

সুলখান সরেন : কাথা মা ত ঠিক গেম মেন এদ কান। ইঞবেন হপর এ্যাঁরা দ হুডিন গিয়া আর বাপ্লা উমের হ বাংহুয় আকান তায়া। মেন খান চিকায়াম আডি আনাট রে মেনা আকাদ লেয়া। আর অলঃ পড়ে হাও কামি হরা হ বালে লাহা দাড়ে কান আতায়। আনাট খাতিরতে নংকান কামিহরা লে সাপড়াও আকাদা। পাশে আতু রে মিৎট্যাং নাপায় কড়া মিনায় আ, আর উনি সাওগে সৌগুন গিরৌ দ সাপাড়ও আকাদা।

(আপনি ঠিকই বলেছেন। আমার মেয়ের এখনো বিয়ের বয়স হয়নি। কিন্তু কি করবো বলুন, আমাদের আর্থিক অবস্থা সেরকম নই। যে মেয়েটাকে আরো পড়াশোনা করাবো। তাই পাশের গ্রামে একটি ভালো ছেলের সন্ধান পাওয়ায় বিয়ে দিতে রাজি হয়ে গেলাম।)

গবেষক : মেন খান গমকে আলে মলে আঁজম আকাদ। আপেয়া সমাজ রে বল্যবিবাহ দ বনু আকাদা মেন খান নেতার বল্যবিবাহ সে হুড়িম উমের রে কড়া, কুড়ি ক বপ্লা কানা।

(আপনাদের সমাজে বাল্যবিবাহ তো সেরকম দেখা যায় না। তবে এখন কি বাল্যবিবাহ দেওয়া হয়।)

সুলখান সরেন : গমকে কাথা দ ঠিক গে বেন মেন আকাদা পৌহিল রেদ নং কান হুড়িন উমের রে বপ্লা দ বাং হুয়ু কান তাহে মেন খান নেতার দ ঞেল এ্যামঃ ক কানা আডি বাড়তি।

(কথাটি আপনি ঠিকই বলেছেন, আগে আমাদের সমাজে বাল্য বিবাহ ছিল না বললেই চলে। কিন্তু বর্তমান সময়ে কিছু ক্ষেত্রে অল্প বয়সে বিয়ে দেওয়া হয়।)

গবেষক : আপেয় সৌগুল বাপ্লা কামি দ আকালেকা পে করাও গিয়। আর চেদ ক কামি কাসনি হুয়ু তে। হুডিন মাছা গাল মারাও ইঞ মে।

(আপনাদের সমাজের বিবাহের রীতি রেওয়াজ বা কীভাবে এই বিবাহ কাজ সম্পন্ন হয়ে থাকে যদি একটু বলেন।)

সুনখান সরেন : আলেয়া সাঁওতা সমাজ রে সৌগুন বপ্লা দ রায়বার হাড়াম এ ঠিক গিয়া আর উনি কড়া সেন খন রায়বার হারাম কুড়ি অড়াতেয় চালা আ তার পর ঞেল ঞেপে হুয়ুঃ আ।

আর কুশি রৌস্কৌ হুয় লেন খান সৌগুন বপ্লা গিরৌ ক ঠিক আ তাঁর পর মালা মুদৌম, আর অনা তায়ম দ বপ্লা দিন সেটের লেন খান। কড়া হড় দ কুড়ি অড়াঃতে বৌয়রৌৎ আতে বপ্লা ক চাল আ আর সৌগুন বাপ্লা দ হুয় আ।

(আমাদের সমাজে বিবাহের ক্ষেত্রে ঘটক প্রথম বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে পাত্রির বাড়িতে যায়। পাত্রী পক্ষের সম্মতি থাকলে ঘটককে জানিয়ে দেওয়া হয়। এর পর ঘটক পাত্র পক্ষের বাড়িতে এসে মেয়েকে দেখতে যাওয়ার দিনক্ষণ ঠিক করেন। নির্ধারিত দিনে পাত্র পক্ষ পাত্রীর বাড়িতে যায় এবং যদি দুই পক্ষের সম্মতি হয় তবে বিয়ের রীতি রেওয়াজ শুরু হয়ে যায়। এর মধ্যে পাত্রপক্ষ পাত্রীর বাড়িয়ে গিয়ে একটি অনুষ্ঠানের মধ্যে দানপত্র দেওয়া হয়। এরপর বিবাহের দিন ঠিক করা হয়।)

গবেষক : আচ্ছা আপেয়া বাপ্লা দ মাড়ং লেকা গে মেনা আকাদা সে এঠা জাতি আঃ অরসং বল আকানা।

(আচ্ছা আপনি যেগুলো বললেন এই নিয়ম নীতিগুলো কি পূর্বের মতো বজায় রয়েছে নাকি কিছু পরিবর্তন এসেছে।)

সুলখান সরেন : হ্যাঁ আডি গান গে আরু ফেরাও আকানা দিন দিন তে। যে লেকা মিৎবার আতুরে দিকু লেকা বাপ্লা রে সেগেল কু জুল দা আর হঁ এটা জাতি লেকা প্যান্ডেল কাতে কু জম ঞ্ঃ দা আর হ ঞেলঃ কানা সাদেস (চাওলে আর রানু) বাকু ইদিয়দা এটা জাতি লে বাজার করেনা জিনিস ক এমা ক কানা নং কা কাতে আলেয়া সানতাড় সমাজ দ আরু ফেরা কানা।

(হ্যাঁ, আগের মতো কিছু ক্ষেত্রে থাকলেও আবার অনেক ক্ষেত্রেই বদল ঘটেছে। যেমন এখন হিন্দুদের মতো বিয়েতে আগুনের ব্যবহার করা হয়, যা সাঁওতাল সমাজে আগে কখনই ব্যবহার করা হত না। আবার হিন্দুদের দেখে এখন প্যান্ডেল করে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। চালের পরিবর্তে বাজার জাত নানান উপহার দেওয়া হয়।)

গবেষক : আড়ি আড়ি সাড়হাও গম কে আড়ি যথাৎ কাথা বেন মেতা দিনা। আর আড়ি মজ ই ঞ বুজ কেদা আপেয়া বাপ্লা রেনা আরি চালি ক।

(আচ্ছা ঠিক আছে ভালো থাকবেন। আপনার কাছে বিয়ে সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারলাম)

৩) নাম- ফুলমনি টুডু

বয়স – ৬০

লিঙ্গ – মহিলা

ঠিকানা – তেলিয়াবাঁধি, জামতাড়া, ঝাড়খণ্ড

শিক্ষাগত যোগ্যতা – নিরক্ষর

সাক্ষাৎকারের তারিখ – ২০.০৮.২০২২

গবেষক : জোহার গে নাপায় গে মেনা আকাদ পেয়া। আপে আতো তে সেটের কাতে ঔোডি নাপায় ইঞ বুজ কেদা। আর অড়াঃ দুয়ৌর ক হ ঔোডি নাপায় এেলঃ কান তাপেয়। চেত তেপে বেনাও আকাদা অডি নাপায় এেলঃ কান।

(জোহার, আপনারা কেমন আছেন। আপনাদের গ্রামে এসে আমার খুব ভালো লাগল। গ্রামের বাড়িগুলো সারিবদ্ধভাবে আছে, যা দেখতে খুব সুন্দর লাগছে। আপনাদের এই বাড়িগুলো কীভাবে তৈরি করেছেন।)

ফুলমনি : আলেয়াঃ অড়াঃ কদ হাঁসা, আর বুসুপ তেলে বেনাও গিয়া। আর কুলহি নাখা দ দুডুপ আঃলে বেনাও কা গিয়া। দাঃ জাপুদ রে ভিত হাঁসা বেস তে তাহেনা। আর ভিত করে দ পুতাও আর গুবিৎ কাতে সাফা-সাফি লে দহকাঃ আ। আর আলেয় ঔোরি চৌলি রেনা চিতৌর ক সে বাহা এখান ক ভিত বে কু বেনাও কাঃ আ।

(আমাদের বাড়িগুলো মূলত মাটি ও খড় দিয়ে বানানো হয়। আর বাড়িগুলোর সামনে মাটির উঁচু বেদি থাকে, যেখানে বসাও হয় আবার বৃষ্টির হাত থেকে বাড়িগুলোকে রক্ষা করে। তাছাড়া গোবর ও মাটি দিয়ে বাড়ির দেওয়াল গুলোকে প্লাস্টার করা হয়। বাড়ির দেওয়ালে আবার আপনাদের সমাজের বিভিন্ন প্রতীক আঁকা থাকে।)

গবেষক : আর হঁ ইঞ এেল কেদা নেতার দ এটা জৌত লেকা দালান অড়াঃ ক বেনাও দা। আর হাঁসা অড়াঃ ক দ বাঙ এেলঃ কানা।

(আপনাদের গ্রামে কিন্তু দেখলাম মাটির বাড়ি খুব কম। সরকারি প্রকল্পে অনেক পাকা বাড়ি হয়েছে।)

ফুলমনি : কাথা দ সারি গিয়া নেতার দ হড়ক হ নকরি ক এ্রাম আকাদা, আর সরকার পাহাঠা খন হঁ অড়াঃ ক এ্রাম দা অনাতে দালান অড়াঃ দুয়ৌর ক বেনাও দা। আর হাঁসা অড়াঃ ক দ বাং এ্রেলঃ কানা।

(আপনি ঠিকই দেখেছেন। সরকারের কাছ থেকে অনেকেই এখন পাকা বাড়ি পায় আবার অনেকে চাকরি করায় নিজেদের উদ্যোগে পাকা বাড়ি বানিয়েছে। আর এর জন্যই মাটির বাড়ির সংখ্যা কমেছে।)

গবেষক : মেন খান আপে অড়াঃ করে চিকৌতে চিতৌর ক-দ-পে বেনাও আ নতার দ। অড়াঃ ক মা দালান অড়াঃ পে বেনাও এদ দ।

(আপনাদের এরকম পাকা বাড়ি হওয়ায় আগের মতো বাড়ির দেওয়ালে বিভিন্ন ছবি বা প্রতীক অঙ্কনের যে শৈলী ছিল সেগুলো কি আর দেখা যায়।)

ফুলমনি : নেতার দ আদ অডি কম চাবা আকানা চিতৌর ক হঁ বাংকু বেনাও দা। দিন দিন তে আদ চাবা কানা।

(এখন আর সেরকম ভাবে বাড়ির দেওয়ালে প্রতীক বা ছবি আঁকা হয়না বললেই চলে।)

গবেষক : আর হঁ আপেয়া যাহা জাহের থান ক যাহা পে বেনাও আকাদা উনা ক দ হঁসা রেনা তাহে কানা। মেন খান নেতার দ ইটৌতে পে তল বেনাওদা। নুয়াতে দ আৌরি চৌলি বাং বদলঃ কানা।

(আচ্ছা, আপনাদের এখানে আমি আগে একবার এসে দেখেছিলাম জাহের থানগুলো মাটির ছিল। কিন্তু এখন দেখছি পাকা করা হয়েছে। এতে কি আপনাদের সমাজে পরিবর্তন এসেছে।)

ফুলমনি : সৌরি গে নুককা তে আলেয় যাহা সাঁওতা ঔরি মৌন তাহে কানা অনাদ আদঃ কানা। আর হাঁসা বদলতে ইটৌ তে ক বেনাও দা। দাঃ জাপুদ রে বেস লেকা তাহেন লাগি। সরকার পাহাঠা খন হক বেনাও দা।

(হ্যাঁ আপনি ঠিকই বলেছেন, আমাদের জাহের থান মাটি দিয়ে বানানোর নিয়ম কিন্তু এখন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পাকা হয়ে গেছে। কারণ পাকা বেদি যেমন বৃষ্টিতে ভেঙ্গে যায় না আবার সরকারি সহয়তায় জাহের থান গুলো পাকা করে দেওয়া হচ্ছে।)

গবেষক : মেন খান আলে মালে আঁজম আকাদ সান্তাড় হড় মা বিরবুরু, দাড়ি নাড়ি রেন প্রভৃতি হড় কানা কু। আর অনকা লেকা গে বঁগা বুরু কামি ক করা আ। মেন খান বাং বদল কানা।

(কিন্তু প্রকৃতির উপাদান থেকেই আপনাদের জাহের থান তৈরির নিয়ম রয়েছে। তাহলে পাকা হওয়ায় আপনাদের সমাজের বৈশিষ্ট্য হারিয়ে যাচ্ছে না।)

ফুলমনি : হ্যাঁ সারি কাথা কানা নংকা কাতে সাঁওতা রেনা ঔরি চৌলি বদলঃ কানা। নুয়ুঃদ আড়ি নাপায় কাথা দ বাং কানা।

(হ্যাঁ ঠিকই বলেছেন আমাদের সমাজের অনেক বৈশিষ্ট্যই আগের মতো আর নেই অনেক পরিবর্তন হয়েছে।)

গবেষক : আড়ি আড়ি সাড়হাও। আমা গাল মারাও তালাতে আড়ি দামান আন কাথা ক বাড়ায় এ্রাম কেদা। জোহার গে।

(আপনার সঙ্গে কথা বলে খুব ভালো লাগল এবং আপনাদের সমাজের অনেক কিছু জানতে পারলাম।)

৪) নাম- সন্তোশ টুডু

বয়স – ৪৮

লিঙ্গ – পুরুষ

ঠিকানা – নেতারপাহাড়ি, দুমকা, ঝাড়খণ্ড,

শিক্ষাগত যোগ্যতা – প্রাথমিক

সাক্ষাৎকারের তারিখ – ২৫.০৯.২০২২

গবেষক : জোহার গে আপে আতো রে গোটা আচুর বাড়া ইঞান আর ইঞ ত্রেল কেদা। আডি নাপায় ডাহার নাখারে অড়াঃ মেনা আকাদা। আর আডি নাপায় গে ঞেলঃ কনা। আচ্ছ আতো অড়াঃ বেনাও লাগিদ যাহানাঃ ঔন আরি ক মেনা আ।

(জোহার, আমি আপনাদের গ্রামগুলি ঘোরার সময় দেখলাম কী সুন্দরভাবে রাস্তার দুপাশে সারি সারি ভাবে গড়ে উঠেছে। আচ্ছা, এই গ্রাম গঠনের কী কিছু নিয়ম আছে।)

সন্তোষ : হ্যাঁ মেনা আকাদা আডি নাপায় ঔন ঔরি তালাতে আতো আডাঃ দ বেনাও আকু। আতো রেন মঁড়ে হড় তে আতে রেনা ঔন ঔরি দক ঞেল সামটাও আঃ। আর জত খন মাবং দয় হুয়ু কনা মৌঝি বাবা। আর জত লেকান কামিরে লৌয় আয়াকু।

(হ্যাঁ, একটা নির্দিষ্ট নিয়মের মধ্যে গ্রামগুলি গড়ে ওঠে। এই গ্রাম গঠনের ক্ষেত্রে গ্রামের পাঁচ সদস্যের সভা কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। তবে এই সভার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে থাকে মোড়ল, যাকে সবকিছু জানাতে হয়।)

গবেষক : গমকে নুয়া সানতাড় সমাজ চাচা লাও লাগিত আতো মড়ে হড় দ অকয় কু কানা কু।

(এই পাঁচ সদস্যের সভায় কারা কারা থাকে।)

সন্তোশ : আডি সেদায় খনগে সানতাড় সমাজ রে আতো মড়ে হড় মেনা আকাদ কুয়া আর উনকুদ ক হুয়ু কানা – মৌঝি বাবা, জগ মৌঝি, গোডেৎ নায়কে, পারাণিক, নুকুগে আতো ক নেল সামটাও আ।

(আমাদের এই সভা অনেক দিন ধরে চলে আসছে। এই পাঁচ সদস্যের সভার সদস্যদের নাম হল – মাঝি বাবা, জগমাঝি, গোডেত, নায়কে আর পারাণিক। এরাই মূলত গ্রাম পরিচালনা করে।)

গবেষক : গমকে আঁজম আকাদলে বংশা সানতাড় সমাজ রে মৌঝি বাবা দয় হুয়ুঃ কানা গৌলিম দ। আর আডি মানাও বাতাও এয়াক। মেন খান নেতার রেন সরকার, আপেরেন মৌঝি বাবা যথাৎ মৌন এমায় কান গিয়া।

(আচ্ছা, আমি শুনেছি যে আপনাদের গ্রামে মোড়ল খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। তবে বর্তমান সময়ে সরকারি ব্যবস্থায় মোড়ল কে কী আগের মতো গুরুত্ব দেওয়া হয়।)

সন্তোশ : কাথামা সারিতো নেতার দ আডি ঔরু ফেরাও আকানা। মৌঝি বাবা চেতান নেতার দ পৌতিয়ী দ কম আকান তাকুনা। আর মৌঝি বা আঃ কাথ কুহ বেস লেকাতে বাকু আঁজম দা নেতার রেন জুয়ৌন কড়া কুড়ি ক।

(আপনি ঠিকই বলেছেন গ্রামের মোড়ল খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। কিন্তু বর্তমান সময়ে সরকারি নিয়মের প্রভাবে মোড়ল তেমন গুরুত্ব পায় না।)

গবেষক : নিতার হঁ অন কাগে কু কামি কানা সে ঔরু ফেরা কানা। নেতার সরকারা আঃ ঔন ঔরিতে

(আপনাদের যদি সরকারি নিয়মের মধ্যেই গ্রাম পরিচালনা করতে হয় তবে আপনাদের নিজস্ব গ্রাম পরিচালনার যে পদ্ধতি ছিল সে গুলো কি আর কাজ করে না।)

সন্তোশ : মাড়াং যাহা লেকা ঔন ঔরি ক তাহে কান অন কাগে মেনা আকাদা। মেনখান কিছু সানতাড় ক সরকার আ ঔন ঔরিতে কু চালা কানা।

(আমাদের পূর্বের যে নিয়মকানুন ছিল সে গুলি আছে। তবে এখন সরকারের নিয়ম মেনেই সব কিছু করতে হয়।)

৫) **নাম- নমিতা কিস্কু**

বয়স – ৩৮

লিঙ্গ – মহিলা

ঠিকানা – লহরজুড়ি, দেওঘর, ঝাড়খণ্ড।

শিক্ষাগত যোগ্যতা – প্রাথমিক

সাক্ষাৎকারের তারিখ – ২৫.১১.২০২২

গবেষক : জোহার, আপে আতু রে হেচ কাতে ইঞ এ্রেল কেদা, আপে অড়াঃ পাশে রে আডি আয়মা হড় ক জাওরা আকানা। যাহানা আচার-বিচৌর, সে অড়াঃ কমি হরা ক হুয়ুঃ কানা সে চেত।

(জোহার, আপনাদের গ্রামে এসে দেখলাম পাশের বাড়িতে অনেক মানুষ সমবেত হয়েছে। মনে হচ্ছে কোনো কিছুর অনুষ্ঠান আছে।)

নমিতা : হ্যাঁ, মেনা আকাদ গিয়া। অনা অড়াঃ রে দ নাওয়া পেড়া ক আগু আঁকা দিয়া অনাতে নিম দাঃ মান্ডি রেনা কামি হরা ক করাও দা।

(হ্যাঁ পাশের বাড়িতে জন্মের অনুষ্ঠান রয়েছে।)

গবেষক : আচ্ছা গমকে আপেয়া সানতাড় সমাজরে গিদরৌ জানম পর চিত ক কামি হরা ক করাও গিয়া পে হুড়িম মাঝতে গাল মারাও তা লাং মে সে।

(আপনাদের সমাজের শিশুর জন্মের পর কী ধরণের অনুষ্ঠান করা হয় যদি একটু আমায় বলেন।)

নমিতা : আলেয় সানতাড় সমাজরে গিদরৌ জানম পর গিদরৌ আ এ্ঞতুম ক এমা কুয়া। অনা লাগিদ যাহা ঔৌন ঔৌরি ক মেনা আকাদা অনা দ ক মেতা কান 'নিম-দাঃ-মান্ডি'। আর গিদরৌ দু বায়কা কু এ্ঞতুম কুয়া নিয়া রেনা চল দ ঔৌডি সেদায় খন গে মেনা আকাদা। মিদ ঠাং দ আপনারা কুশিতে আর মিৎ টাং দ আগিল হাপড়াম ক সে

বুড়হি তাকুয়া ঞুতুম ক দহয় আকুয়া। কড়া গিদরৌ দ হাড়মা বা আর কুড়ি গিদরৌদ বুড়হি তাকুয়া ঞুতুম ক দহয় তাকুয়া।

(জন্মের পর আমাদের সমাজে প্রথমেই নাম করণের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে, যাকে 'নিম-দাঃ-মান্ডি' বলা হয়। এক্ষেত্রে প্রত্যেক শিশুর দুটি নাম দেওয়ার নিয়ম থাকে। একটি নিজেদের ইচ্ছা মতো দেওয়া হয় আর অন্যটি অবশ্যই পূর্ব পুরুষদের নাম থেকে দিতে হয়। বিশেষ করে দাদু বা দিদার নামে হয়ে থাকে।)

গবেষক : আচ্ছা ইঞ আডি গান হড় ইঞ এেল আকাদ কুয়া। সানতাড় হড় ক এটা জৌতি রেন হড় লেকা ঞুতু ক দহয় দা। নং কানা ঞুতুম দ অকা খন পে হাতাও দা।

(আচ্ছা, আমি লক্ষ্য করেছি আপনাদের সমাজে নামের ক্ষেত্রে অন্য সম্প্রদায়ের নামের মিল রয়েছে। এরকম নামগুলো কীভাবে নেওয়া হয়েছে।)

নমিতা : গমকে ঠিক কাথা গে বেন মেন আকাদা নেতার দ আডি বৌড়তি গে এটা জৌত রেনা ঞুতুন ক সানতাড় হড় ক ব্যবহার দা। আর হ এটা জৌত সে হিন্দু খ্রিষ্টান ক লেকা মিৎবার কামি হরা ক হঁ এেল কান গিয়া বলে।

(হ্যাঁ আপনি ঠিকই লক্ষ্য করেছেন অনেকে আজকাল হিন্দু ও খ্রিষ্টানদের মতো নাম রাখছে। শুধু তাই নয় হিন্দুদের মতোই আজকাল আমাদের সমাজে মুখে ভাত বা অন্নপ্রাশনের মতো রেওয়াজ চালু হয়েছে।)

গবেষক : আচ্ছ গমকে আর মিৎ টাং কাথা। আর হ আলে এেল আকাদা এটা টঠা রে দ ছৌটয়ৌর কামি হড়া ক করাও গিয়া। মেন খান অনা কথা দ বাম গৌল মারাও লেদ দ।

(আচ্ছা, অন্যান্য এলাকায় আপনাদের সমাজের মানুষ ছাটিয়ার পালন করে সেটার কথা তো বললেন না।)

নমিতা : আলে টঠা সে আলে নাখাদ ছৌটয়ৌর কামি দ বাঙ এেল এমঃ আ, সে চল গে বানুঃ আকাদা। 'নিম-দাঃ-মান্ডি' কামি তালা তে কমি হরা ক পুরৌও গিয়া।

(আমাদের এই দিকে ছাটিয়ার হয় না বললেই চলে। শিশু জন্মের পর 'নিম-দাঃ-মান্ডি' অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই সমাজে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

পরিশিষ্ট- ২

নীচের সারণির মাধ্যমে অস্ট্রো-এশিয়াটিক মুন্ডারী শাখার বিভিন্ন গোষ্ঠীর ভাষার উৎপত্তি সংক্রান্ত একটি তালিকা তুলে ধরা হল, যেখানে সাঁওতালি ভাষার উৎপত্তির বিষয়টি জানা যাবে।

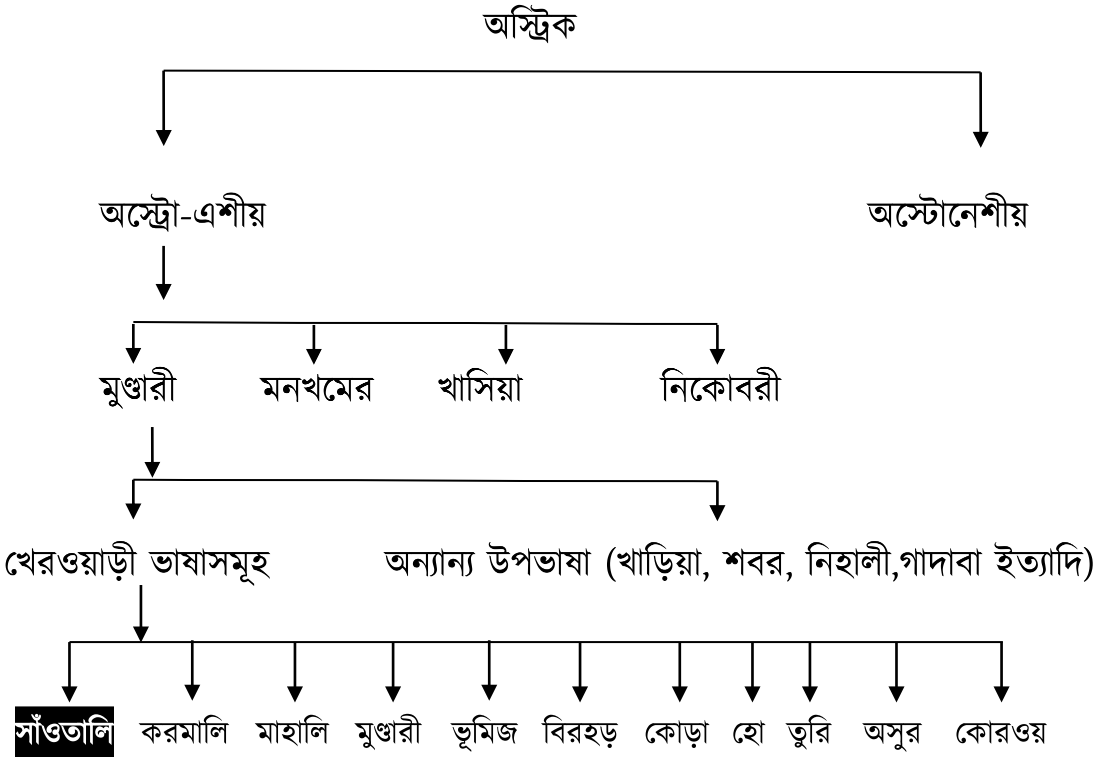

সূত্র:- পরিমল হেমব্রম, সাঁওতালি ভাষা চর্চা ও বিকাশের ইতিবৃত্ত, নির্মল বুক এজেন্সি, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ১০৪।

সাঁওতালদের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়

ভারতের আদিবাসী

প্রোটো-অস্ট্রোলয়েড

কোল বা মুন্ডা, সাঁওতাল, হো, ওঁরাও, ভীল, শবর প্রভৃতি জনগোষ্ঠী এই শ্রেণির অন্তর্গত। এরা অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মিল থাকায় এই রকম নাম করণ। দক্ষিণ ভারত ও পূর্ব ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এই শ্রেণির বাস বেশি।

নিগ্রোবটু

পূর্ব আসামের নাগারা, দক্ষিণ ভারতের কাড়ার, ইরুলা, পুলাইয়া এবং আন্দামান, মালদ্বীপ, কোচিন, ত্রিবাঙ্কুরের পার্বত্য অঞ্চলের মানুষ এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। মূলত আফ্রিকায় এই ধরণের মানুষ ব্যাপক সংখ্যায় রয়েছে।

মঙ্গোলীয়

খাসি, লেপচা, গোর্খা, টোটো, মিজো প্রভৃতি জনগোষ্ঠী এর অন্তর্ভুক্ত। ভারতের আসাম, উত্তর-পূর্ব ভারত, উত্তর-পূর্ব বাংলা, উত্তর বিহার এবং নেপালে এই জনগোষ্ঠীর মানুষের বসবাস সবথেকে বেশি। বার্মা ও ইন্দো চিনের সঙ্গে এদের মিল রয়েছে।

Source :- Biraja Sankar Guha, Race and Racial classification,

https://edenias.com/race-racial-classification-of-dr-b-s-guha/

পরিশিষ্ট- ৩

মানচিত্র

জঙ্গলতরাই জেলার মানচিত্র

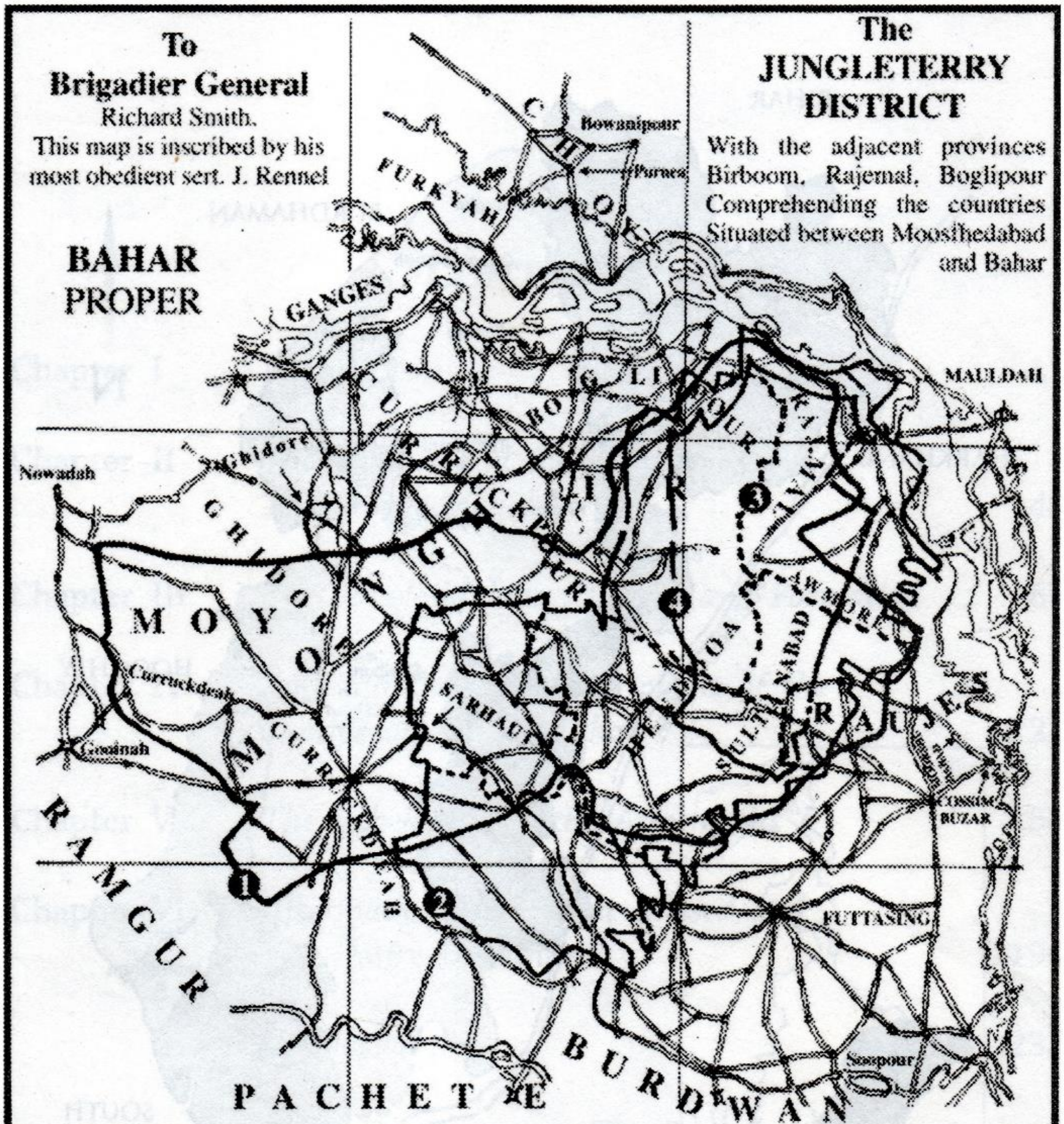

Source: Major. J. Brown/India Tracts, Black-Frairs, 1788, Collected Copy, Bengal Secretariat Library, Kolkata

যুগ্ম অবস্থানে দামিন-ই-কোহ ও সাঁওতাল পরগণার মানচিত্র

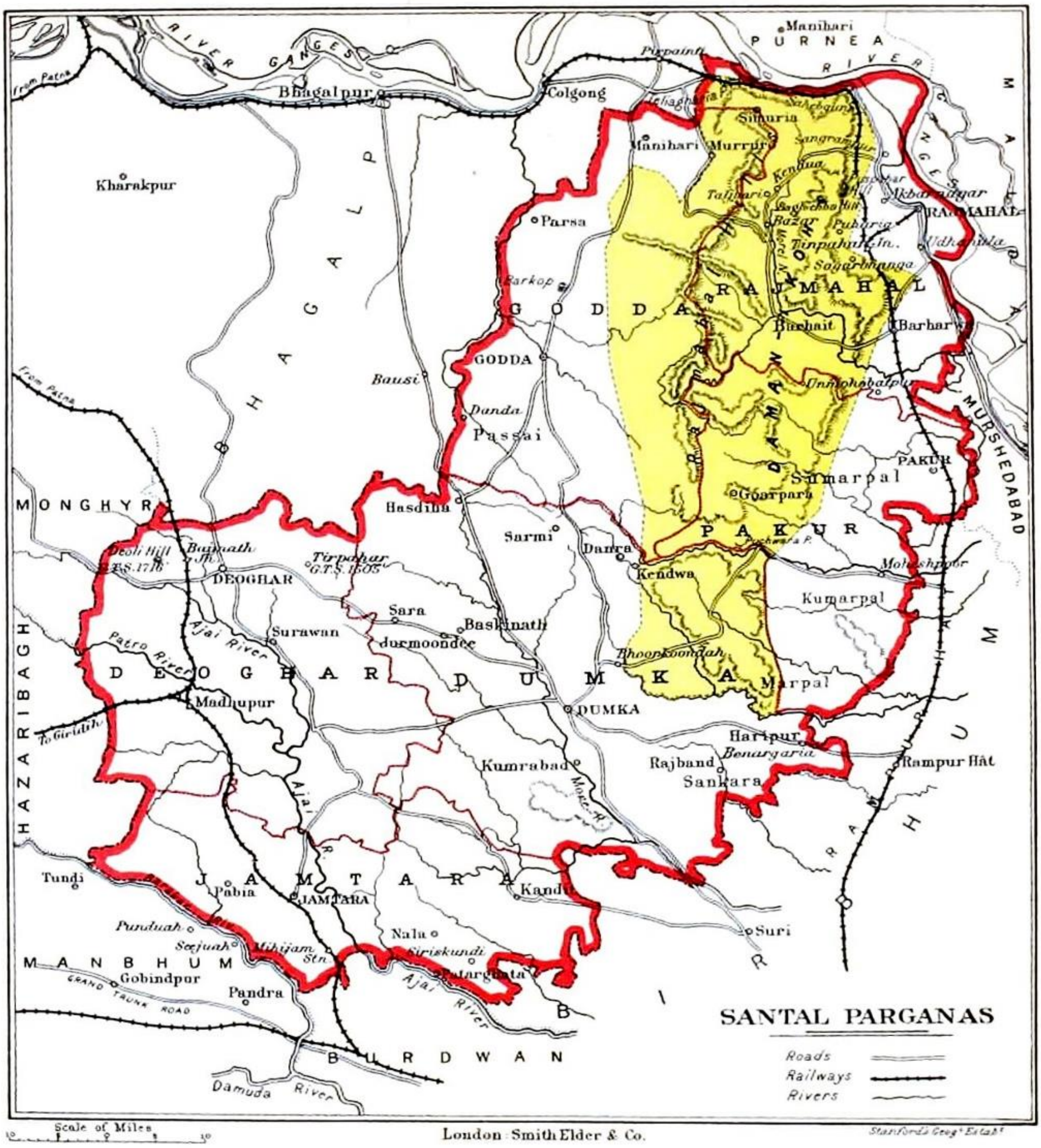

Source: F.B. Bradley Birt, The Story of An Indian Upland, Smith, Elder & Co., London, 1905, p. 355.

সাঁওতাল পরগণার মানচিত্র

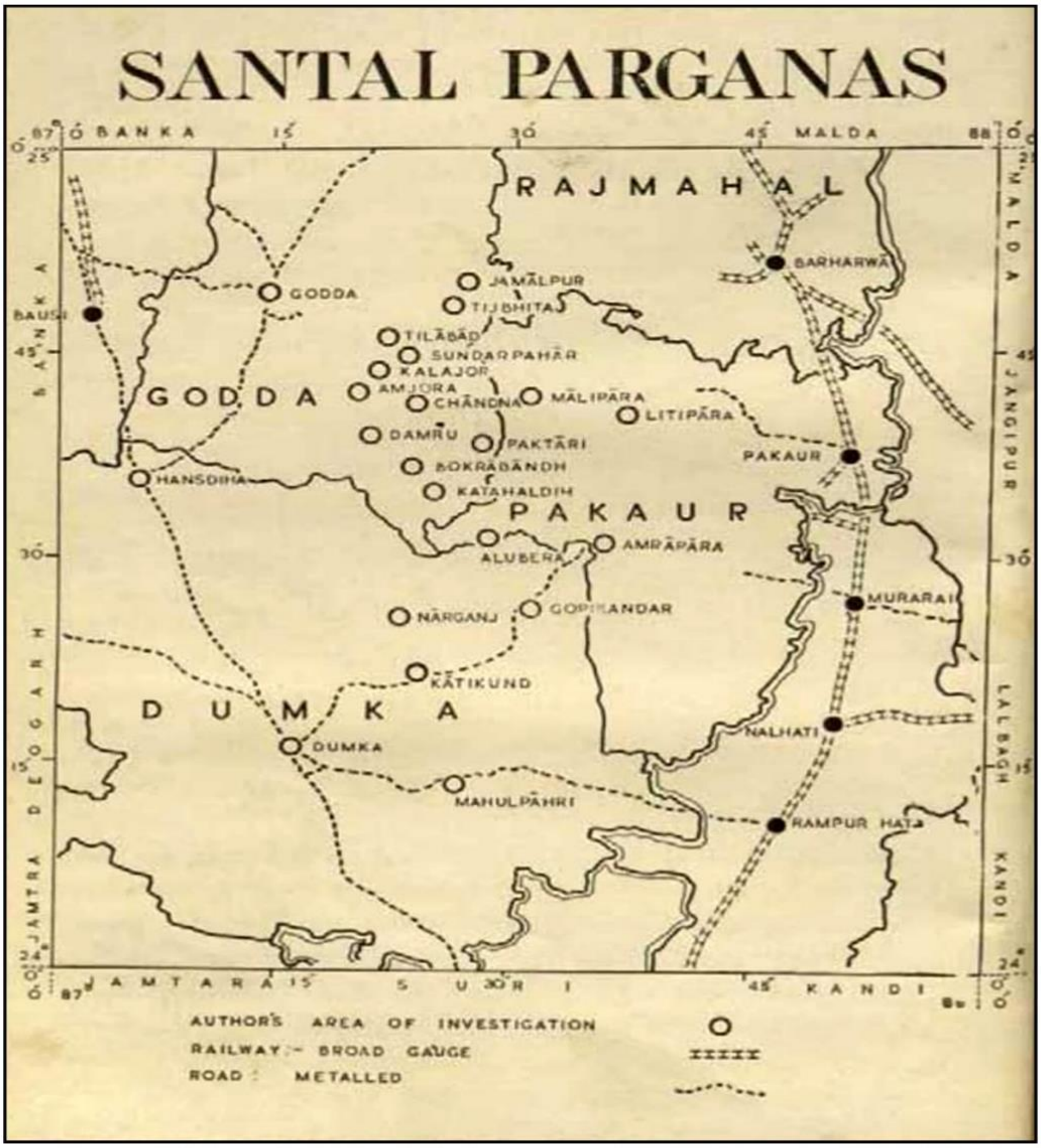

Source: P.C. Biswas, Santal of the Santal Parganas, Bharatiya Adimjati Sevak Sangh, Delhi, 1956

পরিশিষ্ট- ৪

চিত্রাবলী

সাঁওতালদের ঐতিহ্যমন্ডিত জাহের থান, সিমলাডাঙ্গাল, ফতেহপুর, জামতাড়া, ঝাড়খণ্ড।

সাঁওতালদের পরিবর্তিত জাহের থান, সিমলাডাঙ্গাল, ফতেহপুর, জামতাড়া, ঝাড়খণ্ড।

সাঁওতালি বিয়ের অতীত, যেখানে আগুনের ব্যবহার নেই, চাঁদডিহ, দুমকা, ঝাড়খণ্ড।

সাঁওতালি বিয়ের বর্তমান, যেখানে আগুনের ব্যবহার করা হচ্ছে, সোনাডাঙ্গাল, দুমকা, ঝাড়খণ্ড।

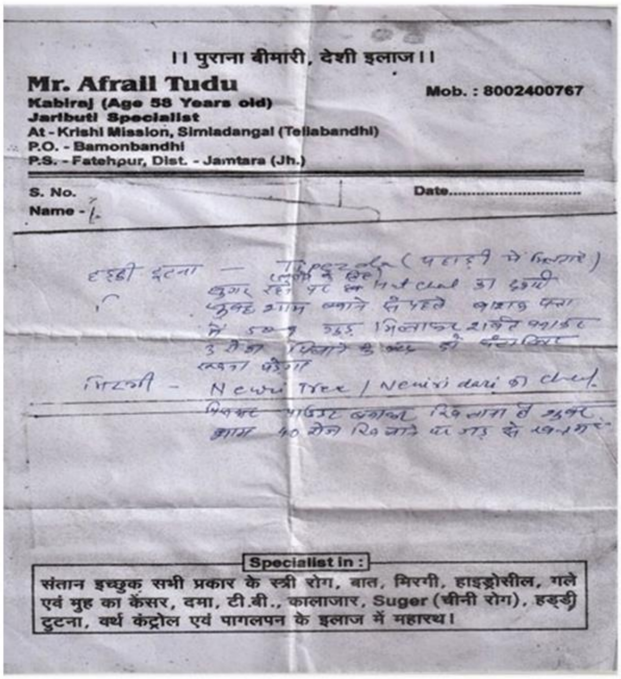

।। पुराना बीमारी, देशी इलाज।।

Mr. Afrail Tudu
Kabiraj (Age 58 Years old)
Jaributi Specialist
At - Krishi Mission, Simladangal (Telabandhi)
P.O. - Bamonbandhi
P.S. - Fatehpur, Dist. - Jamtara (Jh.)

Mob. : 8002400767

S. No.
Date.............................
Name -

Specialist in :
संतान इच्छुक सभी प्रकार के स्त्री रोग, बात, मिरगी, हाइड्रोसील, गले एवं मुह का कैंसर, दमा, टी.बी., कालाजार, Suger (चीनी रोग), हड्डी टुटना, वर्थ कंट्रोल एवं पागलपन के इलाज में महारथ।

খ্রিষ্টান সাঁওতাল কবিরাজের চিত্র ও তাঁর প্রদত্ত প্রেসক্রিপশন অনুলিপি।

ঐতিহাসিক বট বৃক্ষ - যেখানে প্রকাশ্যে কানহুকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল।

ভগনাডিহি গ্রামের সিধু-কানহু মুর্মু স্মৃতি স্থল।

বেনাগড়িয়া মিশন, গবেষকের নিজস্ব সংগৃহিত।

কয়রাবনি মিশন, ফতেহপুর, ঝাড়খণ্ড।

সাঁওতাল বাড়ির দেওয়ালে সাঁওতালি গ্রাম্য হাটের ভাস্কর্য, মিরগাপাহাড়ি, জামতাড়া, ঝাড়খণ্ড।

সাঁওতাল বাড়ির দেওয়ালে শিকার দৃশ্যের ভাস্কর্য, দুমা, জামতাড়া, ঝাড়খণ্ড।

সাঁওতাল বাড়ির দেওয়ালে মারাং বুরুর উপাসনার দৃশ্যের ভাস্কর্য, বেদিয়া, দেওঘর, ঝাড়খণ্ড।

সাঁওতাল বাড়ির দেওয়ালে সাঁওতাল কৃষি জীবনের একটি ভাস্কর্য শৈলী, সিমরা, দেওঘর, ঝাড়খণ্ড।

সাঁওতাল বাড়ির দেওয়ালে বাহা পরবের ভাস্কর্য, লহরজুড়ি, দেওঘর, ঝাড়খণ্ড।

সাঁওতাল বাড়ির দেওয়ালের অঙ্কন শৈলী, তেলিয়াবাঁধি, জামতাড়া, ঝাড়খণ্ড।

সাঁওতাল পরগণার সিমলাডাঙ্গাল গ্রামের নিরজ মুর্মুর গৃহে রাত্রি যাপন ও নৈশাহারে গবেষকের উপস্থিতি।

সাঁওতাল ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে গবেষক, তেলিয়াবাঁধি, জামতাড়া, ঝাড়খণ্ড।

সাঁওতাল বাদ্যকার,দুমা,জামতাড়া, ঝাড়খণ্ড।

হুল দিবসে গবেষকের অংশগ্রহণ।

পরিশিষ্ট- ৫

গবেষণায় প্রাথমিক সূত্রের নির্বাচিত বিষয়বস্তুর কয়েকটি উদাহরণ

1) **The Fifty-First Annual Report of The Santal Mission of The Northern Churches, Dumka, 1919**

a) Santal parents had the firm belief that when their chindren learnt to do what belongs to a Santal farmer's life, that was all that was needed. Now they have come to see that education does not necessarily "spoil" the Santals; moreover that a Santal, who has acquired some education, by the help of this may improve his position in life. Of course, the old apathy is not entirely a thing of the past, but a great many Santal parents now their chindren educated. (p.4)

b) The Dispensary has been attended by 6,268 patients with in all 12,454 consultations. On the busiest day we had 170 patients. Of the 277 operations 18 were for cataract.

The above mentioned 6,268 patients are divided in the following percentage:-

	Men	Women	Total
Heathen Santals	14	9	23
Christian Santals	5	3	8
			Total Santals 31
Hindus	32	16	48
Mohammedans	13	8	21
	64	36	100

As wil be seen the increase consists mostly of Hindus and Mohammedans who come from long distances, whilst the Santals come mostly from the nearest neighbourhood. As last year about third are women.

Miss Larsen writes : When I Wrote my first repost my work here in Dumka was only about three months old; now that I have been over a year here I have got a better impression of the setting of the work. As will be seen from the under noted statistics, about 61 percent of last year’s patients have been men, not with standing their being treated by a woman.

2) **Report on Forest Resources of Santal Parganas and Bhagalpur District of Bihar, Forest Survey of India, Eastern Zone, 1985.**

a) The geographical area of Santal Parganas District is 14,129 sq.km. and that of Bhagalpur District is 5,656 sq.km. The area of Banka Sub-division of Bhagalpur district with in which falls two forest ranges of Deoghar Division is 3091 sq.km. The gross geograophical area of Dumka forest Divison is 7520 sq.km. and that of Deoghar Forest Division is 7420 sq.km. The gross geographical area of sahebganj Forest division is only 2180 sq.km.

b) The total forest area in the district of Santhal Parganas is 1924 sq.km. and that in bhagalpur District is 1,430 sq.km. and that of Deoghar Forest Division is 768 sq.km. The Forest area under sahebganj Forest Division is only 180 sq.km.

3) **Report on the conditions of the Lower classes of population in Bengal, Calcutta, 1888.**

<u>From R. Carstairs, Esq. Offg. Deputy Commissooner, Santhal Parganas</u>

To The Commissioner of Bhagalpur Divisionand S. P The Paharias were a hunting people and used to enjoy the jungles of the plains aroud their hills. The Govt. long tried to get them to clear and cultivate the plains, but failing let in the Sonthals, who deared and occupied the plains.

The chief bar of in the way of improvement of the ryots in this district is the money lender. To meet the money lender the usury clause of Regulation iii of 1872 was introduced. this is not the place to discuss the clause. The evil can not be met by legislation, but by administrative action, Unless Govt. is willing to become mahajana of the ryots, which I do not look upon as a proper function of the Govt, mahajanas must continue to be, because the ryots can not do without them.

4) **Final Report on the Survey and Settlement Operation in the District of Sonthal Parganas 1898-1907 by H. McPherson, I.C.S, Bengal Secretariat book Department,1909.**

The Sonthals are comparative newcomers, dating from the end of the eighteenth or the beginning of the nineteenth century. The oldest aborigines of the district are the Paharias, divided into two branches, the Sauria Maler or northern moun- taineers and the Mal Paharias or southern mountaineers. The census of 1901 has left their enumeration in a state of hopeless confusion. It has shown 47,066 Maler, 25,628 Mal Paharia and 6,426 Naiya or Maulik, who are akin to, and may be reckoned with, the Mal Paharia. I have elsewhere (vide the Selections), guided by previous census figures and information derivable from the present settlement records, endeavoured to make an approximate estimate of the true numbers of the Paharia population. This has resulted in an estimate of 68,000 for Sauria Maler and 63,000 for Mal Paharia. The northern half of the Damin-i-koh hills is the home of the former, and there is a slight overflow east and west of the hills in the adjoining zamindari areas of Godda and Rajmahal. The Mal Paharias are resident in the southern hills of the Damin-i- koh, in the Ramgarh hills, which lie south of that estate and in the scattered hilly tracts of the western subdivisions, where they are commonly known as Naiyas, Pujahars and Mauliks. By my estimate, the combined Paharia tribes account for nearly seven per cent. of the total population.

5) **LETTER COPY BOOK, District Collectorate, Dumka Office**

a) No. 84

To

The Magistrate of Bhagalpore, Dated Dumka, 18.2.56

Sir,

Under instructions from the Commissioner of the Santal Parganas I have the honour to request you will have the goodnes to send up to me for trial the 290 prisonerssent by Mr. Eden to Bhagalpore. In forwarding the prisoners I have to request that they may be fettered in couples, and if you can not send them all at once, I should be obliged if you send them in bands of 50 or 80 at a time. River Tthmson, offg, D. C

b) No. 179

To

Stainforth, Commissioner, S.P., Dated Nya Dumka, March, 1856

Sir,

I regret to inform you that 124 of the prisoners who brought down from Bhagalpore and was tried to be convicted to your court escaped from confinement on the night of Monday last..... About 8 at night before the moon had risen all the prisoners with the exception of 6 rose in one body and scattering in different directions made in the jungles which aroune all sides...The Sowars hearing the disturbances at once hastened to the spot and foppowed the fugitives but the broken natureofthe ground and the darkness prevented any great success attributing their labours.

c) No. 247

To B. Wood, R.E Ronald, Esq, Asistant Comissioner Dated Nya Dumka, 14th April, 1856

Sir, I have the honour to forward herewith for your information, a list of 91 Santhals prisoners who had made their escape from the guard of this place and have not yet been recaptured. A reward of Rs. 10 for the apprehension of each of them has been sanctioned by Commissioner

Barhair Santhal Suboh, Sukur Manjhi, Joyram Manjhi, Bhadoo Manjhi, Chundoo Santhal, Kurram Dome, Ganesh Dome, Kumul Nya, Tuluk Nya Subho Pujhar, Unooh Cole, Poorum Cole

6) **File No. 108/1931**

Dy. Commissioner's Office,

Santal Pagranas,

Dumka,

The 18th April 1931.D.O. No. 470C.

My dear Hallett, The Deputy Commissioner of Hazaribagh wrote to me recently asking me if I could help him'in counter-propaganda, among the Santals.

2. The Hazaribagh problem seems to be rather different to that in the Santal Parganas. I understand that the Congress preachers tried to convert the Santals to Hinduism, telling them that their present degraded position as aboriginals is the fault of the British Government. I enclosed a little story, suitable for translation into Santali, which is I think relevent, but before I get it translated into Santali I should be glad to have the approval of Government. It will of course not bear my name in this case.

3. I am glad to tell you that there has been a great demand for the two pamphlets published in my name which Government were pleased to approve. I do not say this by way of self-congratulation but because I think that Government are wrong in imagining that propaganda by District Officers personally is useless.

Yours sincerely,

M.G. Hallett, Esquire, C.I.E., I.C.S.,

Chief Secretary to the Governmment of Bihar & Orissa.

7) **Extract from the Home Department Proceedings/Public Branch** –

10th may, 1861 nos. 12,13A.

a) Demi Official from Mr. Plowden dated Doomka the 7th May,

1861.

It appears that, sthough the people have complained in large bodies to the Assistant Commissioner, no petition alleging specific grievances has been presented. The Assistant Commissioner in- formed them that the Farmer had a right to measure and to raise the rates within certain limits, and that he could not interfere except upon petition or suit in specific cases. No petition or suit has been lodged in any case, and so the matter has drifted on since the beginning of March last, when the first assembly of the people took place. On that occasion, Mr. Tayler, the Assistant Commissioner, explained to them at Nony Hat that such riotous assembly (as he called it) was not allowable; and they replied that they had only met to take counsel on the subject of the Measurement and enhanced Rents. I think this was probably true, and that all subsequent assemblies have taken place, as declared, either for the same purpose or as hunting parties, though no doubt a few evil-minded persons, not themselves

effected by the proceedings of the Farmers, have taken advantage of the occasion to give bad advice and fomant discord, but not to the extent of an insurrectionary movement. We know pretty well who the evil counselors are. The Chief is one Soondor, a notorious bad character. He was a leader in the late insurrection, and once had a rope round his neck, under General Lloyd's orders, to be hanged, but managed to make his escape. Two years after the insurrection he returned to his home here, and was tried for his life by the present Assistant Commissioner, but was released for want of evidence. It appears that one Doorga, a Naik in the 4th Battalion of the Military Police, Kishnaghur, came to Nony Hat, on a short leave, early in March last, when the Assistant Commissioner was there. The people concerned with him on the subject of the enhanced Rents, and he took seven men with him, of whom Soondor was one, to Kishnaghur, where they heard and saw what going on among the Ryots there. From Kishnaghur the seven proceeded, via Barasat to Calcutta, and returned to Doomka at the end of March or beginning of April. In passing through to their homes they came to the Assistant Commissioner who asked them what they had seen in Calcutta, to which they replied that they had seen the Supreme Court, the Chota Adawlut, Alipur and the Lieutenant Governor. Being asked what the Lieutenant-Gover- nor had said to them, they answered that he had spoken very kindly and fairly to them. It has since transpired that Soondor goes about on a horse, which he says was presented to him by the Lieutenant- Governor, and that he gives out that the Lieutenant-Governor had told them that the rates could not be raised more than 4 annas or so in the Rupee, that is 25 percent.

8) Bengal Judicials Consultaton

Pamphlet of the Revolt of the 1855, Letter dated 14th February, 1856, No.157

From A.C. Bidwell, Esq., Late Special Comissioner for the supression of the Sonthal Insurrection No. 827A of 10th December 1855- (No. 827A)

This is he who sends the Thakoors Perwannah

Sidoo Manjee

Kanoo Manjee

at the incarnation of the Thakoor.

Inhabitanta Kanoo and Seedoo of Bagwadee Pa Kaseata The Thakoor has become an incarnation at the place of Seedoo and Kanoo and his brothers. Whatever the Thakoor declares comes down from the firmament, and the discourse of Kanoo Manjee and Sidoo Manjee is the Thakora, He says "Let all the poor people fight". Kanoo Manjee and Sidoo Manjee are not to fight. The Thakoor himself will fight. You all come near the Thakoor and fight. He who will be sent to the Thakoor by Ganga Mage will rain down fire, Whoever will agree to stay will the favour of the Thakoor you oross the Ganges. So you will obtain incarnation. The Thakoor has ordained the rent at 1 Anna per bullock and at 2 Annas per buffalo. The compassion of religion and investigation of religion will commence. He that will act treacherously (be dhurm) will not be able to stay on earth. The Mahajuns have committed heinous crimes (pap) and all have acted unjustly. The Amlahs now made the whole rules and regulation bad and this is sin to the Sahibs. The Sahib who takes the duties of a Magistrate, he Maib Sazawal is the person who holds investigation, and extorts sixty or eighty rupees by force. This is a sin of the Sahibe. And it is from this that the Thakoor has commanded me that the land does not belong to the Sahibe. a Perwannah. If you do not obey these commands, you must reply to this by He that will agree to this must send his Perwannah dated the 10th Sawreo 1262.

9) **Extract from Sir George Yule's Report on the Sonthal Parganas, for 1858.**

In former Reports I have described the Sontal Districts at so much length that I need say little now. A wonderful change has come over the people ever since last year. They all, and the Sontals in particular, have become so fat and sleek, and they have entirely lost the look, either sulky or anxious, which most of them at first had. Their com- plaints too now are individual, not general. Two deputa- tions of Sontal Manjees-one from Khurruckpore, the other from Chukye, both in Monghyr-came to us at Deoghur to complain of the exactions and oppressions they suffered at the hands of the Mahajuns and Zemindars. I had enquired into their complaints while passing through Khurruckpore, when the Manjees were all absent, having gone to consult Mr. Robinson, whose name is great in Sontaldom. The complaints resolved themselves into two general subjects. The Sontals had pottahs for short periods only; they had settled

in the jungles at low rents at first; these had been gradually increased, and were about to be increased still more. The Sontals wished to revert to the first jumma, or if that could not be done, then they hoped Government would take all their villages into its own hands and retain the present rents without further increase. I could not give them any hope of compliance with either of their requests. The Zemindars had the right, by law, under the circumstances, to increase their rents, and were doing no ryots of neighbouring Zemindars letting out the secret openly or quietly to the Hakim.

গ্রন্থপঞ্জি

গ্রন্থপঞ্জি

PRIMARY SOURCES

A. ARCHIVAL SOURCES:

1. West Bengal State Archives, Kolkata

Bengal Board of Revenue proceedings, 1793-1840.

Bengal General(Mic) Proceedings, September 1875, BJP, File No.133-1/4 Bhagalpur Commissioner's Annual General Report 1874-75.

Proceedings of the Judicial Department, Government of Bengal, 1855, 1856, 1862, 1865, 1867, 1870, 1871, 1881, 1896.

2. Bihar State Archives, Patna

Bhagalpur commissioner's Records: *Damin-I-Kor correspondences*, 1827-1852.

Fortnightly Reports, Bhagalpur 18/1933.

Proceedings of the Governor General in Council in their Revenue Department, 6th January, 1775-1785.

Proceedings of the Judicial Department, Judicial Branch, Government of Bihar and Orissa, 1882, 1905, 1937.

Proceedings of the Political (Special) Department, Government of Bihar and Orissa, 1927, 1929, 1930, 1931, 1933, 1935, 1936, 1938, 1942.

Political Special; File KW 20/1931; DIG CID Report July-December 1931.

Reports DIG CID File number KW 20 1935; January -December 1935.

3. Jharkhand State Archive, Ranchi

Annual Administration Reports roads and buildings irrigation and Railways, 1922-23, 1924-25

Proceedings of the hon'ble the lieutenant governor of Bengal in Council during general department education, 1912.

Report on the land revenue administration of the province of Bihar and Orissa, 1918, 1919, 1920.

The Chotanagpur tenancy (Amendment bill 1920 and referred to their report, 1920).

4. Dumka Record Office (erstwhile Santal Parganas, now at Jharkhand)

Letter copy book (Not systematically arranged), Several Volumes, 1840-1932.

Pontet's Correspondence Book.

5. National Archive of India, New Delhi

Proceedings of the Home Department, Judicial, 1861, 1871, 1872.

B. OFFICIAL DOCUMENTS

1. Census Publication

Archer, W.G., Census of India 1941 Volume VII, (Public Department, 1942)

Beverley, H., Report on the Census of Bengal, Volume II, 1872, Bengal Secretariat Press, Calcutta, 1872.

District Census Report, Santal Parganas, 1891, Bengal Secretariat Press, Calcutta,1892.

Hutton, J.H., Report on the Census of India, 1931, 3 Volumes, Gyan Publishing House, New Delhi, 1966.

Risley, H.H., and Gait, Report on Census of India, volume VI, 1901, Bengal Secretariat Press, Calcutta, 1903.

2. Gazetteers, Settlement Report and Other Government Reports

Gazetteers :

Bihar District Gazetteers : Santal Parganas, Superintendent Secretariat Press, Bihar, Patna, 1965.

O' Malley, L.S.S., *Bengal District Gazetteers: Santal Parganas*, First Published 1910, The Bengal Secretariat Book Depot, Calcutta, Reprint Logos Press, New Delhi, 1984.

Settlement Report :

Craven, J, Final Report on the Suvey and Settlement of Certain Estates in Santal Parganas, 1888-92. Bengal Revenue Proceedings Vol – 4330, March 1893.

Final Report on the Suvey and Settlement of Certain Estates in Santal Parganas, 1892-94. Bengal Revenue Proceedings Vol – 5695, May 1899. Copy also in the Deputy Commissioner's Record Room, Dumka.

Gantzer, J.F., Final Report on the Suvey and Settlement Operation in the District of Santal Parganas 1922-1935, Superintendent Government Printing, Bihar, Patna, 1936.

Mc. Pherson, H., Final Report on the Suvey and Settlement Operation in the District of Santal Parganas 1898-1907, Bengal Secretariat Book Depot, Calcutta, 1909.

Wood, Brown, Final Report on the survey and settlement of the Damin-i-koh (1878-79). Bengal Revenue Proceedings, Vol – 1488, May 1880. Also in Deputy Commissioner's Record Room, Dumka.

Other Government Reports Printed and Publication

Datta, K.K., (ed.) Selection from unpublished correspondence of the Judge Magistrate and the Judge of Patna (1790-1857).

Datta, K.K., (ed.) Selection from the Judicial Records of Bhagalpur District Office (1772-1805), State Central Record Office, Patna, 1968.

Enquiry Report of Mr. H.C. Sutherland, Magistrate of Bhagalpur entitled "Report on the management of the Rajmahal hills dtd 8th june 1819", West Bengal State Archives, Calcutta, also in Deputy Commissioner's Record Room, Dumka.

Prime Minister's speeches, August 1955, Verrier Elwin Papers, Nehru Memorial Museum and Library, New Delhi

First Five-Year Plan in Bihar 1951-56, A Review, Printed by the Superintendent, secretariat Press, Bihar, Patna, 1956.

Mac Donnel, A.P., Report on the food grain supply : A statistical review and relief operations in the District of Bihar and Bengal during the famine of 1873-74, Government of Bengal, Calcutta, 1876.

Prime Minister speech delivered at the Scheduled Tribes Conference, New Delhi, 7th June, 1952, Nehru Memorial Museum and Library, New Delhi

Prasad, Binod Mohon, Santal Parganas, Tenancy Manual, Malhotra Bros., 1995.

Prasad, Ranchor, Bihar District Census Hand Book (1951) : Santal Parganas, Printed by the Superintendent Government printing, Bihar, Patna, 1956.

Prasad, B.N., Revised working plan for the Santhal Parganas Division, 1955-56 to 1964-65, The Superintendent Government, Secretariat Press, Bihar, Patna, 1963.

Prasad, S.D., Bihar District Census Hand Book (1961) : Santal Parganas, 12, part-II, Village and Town Statistics, Published by the Government of Bihar, Patna 1964.

Report of the Santal Parganas inquiry Committee, Superintendent Government Printing, Bihar, Patna, 1938.

Report of The Committee on the Special Multi-Purpose Tribal Blocks, Ministry of Home Affairs, New Delhi, March, 1960.

Report of the Scheduled Areas and Scheduled Tribes Commission, 1960-61, Vol- I and II, Ministry of Home Affairs, New Delhi, 1963.

Report on the Forest Resources of Santal Parganas and Part of Bhagalpur Districts of Bihar, Forest Survey of India Eastern Zone, Ministry of Environment and Forest, Government of India, 1985.

Second Five-Year Plan in Bihar : A Review of Progress in the Second Year, 1957-58, Printed by the Superintendent, secretariat Press, Bihar, Patna, 1958.

Santal Parganas Manual (1911), Secretary to the Government of Bihar, Revenue Department, Patna, Reprint 1961.

Special Laws Applicable to the Santal Parganas, Government of Bihar Law Department, superintendent Secretariat Press, Bihar, Patna, 1965.

The Santal Parganas Settlement Regulation (Regulation No.III of 1872) as Modified up to the 1st October 1899, The Superintendent of Government Printing, Calcutta, 1899.

The Bihar and Orissa Forest Manual, Vol-I and Vol-II, Superintendent, Government Printing , Bihar, Patna, 1917.

Third Five-Year Plan in Bihar, Vol-I, Printed by the Superintendent secretariat Press, Bihar, Patna, 1961.

C. MISSIONARY RECORDS

The Thirty-Fourth Annual of the Santal Mission of the Northern Churches (The Indian Home Mission to the Santal), 1900-1901, Benagaria, 1901.

The Forty-Fifth Annual Report of the Santal Mission of the Northern Churches (The Indian Home Mission to the Santal), 1911-12, Benagaria, 1913.

The Fifty-First Annual report of The Santal Mission of the Northern Churches (The Indian Home Mission to the Santal), 1917-18, Published by the The Santal Mission of the Northern Churches, Dumka, 1919.

The Seventy-Sixth Annual of the Santal Mission of the Northern Churches, 1942, Benagaria, 1943.

The 91st Annual of the Santal Mission of the Northern Churches for the year 1957 and the Eighth year of the Ebenezer Evangelical Lutheran Church, Dumka, Published by the Santal Mission of the Northern Churches, Benagaria, 1958.

D. FIELD WORK IN THE SANTAL PARGANAS (Now at Jharkhand)

সাক্ষাৎকার, সাগেন মারান্ডি, সিমলাডাঙ্গাল, জামতাড়া, ঝাড়খন্ড, ০৯.০৮.২০২২

সাক্ষাৎকার, সুলখান সরেন, মিরগাপাহাড়ি, জামতাড়া, ঝাড়খন্ড, ১২.০৮.২০২২

সাক্ষাৎকার, ফুলমনি টুডু, তেলিয়াবাঁধি, জামতাড়া, ঝাড়খন্ড, ২০.০৮.২০২২

সাক্ষাৎকার, সন্তোশ টুডু, নেতারপাহাড়ি, দুমকা, ঝাড়খন্ড, ২৫.০৯.২০২২

সাক্ষাৎকার, নমিতা কিস্কু, লহরজুড়ি, দেওঘর, ঝাড়খন্ড, ২৫.১১.২০২২

সাক্ষাৎকার, মন্দন মারান্ডি, ফতেহপুর, জামতাড়া, ঝাড়খন্ড, তারিখ – ১৫.০২.২০২২.

সাক্ষাৎকার, রূপলাল মুর্মু, সিমলাডাঙ্গাল, জামতাড়া, ঝাড়খন্ড, তারিখ – ১০.০১.২০২১

সাক্ষাৎকার, জহর মুর্মু, ভীমপাহাড়ি, ফতেহপুর ব্লক, জামতাড়া জেলা, ঝাড়খন্ড, ১৫.০২.২০২১।

পর্যবেক্ষণ : জামতাড়া, দুমকা, দেওঘর, গোড্ডা, তারিখ. ১৭.০৫.২০২১-২০.০৬.২০২১.

পর্যবেক্ষণ: চুটোনাথ মন্দির, দুমকা, ঝাড়খন্ড, তারিখ – ৭.১২.২০২১.

পর্যবেক্ষণ : (সিমলাডাঙ্গাল, তেলিয়াবাঁধী, জোডডিহা, দুমা, ভিমপাহাড়ি), জামতাড়া জেলা, ফতেহপুর ব্লক, ঝাড়খণ্ড, তারিখ – ১০.০২.২০২১ -২১.০২.২০২১।

SECONDARY SOURCES

1. English Books

Adhikary, Ashim Kumar, *The Tribal Situation in India*, Abijeet Publications, Delhi, 2009.

Archer, W.G., *Tribal Law and Justice*, Concept Publishing Company Pvt. Ltd., New Delhi, First Published 1984, Reprinted 2014.

Banerjee, Prathama, *Politices of Time: 'Primitives' and History* - *Writing in a Colonial Society*, Oxford University Press, Delhi, 2006.

Banerjee, Tarasankar, *Changing Land Systems and Tribals Eastern India in The Modern Period*, Subarnarekha, Calcutta, 1989.

Bhargava, Meena, (ed.), *Frontiers of Environment : Issues in Medival and Early Modern India*, Orient BlackSwan, New Delhi, 2017.

Biswas, P.C., *Santals of the Santal Parganas*, Bharatiya Adimjati Sevak Sangha, Delhi, 1956.

Bodding, P.O, *Traditions and Institutions of the Santals*, Gyan Publishing house, New Delhi, Frist Published 1942, Reprint 2013.

Bodding, P.O., *Studies in Santal Medicine and Connected Folklore,(Part-i,ii,and iii),* Gyan Publishing House, New Delhi, , Frist Published 1925, Reprint 2017.

Bompas, C.H., *Folk Lore of the Santal Parganas*, David Nutt, London, 1909.

Bose, Nirmal Kumar, *Hindu Method of Tribal Absorption*, Science and Culture, Delhi, 1941.

Bose, Nirmal Kumar, *Tribal Life in India*, National Book Trust, New Delhi, 1971.

Bradley-Birt, F.B., *The Story of an Indian Upland*, Smith, Elder and Co., London, 1905.

Carrin, Marine and Haralad Tambs- Lyche , *An Encounter of Peripheries: Santals, Missionaries and their Changing Worlds,1867-1900*, Monohar, New Delhi, 2008.

Carrin, Marine and Harald Tambs-Lyche (eds.,), *People of the Jangal : Reformulating Identities and Adaptations in Crisis*, Manohar, Delhi, 2008,

Carstairs, R., *Harma's Village-A Novel of Santal life*, The Santal Mission Press, Pokhariel, 1905.

Carstairs, R., *The Little World of an Indian District Officer*, Macmillan and Co., London, 1912.

Chakrabarti, Ranjan, (ed.), *Does Environmental History Matter ? : Sikar, Subsistence, Sustenance the Sciences*, Readers Service, Kolkata, 2006.

Chakraborti, Digambar, *History of The Santal Hool of 1855*, in Arun Chowdhury (ed.), National Book Agency (P) Ltd., Calcutta, 1989.

Chatterjee, Partha, *The Nation and Its Fragments : Colonial and Post Colonial Histories*, Oxford University Press, New Delhi, 1993.

Chattopadhyay, Pradip, *Redefining Tribal Identity*, Primus Books, Delhi, 2014.

Chaudhuri, B.B., and Arun Bandopadhyay (eds.), *Tribes, Forest and Social Formation in Indian History*, Monohar, New Delhi, 2004.

Chudhuri, B.B., 'Decline of the Old Order in the Adivasi Tribal World', in *Peasant History in late Pre- Colonial and Colonial India*, Volume 8, Chapter X, Pearson Education India, New Delhi, 2008.

Chudhuri, B.B., 'Society and Culture of the Tribal World in Colonial Eastern India: Reconsidering the Notion of Hinduization of Tribes' in Hetukar Jha (ed,), *Perspectives on Indian Society and History : A Critique*, Monohar, New Delhi, 2001.

Chudhuri, B.B., Adivasi Quest for a New Culture in Colonial Bengal: Context, Ideology and Organization 1855-1932, in Sabyasachi Bhattacharya, *A Comprehensive History of Modern Bengal*, 1700-1950, Vol-iii, The Asiatic Society, Kolkata,2020.

Culshaw, W. J., *Tribal Heritage: A Study of the Santals*, Gyan Publishing House, Frist Published 1949, Reprint 2013.

Dalton, Edward Tuite, *Tribal History of Eastern India*, Cosmo Publication, Delhi, 1973.

Daniel J. Rycroft and Sangeeta Dasgupta (eds.), *The Politics of Belonging in India : Becoming Adivasi*, Routledge, New York, 2011.

Das Gupta, Sanjukta and Rajshekar Basu, (eds.), *Narratives from the Margin: Aspects of Adivasi History in India*, Primus Books, New Delhi, 2011.

Datta, K.K., *The Santal Insurrection of 1855-57*, Firma KLM Private Limited, Calcutta, 2001.

De, Debasree, *A History of Adivasi Woman in Post-Independence Eastern India : The Margins of the Marginals, Sage*, New Delhi, 2018.

Elwin, Verrier, *The Aboriginals*, Oxford University Press, New Delhi, 1944.

Elwin, Verrier., *A Philosophy for NEFA*, Oxford, Delhi, 1959, Second Edition, 2008.

George E. Somers, *The Dynamics of Santal Traditions in a Peasant Society*, Avhinava Publication, New Delhi, 1977.

Ghurye, G.S., *The Scheduled Tribes*, Popular Book Depot, Bombay, 1963.

Grove H. Richard, *Green Imperialism : Colonial Expansion, Tropical Islands Edens and The origins of Environmentalism*, 1600-1860, Cambridge University Press, New York, 1995.

Guha, Ramachandra, *Savaging The Civilized : Verrier Elwin, His Tribals, and India*, Penguin Random House India, Haryana, 2016.

Guha, Ranajit, *Elementary Aspects of Peasnt Insurgency in Colonial India*, Oxford University Press, New Delhi, 1983.

Guha, Sumit, *Environment and Ethnicity In India 1200 -1991*, Cambridge University Press, 1999.

Hansda, Sowvendra Sekhar, *The Adivasi Will Not Dance : Stories, Speaking Tiger*, New Delhi, 2017.

Hembram, Chaitan Koomar, *Santal Pargana : Santal or Paharia Koak Itihas*, Santal Mission Press., Taljhari, 1948.

Hembrom, T., *The Santals*, Punthi Pustak, Calcutta, 1996.

Hodne, Olav, L.O. *Skrefsrud: Missionary and Social Reformer Among the Santals*, Egede Instituttet, Oslo, 1966.

Hunter, W.W., *The Annals of Rural Bengal*, Smith Elder and Co., London, 1868.

K.S. Singh (ed.), *Jawaharlal Nehru, Tribes and Tribal Policy : A Centennial Tribute*, Proceedings of a Seminar, Anthropological Survey of India, Calcutta, 1989.

Kisku, Panchanan, *Saviour of The Oldest Cultural Heritage of India*, Kherwal Publication, Orissa, 2001.

Mahapatra, Sitakant, *Modernization and Ritual: Identity and Change in Santal Society,* Oxford University Press, Calcutta, 1986.

Mahato, Nirmal Kumar, *Sorrow Songs of Woods : Adivasi-Nature Relationaship in the Anthropoccne in Manbhum*, Primus Books, Delhi. 2020.

Mahato, Pashupati Prasad, *Sanskritization vs Nirbakization : A Study of cultural resistance of the people of Junglemahal,* Purbalok Publication, Kolkata, First Published 2000, Second Edition 2012.

Mallick, Samar Kumar, *Transformation of Santal Society: Prelude to Jharkhand*, Minerva Associates Publication Pvt. Ltd., Calcutta, 1993.

Man, E.G., *Sonthalia and the Sonthals*, Geomyman and Co., Calcutta, 1867.

Methur, Nita, (ed), *Santal Worldview*, Concept Publishing Company, New Delhi, 2001.

Mishra, Asha and Chittaranjan Kumar Paty, *Tribal Movement in Jharkhand 1857-2007*, Concept Publishing Company Pvt. Ltd., New Delhi, 2010.

Mishra, Ramesh Chandra, Durganand Sinha and John Widdup Berry, *Ecology, Acculturation and Psychological : A Study of Adivasis in Bihar*, Sage Publication, New Delhi, 1966.

Mitra, Parimala Chandra, *Santali: The Base of World Language*, Firma KLM Private Limited, Kolkata, 1988.

Mondal, Partha, *Contextualising the Tribal Medicine of Santal Parganas: Changing Patterns of historical significance*, in Mahua Sarkar (ed.), History Essays in Memory of Professor Subhasis Biswas : Themes in Science, Technology, Environment and Medecine, Alphabet Books, 2021.

Mukherjee, Charulal, *The Santals*, Gyan Publishing House, New Delhi, First Published 1962, Reprint 2017.

Olav Hodne, *The Seed Bore Fruit: A Short History of the Santal Mission of the Northern Churches 1867-1967*, Santal Mission of the Northern Churches, Dumka, 1967.

Orans, Martin, *The Santal : A Tribe in Search of a great Tradition,* Deroit, Wayne State University, 1965.

Pati, Biswamoy, *Adivasi in Colonial India: Survial, Resistance and Negotiation*, Orient Blockswan, Delhi, 2011.

Poffenberger, Mark and Betsy McGean (eds.), *Village Voices*, *Forest Choices*, Oxford University Press, Delhi, 1996.

Prasad, Narmadeshwar, *Land and People of Jharkhand*, Editor, Prakash Chandra Oraon, Dr, Ram Dayal Munda Tribal Welfare Research Institute, Ranchi, 1961, Reprint, 2020.

Rangarajan, Mahesh, and K. Sivaramakrishnan,(eds.), *India's Environmental History : Colonialism, Modernity, and the Nation*, Permanent Black, 2012.

Sahu, Chaturbhuj, *Approaches of Tribal Development*, Adhyayan Publishers & Distributors, New Delhi, 2009.

Saren, Baidyanath, *The Kherwal : Ancient History of the Santals*, Adibasi Socio Education and Cultural Association (W.B), Kolkata, 2008.

Sarkar, Mahua, (Ed.), *Environment and the Adivasi World*, Alphabet Books, Kolkata, 2017.

Sen, Suchibrata, *The Santals of Jungle Mahals Through the Ages*, Ashadeep publication, Kolkata, 2013.

Sengupta, Nirmal, *Fourth World Dynamics : Jharkhand*, Authors Guild Publication Delhi, 1982.

Sing, K.S.,(ed.), Tribal Movement in India, Vol- 1 and 2, Manohar, New Delh, First Published 1982, Reprint 2015.

Singh, K.S.,(ed.), *Economics of The Tribes and Their Transformation*, Concept Publishing Company, New Delhi, 2016.

Singh, Sunil Kumar, *Inside Jharkhand*, Crown Publications, Ranchi, 2018.

Sinha, S.P., *Conflict and Tension in Tribal Society,* Concept Publishing Company, New Delhi, 1993.

Sinha, Surajit, (Ed.), *Tribal Politices and State system in pre-colonial eastern and North eastern India,* Centre for studies in society sciences, Calcutta,1987.

Sivaramakrishnan, K, Modern *Forests : Statemaking and Environmental Change in Colonial Eastern India,* Oxford University Press, New Delhi, 1999.

Surendra Jha and Shiv Shankar Raut, *History of the Santals of Jungle Terai (1800-1855*), Ayushman Publication House, New Delhi, 2015.

Susana B.C. Devalle, *Discourses of Ethnicity and Protest in Jharkhand,* Sage Publication, New Delhi, 2006.

Troisi, J., *The Santals : A Classified and Annotated Bibliography*, Manohar, New Delhi, 1976.

Troisi, J., *Tribal Religion*, Manohar Publications, Delhi, 1979.

Velayutham Saravanan, *Environmental History and Tribes in Modern India*, Palgrave MacMillian, Singapore, 2018.

Vidyarthi, L.P., and Makhan Jha, (eds.), *Growth and Development of Anthropology in Bihar*, Classical Publication, New Delhi, 1979.

W.J. Culshaw, *Tribal Heritage : A Study of the Santals*, Butterworth Press, London, 1949.

Xaxa, Abhay Flavian and G.N. Devy (eds.), *Being Adibasi : Existence, Entitlements*, Exclusion, Penguin Random House India, Haryana, 2021.

Xaxa, Virginus, State, Society, and Tribes : Issues in Post-Colonial India, Pearson, Noida, 2008.

2. English Articles in Journals

Ambashat, N.K, ‘Santal Coal Miners : A Few Case Studies’, Bulletin of the Bihar Tibal Research Institute, Ranchi, 5 (1), 1963.

Banerjee, Prathama, ‘Culture/Politics : The Irresoluble Double Bind of The Indian Adivasi’, in Indian Historical Review, Vol.XXXIII, no.1 (New Delhi : The Indian Council of Historical Research, 2006).

Banerjee, Prathama, 'Writing the Adivasi : Some Historiographical notes', in Indian Economic and Social History Review, Vol.LIII, no.1, January-March, 2016.

Basu, K.K., ' Missionary Education in the Sonthal Parganas', Journal of the Bihar Research Society, Ranchi, 30(2), 1944.

Basu, Sunil Kumar, 'Identity Crisis Among the Tribals', in Bulletin of the Cultural Research Institute, Vol.XVIII, No.1-2, 1992.

Bodding, Paul Olaf, 'The Santals and Disease', Memories of The Asiatic Society of Bengal, Calcutta, 10(1), 1925.

Campbell, Andrew, 'Death and Cremation Ceremonies among the Santals', Journal of the Bihar and Orissa Research Society, Patna, 2(4), December, 1916.

Chattopadhyay, K.P., 'Santal, Migration', Proceedings of the 31st Indian Science Congress, Delhi, 1994.

Choudhary, Binay Bhushan, 'Revaluation of Tradition in the Ideology of the Radical Adivasi Resistance in Colonial Eastern India, 1855-1932', in Indian Historical Review, Part.I, 36,2,2009.

Choudhary, Binay Bhushan, 'Revaluation of Tradition in the Ideology of the Radical Adivasi Resistance in Colonial Eastern India, 1855-1932', in Indian Historical Review, Part.II, 37, I, 2010.

Chowdhury, Uma, 'Marriage Customs of the Santals', Bulletin of the Department of Anthropology, Calcutta, 1(1), January, 1952.

Culshaw, W.J., 'Some Notes on Bongaism', Journal of the Asiatic Society of Bengal, Calcutta, 5, 1939.

Damodaran, Vinita, 'History, Landscape, and Indigeneity in Chotanagpur, 1850-1980, in Journal of South Asian Studies, Vol.25, Issue no.2, 2002.

Damodaran, Vinita, Environment, Ethnicity and History in Chotanagpur, India, 1850-1970, in Environment and History, no.3, October 1997.

Das, Victor, 'Jharkhand Movement: From Realism to Mystification', , in Economic and Political Weekly, Vol.25, No. 30, Jul.28.1990.

Gadgil, Madav, ‘Sacred Groves : An Ancient Tradition of Nature Conservation’, in Scientific American, December 1, 2018.

Ghosh, Arunabha, ‘Probing the Jharkhand question’, in Economic and Political Weekly, Vol.26, No.18, May 4, 1991.

Guha, Avijit, ‘Scrutinising the Hindu Method of Tribal Absorption’, in Economic and Political Weekly, Vol.53, Issue No.17, 28 April, 2018.

Guha, Ramachandra, ‘Forestary and British and Post British India : A Historical Analysis’, in Economic and Political Weekly, Vol.18, Issue no.44, 29 Oct 1989.

Guha, Sumit,‘States, Tribes, Castes : A Historical Re-Exploration in Comparative Perspective’, in Economic and Political Weekly, Vol.50, Issue no.46-47, 21 November, 2015. \

Kochar, Vijay Kumar, ‘Village Organisation among the Santals’, Bulletin of the Cultural Research Institute, Calcutta , 5 (1-2), 1966.

Mohapatra, Prabhu Prasad, ‘Class Conflict and Agrarian Regimes in Chotanagpur, 1860-1950’, in The indian Economic and Social History Review, Vol.28, 1, 1991.

Mookherjee, Harshanath, ‘Ceremonies Associated with the Agricultural Operation of the Santals’, Folklore, Calcutta, 8 (3), March 1967.

Mukherjees, Charulal, “ ‘Baha’ The Santal Sal-Blossom Festival”, The Modern Review, Calcutta, 59(5), May 1936.

Olav Hodne, ‘Early Missionary Work among the Santals’, Santal Theological Seminary : Fiftieth Anniversary, 1961-1966, Santal Mission Press, Benageria, 1966.

Roy, S.N., ‘The Conversion of Santal to Hinduism’, Journal of The Bihar and Orissa Research Society, Patna, 2(1), March 1916.

Sengupta, Nirmal, ‘Class and Tribe in Jharkhand’, in Economic and Political Weekly, Vol.15, No.14, April 5, 1980.

Serwill, Captain Walter, ‘Notes Upon a Tour Through The Rajmahal Hills’, in Journal of The Asiatic Society of Bengal, No.VII, 1854.

Shore, John, ‘On Some Extraordinary Facts, Customs and Practices of the Hindus’, Asiatic Researches, Calcutta, 4, 1975.

Sundar, Nandini, “ ‘Custom’ and ‘Democracy’ in Jharkhand”, in Economic and Political Weekly, Vol.40, No.41, October 8-14, 2005.

Wadell, L.A., ‘The Traditional Migration of the Santal Tribe’,The Indian Antiquary,Bombay, 22, Oct.1893.

Walter Fernandes, ‘Rehabilitation Policy for the Displaced’, in Economic and Political Weekly, Vol.39, no.12, 26 March 2004.

Xaxa, Virginus, ‘Transformation of Tribes in India’, in Economic and Political Weekly, Vol.34, no.24, June 12, 1999.

Xaxa, Virginus, ‘Tribes as Indigenous People of India’, in Economic and Political Weekly, Vol.34, no.5, December 18, 1999.

3. Bengali Books

এলুইন, ভেরিয়ার, *আদিবাসী,* ভাষান্তর ও সম্পাদনা, ঋত্বিক মল্লিক, সেতু পাবলিকেশন, কলকাতা, ২০১২।

গুহ, রামচন্দ্র, *গাঁধী উত্তর ভারতবর্ষ,* (অনুবাদ), আশিস লাহিড়ী, আনন্দ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ২০১২।

ঘোষ, ঋষিপ্রতিম, *তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যে সাঁওতাল জনগোষ্ঠী,* পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০১২।

ঘোষ, সুবোধ, *ভারতের আদিবাসী,* ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ১৯৮৬, চতুর্থ মুদ্রণ ২০১৮।

চন্দ্র, বিপান, মৃদুলা মুখার্জি ও আদিত্য মুখার্জি, *ভারতবর্ষ স্বাধীনতার পরে ১৯৪৭-২০০০,* (অনুবাদ), আশিস লাহিড়ী, আনন্দ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০০৬, দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০১১।

চৌধুরী, বিনয়ভূষণ, ‘ধর্ম ও পূর্ব-ভারতে কৃষক আন্দোলন : (১৮২৫-১৯০০)’, ইতিহাস চর্চার ধারা, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০৫।

চৌধুরী, কমল, (সম্পাদনা), *সাঁওতাল বিদ্রোহ: সমাজ ও জীবন,* দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১১।

টুডু, বুদ্ধেশ্বর, *সাঁওতাল স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস,* জ্ঞানপীঠ পাবলিকেশন, কলকাতা, ২০১৬।

দত্ত, লোকনাথ, *সাঁওতাল কাহিনী,* অরুণ চৌধুরী, (সম্পাদনা), লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, ১৯৯৮।

দাস, স্বপন কুমার, (সম্পাদনা), *আদিবাসী জগৎ প্রবন্ধ সমগ্র,* আদিবাসী সাহিত্য প্রকাশনী, হাওড়া, ২০১৪।

দাস, স্বপন কুমার, (সম্পাদনা), *আদিবাসী জগৎ ও স্বদেশ চর্চা,* আদিবাসী সাহিত্য প্রকাশনী, হাওড়া, ২০১৮।

দাস, স্বপনকুমার, *লালমাটি,* আদিবাসী সাহিত্য প্রকাশনী, হাওড়া, ২০১৫।

দে, দেবশ্রী, *পূর্ব ভারতের আদিবাসী নারী বৃত্তান্ত ১৯৪৭-২০১০,* সেতু, কলকাতা, ২০১২।

দেবসেন, সুবোধ, *বাংলা উপন্যাসে আদিবাসী সমাজ,* পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০১০।

দেবী, মহাশ্বেতা ও পৃথ্বীশ সাহা, (অনুবাদ*), ভেরিয়ার এল্যুইন-এর আদিবাসী জগৎ,* সাহিত্য অকাদেমি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০০০, চতুর্থ মুদ্রণ ২০১৫।

পাল, শিবানন্দ, *সামাজিক প্রেক্ষাপটে সাঁওতাল মহাবিদ্রোহ,* হিরামনি মান্ডি, নদীয়া, ২০২১।

বড়ুয়া, সুপর্ণা লাহিড়ী, *ডাইনি হত্যার উৎস সন্ধানে,* সেতু প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৬।

বন্দোপাধ্যায়, তপন, শুভেন্দুশেখর ভট্টাচার্য, *সাঁওতালী কবিতা,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১০।

বন্দোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *আরণ্যক,* যূথিকা বুক স্টল, কলকাতা, ২০১১।

বাগ, গীতা, *বীরভূমের সাঁওতালি জীবন- বৈচিত্র্য,* আশাদীপ পাবলিকেশন, কলকাতা, ২০১৮।

বাস্কে ধীরেন্দ্রনাথ, *আদিবাসী সমাজ ও পালপার্বণ,* লোক সংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, ২০০৯।

বাস্কে, ধীরেন্দ্রনাথ, *পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ,* সুবর্ণরেখা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৬।

বাস্কে, ধীরেন্দ্রনাথ, *সাঁওতাল গণসংগ্রামে নারী সমাজের ভূমিকা,* সুবর্ণরেখা, কলকাতা, ২০০৬।

বাস্কে, ধীরেন্দ্রনাথ, *সাঁওতাল গণসংগ্রামের ইতিহাস,* বাস্কে পাবলিকেশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৭৬, অষ্টম প্রকাশ ২০১৩ ।

বাস্কে, ধীরেন্দ্রনাথ, *সাঁওতালী ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস,* বাস্কে পাবলিকেশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৯, অষ্টম প্রকাশ ২০১৬।

ভট্টাচার্য, প্রীতীন্দ্র কৃষ্ণ, (সম্পাদনা), *মুক্তির সংগ্রামে ভারত,* তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, ১৯৯৬।

ভাদুড়ী, পাঁচুগোপাল, *ভগনাদিহির মাঠে,* ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৫৫।

ভাদুড়ী, সতীনাথ, *ঢোঁড়াই চরিত মানস,* বেঙ্গল পাবলিশার্স (প্রাঃ) লিমিটেড, কলকাতা, ২০১১।

ভৌমিক, সুহৃদকুমার, (অনুবাদ ও সম্পাদনা), *সাঁওতালি : গান ও কবিতা সংকলন,* সাহিত্য একাডেমি, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৬, তৃতীয় মুদ্রণ ২০১৩।

মণ্ডল, অমলকুমার, *ভারতীয় আদিবাসী,* দেজ প্রকাশন, কলকাতা, ২০১৭।

মণ্ডল, পার্থ, 'অলচিকি লিপির উদ্ভব ও সাঁওতালি ভাষা আন্দোলন : সাঁওতাল সমাজের একটি দ্বান্দ্বিক সমস্যা (১৯২৫-২০০৩)', ইতিহাস অনুসন্ধান ৩৬, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, এস পি কপমিউনিকেশনস্ প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০২৩।

মাহাতো, পশুপতি প্রসাদ ও সজল বসু, *ঝাড়খণ্ড : সমাজ ও বিদ্রোহ-আন্দোলন,* বুকপোস্ট পাবলিকেশন, ২০২০।

মাহাতো, পশুপতি প্রসাদ, *জঙ্গলমহল ও ঝাড়খন্ড লোক দর্শন,* পূর্বালোক পাবলিকেশন, কলকাতা, ২০০৪

মিত্র, স্বর্ণ, *দামিন-ই-কো'র ইতিকথা,* বাস্কে পাবলিকেশন, কলকাতা, ২০১৩।

মিদ্দে, ড. সুরঞ্জন, *সাঁওতাল ও মিশনারি,* নান্দনিক, কলকাতা, ২০১৮।

মিশ্র, শিবেন্দুশেখর, *সাঁওতাল সমাজ সংস্কৃতি ও সংগ্রাম,* লোক সংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, ২০১৭।

রাণা, কুমার ও সৌমিত্রশংকর সেনগুপ্ত, (সম্পাদনা), *সাঁওতাল লোককথা : পল ওলাফ বোডিং এর সান্তাল ফোক টেলস-এর বাংলা তর্জমা,* দি এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা, ২০২২।

রানা, কুমার, *বিরসা মুন্ডা,* দোয়েল প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৬।

রায়, অরিন্দম, *আদিবাসী জীবনের আখ্যান ও আখ্যানে আদিবাসী জীবন,* এবং প্রান্তিক, ২০১৮।

রায়, মোহিত, (সম্পাদনা), *পরিবেশ চর্চা : ইতিহাস ও বিবর্তন,* অনুষ্টুপ, কলকাতা, ২০১৫।

রায়, শরৎচন্দ্র, *ভারতবর্ষের মানব ও মানব সমাজ,* দেজ পাবলিশিং,কলকাতা, ১৯৩৮.

রায়, সুপ্রকাশ, *সাঁওতাল বিদ্রোহ,* র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা, ২০১১।

সিকদার, সুকুমার ও সারদা প্রসাদ কিস্কু (অনুবাদ ও সম্পাদনা), *খেরওয়াল বংশা ধরম পুথি : সাঁওতাল ধর্ম ও সংস্কৃতির আদিগ্রন্থ,* নির্মল বুক এজেন্সি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০০৪, তৃতীয় সংস্করণ ২০০৭।

সেন, শুচিব্রত, *সত্তার সন্ধানে : বঙ্গসংস্কৃতি, আদিবাসীযাপন ও অন্যান্য,* আশাদীপ, ২০২০।

সেন শুচিব্রত, *ভারতের আদিবাসী : সমাজ, পরিবেশ ও সংগ্রাম,* বুকপোস্ট পাবলিকেশন, কলকাতা, ২০২১।

সেন, ক্ষিতিমোহন, *ভারত-সংস্কৃতি,* বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ২০১৫।

সেন, শুচিব্রত, *পূর্ব ভারতের আদিবাসী অস্তিত্বের সঙ্কট,* দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৩।

হেমব্রম, পরিমল, *আদিবাসী স্বাধীনতা সাংগ্রামীদের কথা,* আদিবাসী সাহিত্য প্রকাশনী, হাওড়া, ২০১৮।

হেমব্রম, পরিমল, *ঝাড়খণ্ডের ইতিহাস,* সাহিত্যম প্রকাশন, কলকাতা, ২০১৮।

হেমব্রম, পরিমল, *সাঁওতালি ভাষা-চর্চা ও বিকাশের ইতিবৃত,* নির্মল বুক এজেন্সি, কলকাতা, ২০১০।

হেমব্রম, পরিমল, *সাংবিধানিক স্বীকৃতির দাবীতে সাঁওতালি ভাষা আন্দলেনের ইতিহাস,* আদিবাসী সাহিত্য প্রকাশনী, হাওড়া, ২০১৭।

4. Bengali Journals

অক্ষরেখা, একাদশবর্ষ, প্রথম সংখ্যা, সম্পাদক, নীলকমল সরকার, সেপ্টেম্বর, ২০১৮।

অনুষ্টুপ, ভারতীয় উপমহাদেশে ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির মানচিত্র, ৫২ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা সম্পাদক, অনিল আচার্য, প্রাক-শারদীয় বিশেষ সংখ্যা, ২০১৮।

অনুষ্টুপ, আদিবাসী ভারত বিশেষ সংখ্যা, বর্ষ ৫৬ সংখ্যা ৪, সম্পাদক, অনিল আচার্য, প্রাক্-শারদীয় ২০২২।

পরিকথা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক বার্ষিক পত্রিকা, দ্বিতীয় সংখ্যা, সম্পাদক, দেবব্রত চট্টোপাধ্যায়, ডিসেম্বর, ১৯৯৯।

স্বদেশচর্চা লোক, প্রান্তবাসী : সমাজ-সংগ্রাম-সংস্কৃতি, সম্পাদক, প্রনব সরকার, শারদ সংখ্যা, অক্টোবর ২০১৮।

কোরক, পরাধীন ভারতের বিদ্রোহ, সম্পাদক, তাপস ভৌমিক, শারদ ২০২১।

পশ্চিমবঙ্গ, সাঁওতাল বিদ্রোহ সংখ্যা, বর্ষ ২৯, সংখ্যা ২-৬, সম্পাদক, দিব্যজ্যোতি মজুমদার, ১৪, ২১, ২৮ জুলাই ও ৪, ১১ আগস্ট ১৯৯৫।

অন্তর্মুখ, একুশ শতক : সমাজতাত্ত্বিক বীক্ষণ, পর্ব-৮, সংখ্যা-১, সম্পাদক, খোকন কুমার বাগ, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৮।

এবং প্রান্তিক, বর্ষ ৯, সংখ্যা ২০, সম্পাদক, আশিস রায়, ২৩ মে ২০২২।

খোয়াই, বর্ষ ৪৮, সংখ্যা ৪৮, সম্পাদক কিশোর ভট্টাচার্য, ৯মে ২০২২।

5. Santali Books

হাঁসদা, কানাইলাল, *খেরওয়াল বিরৌদালি কোওয়াঃ মারেন নাগাম*, আদিবাসী সাহিত্য প্রকাশনী, হাওড়া, ২০০৮।

কিস্কু, বুধন, *খেরওয়াল হপন কোওয়াঃ সিরজন কৌহ্নি*, প্রজ্ঞা প্রকাশনী, ২০০২।

মুরমু, রামেশ্বর, *জাহের বঙ্গা সান্তাড় ক*, আদিম পাবলিকেশন, কলকাতা, ২০০১।

বেসরা, দময়ন্তি, *সানতাড়ি সাঁওহেদ রেয়া নাগাম*, রয়্যাল পাবলিকেশন, ২০১২।

হেমব্রম, নিন্তানন্দ, *খেরওয়াল সাঁওনতা রেয়াহঃ নাগাম*, মার্শাল বাস্বার, ঝাড়গ্রাম, ২০১২।

হেমব্রম, নিন্তানন্দ, *খেরওয়াড় কয়াঃ ঔরিচৌলি আর রৌয়রিত রেয়াঃ তেতেদ*, লিখন গড়হন, ঝাড়গ্রাম, ২০০৯।

খেরওয়াড় ঘাঁরঞ্জ ঔন-ঔরি, আসেকা সম্পাদিত ও প্রকাশিত, কলকাতা, ২০১৬।

টুডু, কৃষ্ণচন্দ্র, *সানতাড়ি পৌরসি সাঁওহেদ,* মার্শাল বাস্কার, ঝাড়গ্রাম, ২০১৮।

হাড়াম, কোলিয়ান ও জুগিয়া, *হড়কোরেন মারে হাপড়ামকো রেয়াঃ কাথা,* রেভানেণ্ড এল ও স্ক্রেফ্সরুড(সম্পাদিত), সান্তাল মিশন অফ দ্য নর্দেন চার্চেস, বেনাগড়িয়া, ১৮৮৭।

দেশমাঞ্ঝি, ছটরায়, *দেশমাঞ্ঝি রেয়াক কাথা,* ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে (আনুবাদ), সাঁওতাল গণসংগ্রামের ইতিহাস, বাস্কে পাবলিকেশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৭৬, অষ্টম প্রকাশ ২০১৩।

6. Santali Journals

Umul, Vol.19, No.3-4, Editor, Binay Kumar Soren, Jul-Dec, 2021.

Sarjom Umul, Vol.8, Issue No.4, Editor, Ganesh Marandi, Oct. to Dec. 2018.

Sarjom Umul, Vol.8, Issue No.10, Editor, Ganesh Marandi, Oct-Nov-Dec, 2021.

Sibil, Vol.I, Issue No.III, Editor, Sanat Kumar Hembram, Apr to June, 2009.

Nonol Tiryo, Vol.I, Issue.I, Editor, Pradhan Murmu, Apr-Jun, 2019.

7. Hindi Books

দীনেশ, বী, এন, *সান্তাল পরগণা ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব ও সংস্কৃতি,* প্রথম ভাগ, একাডেমিক ফোরাম, দুমকা, ২০০৪।

সোরেন, ইংরেজ, *ইতিহাস কে আইনে মে সান্তাল পরগণা,* বীণা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, দুমকা, ২০১৪।

8. Online Sources:

http://www.academia.edu/Documentsin/santal

http://www.jstor.org

http://www.tribalzone.nct/history/santhal.htm

http://www.tribalzone.net/history/santhal.htm

http:/archive.org

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Damodar_Valley_Corporatio,

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Five-Year_Plans_of_India.

https://indiankanoon.org/search/?formInput=AIR%201974%20+doctypes:patna,

https://www.ideasforindia.in/topics/governance/land-disputes-in-santhal-parganas-issues-and-solutions.html

https://www.revolvy.com/page/santhal

https://www.wbiwd.gov.in/index.php/applications/mayuraksh